অমৃতা প্রীতমের গল্প

বিশেষ রচনা   কানোরিয়া জুটমিল প্রসঙ্গে

বিতর্ক   মৌলবাদ   তসলিমা নাসরিন

756.3
017/B

নানা ভাষা নানা মত
নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ
মিলন মহান

107

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ৪৪৯/৯৪

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ৪৪৯/৯৪

সংগ্রহে রাখার জন্য সেরা বই বেছে নিন

প্রতিবেশী সাহিত্য (ছোটগল্প)

উর্দু গল্প সঙ্কলন ২৪·০০
ওড়িয়া গল্প সঙ্কলন ১০·০০
গুজরাতী গল্পসঙ্কলন ১৭·০০
তেলেগু গল্প সংগ্রহ ২৬·০০
প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ ৩৮·০০
সমকালীন মালয়ালম ছোটগল্প সঙ্কলন ২৫·০০
জয়কান্তনের গল্পগুচ্ছ ৩৮·০০
পত্নমৌপত্তনের গল্পগুচ্ছ ৯·৫০

প্রতিবেশী সাহিত্য (উপন্যাস)

কন্নড় : **চিক্কবীর রাজেন্দ্র**—"মাস্তি" বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার ৩৩·০০
শান্তি—শান্তিনাথ দেশাই ৩২·০০
মৃত্যুর পরে—শিবরাম কারন্ত ১৮·০০
মলয়ালম : **ফেলে আসা দিনগুলি**—কে. পি. কেশব মেনন ২৮·০০
লালুকেট্টু—এম. টি. বাসুদেবন নায়ার ১৬·০০
পুতম্মার ছাগল ও বাল্যসখী—ভৈকম মু. বশীর ১০·০০
হিন্দী : **বিন্দু ও সিন্ধু**—অমৃতলাল নাগর ৩৭·০০
ময়লা আঁচল—ফণীশ্বর নাথ "রেণু" ১৮·৭৫
মানুষের রূপ—যশপাল ২০·৭৫
ওড়িয়া : **দানাপানি**—গোপীনাথ মহান্তি ২২·০০
শাস্তি—কান্থচরণ মহান্তি ২৪·০০
বিষন্ন বসুন্ধরা—উপেন্দ্র কিশোর দাশ ৯·৫০
উর্দু : **বহ্নি সাগর**—কুর অতুলয়েন হায়দার ২৯·০০
পুরনোলখনউ—আব্দুল হলীম শরর ২১·২৫

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীণ পার্ক, নয়াদিল্লি 110016
পূর্বাঞ্চল শাখা কার্যালয়, 5A, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা 700073

অশ্লীল ছবির প্রদর্শণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনের ছাড়পত্র ছাড়া কোন চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে প্রদর্শন করা যায় না। কোন কোন সিনেমা হাউস ও ভিডিও পার্লারে বৈধ ছাড়পত্র পাওয়া ছবির সঙ্গে উক্ত বোর্ড কর্তৃক বাতিল করা বা ভিন্ন কোন অশ্লীল ছবির অংশ বিশেষ বেআইনীভবে জুড়ে এমন ছাড়পত্রহীন সম্পুর্ণ অশ্লীল ছবি দেখানোর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। কই জাতীয় অবৈধ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ঘটনা নজরে পড়লে স্থানীয় থানায় জানান। কলকাতায় ডি. সি. ডি. ডি, লালবাজার এবং জেলাতে জেলা পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের গোচরেও আনুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ৪৪৯/৯৪

পরিচয়

জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, মাঘ—ফাল্গুন ১৪০০
৬৩ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

মাও জে দং-জন্মশতবর্ষ : বাসব সরকার ১
মাও জে দং-এর কয়েকটি কবিতা অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রবন্ধ :

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ-স্মরণে মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৭
শতবর্ষের আলোয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র অমূল্যভূষণ গুপ্ত ৩৪
পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (১৯৩৭-৪৭) সুস্নাত দাশ ৪৯
মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ : একটি প্রত্যুত্তর / সমীরকুমার দাস ১১৬

প্রতিবেশী গল্প

এক নম্বরের তফাৎ অমৃতা প্রীতম অনুবাদ : মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫

গল্প :

চোখবন্ধের খেলা জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১০১

কবিতা

তুষার চৌধুরী কৃষ্ণা বসু প্রদীপচন্দ্র বসু ৪৬—৪৮
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত বসু রূপা দাশগুপ্ত বিজয় মাখাল
মুরারী ভট্টাচার্য কৌশিক মিত্র কৃষ্ণা রায় অরূপ পান্তী ১০৯—১১৫

আলোচনা / বিতর্ক / মতামত

যুক্তি, বিশ্বাস ও জীবন প্রদীপ বসু ১৩৮
তসলিমা নাসরিন : আলোড়নে-সম্ভাবনায় শিবাশিস দত্ত ১৫৮
বিতর্ক : তসলিমা নাসরিন সুভাষ বসু ১৬৩

চিঠিপত্র

১৬৬—১৭০

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

কানোবিয়ার স্বপ্ন   শিবাশিস দত্ত   ১৭১

পুস্তক পরিচয়

কার্তিক লাহিড়ী ১৭৬ সব্যসাচী সরকার ১৭৯ সিদ্ধার্থ সাহা ১৮৪
প্রবীরকুমার সাহা ১৮৭ অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৯০ জগন্নাথ ঘোষ ১৯৫

বিয়োগপঞ্জি

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সৌরীন ভট্টাচার্য ১৯৯ উৎপল দত্ত
বিষ্ণু বসু ২০৬ সুনীল সেন সৌরেন বসু ২১১

প্রচ্ছদ :

সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
রঞ্জন ধর

P, 5412

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

মাও জে দং-জন্মশতবর্ষ

বাসব সরকার

"দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব"। চীন বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মাও জেদং যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন তার পর প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তখনও চীন বিপ্লবের সাফল্য দূরবর্তী ছিল। সাফল্য সম্পর্কে একটা সুগভীর প্রত্যয় ছাড়া মাও কিম্বা তাঁর সহযোদ্ধাদের জোর করে বলার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। চীন বিপ্লবের সফল পরিণতি মাওয়ের বক্তব্যের মর্মবস্তুকে একসূত্রে গাঁথতে পেরেছিল। কিন্তু তার পরেও তো সাড়ে চার দশক কেটে গেছে। এরই মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ও ঘটে গেছে। এক দশক আগেও সমাজতন্ত্রের রুশ বা চীনা মডেল বলে যা ছিল আজ তার তা নেই, তাহলে মাওয়ের জন্মশতবর্ষে একথাগুলির আদৌ কি কোন অর্থ, তাৎপর্য আছে?

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ মাও জীবিত থাকলে শতায়ু হতেন। শতায়ু হতে না পারা কোন ত্রুটি নয়। মানুষ শতায়ু হলেই স্মরণীয় বা বরণীয় হন না। মাও জন্মশতবর্ষে চীনের বাইরে বহু দেশে যেখানে তাঁর শতবর্ষ জয়ন্তী হচ্ছে, সেখানে অশীতিপর মাও জেদং নয়, চীন বিপ্লবের নেতা মাও, মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশের অন্যতম মুখ্য নেতা হিসেবেই তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। সুতরাং জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কি বলা হয়নি অথবা যায়নি, তাদের বদলে কি কথা বলা যেতে পারে এবং বলা হয়েছে, অক্লেশে এবং নির্দ্বিধায়, সেটার উপরেই জোর পড়েছে। শেষোক্ত এই কাজের সঙ্গে যে মাও জড়িত, তিনি আমাদের সুপরিচিত। দুনিয়ার মানুষ একদা এই মাওকে বিপ্লব-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখেছিল। আজও তারা দেখতে চায় সেই একই বিপ্লবের তাগিদ থেকে। জনগণের দাবিতে, প্রচেষ্টায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যেখানে বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা, অনিবার্যতা সম্পর্কে ধারণা বদল হয়নি এতোটুকু, সেখানে মাওয়ের ভাবমূর্তি অম্লান রয়েছে। তার ভিত্তি কোথায় এবং কতোটুকু, সেটি বোঝা ও বিশ্লেষণ করা গেলেই শতবর্ষ জয়ন্তী অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতার বদলে জনচিত্তের গভীরে প্রবেশের সুযোগ পাবে। এই সম্ভাব্যতাই মাওয়ের অভিজ্ঞতাকে সমকালীনতার মাত্রা দিয়েছে।

দুনিয়ার সব দেশ, সব জাতি, সব ধরনের মানুষের কাছে বলা বাহুল্য এই সম্ভব্যতার কোন চরম মূল্য নেই। মাও যখন সেকথা বলেন, তখন তিনিও তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিশ্ব পরিসরে প্রযোজ্য বলে মনে করেন নি। ফলে চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা কেবল চীন দেশেই প্রাসঙ্গিক বলা হয়েছিল। সন্দেহ নেই দুনিয়ার প্রতিটি বিপ্লবই অন্যের চোখে নিজেকে যাচাই করে নিতে চায়। চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম ঘটেছিল। এই অভিজ্ঞতার সমীকরণ ঘটবে তৃতীয় দুনিয়ার পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সঙ্গে। মোটামুটি এটাই ছিল বিশ্বাস। বিগত চার দশকে যে ঔপনিবেশিক দুনিয়া কখনও ধীরে কখনও দ্রুতগতিতে তৃতীয় দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে, সেখানে চীন বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই। কোরিয়া, ভিয়েতনাম কিম্বা কিউবা'য়. কোথাও চীনা মডেল স্বজ্ঞানে অনুসৃত হয়নি। কোথাও তার আপাতঃ মিল কিছু থাকতে পারে কিন্তু সেই মিলের প্রান্তিক গুরুত্বও নেই। অথচ "চীনের পথ, আমাদের পথ" বলার সময় এটাই ছিল আন্তরিক বিশ্বাস। লক্ষ্য করা দরকার জীবনের শেষ দশ বছরে মাও এই ধরণের বক্তব্য এমন কি "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" এর মতো অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর ধারণার বিরোধিতা করেছেন কিম্বা কাউকে বিরোধিতার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও শোনা যায় নি। তবু মাও আজ স্মরণীয় কেন?

মাও ছিলেন এমন একজন জননেতা যিনি চীনা জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে, প্রাগ্রসর থেকে নিরক্ষর, দীন দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে এক ধরণের একাত্মতা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কথায় ও কাজে জনগণের উপর গভীর আস্থা প্রকাশ করা, তাদের সঙ্গে নিয়ে চলা, ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজে শেখা ও জনগণকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মধ্যে যে স্থির লক্ষ্য আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে, সেটাই মাও নেতৃত্বকে অনন্যতা দিয়েছে। লং মার্চের দিনগুলি থেকে মাও ও তাঁর সহযোদ্ধারা যে ভাবে জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন, সেটাই চীন বিপ্লবের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল। বিপ্লব-পূর্ব গৃহযুদ্ধের দিন গুলিতে গণমুক্তি ফৌজ বহুক্ষেত্রে চিয়াং কাইশেখের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চলানোর সময় যে ভাবে গণ সমর্থন লাভ করেছিল, এক একটি অঞ্চলের মানুষ যে ভাবে নিজেদের যা কিছু হাতিয়ার নিয়ে অভিযানে সামিল হয়েছিল, এমন কি অনেক সময়

চিয়াং বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে কিম্বা সরকারী পক্ষ ছেড়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে ছিল. তার থেকে প্রমাণ হয় মাওয়ের বিপ্লবী রণকৌশল কতোটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। এখানেই সোভিয়েত বিপ্লবের সঙ্গে চীন বিপ্লবের একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ; করা যায়। লেনিনের ডাকে অক্টোবর মহাবিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের অন্যান্য জঙ্গী অংশের মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটেছে, কিন্তু দেশের জনগণের ব্যাপক অংশে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়ার ঘটনা ঘটেছে পরে। মস্কো বা পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েত সমূহের মধ্যে যে অভ্যুত্থান ঘটে, সেই বিপ্লবী চেতনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বিপ্লবের পরে, তার সদর্থক দিকগুলি লক্ষ্য করে। কিন্তু চীনবিপ্লবে সেই প্রক্রিয়া চলছে এক সঙ্গে পাশাপাশি। দেশের নানা অঞ্চল থেকে গণমুক্তি ফৌজ এলাকার পর এলাকা মুক্ত করতে করতে এসে জড়ো হয়েছে রাজধানীর উপর চরম আঘাত হানতে। মাও যখন বলতেন বিপ্লবীরা জনগণের মধ্যে মিশে থাকলেই সংগ্রামী থাকতে পারে, যেমন মাছ জলে থাকলেই সজীব থাকে, সেটা চীন বিপ্লবের শিক্ষা।

মাও মানবমুক্তিতে বিশ্বাস করতেন আন্তরিকভাবে বলেই চীনা জনগণকে আর্থ-সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্বিক দিক থেকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। চীনের যে চরম পিছিয়ে পড়া মানুষদের, তাঁর আগে অনেক আন্তরিকভাবে জনদরদী নেতা সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াইয়ে বোঝা বলে মনে করতেন, মাও সেই পিছিয়ে থাকা মানুষদেরই বলেছেন বিপ্লবী সংগ্রামের সম্পদ। কারণ এই হতদরিদ্ররা জীবনের দুঃখ কষ্টের মোকাবিলায় এমনই পোড় খাওয়া, এদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নিকাশগুলি এমনই সামান্য ও সাধারণ যে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে বোধহয় অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হতে পারে। চীনের মতো দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশে এমন দেশ জোড়া বিপ্লবী আলোড়ন অন্য কোন ভাবে ঘটানো যেত কিনা সন্দেহ। তার অর্থ মোটেই এটা নয় যে মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র যতো বাড়বে ততোই বিপ্লবী চেতনা ও তৎপরতা বাড়বে। বিপ্লবীয়ানার নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের তত্ব যে নিতান্ত অর্থহীন, সেকথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ভারত সহ তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে যে আজো গণবিপ্লব ঘটেনি, তার থেকেই বোঝা যায় বিপ্লবের দারিদ্র্য সূত্র পাগলামীর

নামান্তর। সেটা অতি বিপ্লবীয়ানায় মদৎ দেয়, দিতে পারে, বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে পারে না।

মাও যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র, সাংস্কৃতিক মানে অনগ্রসর চীনের বিপুল জনগণকে বিপ্লবী সক্রিয়তার সম্পদ বলে ছিলেন, তখন তিনি তাদেরই একজন সহমর্মী, সহকর্মী, সহযোদ্ধারূপে তাদের চেতনার নাড়ীতে হাত রেখেই সেকথা বলতে পেরেছিলেন। চীনা কৃষকদের জীবনের অভিজ্ঞতার, সংগ্রামের শরিক হিসাবে তিনি প্রাগ্রসর চিন্তার ভিত্তিতে তাদের এক পা এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদের সেই আন্তরিক স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিলেন যে, এই মানুষটি তাদেরই ভাষায়, তাদের কথা বলে। তুলনা হয়তো করা যায় না, তবু জনচিত্তের নানা দিক উপাদান, উপকরণ সম্পর্কে এদেশে গান্ধী যে গভীর অনুভবের পরিচয় দিয়ে ছিলেন, মাওয়ের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছিল আরো ব্যাপক ভাবে। গান্ধী অনেকবার বলেছেন, ভারতের মাটিতে আমি কান পেতে আছি। জনগণের অস্থির পদচারণার শব্দ আমি শুনতে পাই। কথাটা মাও বলতে পারতেন, প্রায় একই ভাবে ও ভাষায়। মাও নেতৃত্বের জোরটা ছিল এইখানে যে, তিনি চীনের মানুষদের বোঝাতে পেরেছিলেন বিপ্লব করার জন্য তিনি জনগণকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন না। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই তিনি পায়ে পায়ে হাঁটতে চেয়েছেন বৃহত্তর, মহত্তর একটা লক্ষ্য পূরণের দিকে। তাঁর জীবন ও কাজে এই কথা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল বলেই তাঁর নেতৃত্ব এইভাবে সফল হতে পেরেছিল।

মাও সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন সমাজ পরিবর্তনের চেতনা মানুষের মনে জাগিয়ে তোলাই হলো বিপ্লবের সবচেয়ে বড়ো কাজ। সেই পরিবর্তনের দায় ও দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে। সেই সুপ্ত শক্তির বোধন ঘটাতে গেলে মানুষের মধ্যে মিশে কাজ করতে হবে। সেটা কোন মঞ্চশোভন নেতার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে করা যাবে না, কোন উপদেশ দিয়ে নয়, তাদের সঙ্গে একত্রে সাফল্য-ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে ঘটাতে হবে। সেই চেতনাই তাঁকে বলতে প্রেরণা দিয়েছিল 'জনগণ চায় বিপ্লব' যাকে নেতা সুলভ বাণী বলে মনে করা ভুল।

'জাতি চায় মুক্তি' কিম্বা 'দেশ চায় স্বাধীনতা' দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী-কালে, অক্টোবর মহাবিপ্লবের বিশ্বজোড়া তাৎপর্যের অভিঘাতে অন্য অনেক

দেশের অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাও প্রায় একই কথা বলেছেন। আর শুধু তাই বা বলি কেন। আমাদের দেশে বিশ শতকের সূচনায় অনেক বরেণ্য নেতাও বলেছেন : 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, সেটা পেতেই হবে'। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহ উনিশ শতক থেকেই দূরদর্শী বহু মানুষকে আলোড়িত করেছিল। দেশের স্বাধীনতার দাবি ইতিহাসের কারণেই দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় শোনা গেছে। দেশের স্বাধীনতার দাবি জোরালো হয়ে ওঠার সূত্রেই ক্রমে জাতির মুক্তি দাবিতে পরিণত হয়। জাতির মুক্তি দাবি যে দেশের স্বাধীনতা দাবির চেয়ে আরো অর্থবহ, আরো গভীর পরিবর্তনের তাৎপর্যবহন করে, সেটা অবশ্যই প্রথম থেকে স্পষ্ট ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বরং জাতীয় মুক্তির কথা দেশের স্বাধীনতা দাবিকেও ছাপিয়ে ওঠে। কারণ মানুষ অভিজ্ঞতায় বোঝে দেশের স্বাধীনতা হলো একটা রাষ্ট্রিক পরিচয়, পরাধীন দেশের মানুষের কাছে তার বিরাট মূল্য থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের স্বাধীনতার মধ্যেও জাতির প্রকৃত মুক্তি নাও ঘটতে পারে। তৃতীয় দুনিয়ায় এমন রাষ্ট্র শতাব্দীর এই শেষ দশকে বিরল নয়, যার স্বাধীনতা কেবল জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীত আর জাতীয় রাজধানীর মধ্যেই আবদ্ধ রয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা অর্থাৎ রাষ্ট্রসত্তার সার্থক রূপ প্রকাশ পেতে পারে জাতির মুক্তিতে।

আর একথা বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে জাতীয় মুক্তি আর জনগণের মুক্তি এক নয়। এই দুয়ের মধ্যে থাকে আশমান-জমীন ফারাক। গণমুক্তির ভিৎ গড়ে ওঠে শোষণ মুক্তি থেকে। বিপ্লব হলো সেই শোষণ মুক্তির ডাক। মাও 'স্বাধীনতা-মুক্তি-বিপ্লব' এই তিনটি ধারণাকে এক সূত্রে গ্রথিত করে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজো নিঃশেষিত হয়নি। মাও যেখানে দেশের স্বাধীনতা ও জাতির মুক্তির কথা বলেন সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তার সদর্থক দিকটি তুলে ধরেন। আর যেখানে তিনি জনগণের বিপ্লবের কথা বলেন, সেখানেই তিনি জাতীয় বিপ্লবী থেকে সমাজ বিপ্লবীতে পরিণত হন। মাও জেদংয়ের চিন্তাধারায় এই দুটি দিক, চীন-বিপ্লবের পটভূমিতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ চীনের বাস্তব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হয়েও জাতীয় পরিসরে তার তাত্ত্বিক প্রয়োগ সম্ভব করার জন্যই মাওকে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হয়। সেখানেই তাঁর অনন্যতা।

অনেকেই মাওয়ের শতবার্ষিকী মূল্যায়নে বলেছেন তাঁর প্রধান অবদান হলো মার্কসবাদকে ইউরোপকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার অন্য মহাদেশের অ-পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে প্রয়োগ করা। চীনের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় গণবিপ্লবকে সমাজ পরিবর্তনের মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সময় তিনি তত্ত্ব ও প্রয়োগের যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, বিশ্ববিপ্লবের এই তত্ত্বের অ-ইউরোপীয়করণ ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। সমাজবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বই যেভাবে তাকে পাওয়া যায়, হুবহু সেই ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। প্রতিটি সমাজের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলি সেটা করতে দেয় না। তাই সমাজ পরিবর্তনে কেবল নয়, স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামেরও কোন মডেল হয় না। এই সত্য বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে, অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। মাও যখন তাঁর দেশে একই সঙ্গে আধা-ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির জন্য দেশের স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়ার কবল থেকে বের হয়ে আসতে জাতির মুক্তি, আর সামন্ততন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থের শোষণ থেকে অব্যাহতি পেতে গণবিপ্লবের কথা বলেন, তখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চৈনিকিকরণ, Sinification সম্পূর্ণ হয়। তৃতীয় দুনিয়ার দেশ ও রাষ্ট্রগুলির বিকাশপর্ব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মাওয়ের এই বক্তব্যের প্রথম দুটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ ও জাতির স্তরে তাদের অভিজ্ঞতার সমধর্মী উপাদান কিছু আছে। কিন্তু শেষ পর্বে অর্থাৎ গণবিপ্লবের পর্বে সেখানে পার্থক্য বিরাট এবং সেটাই স্বাভাবিক। পাঠকদের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই প্রসঙ্গে সম্ভব বলে মনে করি।

সেটা ১৯৫১ সালের দ্বিতীয়ার্ধের কথা। ভারত থেকে প্রথম বেসরকারী একটা শুভেচ্ছা মিশন তখন চীন সফর করে দেশে ফিরেছেন। তার নেতৃত্ব করেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা পণ্ডিত সুন্দরলাল। দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তিন জনের নাম মনে পড়ে। তাঁরা ছিলেন ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও যিনি পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন, আর দুজন বাঙালি অধ্যাপক, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। এঁরা দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষক। ফিরে আসার পর দ্বারভাঙ্গা হলে এক সভার আয়োজন করে ছাত্র সংসদ, যেখানে পণ্ডিত সুন্দরলাল, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরারি চক্রবর্তী তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের শুনিয়ে

ছিলেন। বিপ্লবের পর তখন দু'বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। বিপ্লবোত্তর চীনে নেতৃত্বের যে সব বৈশিষ্ট্য সুন্দরলালকে অভিভূত করেছিল সেগুলি তিনি গান্ধী নেতৃত্বের সমধর্মী বলে মনে করেছিলেন। এই প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা বক্তৃতার মধ্যেই মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে শ্রোতাদের স্মরণ করাতে থাকেন দেশ পরিচালনায় গণস্বার্থ সম্পর্কে গান্ধী কি বলেছেন আর নেতারা তার থেকে কতোদূরে সরে গেছেন, আর সেখানে মাওয়ের সঙ্গে গান্ধীর মিল কতো বেশি। অন্য দুই অধ্যাপকও তাঁদের বক্তৃতায় এটুকু বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজ পরিবর্তনে মাও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাদের থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে নয়। আর এই জনগণ সত্যই চীনের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, শাসকদলের সদস্য ও সমর্থক নয়। বলা বাহুল্য জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় বড়ো রকমের পার্থক্য না ঘটে গেলে এটা সম্ভব ছিল না।

এই পর্যন্ত কিম্বা তার পরেও কয়েক বছর মাও যা করেছেন, বলেছেন তার সঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশের আম জনতা অভিজ্ঞতার সমীকরণ ঘটাতে পারাকে নিজেদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বদলের উদ্যোগে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে সুরু করে। মাওয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও বহু জ্ঞানীগুণীজন মনে করেন এই সময় থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিমণ্ডল, সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক, তৃতীয় দুনিয়ার বিকাশমান পরিস্থিতি এবং চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সব কিছু মিলে মিশে মাও নেতৃত্বের জাতীয়ওবিশ্বপরিস্থিতি মূল্যায়নে এমন একপেশে, আত্মমুখীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য ঘটায় যে বিপ্লবের নেতা মাও ক্রমেই জাতীয়তাবাদী মানসিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বাস্তব কারণ এই ছিল অথবা অন্য কিছু, এখনো তার বিশ্লেষণে কোন সদর্থক উত্তর পাওয়া যায়নি। যা কিছু বলা বা ভাবা হয়ে থাকে তার মধ্যে সাবজেক্টিভ্ ধারণার বাহুল্য থাকা অস্বাভাবিক তো নয়ই বরং খুবই সম্ভব। তা ছাড়া মাও জীবনের এই পর্ব থেকে প্রয়াণকাল ১৯৭৬ পর্যন্ত, চীনের অভ্যন্তরীন ইতিহাস নিয়ে একদিকে প্রবল উচ্ছ্বাস ও অন্যদিকে প্রচণ্ডতম ধিক্কারের যে বন্যা বয়ে গেছে সেখানে নির্মোহভাবে প্রায় কিছুই বলা হয়নি। হয়তো বর্তমানে মার্কসবাদী নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা প্রবীণ তাঁদের অনেকেই বস্তুনিষ্ঠভাবে কিছু বলা অসম্ভব মনে করেই চুপ করে আছেন। ওই কাল পর্বে যাঁরা মাও নেতৃত্বের অনেক

কাজের সমালোচনা কিছুটা নীচু গলায় শুরু করে পরে কঠোর বিরোধিতার লাইন করে ছিলেন, তাঁরা কিছুটা আত্মসমালোচনার সুরে তাঁদের পুরানো মত প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজেদের সমালোচকের ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাইছেন। আর যাঁরা মাওয়ের বক্তব্যকে সমকালের মার্কসবাদ নাম দিয়ে তাকে 'মাওবাদ' বলতে সুরু করেছিলেন তাঁরা কিছু ভুল ত্রুটি স্বীকার করে মাও নেতৃত্বের বিচ্যুতির দায় অন্যদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মাওয়ের বক্তব্যের আলোয় সব কিছু বিচার করে বাকিসব মতামত মেহের আলির মতো সব ঝুট্ হ্যায় বলতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রের হালফিল বিপর্যয়ের পর লেনিনকেও রেয়াৎ না করে মূল মার্কসে ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন। এই সব তাত্ত্বিকদের বক্তব্য এতোটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার একমাত্র কারণ হলো শুধু এইটুকু বলা মাও, চীন, সমকালীন দুনিয়া, নিজের দেশের সামাজিক বাস্তবতা কোন কিছুই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার না করে কোটেশন ধর্মী পাণ্ডিত্যের চমক দেখিয়ে নাম করার প্রবণতা তাঁরা তখনও ছাড়তে পারেন নি, এখনও না।

মাও নেতৃত্বের বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ণ তাঁর জন্মগত বর্ষেও অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন অথবা আন্তর্জাতিকতাবাদী, মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষা নাকি চীনের বাস্তবতা কোনটি তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিল, সেই আলোচনা করার মতো সময় এখনো আসেনি এবং প্রস্তুতি করাও সম্ভব হয় নি, এই সত্যটুকু জন্মশতবর্ষে মাওয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় স্বীকার করে নেওয়া ভালো। চীনে মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতা কেন পঞ্চাশের দশকের শেষে গ্রেট লিপ্ ফরোয়ার্ড নীতি ঘোষণা করে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েও সেই ব্যর্থতার কোন আত্মসমালোচনা করলেন না, কেন তাঁর মতো একজন বিপ্লবী নেতা পার্টি ও দেশের জন্য নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মতো বুর্জোয়া অভ্যাসের শিকার হলেন, কেন চীনের রাষ্ট্রনীতিকে প্রাক্‌বিপ্লব চীনের চিরাচরিত ধারায় সম্প্রসারণবাদী করার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, কেন বিশ্ব রাজনীতির 'পাওয়ার পলিটিক্সের' তত্ত্ব অনুসরণে আকৃষ্ট হলেন, কেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপরের তাকে স্থান দিলেন, কেন চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে চরম হঠকারিতার পথে চালিত

করতে দ্বিধা করলেন না সেটা কি কেবল ক্ষমতা দ্বন্দ্ব বা অন্য কিছু ছিল এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, এই সবের ব্যাখ্যা হয় তো আছে, তা মাওবাদী ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা নয়। অথচ একথা হয়তো বলার দিন আজ এসেছে যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সেদিন দ্বিখণ্ডিত না হলে সমাজতন্ত্রের সংকট ও বিপর্যয় হয়তো ঘটতো না। একথা বলার সময় অবশ্যই সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রনেতৃত্বকে সমালোচনার উর্ধে রাখার চেষ্টা হচ্ছে না। তাঁরাও এই সব সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতাকে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক চিন্তার ভিত্তিতে এমনকি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতার মতো সমকালীন দ্বন্দ্ব সংঘাতের উর্ধে উঠে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন নি। এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি আজ আর চেপে রাখার সময় নেই, সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনের পরে তো নয়ই। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন মাও স্মরণীয়, কেন বরণীয় তিনি। শতবর্ষের স্মরনিকা নিছক কি প্রথা, রীতি সম্মত, অথবা তার কোন যথার্থ মূল্য আছে?

মাওয়ের অবদানের মূল্যায়নে, তাঁর জীবনের শেষ বিশ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বিরূপতা আজ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র দলিলেও স্থান পেয়েছে। কিন্তু 'শত পুষ্প প্রস্ফুটিতও হোক, শত মতের সংঘাত ঘটুক' বক্তব্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল তার গুরুত্ব তখন যে ভাবেই বিবেচিত এবং ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন, কমিউনিস্ট পার্টি'র নীতি নির্ণয় প্রক্রিয়ায় এখন যে খোলামেলা আলোচনার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে তার দৃষ্টান্তে বলা যায়, এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা এখন সব কমিউনিস্ট সংগঠন ক্রমে ক্রমে স্বীকার করে নিচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র বিংশতি কংগ্রেসে ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে খ্রুশ্চেভের আক্রমণ তার সূচনা করেছিল। মাও সেই ধারাকেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, অভ্যস্ত বাক্‌রীতিতে প্রকাশ করেছিলেন। পরে সোভিয়েত ও চীন উভয় দেশের নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে আর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে অগ্রসর হতে চাননি। সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনের এই পটভূমিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থেই সেই নীতির পুনর্ঘোষণা দরকার। অবশ্যই সেকাজ গর্বাচেভের কায়দায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা যাবে না, কিন্তু মত প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য কায়েম করা দরকার হয়ে পড়েছে। তবু এটাও মাওয়ের একান্ত নিজস্ব অবদান নয়।

যে নিজস্ব অবদানের জন্য মাও স্মরণীয় সেটা হলো সমাজ পরিবর্তনে জনগণের বিপ্লব করাকে প্রায় অধিকারে পরিণত করার সপক্ষে মত প্রকশ করা। মানুষ চলতি সমাজ জীবনের সমূহ পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে পারে, ভোট যেমন তার অধিকার, সমাজ বদলের জন্যে উদ্যোগ নেওয়াও তার অধিকার, এই ধারণা মাওয়ের মতামতেই প্রথম পাওয়া যায়। জনগণের নামে তার অগ্রনী অংশের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে বিপ্লব নয়, জনগণের নিজের উদ্যোগে বিপ্লব করা, মাও একথাই বলতে চেয়েছিলেন। মানুষ স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে, না বদলাবে, সেটা তার অধিকার ও বিচার বিবেচনার অন্তর্গত। এই অধিকার প্রয়োগ করতে মানুষ ঠিক বা ভুল যে পদক্ষেপেই নিক্ না কেন তার দায়ভাগ তারাই বহন করবে। এটা কেবল কথার কথা নয়, এ কথাকে প্রয়োগের দিক থেকে অপরিবর্তনীয় করে তোলাই হবে বিপ্লবী শক্তির কাজ। একটা বিপ্লবী চেতনা জনমানসে ব্যাপক হয়ে উঠলে তখন জনগণের এই অধিকার বোধ জন্মায়. তাকে প্রয়োগ করার মতো প্রত্যয় আসে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাজ সেই প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করা, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, যাঁরা বিপ্লব করতে পারেন নি অথচ তার জন্য স্থিরলক্ষ্যে কাজ করেছেন, তাঁরা যাকে জনগণের সঙ্গে থেকে চলা বলেছেন, মাও সেটাই সার্থকভাবে চিন্তা ও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। মানুষের সমাজ পরিবর্তনের অধিকারে অবিচল নিষ্ঠা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মাওয়ের নেতৃত্বের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যই তিনি স্মরণীয়।

চীন বিপ্লবের মডেল মেনে নিয়ে মাও নেতৃত্বকে স্মরণ করা আজ সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনীয়তাও নেই। তৃতীয় দুনিয়া আজ আর চার দশক আগেকার মতো নেই। গোটা দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি পুরানো কায়দায় বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ। যে চীনা মডেল পঞ্চাশের, ষাটের দশকে তৃতীয় দুনিয়ায় কোথাও অনুসৃত হয়নি, সত্তরের দশক মুক্তির দশক বলে ঘোষণা করার পরেও আফ্রিকায়, পর্তুগালের বিপ্লবে, নিকারাগুয়ায় তাকে প্রয়োগ করা যায়নি, আজ এই এক মেরুকৃত বিশ্বে যেখানে স্যাটেলাইটের গোয়েন্দাগিরি দুনিয়ার কোথাও কিছু অজানা থাকতে দেয় না, সেখানে লং মার্চ থেকে স্থরু করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার তত্ত্ব আর প্রযোজ্য হবে কিনা সন্দেহ। তবু মাও স্মরণীয় হবেন চীন বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ে

বলিষ্ঠভাবে, প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজস্ব পথ নির্ণয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে, এমন এক কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্যে যা জনগণকে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থাপন করেছিল। জনগণ যে বিপ্লব চায়, মাও তা হাতে কলমে প্রমাণ করার জন্যই শতবর্ষে স্মরণীয়।

মাও জে-দং-এর কয়েকটি কবিতা

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

মায়াবী গুহায়

গোধূলির ঘন হয়ে আসা আলোয়
মাথা তুলেছে সমর্থ পাইনেরা।
দাঙ্গাবাজ মেঘদল জোর কদমে ছুটি চলেছে অতীন মাড়িয়ে।
মায়াবী গুহাচিত্রে নিজেকে সাজিয়েছে নিসর্গ,
থরো থরো পাহড়চুড়োগুলিতে
রুপোর ফোয়ারা খুলে হাসছে সুন্দর।

লি শূ-ইকে জবাবি চিঠি

আমি হারিয়েছি আমার অহংকারী পপলার, তুমি তোমার উইলো।
নবম স্বর্যের দিকে মাথা তুলেছে তারা।
য়ু-কাং প্রশ্ন করছে :
ঐ গাছগুলোর শিখরে সে মালা জড়িয়ে দেবে কি না।

একাকিনী চাঁদ তার বিশদ আস্তিন মেলে
অসীম শূন্যতায় নেচে চলেছে জ্যোৎস্নাপীড়িতদের জন্য।
পৃথিবী হঠাৎ জানিয়ে দেয়—বাঘ এখন খাঁচাবন্দী,
তুমুল বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামছে
তার অঝোর চোখের জল।

নারী বাহিনী

কুচকাওয়াজের মাঠে প্রথম সূর্যের আলোয়
পাঁচফুট—রাইফেল কাঁধে
কি উজ্জ্বল আর সাহসী দেখাচ্ছে তাদের।
রোখা মেজাজে ভরপুর চীনের মেয়েরা
তারা হাতিয়ারগুলির প্রেমিকা,
সিল্ক আর শাটিনের নয়।

ঝর্ণা

চোখের জল জমে জমে বরফ।
মনে হতে পারে
        দুঃখের বুঝি আর ভোর নেই।
অনেক এগোনো—পেছোনো
অনেক টালমাটালের পর
হঠাৎ কে একটানে উড়িয়ে দেয় ভারী চাদর
আর খল খল খিল খিল
সমস্ত জমাট-বাঁধা বরফ
        কখন যে ঝর্ণার একটানা হাসি আর হাসি!

হুঁশিয়ার

এই সময়
    কোনো কথা বলতে নেই।
এই সময়
    কারো ডাকে সাড়া দিতে নেই।
তাহলেই
    তোমার ভাইবেরাদারদের ভেতর থেকে
তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে সেই কালো হাত
যা মানুষকে গুনতি করতে চায়
একটার পর একটা মাথার খুলি দিয়ে।

গান

এভাবে কি গাইতে আছে,
তাও এমন সময়।
আমাকে দুর্বল করে দিও না, গান,
আমার শুকনো চোখ থেকে নিংড়ে নিও না অশ্রু
তাহলে পাথুরে পথ এত পিছল হয়ে যাবে যে
আমরা এককাট্টা পাড়ি দিতে পারব না কুয়াংচু-র দিকে,
দোহাই, চুপ করো,
গান গাইবারও তো
    একটা সময়—অসময় আছে।

বাতাস

বাতাস,
আমাদের পায়ে এমন জোর দাও
যা দিয়ে তোমারও আগে ছুটে যেতে পারি।
বাতাস,
আমাদের ইচ্ছেগুলিকে এমন একমুখো করে তোলে
যাতে যে কোন লক্ষের চাঁদমারিতে
আমরা বল্লমের মত বিঁধে যেতে পারি।
বাতাস,
আমাদের এমন ভালোবাসা দাও
যাতে শত্রুদমনের পর আমরা প্রত্যেকে এ-ওকে
তোমার মত জড়িয়ে ধরতে পারি।

তোমাকে

পুরোপুরি পাওয়ার জন্যই
কয়েকটা বছর ভুলে থাকতে চাই তোমাকে।
এই ঝোড়ো দিনগুলিতে
আমরা কিছু পাহাড়ের মাথা গুঁড়িয়ে দেব,
নিকেশ করব নেকড়ে—সমেত জঙ্গল,
কাঁটা ঝোপ নিড়িয়ে শুরু করব ফুলের আবাদ,
সাল্‌তির পর সাল্‌তি সাজিয়ে
নদীর ওপর গড়ব সেতুবন্ধ,
যার ওপর দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত ভালোবাসা
একদিন তোমার কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ স্মরণে

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে, বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, দাঁড়িয়ে এই শতাব্দীর বিশের তিরিশের দশকের যুগসন্ধিক্ষণের সাহিত্যসেবী সাহিত্যপ্রাণ এক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক, যাঁকে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' স্মৃতিচারণে 'সে যুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি' বলে উল্লেখ করেছেন. সেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে আমি তাঁর পুত্র হিসাবে স্মরণ করছি। কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রৌঢ়ত্বে তার যৌবনের প্রতীক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্মরণ করছি ভাবাদর্শের সংকট জনিত মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণু এই সমকালে ভাবাদর্শের, মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা জীবন ভেলায় অকুতভয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁদেরই একজনকে।

তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল "শেলী"র মরমী জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে। শেলীর দ্বিশতবর্ষ জন্ম পূর্তি লগ্নে তাঁর এক সত্যনিষ্ঠ উপাসককে স্মরণ করছি। তিনি 'শেলী'র জীবনী রচনায় মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সেই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন মরমী জীবনীকার ও অনুবাদক হিসাবে। একশ পৃষ্ঠার মাত্র একটি পুস্তকে Andre Maurois -এর Ariel''কে তিনি রূপায়িত করেছিলেন তাঁর "শেলী''তে। তখন তিনি সিটি কলেজে আই. এ ক্লাশের পাঠ সমাপ্ত করেছেন মাত্র। কিন্তু তাঁর বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা তখন দিগন্ত প্রসারী। সে কথা এখন থাক।

শেলীর দ্বিশত জন্মলগ্নে শেলীকে একটু স্মরণ করা যাক এই প্রসঙ্গে। Edward Aveling ও Eleanor Marx-Aveling (যিনি Fredrick James Furnivall প্রতিষ্ঠিত "New Shakespeare Society" ও "Shelley Society-র একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন) লিখছেন শেলী সম্পর্কে: "He was the child of the French Revolution. 'The wild eyed women' thronging round the path of Cythna as she went through the great city were from the streets of Paris, and he (Shelley), more than anyother of his time knew the full strength and beauty of this wild mother of his and ours.

With this singular poetical and historical insight he saw the real significance of his holy struggle." (Shelley's Socialism-Two lectures). কার্ল মার্কস্ শেলী সম্পর্কে বলেছেন "Shelley died at twentynine, because he was essentially a revolutionist and he would always have been one of the advanced guard of socialism."

শেলীর কথায় "the system of human society as it exists at present must be overthrown from the foundations" এবং (Leigh Hunt-কে লেখা শেলীর চিঠি, ১লা মে, ১৮২০) "The sacred few who could not tame. Their spirits to the conquerors" (Triumph of life).

শিল্প সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক ও চিন্তাবিদরা শেলীর দ্বিশত জন্মবর্ষে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'শেলী' পুস্তকের উৎসর্গে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি সযত্নে উদ্ধৃত করেছেন, তা শুধু এখানে স্মরণ করি :

"আমি আজকে শেলীকে আমাদের এই সভাতে, আমাদের এই বাঙ্গালীর সভাতে, আদর করে ডাকছি ; আমি এই জন্যেই বলছি যে তোমার বাণী আমাদের বাণী। তোমার কাব্যে পৃথিবীর সকল মানুষের কথা, বিশেষভাবে আমাদের এই কালের, আমাদের এই দেশের। প্রবল বিদ্রোহ নিয়ে তিনি যে সব প্রচণ্ড শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন, তাড়িত হয়েছেন, সেই শক্তি আমাদের সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দুর্গ বাইরে নয়, মনে। এই যে প্রচণ্ড শক্তি এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে হবে। কবির কাছ থেকে তার সম্মতি আসবে। এইজন্য বলছি যে আজিকার দিনে তোমাকে আমরা অভিবাদন করি. তোমাকে আমরা আহ্বান করি আমাদের মনের মধ্যে ! আমাদের আপনাদের মধ্যে তুমি তোমার সিংহাসন গ্রহণ কর।"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের 'শেলী' রচনার পিছনে এই প্রেরণা, এই আত্মগত ভাব, কাজ করেছে শুধু এই টুকুই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এরপর যে উল্লেখযোগ্য রচনা তাহচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কির "Mother" এর অনুবাদ পর্ব। একটু সংক্ষিপ্ত আকারের হলেও এই অনুবাদে গোর্কির পাভেল, মা ও সংগ্রাম একাকার হয়ে গেছে। এই অনুবাদ

সে সময়ের এবং পরেও বাঙ্গালী পাঠকের কাছে, পথ সন্ধানী যুবসমাজের কাছে, এক প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। অধুনালুপ্ত প্রায় বিস্মৃত সেই অনুবাদটির কথা আজকের ক্ষয়ে আসা মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরনীয়। একদা যা ছিল অনুমান মাত্র তা আজ প্রত্যয়িত যে এই অনুবাদ কর্মটি সে যুগে একেবারে অপরিকল্পিতভাবে হয়নি। এর পিছনে সে যুগে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার কাজটির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের গোর্কির শতবর্ষ উপলক্ষে ২৮শে মার্চ ১৯৬৮ সালে মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে ভাষণের অংশবিশেষে উল্লেখ করছি (মুজফ্‌ফর আহমদ নির্বাচিত রচনা সংকলন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি : সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সাল) :

"১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখ বাঙলা সাপ্তাহিক 'লাঙল' প্রথম বা'র হয়েছিল। এখনা ছিল 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র' সাপ্তাহিক মুখপত্র। তার মলাটের ওপরে লেখা থাকত "প্রধান পরিচালক—নজরুল ইসলাম"। লাঙলের প্রথম সংখ্যা হতেই তাতে 'মা'র অনুবাদ বার হতে থাকে। অনুবাদ করেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। অল্প অল্প করে এই অনুবাদ বেশ দিন 'লাঙলে' বা'র হয়েছিল। তারপরে অনুবাদ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রচণ্ড অর্থাভাব ছিল। কিন্তু 'লাঙল' তাকে কিছু দিতে পারছিল না।"

এই প্রসঙ্গে জানাই এই অনুবাদ পরে সম্পূর্ণ করে সম্ভবতঃ গুপ্ত ফ্রেণ্ডসের তরফে প্রকাশ করা হয়।

গোর্কির 'মা'র অনুবাদ প্রসঙ্গে আর যে তথ্য মুজফ্ফর আহমদ জানিয়েছেন তাও এখানে একটু উল্লেখ্য সাধারণের জ্ঞাতার্থে :

"আমরা অ-ইংরেজি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বন করেই করি। ইংরেজি ভাষায় আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের অনুবাদ পৃথক পৃথক। ...তারা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করতে গিয়ে পুস্তক সংক্ষেপিত করেন। কাজেই ইংরেজি অনুবাদগুলি অবলম্বন ক'রে যেসকল বাংলা অনুবাদ হয়েছে তার মধ্যে কোনটি পুরো অনুবাদ. কোনটি নয় তা বলা কঠিন। সোভিয়েৎ দেশ হতেও ম্যাকসিম গোর্কির 'মা'-র একটি পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ বা'র হয়েছে। এর পূরো বাঙলা অনুবাদ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য শ্রীযুক্তা পুষ্পময়ী বসু করেছেন।"

মুজফ্‌ফর আহমদ লাঙলে 'মা'র অনুবাদ প্রসঙ্গে আর যে কথা

বলেছেন "নৃপেন অনুবাদ করা ছেড়ে দিলে সুরেশ বিশ্বাস খানিকটা অনুবাদ করেছিলেন। তিনি তখন বাঙলায় এম. এ. পড়তেন। পরে ইংল্যাণ্ড হতে ব্যারিষ্টারি পাশ করে এসে কলকাতা ছোট আদালতের জজ হয়েছিলেন।

কেউ যদি প্রমাণ উপস্থিত করেন যে 'লাঙলে'র আগেও ম্যাকসিম গোর্কির 'মা'র বাঙলা তরজমা অন্য কোথাও বার হয়েছিল আমি তা নতমস্তকে মেনে নেবো।" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন আমার পিতৃদেব "লাঙ্গলে" লিখেছেন দেবব্রত বসু ছদ্মনামে। ('দেশ' ৩রা আগস্ট, ১৯৬৩ সংখ্যা)।

যে কথা বলতে চাইছি এখানে তদানিন্তন রুশবিপ্লব ও তার মতাদর্শগত চিন্তার সঙ্গে সেই যুগে অনেকের সঙ্গে আমার পিতৃদেব নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নিবিড় মানসিক যোগ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে আমার পিতৃদেব আমায় একসময় প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বলেছিলেন, "তখন সোভিয়েত দেশ থেকে এম. এন. রায় মারফৎ যে সমস্ত কাগজপত্তর গোপনে আসতো তার অনুবাদ ইত্যাদি কাজ কিছু করতাম।" তাঁর এইরকম আর একটি স্বগতোক্তি "কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো বাংলায় অনুবাদ করার পিছনে আমার ও সৌম্যর (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) অবদান আছে।"

পিতৃদেব তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে ভীষণ নীরব বিনয়ী ও প্রচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করতেন বলেই আমার ধারণা। তিনি তা সচেষ্টভাবেই করতেন, কেননা তিনি বলতেন, আমি সাহিত্য করি রাজনীতি করি না। এবিষয়ে তাঁর যা প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁর সাহিত্য সাধনার অঙ্গীভূত রূপে। নজরুল এবং তাঁর মাধ্যমে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্টতার অংশটুকু সেইভাবেই এসেছে বলে আমার ধারণা। 'মা'র অনুবাদ প্রসঙ্গে 'লাঙল' ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রসঙ্গটা এসে পড়লো। তার আগের পর্যায়ে "ধূমকেতু" ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতার পর্ব, সে প্রসঙ্গে পরে আসছে। তার আগে এখানে যে কথাগুলো বলে নেওয়া দরকার তা হলো তিনি লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কী, ভরোশিলভ ইত্যাদি নেতাদের ছোট ছোট জীবনী আলেখ্য নিপুণভাবে রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর "রুশজাতির কর্মবীর" পুস্তকটি উল্লেখ্য। তিনি স্টালিন ট্রটস্কী বিরোধসংক্রান্ত আর একটি পুস্তক 'চক্র ও চক্রান্ত' নামে লিখেছিলেন। এগুলি পড়ে এবং তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহের বিষয়টি থেকে (যার অনেকটাই লুপ্ত ও বিনষ্ট

হয়েছে তাঁর ভাড়াটে বাসস্থানজনিত বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের কারণে) আমার জানা ও উপলব্ধি ঘটেছে যে এবিষয়ে এবং অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে তাঁর কি গভীর অধ্যয়ন ছিল, যদিও আমি জানি আমার পক্ষে তার পূর্ণ মূল্যায়ন করার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু অনেকের সঙ্গে এ বেদনা আমারও যে, তাঁর সৃজনীকর্মে তা প্রকাশিত হয়নি বা হতে পারেনি নানা কারণে। আমার যা মনে হয়েছে, তাঁর গভীর মননশীল ভাবুকতা ও বিচিত্রগামিতা ; সেই সঙ্গে তাঁর এক জটিল সাংসারিক বৃত্তের দায়বদ্ধতা, যুগের অস্থিরতা, তাঁর পেশাদারী মনোভাবের প্রতি বিরূপতা এবং সেই যুগের প্রকাশকদের বাজারী মনোভাব ও সামাজিক অপূর্ণতা এগুলিই মূলত দায়ী। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় যে কথা লিখেছিলেন তা একটু এখানে উদ্ধৃত করছি :

"অনেক পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বহুতর কীর্তিতে তিনি কীর্তিমান হতে পারতেন, কিন্তু দুরন্ততর অশান্ততর সমুদ্রপথে জীবনকে চালনা করে তা করা সম্ভবপর হয়নি ; তা না হোক যা করে গেছেন তা কম নয়। দুঃখকে উপহাস করেছেন যুদ্ধে উল্লাস বোধ করেছেন মেঘলা আকাশের অন্তরালে ঢাকা সূর্যের স্বপ্ন দেখেছেন। এই জাতি এই সমাজের মধ্যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে একটি মান সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনায় নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও 'ধূমকেতু' প্রসঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ একটি বিশেষ অধ্যায়। অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোলে'র বিবরণ অনুযায়ী (আমারও অনুরূপভাবে পিতৃদেবের কাছে শোনা) কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বৈঠকখানার সাহিত্য বাসরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে কবি নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। অচিন্ত্যকুমারের বর্ণনায় :

"নৃপেন তখন সিটি কলেজে আই. এ পড়ে ও আর পুলি লেনের এক বাড়িতে ছাত্র পড়ায়। দু-তিনখানা বাড়ির পরেই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়ি। সেসব দিনে তখন ১৩১৮ সাল (১৩২৮ সাল হবে এটা, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯২১।১৯২২. পিতৃদেবের বয়স তখন ১৬.১৭ বৎসর এবং তাঁর জন্ম সাল ১৯০৫, সেই কারণে এই সংশোধন প্রয়োজন) বাগচি কবির বৈঠকখানায় কলকাতার একটা সেরা সান্ধ্য মজলিস বসত। বহু গুণী গায়ক ও সাহিত্যিক সে মজলিসে জমায়েত হতেন।

P, 5412

নৃপেন দু-দুবার সে বাড়ির সমুখ দিয়ে হেঁটে যায়, আর ভাবে, ঐ স্বর্গরাজ্যে তার কি প্রবেশের অধিকার হবে? আদর্শতাড়িত যুবক, সাংসারিক দারিদ্র্যের চাপে সামান্য টিউশনি করতে হচ্ছে, বাগচি কবি কি করে জানবেন তার অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অনুরাগ, তার নির্জনলালিত বিদ্রোহের ব্যাকুলতা! নৃপেন যায় আর আসে···

একদিন তার ছাত্র নৃপেনকে বললে 'জানেন মাষ্টারমশাই, আজ বাগচি বাড়িতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আসছেন।'···

রাস্তার উপরে উৎসুক জনতা ভিড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে একজন তরুণ গাইছে তারস্বরে। সন্দেহ কি, শুধু 'বিদ্রোহী'র কবি নয়। কবি বিদ্রোহী। তার কণ্ঠস্বরে প্রাণবন্ত প্রবল পৌরুষ, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা। গ্রীষ্মের রুক্ষ আকাশে যেন মনোহর ঝড় হঠাৎ ছুটি পেয়েছে···

নিজেরো অলক্ষ্যে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নৃপেন, সমস্ত কুণ্ঠার কালিমা নজরুলের গানে মুছে গেছে। শুধু কি তাই? গানের শেষে অতর্কিতে সাহিত্যালোচনায় যোগ দিয়ে বসেছে নৃপেন। কথা হচ্ছিল রুশ সাহিত্য নিয়ে সব সুমহান পূর্বসূরিদের সাহিত্য-পুশকিন, টলষ্টয়, গোগোল, ডস্টয়ভস্কি। নৃপেন রুশ সাহিত্যে মশগুল, প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে। কে যেন ডস্টয়ভস্কির কোন উপন্যাসের চরিত্রের নাম ভুল করেছে। নৃপেন তা সবিনয়ে সংশোধন করলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিস্তৃতি। সকলের চোখ পড়ল নৃপেনের উপর। নজরুলের চোখ পড়ল নবীন বন্ধু তার।" অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন সভাশেষে নজরুল নিজেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করেন। সঙ্গে ছিলেন 'মোসলেম ভারতে'র আফজালুল হক। সেইদিন পরস্পর পরস্পরকে বাড়িতে হেঁটে পৌছে দেবার নিবিষ্টতায় আলাপ। আমার পিতৃদেব তখন থাকতেন কলকাতার পূর্বপ্রান্তে চিংড়িঘাটায়। নজরুল কলেজ স্ট্রিটে। সেই রাত্রে তাঁরা পরস্পরকে এগিয়ে দিতে সেই পথ সেদিন দুবার পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন দীর্ঘ আলাপচারিতায়···অন্তরঙ্গতায়। অচিন্ত্যকুমার লিখছেন: "রাত গভীর হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে গভীর হয়ে এল হৃদয়ের কুটুম্বিতা। দৃঢ় করে বাঁধা হয়ে গেল গ্রন্থি। নজরুল বললে, 'ধূমকেতু' নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি ত্রিশূল। আসুন দেশের ঘুম ভাঙাই, ভয় ভাঙাই—"

তারপর চাওয়া হল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। কবিগুরুর কাছে থেকে চলে এল তা, জাতির সেই লগ্নে জাতির মহাকবির সেই আশীর্বাদ :

"আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন.
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন!"

অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন : "সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের গলি থেকে বেরুল "ধুমকেতু"। ফুলস্কাপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম বোধ হয় দু পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, আর তার ঠিক উপরে রবীন্দ্রাথের লেখা ব্লক করে কবিতাটি ছাপানো। কলির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে "ত্রিশূলে"র আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের সন্ধ্যাতে ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করার মত সে লেখা নয়।"

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা" থেকে এই প্রসঙ্গে কিছু কথা উল্লেখ করা যায়। "ধূমকেতু'র কল্যাণে অনেক নূতন নূতন লোকের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। অনেকসব নূতন বন্ধু নজরুল পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সেই সময়েই হয়েছিল নজরুলের প্রথম পরিচয়। ছোটছেলে বললেই হয়। যতটা মনে পড়ে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে তখন সে পড়ত। কিন্তু আই এ ক্লাশে পড়লে কি হয়, নানান বিষয়ে নৃপেনের অনেক পড়াশুনা ছিল। যার সঙ্গেই তখন তার পরিচয় হয়েছে তিনিই নৃপেনকে না ভালোবেসে পারেন নি। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবন নিয়ে নৃপেন "ধূমকেতু"তে লিখত। নিজের নাম দস্তখৎ করত ত্রিশূল। 'ধূমকেতু' বার করতে গিয়ে নজরুল যাঁদের নূতন বন্ধুরূপে পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে নৃপেন ছিল নজরুলের একটি বড় পাওয়া। নৃপেন আমারও স্নেহাস্পদ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। যে অল্পসংখ্যক লোকের সঙ্গে আমি কথাবার্তায় তুমি বলতাম কিংবা এখনও বলি তাদের ভিতরে সেই

ছিল একজন। সে কোন দিন 'আপনি' কথা আমাকে উচ্চারণ করতেই দেয়নি। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে 'টক' দিতে গিয়ে যখন নজরুলের রোগের লক্ষণ দেখা দিল, তার জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগল, তখন নৃপেনই ছিল নজরুলের পাশে। সেই সেদিন নজরুলকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

বাঙলা সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চটোপাধ্যায় আর আমাদের ভিতরে নেই। অকালে মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে।"

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাই। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর খবর (২৩শে জুলাই, ১৯৬৩ সাল) সংবাদপত্রে পড়ে তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ভবানী সেন মহাশয় কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে পার্টির তরফে তাঁর মৃতদেহতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে আসেন। মৃতদেহ তখন ইলেকট্রিক চুল্লীতে দেওয়া হয়ে গেছে। আমি তখন সেই পুষ্প স্তবক গ্রহণ করি।

মুজফ্ফর আহম্দ (নির্বাচিত রচনা সংকলনের) 'ধূমকেতু' শীর্ষক রচনায় আবেদন রাখেন "অন্যসব কথা যদি ছেড়েও দিই, তবে শুধু সংরক্ষণের জন্যে কাজী নজরুলের 'ধূমকেতু' লেখা সংগৃহীত ও পুস্তক আকারে প্রকাশিত হওয়ার দরকার।" এই সঙ্গে আমার আবেদন ঐ পত্রিকায় 'ত্রিশূল' নামে প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের লেখাগুলিও প্রকাশিত হোক।

মুজফ্ফর আহম্দ ঐ রচনায় 'ধূমকেতু' প্রসঙ্গে যে তথ্য জানিয়েছেন তাও এখানে সাধারণের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য। "কিন্তু "ধূমকেতু" পাওয়া যায় না। এ কাগজের কয়েকটি সংখ্যামাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে [এখন তাও পাওয়া যায় না বলে ঐ সংকলনের সম্পাদক জানিয়েছেন]।"

ধূমকেতু সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য যেমন দিয়েছেন তা এই রূপ—

"১) ১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে "ধূমকেতু"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

২) ১৯২২ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে পুলিশ ৭, প্রতাপ চাটুজ্যে লেন স্থিত "ধূমকেতু" অফিসে তল্লাশি করতে আসে। পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল:

(এক) 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতাটিকে "ধূমকেতু"র যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল তা বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণে নিয়ে যাওয়া।"

(দুই) ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪ ধারা অনুসারে ইস্যু করা

কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানার বলে কাজী নজরুল ইসলামকে গিরেফতার করা।

প্রিণ্টার ও প্রকাশক মুহম্মদ আফজালুল হককে পুলিশ ৩২, কলেজ ষ্ট্রীট হতে গিরেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল, নজরুল ইসলামকে পায়নি। তার চার পাঁচ দিন আগে সে সমস্তিপুর চলে গিয়েছিল; সেখানে গিরিবালা দেবীর (নজরুলের শাশুড়ী) বাপের বাড়ী—সকন্যা তিনি সেখানে ছিলেন। সেখান থেকে নজরুল তাদের নিয়ে কুমিল্লায় রেখে আসতে যান। ২৩শে নভেম্বর (১৯২২) তারিখে নজরুল কুমিল্লায় গিরেফতার হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে সে কলকাতার চীফ প্রেসেডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর দ্বারা এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।"

মুজফ্ফর আহমদ এও জানিয়েছেন যে নজরুলের গ্রেপ্তারের চার পাঁচদিন আগে হতে নজরুল ইসলামের কোনও লেখা আর "ধূমকেতু"তে ছাপা হয়নি। একথা মনে রেখেই নজরুল ইসলামের ঐ পত্রিকায় লেখাগুলি সংগ্রহ করতে হবে। তিনি এও জানিয়েছেন যে, পরেও কয়েকসংখ্যা "ধূমকেতু" ছাপা হয়েছিল। সে সব সংখ্যার কোনও লেখাই নজরুল ইসলামের নয়। (মুজফ্ফর আহমদ নির্বাচিত রচনা সংকলনে' 'ধূমকেতু' শীর্ষক রচনা দ্রষ্টব্য)। ধূমকেতুর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে কারা লিখেছেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আদৌ লিখেছেন কিনা, সেগুলির পূর্ণ পরিচয়,সেই যুগ ও ধূমকেতু'র ঐতিহাসিক আলোচনার দরকার।

শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় জড়িয়ে আছে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশির ভাদুড়ীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ সে সময়ে একাকার হয়ে যায়। যতদূর জানা আছে পিতৃদেব তাঁর যৌবনে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় প্রসঙ্গে, সম্ভবতঃ বিজলী পত্রিকায় একটি আলোচনা করেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেনঃ নতুন 'বিজলী'তে নৃপেন থিয়েটার আলোচনার ভার নিল। আজকালকার পাটোয়ারী আলোচনা নয়, সত্যিকার রসবস্তু (দেশসংখ্যা, ৩রা আগষ্ট, ১৯৬৩); সেটি পড়ে ভাদুড়ীমশায় তাঁকে ডেকে পাঠান। সেই সূত্রে পরিচয় ও ঘনিষ্টতা হয় উভয়ের মধ্যে। তাঁর এই নাটক সম্পর্কে আগ্রহ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে চলচিত্রে নিয়ে আসে গল্পকার, চিত্রনাট্যকার হিসাবে। 'গরমিল' (তাঁর নিজের কাহিনী অবলম্বনে) সম্ভবত প্রথম চিত্রনাট্য। তার পরে আসে শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও সাফল্য। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী নিয়ে

রচনা করেন 'স্বামীজি' চিত্রনাট্য। অমর মল্লিক তার পরিচালক ছিলেন। আমার ছোট কাকা শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, বর্তমানে পণ্ডীচেরী বাসী তার সহকারী পরিচালক ছিলেন। মধু বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা'র চিত্রনাট্য পিতৃদেব রচনা করেন। মাঝ বয়সে তিনি নিউ থিয়েটার্সে 'মহাকবি কালিদাস' চলচিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। সম্ভবত চলচিত্রটি নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত ছিল। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে প্রায় গৃহবন্দী তখন চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যরচনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই পর্বে 'ভগিনীনিবেদিতা' 'নীলাচলে মহাপ্রভু (চৈতন্যের জীবনভাষ্য), 'দাদাঠাকুর' ইত্যাদি জীবনীমূলক চিত্রনাট্য রচনা করেন। দর্শক সমাদর ছাড়াও এর মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্রিয় পুরস্কার লাভ করে। এ ছাড়া তাঁর নির্মিত জনপ্রিয় চিত্রনাট্য হলো 'শেষ পর্যন্ত', 'শশীবাবুর সংসার', 'হারানো সুর' (Random Hervest অবলম্বনে), সাতপাকে বাঁধা, দুই ভাই রাণীরাসমনী, শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ'। বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ তার চিত্রনাট্যে শক্তিশালী ও সাহিত্যধর্মী হয়ে উঠেছিল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সঙ্গে শিশির ভাদুড়ীর অন্তরঙ্গতা প্রসঙ্গে পিতৃদেবের চিঠির যে অংশ বিশেষ (দেশ সংখ্যা ৩রা আগষ্ট, ১৯৬৩) উল্লেখ করেছেন তা এইরূপ 'সে আড্ডা, সেখানকার সব আলোচনা মদের চেয়েও মাদক। যৌবনের সেরা দিনগুলো কীভাবে যে বিসর্জন দিলাম ভাবতে দুঃখ লাগে। 'Wastage, brilliant wastage!' হ্যাঁ brilliant wastage ছিল তা যথার্থ অর্থে! ইচ্ছে করলে তিনি অনেক সার্থক উপন্যাস ও নাটক লিখতে পারতেন তাঁর চিত্রনাট্যে যে গল্পের বিন্যাস ও সংলাপ রচনায় তার প্রমাণ রেখেছেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ১৯০৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী জয়নগর-মজিলপুর-সন্নিকটে ফুটিগোদা গ্রামে। পিতা অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফুটিগোদা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। জয়নগর স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় মাতুলালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন। কলকাতার পূর্বপ্রান্তে চিংড়িঘাটা অঞ্চলে মাতুলালয়ের অংশে তাঁর পারিবারিক জীবন সুরু করেন। প্রথম জীবনে সওদাগরী অফিসে কর্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সওদাগরী অফিসের অধীনে কর্মে

বন্ধন বোধ করায় শিক্ষকতা পেশায় আসেন এবং সারা জীবন দারিদ্র্য ও পারিবারিক নানা প্রকার দুর্ভাগ্যের ও বিড়ম্বনার শিকার হন। তিনি উন্নতশির মানুষ ছিলেন। সেকালের চোখে তিনি ছিলেন গোঁড়া মনোভাবের মানুষ কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল স্নেহশীল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর মধ্যম (তৃতীয়) সন্তান। দুই জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা ও ভগিনী যৌবনে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার ফলে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের উপর পিতার সংসারের দায়ভার অতি অল্প বয়স থেকেই বর্তায়। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার সময় থেকেই তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে পিতার সংসারের দায় বহন করতে হয়। তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক ভগিনী ছিলেন। যুগধর্মের কারণে তাঁর স্বভাবধর্ম ও জীবন চেতনা পিতা অতুলচন্দ্রের বিপরীত ধর্মী ছিল। সেই কারণে তাদের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত যেমন ছিল তেমনই পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা সমানভাবে ছিল। সেই পারিবারিক পটভূমিকায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সাহিত্যের প্রতি স্বভাবজ আকর্ষণ বোধ করেন অল্প বয়স থেকেই। সেই সাহিত্যপ্রীতি যেমন তৎকালীন সামাজিক, দেশজ আন্দোলনের প্রেরণাজাত তেমনই ছিল স্ব-ভাবগত। তাঁর সামনে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্মৃতি, রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বও প্রতিভার সর্বমনোহর আকর্ষণী চৈতন্য এবং রুশ বিপ্লবের সমকালীন আদর্শগত অবস্থান। এসবের মধ্যে তিনি সাহিত্যকে দেশসেবার এবং আপন জীবন সাধনার ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং আজীবন তা লালিত এবং জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তা সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। জীবনচারিতায় বিচিত্রগামিতার মধ্যে তাঁর জীবনের ভাবাদর্শগত যে ধারাবাহিকতাটা চিরকাল অক্ষুন্ন ছিল তা হল জাতীয়তাবাদী এক নির্মল মনোভাব যা কখনো কখনো বিদ্রোহী হয়েও, একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী মানবিকতা ধর্মী থেকে যায়। তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনায় তা অকপটভাবেই প্রতিফলিত। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মৃত্যুতে তারাশঙ্করের স্মৃতিচারণ থেকে একটু এখানে উল্লেখ করা যায় প্রাসঙ্গিক কারণে: "কল্লোলে তাঁর প্রথম আবির্ভাব, তখন তিনি কলেজের ছাত্র। কিন্তু পড়া হয়ে গেছে অনেক। আরও অনেক পড়ার তৃষ্ণা। বুক কোম্পানীতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই পড়েন। সেখানে দেখা হয় শৈলজানন্দের সঙ্গে. আলাপ হয়। শৈলজানন্দের সঙ্গে আসেন পটুয়াটোলায় কল্লোল অফিসে। এখানে ত্রয়ীর সৃষ্টি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ-শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র। সুরু হল তাঁর সাহিত্য জীবন। পড়া ছাড়লেন (কলেজের)। নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান—চাকুরী, ভবিষ্যৎ বা সে-কালের কল্পনা সরিয়ে

রেখে সে-কালের সাহিত্যের পথ-যার সম্মুখে ঘন মেঘের কৃষ্ণ ছায়া, অশান্ততর বিক্ষুব্ধ সমুদ্র—সেই পথে চালালেন নৌকা।”

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সাহিত্য কর্ম প্রসঙ্গে কিছু বলতে হলে তাঁর “উনিশ শ পাঁচ” গ্রন্থটির (১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশ, বাঙলা ১৩৫৬, চৈত্র) এখানে একটু বিশেষ উল্লেখ দরকার। ১৯০৫ তাঁর নিজের জন্ম সাল। নিজের জন্মক্ষণের এই সালটি আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষস্থানের অধিকারী। তাঁর ভাষায়ঃ “বাংলার এবং ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাসে উনিশ শ’ পাঁচ সাল হলো জন্মবেদিকা। এই অবিস্মরনীয় লগ্নে বাঙ্গালীর মধ্যে তার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতিতে যে নতুন জোয়ার আসে, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আজ আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করেছি। এইসময় বাঙ্গালীর মন ভেতর থেকে যেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে মানব ইতিহাসের তা এক সুন্দরতম অধ্যায়। আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র উনিশ শ’ পাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। তাই প্রত্যেক বাঙালীর কাছে এই সময়কার জীবন ও ইতিহাস তার জাতীয় চেতনার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। কারণ আমাদের জাতীয় চেতনার মূল শেকড় সেখানেই আছে” এই ভাবেই তিনি উনিশ শ’ পাঁচকে দেখতে চেয়েছেন। এই মত হয়ত আমাদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সকলের কাছে সমানভাবে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে এই মতটি তিনি এই পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। মতভেদ থাকলেও পরবর্তী অংশে তিনি যা বলেছেন তা প্রণিধান যোগ্য মনেকরে একটু উল্লেখ করছি : “যে তরুণ তার নিজের জাতির মনকে চেনে না, তার চেয়ে হতভাগ্য, তার চেয়ে অশিক্ষিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তার সমস্ত শিক্ষা একটা মানসিক আত্ম প্রবঞ্চনার নাম মাত্র।” নিজের জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তা আজকে নিশ্চয় খুবই প্রাসঙ্গিক, সর্বকালের পক্ষেও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ও সংকল্পে অপরিহার্য।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী বলেছেন : “নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে সে ছিল একান্তভাবে সৌন্দর্যের পূজারী। তার চোখে যা সুন্দর তাকে সে সমস্ত ভাবকল্পনায় স্তরের পর স্তর মণ্ডিত ক’রে দিতে পারত।”

তাঁকে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন রোমান্টিক ধর্মীহিসাবে। আমার

আপত্তি নেই তাতে। বাস্তবজীবন ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর খুঁটি নাটি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কী ভীষণভাবে ছিল পুত্র হিসাবে তা অন্ততঃ আমার জানা আছে। সে পরিচয় এখানে বিস্তারিত করার অবকাশ নেই। ইতিহাস বিশ্লেষণে রোমান্টিকতার প্রসঙ্গ এবং মর্মবোধ কে কি ভাবে গ্রহণ করেন, বা বর্জন করতে পারেন কিনা, তা নিশ্চয় বিতর্কের বিষয় হতে পারে। সে প্রসঙ্গও এখানে বিশেষ আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু একথাও যেন উপেক্ষিত না হয় যে রোমান্টিকতা সমস্ত রকমের সৃজনীকর্মের প্রাণসত্বা ও প্রেরণা। সৃজনীকর্মের সেই রোমান্টিকতা ও প্রাণসত্বাকে বাদ দিয়ে যে সৃজনীকর্ম তা অন্তত শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে না, সত্যানুসন্ধান হয় কিনা জানি না!

কার্ল মার্কস ইতিহাসের দিক নির্দেশক হিসাবে 'প্যারিকমিউন' 'ফরাসী বিপ্লব'কে বেছে নিয়েছিলেন। সেই সব ঘটনার বিশ্লেষণও করেছিলেন নিপুণভাবে, ঐতিহাসিক ভাবেই। কিন্তু তার রোমান্টিকতাকে একেবারে উপেক্ষা করেছিলেন এমন ত মনে হয় না। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ উনিশ শ পাঁচকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব ভাবদর্শনের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে। সেটা তাঁর মধ্য বয়সের অতিক্রান্ত বেলার দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ জনিত স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। এই স্বাধীনতাকে তিনি ক্ষমতা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবার প্রবৃত্তি বলে মনে করেছিলেন এবং জাতীয় নেতৃত্বের উপর মোটেই খুশী ছিলেন না। তিনি এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বিক্ষুব্ধ, খানিকটা হতাশ বোধও করেছিলেন।

একথা অনেকের বোধহয় জানা নেই যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতা রেডিও-র জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে কলিকাতা রেডিও-র অন্যতম স্থপতি বলা যায়। তিনি ছোটদের আসরের দ্বিতীয় কর্ণধার ছিলেন। প্রথম জন শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু "গল্পদাদু" বলে পরিচিত ছিলেন। তারপর পিতৃদেব ঐ আসরের কর্ণধার হন এবং রেডিও-র "দাদুমণি" বলে পরিচিত ও জনপ্রিয় হন, বিশেষকরে তৎকালীন শিশু ও কিশোরদের কাছে। আজকে যাঁরা প্রৌঢ় তাঁরা সেই কথা স্মরণ করতে পারেন। তাঁর বলার ভঙ্গি, ভাষা, কণ্ঠস্বর বিষয় ব্যঞ্জনা সেই সময়ের শিশু কিশোর মনে ধ্বনিত হয়ে আছে। তাও স্মরণযোগ্য। তারপর তিনি কলিকাতা রেডিওতে 'বিদ্যার্থীর আসর' নামে

ইস্কুলের পড়ুয়াদের জন্য একটি বিভাগ খোলেন, তার পরিচালনা করেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর এইভাবে বাঙলার শিশু-কিশোরমন তৈরী করার পিছনে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৮ সালে ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীন ভারতে প্রথম জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে উপলক্ষ্য করে সেই রেডিও-র সঙ্গে তাঁর চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি স্বেচ্ছায় এবং ভারত সরকারের নেতাজীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ সম্পর্ক ছেদ করেন। সেদিন ২৩শে জানুয়ারী তাঁর লিখিত ভাষণ রেডিও কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নির্দেশে বাতিল করে। সেইদিনই তার প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি রেডিও থেকে পদত্যাগ করেন। তারপর আর কোনও দিন রেডিওতে যান নি। সেই সময় 'দেশ' পত্রিকায় (১৯৪৮ সাল) এবিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'গল্পভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে ধারাবাহিকভাবে তাঁর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, সারদা দেবীর জীবনী প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে বর্তমান ভারতের বিষয় নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের অধ্যাত্ম চেতনা এই সময় বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। নব যুগের সমস্যা গুলিও তাঁকে ভাবিত করে তোলে। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন চিন্তা তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছোট ভাই দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হন। তিনি নিজেই ভায়ের সেবা শুশ্রূষা সহ যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। সে ভ্রাতৃপ্রেম ও দায়িত্ব বোধ না দেখলে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক বৃহৎ সংসারের দায়িত্বভারসহ সমস্ত রকম দায় দায়িত্ব তিনি পালন করে চলেন নীরবে নিঃসংকোচে। "উনিশ শ পাঁচ" লেখা হয় এই পর্বে (১৯৪৯ সালে)।

তাঁর "উনিশ শ পাঁচ" থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। তিনি লিখছেন :

"বড় দুঃখে বঙ্কিম বলেছেন. বাঙ্গালী আত্ম বিস্মৃত জাতি। দু'হাত দূরে রয়েছে উনিশ শ' পাঁচের প্রভাত, অথচ আজকের তরুণ বাঙ্গালী মনে, ভয়াবহ বেদনায় দেখছি. তার একটি আলোকচ্ছটা এসে পড়েনি।

বাঙ্গালী তার নিজের ঐতিহ্যের কাছ থেকে যেন ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

নিজের ছায়ার কাছ থেকে যেমন ছুটে পালানো যায় না, তেমনি যায় না নিজের ঐতিহ্য থেকে। যদি কখন সম্ভব হয়, তা হয় আত্মহত্যার রাত্রিতে।

তাই আজ সভয়ে সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করছি; সেই আত্মহত্যার নিবিড় রাত্রির অন্ধকার কি তোমার আমার শেষ গন্তব্য ?

নিজেকে চেনা নিজেকে জানা, এই হলো যত শিক্ষার মূল কথা। তেমনি মূলকথা হলো, নিজের জাতিকে চেনা, নিজের জাতিকে জানা।"

"উনিশ শ' পাঁচ" নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এই আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী, নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভবে। তাঁর অনুভবে সকলে একমত হবেন এমন মনে করি না। কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জাতীয়তাবোধ অনুধাবনে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য মনে করি।

দীর্ঘ ছয় বছর 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার পরে তিনি তাঁর সাধের 'গল্পভারতী' থেকেও সরে আসেন। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক দীর্ঘ রচনায় তাঁর যে বিক্ষোভ প্রকাশিত হয় তাতে কর্তৃপক্ষ সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না আশঙ্কা করে লেখাগুলি সম্পর্কে সংযত হতে বলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পত্রিকার সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করেন। এখানে আমরা সেই 'শেলী'য়ান নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে পাই, যেখানে তিনি বিবেকেরপ্রতি দায়বদ্ধতায় আপসহীনভাবে স্বাধীন সত্তার অধিকারী।

তারপর পিতৃদেব স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীভূপতি মজুমদার প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর ভাই শ্রীশৈলেশ মজুমদার পরিচালিত 'সৈনিক' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। সেখানে ছদ্মনামে তাঁর বেশ কিছু উদ্দীপনাময়-দেশাত্মবোধক রচনা প্রকাশিত হয়। ঐসব লেখায় তাঁর বলিষ্ঠ দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা, ইতিহাস দর্শন অনন্য ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'প্রার্থনা' শীর্ষক এই রচনাগুলি গভীর অনুভূতি-ব্যঞ্জক এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। ঐসকল রচনা, যতদূর জানা আছে, এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। নিছক সাহিত্যিকমানেই তাদের উৎকর্ষতা তর্কাতীত। তাই সৎ সাহিত্যের দাবিতেই তাদের প্রকাশ কাম্য।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর যেসব রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য ও জীবনমনস্ক মানুষদের স্বার্থেই তাদের উদ্ধার প্রয়োজন। শোনা আছে যে 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী', 'নাট্যলোক', 'জয়শ্রী', 'বঙ্গশ্রী' ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তিনি লিখেছেন প্রচুর। 'ধূমকেতু'-র প্রসঙ্গ

আগেই বলেছি। ‘লাঙলে’ গোর্কির ‘মা’ অনুবাদ ছাড়া অন্য লেখা আছে কিনা সে বিষয়ে গবেষক পাঠক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলিকাতা রেডিওর ছোটদের আসরে তার ‘দাদুমণি’র বেতার ভাষ্যগুলি উদ্ধার করা গেলে আজকে বাঙলার শিশু-কিশোরা উপকৃত হবে বলেই মনে হয়, যেহেতু জীবন গঠনের নানা উপকরণে সেগুলি সমৃদ্ধ ছিল। শিশু-কিশোরদের পত্রিকা ‘মৌচাক’, ‘কিশোর ভারতী’, ‘শুকতারা’য় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে অনেক, যার সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেন।

বাংলার শিশু-কিশোরদের মহত্তর চেতনায় শিক্ষিত করে তোলা তাঁর জীবনে সাহিত্য সাধনার এক মহান ব্রত ছিল। বিশ্ব সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার অনুবাদ ও গল্পকথায় তাদের সামনে উপস্থাপিত করে গেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। তিনি তাদের মানসলোক মহত্তর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন নিজের আরব্ধ কাজ হিসেবে। তাদের কয়েকটি এখনও উল্লেখযোগ্য যেমন, “শেক্সপীয়রের ট্রাজেডী”, “শেক্সপীয়রের কমেডী”, “নতুন যুগের নতুন মানুষ”, “মোসলেম জাতির কর্মবীর”, “রুশজাতির কর্মবীর”, “আবিষ্কারের কাহিনী”, “দক্ষিণ মেরু অভিযান”, “হিমালয় অভিযান”, “জানা অজানা”, “আংকল টমস কেবিন”, “অলিভার টুইষ্ট”, “ডাক্তার জ্যাকেল ও মিষ্টার হাইড”, “ছোট লোকের ছেলে”, “দুঃখজয়ীর দল’, “বন্ধুর চিঠি” ইত্যাদি। এছাড়াও আছে কিছু রহস্য রোমাঞ্চ রচনা শিশু-কিশোদের জন্য। বয়স্কদের জন্য তাঁর রচনা “শেলী” ও গোর্কির ‘মা’-র অনুবাদ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে বহু অনুবাদ যেমন, “জঁ্যা ক্রিসতফ (প্রথম খণ্ড)”, “কুলী”, “দুটি পাতা একটি কুঁড়ি”, কাঁতয়ালার “এরাও মানুষ”-“কথাকণ্ড” (ভেরকর্সের), লিওটলষ্টয়ের Kreutzer Sonata-র অনুবাদ “এযুগের অভিশাপ” হের লিওনার্ড ফ্রাঙ্কের “কার্ল য়্যাণ্ড আন্না” ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন “ডঃ জিভাগো”, “ওয়াদিপস দি কিং” প্রসঙ্গত তাঁর অন্যতম মৌলিক রচনা “অবিস্মরণীয় মুহূর্ত” বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

তাঁর রচনার সমগ্র গ্রন্থপঞ্জী এখানে দেওয়া হয়ত সম্ভব হল না। তবু যতটা সম্ভব এখানে উল্লেখ করেছি আমার জ্ঞান ও সাধ্যমত। স্থানাভাবেও তাঁর রচনার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ এখানে করা সম্ভব হল না, যদিও সেটা করার মত বিশেষজ্ঞতার আমি দাবিদার নই। পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে

সুধী সমাজের কাছে আমার অক্ষম অসম্পূর্ণ প্রয়াস তুলে ধরলাম মাত্র। সুধী সমাজের এবিষয়ে দায় বোধ এলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা পিতৃদেবের চিঠির একটু অংশ, যেখানে তিনি নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন সেটি উল্লেখ করে এই স্মৃতিচারণ শেষ করি। "আমার উপর দুটো বড় প্রভাব ছিল সাহিত্যের দিক থেকে—এক গোর্কির দরিদ্র challenging নায়ক, আর হামসুনের idyllic man।" ব্যক্তি ও সমাজজীবনের মধ্যে এই দুই এর সমন্বয়ের সাধনায় মগ্ন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আমার দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর রেঁনাশাসের এক ভাবময় যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তিত্ব। পরিচয়ের পাঠক ও বৃহত্তর সুধী সমাজের কাছে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবন ও সাহিত্য সাধনার মূল্যায়ণে অংশগ্রহণের আবেদন রেখেই এই স্মরনিকা শেষ করি।

শতবর্ষের আলোয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র

অমূল্যভূষণ গুপ্ত

একক ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় বহুধা বিস্তীর্ণ বিজ্ঞানশাখার কোন একটিতে বিশ্বমানচিত্রে স্বদেশের নামটি মুদ্রিত করে দেওয়া এক কথায় অসাধ্যসাধন। কিন্তু এই আপাত-অসম্ভব ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতবর্ষেই। বর্তমান শতকের প্রথম পাদে। নায়কের নাম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। আর বিজ্ঞানশাখাটি হল পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্স। ইতিহাস প্রেমিক রসায়ণবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই বলতেন—“I am a Chemist by mistake”। কথাটির সামান্য হেরফের করে পরিসংখ্যানের পরিভাষায় প্রশান্তচন্দ্রও বলতে পারতেন—“I am a Statistician by chance.”। বিষয়টি একটু খুলে বলা যাক। পদার্থ বিজ্ঞান আর গণিতের কৃতী ছাত্র প্রশান্তচন্দ্র পরিসংখ্যানবিদ হতে চান নি। চাওয়া সম্ভবও ছিল না। কেননা, ভারতের কথা অনুক্তই থাক, বিশ্বের কোথায়ও তখন পৃথক বিজ্ঞানশাখা হিসাবে পরিসংখ্যানের স্বীকৃতি দূরের কথা, তেমন কোন পরিচিতিই ছিল না।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হয়ে প্রশান্তচন্দ্র ১৯১৩-য় গেলেন ইংল্যাণ্ডে। উদ্দেশ্য, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান আর গণিতে উচ্চতর শিক্ষালাভ। একদিন কেম্ব্রিজে বেড়াতে গিয়ে ঘটনাচক্রে সেখানকার কিংস কলেজে ভর্তি হলেন। কেম্ব্রিজে প্রায় দু'বছর কাটিয়ে ট্রাইপোসে প্রথম হয়ে বৃত্তি লাভ করে প্রশান্তচন্দ্র দেশে ফিরলেন। সঙ্কল্প ছিল কিছুদিন দেশে কাটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য আবার ফিরে যাবেন কেম্ব্রিজে। কিন্তু ইতিহাসপুরুষের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে অনিশ্চয়তা। তার মধ্যেই দেশে ফেরার আগে প্রশান্তচন্দ্র ঠিক করে ফেলেন যে, ফিরেই বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরিতে শ্রুতকীর্তি পদার্থবিদ সি. টি. আর. উইলসনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করবেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন মহলানবিশের দেশে ফেরা কিছুদিনের জন্য আটকে যায়। সময় কাটাতে তিনি কলেজ লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে থাকেন। একদিন তাঁর টিউটর অধ্যাপক মেকলে কার্ল পিয়ারসন সম্পাদিত কয়েক খণ্ড ‘বায়োমেট্রিকা’ জার্নাল

দিলেন পড়ে দেখার জন্য। প্রশান্তচন্দ্র সেগুলো পড়ে এতোদূর মুগ্ধ হলেন যে, ঐ জার্নালের সমস্ত সেটটি তিনি নিজেই কিনে ফেললেন। দেশে ফেরার পথে সেগুলো এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আরও কিছু বই তিনি সঙ্গে নিলেন। গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ তিনি পথেই জাহাজে পড়ে ফেললেন। হঠাৎ তাঁর সামনে খুলে গেল এক নতুন জগতের স্বর্ণদুয়ার। মনশ্চক্ষে তিনি পরিসংখ্যানের বিপুল সম্ভাবনাময় চিত্ররূপটি প্রত্যক্ষ করলেন।

এদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। যুদ্ধের দরুন বিদেশিরা কেউ আসছেন না। পদার্থ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক আবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। প্রশান্তচন্দ্রের কাকা এস্. সি. মহলানবিশ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান। ভাইপো প্রশান্তচন্দ্রকে একদিন তিনি অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সপ্রতিভ প্রশান্তচন্দ্রকে জেমসের পছন্দ হল। তিনি তাঁকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। এভাবে মহলানবিশ ইণ্ডিয়ান এডুকেশান সার্ভিসে ঢুকলেন। কেম্ব্রিজে আর ফেরা হল না।

জীবনে কেম্ব্রিজের স্মৃতি মহলানবিশ কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ড ও জীবনদর্শনবহুলাংশে কেম্ব্রিজের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি শ্রীনিবাস রামানুজম, জি.এইচ. হার্ডি, জে.এম. কীন্স, ডিকিন্সন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ বহু দিকপালের সান্নিধ্যে আসেন। মনে হয়, নিজ জীবনের বহুমুখী প্রতিভার বীজটি তাঁর মানসক্ষেত্রে তখনই উপ্ত হয়েছিল।

ওদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ব-আগ্রহ হিসাবে চলল অতন্দ্র পরিসংখ্যান চর্চা। প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করা ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। অল্প দিনেই পার্শ্ব-আগ্রহ মুখ্য হয়ে উঠল। পদার্থবিদ প্রশান্তচন্দ্র পরিচিত হয়ে পড়লেন পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে। নতুন বিজ্ঞানের রীতিপদ্ধতি তাঁকে মুগ্ধ করল। কলেজের বেকার ল্যাবরেটরির এক ক্ষুদ্র কক্ষে আত্মপ্রকাশ করল ভারতে পরিসংখ্যান চর্চার প্রথম কেন্দ্র—'ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরি'।

বিদেশী সরকারকে তিনি বোঝালেন পরিসংখ্যানের সারবত্তা। দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে প্রথমে জানা দরকার কতটা অন্ধকারে আমরা আচ্ছন্ন রয়েছি। আর, সেজন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা। এভাবে নতুন বিজ্ঞানে গবেষণার সূত্রপাত করতে তিনি অর্থের ব্যবস্থা করলেন। বীজ

থেকে অঙ্কুরোদ্গম, আর অঙ্কুরিত চারার মহীরুহপ্রাপ্তি—সবই তিনি জীবদ্দশায় দেখে গেছেন। না, ঠিক বলা হল না। এই গোটা নাটবটির তিনিই ছিলেন মুখ্যচরিত্র—একমেব অদ্বিতীয়ম্। ভাবলেও বিস্ময় লাগে। শুরু হয়েছিল পরাধীন ভারতে। প্রেরণা জুগিয়েছিলেন দুই মহারথী—একজন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অন্যজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর দেশ স্বাধীন হল। জওহরলাল মহলানবিশের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করলেন। প্রশান্তচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে আম্রপালির চারদিকে গড়ে উঠল এক বিশাল শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। বটগাছের মতো তা ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। কতো দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থী আর পণ্ডিতের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠল সেই গবেষণাকেন্দ্র—'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্' যেন তা-ই হয়ে উঠল। সেইদিনের সেই 'ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরি' শেষ পর্যন্ত ১৯৩২-এর ২৮শে এপ্রিল রূপ পেল 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইঃস্টিটিউট' বা সংক্ষেপে ISI-এ। এটি আজ একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা' ও ডিমড্ ইউনিভার্সিটি। মূলকেন্দ্র কলকাতা। এ ছাড়া, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, বরোদা, বম্বে, পুনে মাদ্রাজ, কোয়েমবাটুর, মাইশোর, ত্রিবান্দ্রম, গিরিডি——সারা ভারত জুড়ে শাখা প্রশাখা। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ই. স্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠা মহলানবিশের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। তাঁর সংগঠন ক্ষমতার জ্বলন্ত প্রতীক।

শতবর্ষের আলোয় আজ যখন আমরা তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা দেখছি তখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে পরিসংখ্যানে প্রশান্তচন্দ্রের অবদান কি? এই ছোট প্রতিবেদনে প্রশ্নটির বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। তবে, স্পষ্টত এর দুটি অংশ। প্রথমত, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি আমাদের জন্য কী রেখে গেছেন? দ্বিতীয়ত, ভারতে পরিসংখ্যান চর্চার ক্ষেত্রে এই পথিকৃৎ পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীর ভূমিকাটি কী ছিল? দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আগের অনুচ্ছেদটিতে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। নতুন সংযোজন হিসাবে আর যা উল্লেখ করা চলে তা হলঃ তিনিই প্রথম ভারতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালু করেন ১৯৪১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং তিনিই ছিলেন প্রথম বিভাগীয় প্রধান। এর আগে ১৯৩২-এ তিনি ISI-এ স্নাতকোত্তর পরিসংখ্যান শিক্ষাক্রম চালু করেছিলেন। সারা ভারতে আর কোথাও তখন এর অস্তিত্ব ছিল না। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে

(NSS) বা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এটি মহলানবিশের আর এক অক্ষয় কীর্তি। ধারাবাহিক রাশিতথ্য সংগ্রহের এমন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিরল। দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে যোজনা ভবনে যেসব বিশেষজ্ঞ বসে আছেন আজ যে সরকারকে তাঁদের সাহায্য ও পরামর্শ নিতে হয় সে-ও তাঁরই ব্যবস্থা অনুসারে। NSS-ছাড়াও তাঁর একক প্রচেষ্টায় রাজ্যে রাজ্যে গড়ে ওঠে স্টেট ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো। এগুলো কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট্রাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশান (CSO) বা কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা। শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিসংখ্যানের প্রয়োগে বা Statistical Quality Control (SQ.C)-এ ভারতে তিনিই পথিকৃৎ। তাঁরই চেষ্টায় IAS-এর সমতুল একটি ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস ISS চালু হয়েছে। এসব কাজে যে দুই ব্যক্তিত্বের অকুণ্ঠ সহযোগিতা তিনি লাভ করেন তাঁদের একজন ছিলেন জওহরলাল নেহরু, অন্যজন মহলানবিশের কেম্ব্রিজ জীবনের সতীর্থ সি, ডি, দেশমুখ। গবেষণার কাজে ভারতে প্রথম কম্পিউটারের প্রয়োগও করেন এই মহলানবিশ তাঁর ISI-এ। দেশ কিন্তু তখন পরাধীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর পর্বে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা চালিয়েছেন হাওয়ার্ড অ্যাল্লকেন, জন ফন নয়মান, নোরবার্ট ভাইনার প্রমুখ দিকপালদের সঙ্গে। 1933 থেকে তিনি পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের জার্নাল ‘সংখ্যা’ প্রকাশ করেন যা আজও বিশ্বের রাশিবিজ্ঞানের জার্নালগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। একান্ত তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসে পরিসংখ্যান একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। আর, বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিতে যেসব পরিসংখ্যানবিদ কর্মরত আছেন তাঁদের একটা বড় অংশ ISI-এর প্রাক্তন ছাত্র। এসব ছাত্র ও গবেষকের পক্ষে জীবনের উষালগ্নে ISI-এর বি, টি, রোড ক্যাম্পাসে রোনাল্ড ফিশার, হলডেন, কলমোগোরভ, লিনিক, আব্রাহাম ওয়াল্ড, শিউহার্ট, ভাইনার প্রমুখ বিজ্ঞানকুলতিলক বা বেট্‌লহেম, লাঙে, টিনবার্গেন, গলব্রেথ প্রমুখ অর্থনীতির দিকপালদের সাহচর্য লাভ সম্ভব হয়েছিল তা একমাত্র মহলানবিশের ব্যক্তিত্বে ও তাঁর সহধর্মিনীর ব্যবস্থাপনায়।

এ ও গেল দ্বিতীয় অংশের কথা। প্রথম অংশ মূলত বিশেষজ্ঞদের আলোচ্য। আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি মাত্র। স্ট্যাটিস্টিক্সের

কোন উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক নমুনা হিসাবে তুলে নিয়ে যদি একবার Author index-এ চোখ বোলানো যায় তবে দেখা যাবে যে, মহলানবিশের নামটি অন্তত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে যুক্ত রয়েছে। এগুলো হল : মহলানবিশ দূরত্ব D^2, পরীক্ষা-পরিকল্প বা ডিজাইন অব্ এক্সপেরিমেন্টস এবং ব্যাপক নমুনা সমীক্ষা বা লার্জ স্কেল স্যাম্পলিং—তত্ত্বে ও প্রয়োগে।

D^2-র পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৯২০-এ নাগপুর বিজ্ঞান কংগ্রেসে হঠাৎ মহলানবিশের সঙ্গে তৎকালীন অ্যানথ্রপোলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর ডঃ অ্যানানডেলের দেখা হয়। তাঁর অনুরোধে প্রশান্তচন্দ্র অ্যানানডেল সংগৃহীত কলকাতার অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে কিছু তথ্য বিশ্লেষণে রাজি হন। এর ফলেই রাশি বিজ্ঞানে মহালানবিশের প্রথম গবেষণাপত্র Anthropological observations on the Anglo-Indians of Calcutta (১৯২২) প্রকাশিত হয়। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে তিনি রাশি বিজ্ঞানের একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেন। তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অ্যানথ্রপোলজিক্যাল শাখার সভাপতির ভাষণ দেন—Analysis of race Mixture in Bengali তারপর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পিয়ারসনের ল্যাবরেটরিতে রেসাল লাইকনেস ফাংশন নিয়ে গভীর অধ্যয়ন। শেষ পর্যন্ত এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল ১৯৩০-এ তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্র- 'Test and Measures of Group divergence, আর তাতেই তিনি প্রস্তাব করলেন তাঁর D^2-ষ্ট্যাটিস্টিক। এখানে D হল দূরত্ব। কিন্তু এই দূরত্ব বলতে কি বোঝায়? পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ও সেখানেই বিস্তৃতি লাভ করে। এখন দুই ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী একই জাতি থেকে উদ্ভূত কিনা বা তারা কতটা ভিন্ন তা এই মহলানবিশ দূরত্ব D থেকে জানা যায়। ব্যাপারটা এই রকম : আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা বৈশিষ্ট্য মাপতে পারি। যেমন, উচ্চতা, ওজন, খুলির ক্ষেত্রফল, ছাতির বিস্তৃতি ইত্যাদি। এক এক গোষ্ঠীর এই সব পরিমাপের গড় প্লট করতে গিয়ে যদি দেখা যায় তাদের বিন্দুগুচ্ছ কাছাকাছি, তবে ঐ দুই গোষ্ঠী একই জাতি থেকে উদ্ভূত। দূরত্ব বেশি হলে তা বলা যাবে না। আজ শুধু নৃতত্ত্বে নয়, মনোবিজ্ঞান, জীবমিতি, ভূতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থমিতি কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্যাটার্ন নির্ণয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখায় 'মহলানবিশ দূরত্ব' এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

D^2_{ij}-নিয়ে মহলানবিশ যখন ব্যস্ত, প্রায় ঠিক সেই সময়ে (১৯২৫) পরিসংখ্যানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তিনি বাধ্য হয়ে প্রবেশ করেন। কালক্রমে, নতুন ক্ষেত্রটি হয়ে ওঠে পরিসংখ্যানের এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র—পরীক্ষা-পরিকল্প বা ডিজাইন অব্ এক্সপেরিমেন্টস। যোগাযোগটি ছিল কাকতলীয়। কৃষিবিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্রীয় পরীক্ষায় (Field trials) তথাকথিত error গণনা নিয়ে মহলানবিশ তখন হিমসিম খাচ্ছেন। ভুল-ভ্রান্তি' অর্থে যে error এ ঠিক তা নয়, এতে দোষাবহ কিছু নেই। হুবহু অনুরূপ পরীক্ষায় লব্ধ ফলাফলগুলো আদর্শগতভাবে একই হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা কখন হয় না, কিছুটা ভেদ বা variation ঘটেই। যে সূত্রগতই হোক না কেন, ভেদের এই অস্তিত্বকে জানানোর নাম হল কতটা error হয়েছে তার উল্লেখ করা।

ছ'টি ভিন্ন প্রকার ধানের ফলন নিয়ে মহলানবিশ তখন পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাতে জমির উর্বরতাজনিত ভেদের দারুণ ফলনে কতটা ভেদ ঘটতে পারে তা গণনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রকার ধানগুলো রোয়া হয়েছিল সমান্তরাল সব প্লটে, আর একাধিক ব্লকে একই ক্রমে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। এক স্থূল অংশাঙ্কন পদ্ধতিতে (graduation) মহলানবিশ শেষ পর্যন্ত তাঁর গণনা কাজ সমাধা করেন। বেশ কয়েক বছর পরে বিজ্ঞানী নেম্যান পদ্ধতিটিকে স্বাধীনভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। কিন্তু ঘটনার উল্লেখযোগ্য দিকটি হল, এই কাজের মাধ্যমে মহলানবিশের সঙ্গে রোনাও ফিশারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। কিন্তু কে এই ফিশার? মহলানবিশ যখন পরিসংখ্যানে কাজ শুরু করেন তখন বিষয়টির নিতান্তই শৈশবদশা। পিয়ারসন, গোসেট প্রমুখেরা সবেমাত্র ভিত স্থাপনের কাজে ব্রতী হয়েছেন। এই সময় যার যুগান্তকারী কাজকর্মের মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞান সমাজে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই হলেন ফিশার। মহলানবিশের গবেষণাপত্র পড়ে ফিশার সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সমানমনা অন্তত আরো একজন রয়েছেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি ভেদ-নিয়ন্ত্রণে কৃষি সংক্রান্ত পরীক্ষা-পরিকল্প বিষয়ক নিজের কাজগুলোর রিপ্রিন্ট তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। বড় মাপের দুই ব্যক্তিত্বের আকস্মিক যোগাযোগ আমৃত্যু বজায় ছিল। জ্ঞানচর্চার ঐক্য উভয়কে সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল। যতদিন বেঁচেছিলেন, সাইবেরিয়ার পাখিদের মতো, প্রতি শীতেই শ্মশ্রুমণ্ডিত ফিশারকে আমরা আম্রপালির বাগানে বাগানে ঘুরতে দেখতাম।

পরিসংখ্যানের ফিশারীয় দর্শনে প্রথমদিকের বিশ্বাসীদের অগ্রগণ্য হলেন মহলানবিশ। ভারতে তিনি ফিশারের পদ্ধতিগুলো শুধু প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হন নি সেগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রসার ও বিবর্ধনও ঘটিয়েছিলেন। পরীক্ষা-পরিকল্পরূপী এই নতুন ও যুগান্তকারী পদ্ধতিকে ভারতে চালু করতে মহলানবিশ কার্যত এক আন্দোলনের পুরোধা-পুরুষ হয়ে ওঠেন। অন্যদের সহযোগিতায় তিনি কৃষিকর্মিদের জন্য তৈরি করলেন Statistical Notes। নিজের, 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল ল্যাবরেটরি'তে উদ্ভাবিত বিষয়কে ফিশারের পদ্ধতিতে সংযোজিত করা হল। এভাবে সরাসরি ক্ষেত্রীয় প্রয়োগের জন্য উপস্থাপিত হল এক pre-fabricated প্রয়োগবিধি। এগুলোর বর্তমান নাম Latin squares এবং randomised and confounded block designs। একাজে অন্য যে বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তিনি হলেন রাজচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানজগতে আর. সি. বোস নামে যিনি পরিচিত। রাজচন্দ্র ছিলেন মহলানবিশেরই এক আবিষ্কার, অনেকটা যেমন ফ্যারাডে ছিলেন ডেভির। মহলানবিশের আগ্রহেই বিশুদ্ধ গণিতবিদ রাজচন্দ্র ফলিত পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে নির্ভীক পদচারণা করেন। শুধু আর. সি. বোস-ই নন, netting the right fish ব্যাপারটায় মহলানবিশের সুনাম ছিল। তিনি তাঁর চারপাশে বহু প্রতিভাকে জড়ো করতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শুভেন্দুশেখর বসু, জে. এম. সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্রনাথ রায়, কে. আর. নায়ার, হরিশ্চন্দ্র সিংহ, অমূল্যরতন সিংহ, সি. রাধাকৃষ্ণ রাও প্রমুখেরা।

নমুনাতত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহলানবিশের কাজের গুরুত্ব বুঝতে জানা দরকার নমুনা বলতে কি বোঝায়? নমুনা হল কোন বস্তুপুঞ্জের সামান্য একাংশের এমনভাবে নির্বাচন যাতে সেটি 'সমগ্র' বস্তুপুঞ্জের যথার্থ প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারে। দৃশ্যত মনে হয়, এ আর এমন কি? কিন্তু ঐ 'সমগ্র' বস্তুটি যদি ভারতের মতো বিরাট ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে? যেমন ধরা যাক, যা ঘটেছিল ১৯৩৭-এ। Indian Central Jute Committee সারা বাংলার মোট জমির পরিমাণ ও সেই জমিতে মোট কত পাট পাওয়া যাবে, বীজ বোয়ার পরে এবং উৎপাদনের আগেই তার আনুমানিক হিসাব বা পূর্বাভাস জানাতে মহলানবিশের সাহায্য চাইলেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ব্যাপারটি যত সোজা মনে হচ্ছিল আদতে তা নয়। বস্তুতঃ

থেকে চাল পরীক্ষা করে চাল কেনার ক্ষেত্রে যে 'নমুনা' এ তা নয়, বা স্লাইডে রোগীর দেহ থেকে 'নমুনা' রূপে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে যে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এটি ঠিক তেমনও নয়। Jute Committee-র ঐ সমীক্ষা তিনি চালান অংশক-চয়ন পদ্ধতিতে (Sample survey method)। এরই সূত্র ধরে মহলানবিশের যুগান্তকারী কাজ ব্যাপক নমুনা সমীক্ষা বা লার্জ স্কেল স্যাম্পেল সার্ভে পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এ সম্পর্কে রয়্যাল সোসাইটির Philosophical transaction-এ তিনি এক দিগ্‌দর্শী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। রাশি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কাজ তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বরমাল্যে ভূষিত করে। সেই সঙ্গে ISI আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রুত পরিসংখ্যানবিদ্ হোটেলিং-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য —The ISI has taken the lead in the original development of the technique of sample surveys, the most potent factfinding process available to the administration"। এই কাজের স্বীকৃতিতে ১৯৪৫-এ প্রশান্তচন্দ্র FRS হন, রাষ্ট্র সংঘ তাঁকে UN স্যাম্পল সাব-কমিশনের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান।

তাঁর জীবনের শেষ পর্বের বৈজ্ঞানিক অবদান হল Fractile Graphical Analysis বা FGA। NSS দ্বারা সংগৃহীত বিপুল তথ্যরাজিকে কি করে আরও অর্থবহ করে উপস্থাপিত করা যায়, গাণিতিক দিয়ে সরল ও বুঝতে সহজতর করা চলে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর তা থেকেই FGA-এর উদ্ভব। দুই কালের ব্যবধানে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বা একই কালে দুই শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা করা বড়ই অসুবিধাজনক ধরা যাক দুই ভিন্ন কালে একই জনগোষ্ঠীর খরচের প্যাটার্নের তুলনা করতে হবে। যদি বিভিন্ন আয়স্তরের লোকদের খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ইত্যাদি যাতে গড় খরচের তুলনা করা হয় তা হলে সেটি বস্তুত দুই ভিন্ন কারেন্সিতে করা খরচের তুলনার শামিল হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, টাকার ক্রয়ক্ষমতা ইতিমধ্যে আমূল পাল্টে গেছে। প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতির প্রয়োগ এক্ষেত্রে একেবারে অর্থহীন। অর্থবহ তুলনার জন্য যা প্রয়োজন তা হল টাকার ক্রয় ক্ষমতাকে একেবারে প্রভাবহীন করে দেওয়া, এখানেই FGA-এর গুরুত্ব। এজন্য প্রয়োজনীয় Compute software বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টা চালান।

কিন্তু এই কি পরিসংখ্যানে মহলানবিশের দানের মোট ফসল ? না

স্থূলসূক্ষ্ম আরও অনেক কিছু আছে। তবে মৌলিকত্বে সেগুলো ততটা ভাস্বর নয়। এদের বড় অংশ হল নানা বাস্তব সমস্যার সমাধানে দৃশ্যত পরিচিত সব রুটিনী পদ্ধতির প্রয়োগ। তবে সমস্যাগুলোর অধিকাংশ কিন্তু মোটেই রুটিনী ছিল না। সবগুলোর পরিচয় দেওয়া স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৯২২-২৩-এ তদানীন্তন ডাইরেক্টর জেনারেল অব্ অবসারভেটরিজ-এর অনুরোধে মহলানবিশ আবহ বিজ্ঞানের কিছু সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন। বিশুদ্ধ পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণে তিনি দেখান যে, ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়ার সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ-অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত। এর কয়েক বছর পরে ভৌতবিজ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞানীরা একই সিদ্ধান্তে পৌছান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশায় বিধ্বংসী বন্যার পর ভবিষ্যতে বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির সুপারিশ ছিল, ভবিষ্যতে বন্যার হাত থেকে বাঁচতে ব্রাহ্মণী নদীর পাড়-কে (embankment) আরও কয়েকটি উঁচু করতে হবে। সুপারিশ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল। মুখ ভূমিকায় স্বয়ং মহলানবিশ। ওড়িশার নদীগুলোর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ রাজ্যের বিগত ৬০ বছরের বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রীয় ও কালিক বণ্টনের পরিসংখ্যান তাঁর হাতে ছিল। পরিসাংখ্যিকভাবে তা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যে, ১৯২৬-এ নদীটির জলস্তরের যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি তার কারণ ঐ বছর নদীটির ক্যাচমেণ্ট এলাকায় অস্বাভাবিক বেশি বৃষ্টিপাত। কমিটি ভেবেছিল, নদীগর্ভ উঁচু হয়ে গেছে। ব্যাপারটি আসলে তা ছিল না। এজাতীয় সমস্যার সমাধান পরিসংখ্যানের ভাষায় যে এলাকায় পড়ে তার নাম 'অপারেশান রিসার্চ' (operation research)। এব্যাপারে মহলানবিশের দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। শুধু ব্রাহ্মণী নদীর ক্ষেত্রেই নয়, উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

এভাবে নানা বাস্তব সমস্যার তাৎক্ষণিক বা রেডিমেড সব সমাধান যোগাতে মহলানবিশ সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। পরিসংখ্যানকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো একটি ফলিত বিজ্ঞানশাখা হিসাবে দেখতেন। তাঁর প্রতীতি জন্মেছিল যে, দেশের পক্ষে 'sterile intellectual acrobatics'-এর চেয়ে ঢের বেশি জরুরি ও প্রয়োজন পরিসংখ্যানের ফলিত প্রয়োগ।

ফিশার ও মহলানবিশ উভয়েই বলতেন—'statistics is a key technology'। বাস্তব সমস্যার সমাধানে সে কতটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে তা দিয়েই তার মূল্যায়ণ হবে। একথা ঠিক যে, পরিসংখ্যান গণিত নির্ভর। ইঞ্জিনিয়ারিং-ও তা-ই। তাকে গণিতের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু তা বলে ইঞ্জিনিয়ারিং গণিত নয়। মহলানবিশের দৃষ্টিতে পরিসংখ্যানও নয় বিশুদ্ধ গণিত। ISI-এর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টররূপে নিজ সহকর্মিদের মধ্যে এই ধারণাটি মুদ্রিত করতে তিনি সারাজীবন নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন। তবে তিনি এ-ও জানতেন যে, পর্যাপ্ত তত্ত্বীয় ভিত্তিবিহীন ফলিত ক্রিয়াকর্ম কখনও দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু তত্ত্বের খাতিরে যে তত্ত্বতা নেহাৎ বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরীমাত্র। কোন কাজে আসে না। এ দুয়ের যে কাম্য প্রতিমিতি বা ব্যালান্স তা অবশ্য সব সময় বজায় রাখা খুব দুষ্কর। এমন কি, ISI-এ মহলানবিশের পক্ষেও তা করা সর্বদা সম্ভব হয় নি। তথাকথিত Mathematical excess বা গাণিতিক বাড়াবাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েই সম্ভবত তিনি রাজচন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানীকে হারিয়েছিলেন। নিজ বিষয়ের প্রতি আনুগত্যে বসু শেষ পর্যন্ত স্বদেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং বিশিষ্ট গণিতবিদ হিসাবে বন্দিত হন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ISI-এর একদল বিজ্ঞানকর্মীর পরিসাংখ্যিক উৎপাদে ফলিত তির্যকতা আনতে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন। এবং দেশের পক্ষে তা মঙ্গলজনকও হয়েছিল। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ISI-এ শুধু পরিসংখ্যান আর গণিত বিভাগই ছিল না। 1972-এ তাঁর প্রয়াণ বৎসরে দেখা যায়: বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও ট্রেনিং-এর জন্য ISI-এ রয়েছে নানা বিজ্ঞান বিভাগ—সাইকোমেট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, বোটানি, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্যুনিকেশান সায়েন্স, ডিমোগ্রাফি, ইকোনমিক্স, জিওলজি, জিনেটিক্স, লিঙ্গুয়িষ্টিক্স, ন্যাশনাল ইনকাম, প্ল্যানিং, ফিজিক্স, অ্যানথ্রপোমেট্রি, সোসিওলজি, অবশ্যই ম্যাথম্যাটিক্স ও ষ্ট্যাস্টিস্টিক্স। অসংখ্য ঝুড়ি-নামানো বটবৃক্ষ, নিচে লেখা Unity-in diversity-এই ছিল তাঁর ISI-এর Emblem।

পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধ ফ্রেমটিতে নিছক রূপরেখায় বিজ্ঞানী মহলানবিশের যে চিত্রটিকে এতোক্ষণ ধরে আঁকা হল, তা কিন্তু মোটেই তাঁর পূর্ণরূপ নয়। প্রতিভাধর এই পুরুষটি তাঁর বহুধাবিস্তৃত জীবনক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু করেছেন যা জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। সেগুলোর সামান্যতম পরিচয়

দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি বিশ্বভারতীর অন্যতম সচিব ছিলেন। বিশ্বভারতীর পুনর্গঠনে তাঁর অসামান্য পরিশ্রম ও প্রতিভার কথা সাধারণ্যে তেমন সুবিদিত না হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা বৌদ্ধিক আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ, এক বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষুরধার বাগ্মী, বাংলা সাহিত্যের এক গণনীয় ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন ভারতের জৈন উপভাষা নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানে বাস্তবতার ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনাবাদ, অর্থাৎ পরিসংখ্যান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রহণ করা হয়েছে তার সঙ্গে ঐ গোষ্ঠীর কিছু চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন। তা ছাড়া, অর্থতত্ত্বের গভীরেও এই পানকৌড়ি অনায়াস পটুতায় ডুব দিতে পারতেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অর্থমিতির এক প্রকল্পের রূপকার। প্রকল্পের নাম 'মহলানবিশের দুই ও চার সেক্টর অর্থমিতি মডেল' বা সংক্ষেপে 'মহলানবিশ মডেল'। এই মডেল থেকে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে কি পরিমান বিনিয়োগ 'পরম উপযোগী' বলে গণ্য হবে তা নির্ধারণ করা যায়। বস্তুত, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আস্থাভাজন, এক কথায় নেহরুর brain trust। সেই অধিকার ও দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তখন তাঁর মূল্যবান সময়ের প্রায় সবটা জাতীয় পরিকল্পনার কাজে ব্যয় করেন। এর ফলশ্রুতি ভারতের 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা (১৯৫৬)'।

অক্লান্তকর্মা এই কর্মযোগীর পরিশ্রমের ফসলগুলো একদিকে যেমন তাঁর জন্য বয়ে এনেছে অবিসংবাদিত নেতৃত্বের বরাসন, অন্যদিকে তেমনি তাঁকে করে তুলেছে এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। একদিন যখন বিতর্কের ধূলিজাল স্তিমিত হয়ে আসবে, অবসিত হবে ঝড়ঝঞ্ঝার বজ্রনির্ঘোষ তখন দেখা যাবে যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তী পুরুষ, ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদদের কাছে এক পিতৃসম ব্যক্তিত্ব যা থেকে শুধু স্নেহের ধারাই ক্ষরিত হত না, শাসনের দাহও সমভাবে বিকীর্ণ হত। ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক, বিশ্বের চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যার সারথি। তাঁর আন্তর্জাতিকতার পরিচয় পেতে আম্রপালির বাগানে বাগানে এবং স্নিগ্ধ অপরাহ্নবেলায় নিঃশব্দ পদচারণাই যথেষ্ট হবে। বাগানের প্রতিটি গাছ জানিয়ে দেবে কার করস্পর্শে

সে ভূমিস্থ হয়েছে। তাতে যেমন পাওয়া যাবে বিজ্ঞানী নীল্‌স বর, পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট, জোলিও কুরি, রোনাল্ড ফিশার, কলমোগোরভ, ক্রেমার, হলডেন, শিউহার্ট প্রমুখের নাম, তেমনি মিলবে হো-চি-মিন, চৌ-এন-লাই প্রমুখ রাজনৈতিক জগতের সব ধুরন্ধরদের নাম, দেশের জ্ঞানীগুণিদের ত কথাই নেই।

ধ্যানমগ্নতা নয়, কর্মোদ্যোগের দর্শনই ছিল মহলানবিশের জীবন দর্শন। জাতির প্রাণভাণ্ডারে যাঁরা নিঃশব্দে প্রাণশস্য সঞ্চয় করে রেখে যান তিনি তাঁদেরই একজন।

হা কৃষ্ণ

তুষার চৌধুরী

কুষ্ঠরোগী, পাতাখোর, খঞ্জ, অন্ধ, যাযাবর, যৌনকর্মী, ঝুপড়ির বাসিন্দা,
গাড়িবারান্দার নিচে রাত কাটে তোমাদের, নীল আকাশের নিচে দিন ।
এসেছ নরকে উড়ে, ঠিক পরিযায়ী নও, তোমরা মুদ্দফরাস পরিন্দা ;
উচ্ছিষ্টে দারুণ মতি, হানাহানি হুটোপুটি, ঘুমঘোরে হাওয়ায় উড্ডীন ।

ভূরি ভূরি পয়দা হচ্ছে মেঘ বৃষ্টি খরা হিম শিশির কুয়াশা ছায়া রোদ
সাপ ব্যাঙ কেঁচো কেন্নো তার সাথে সত্যশিবসুন্দরের সাধক সন্তান ।
জৈবপ্রকৌশলে ফলে অর্কিড জনার ধান উপগ্রহ বোমা ও বিমান ।
প্রকাণ্ড হাতির পায় মুহূর্তেই থেতলে যায় হঠকারী খুদে প্রতিরোধ ।

কোনো কথা নয় শুধু শুনে যাও, যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে মানা চাই ।
শুধুই মানুষ বাড়ে, উদ্ভ্রান্তের জাতিবৈর, বর্ণদাঙ্গা, মজহব-জিগির ;
বাড়ে তো বাড়ুক, হোক এলোমেলো, গুপ্তহত্যা, ভাইয়ে ভাইয়ে
চলুক লড়াই ।

নতজানু হও, নাও অস্ত্র ঋণ, মানদণ্ড বণিকের হাতে থাক স্থির ।

আকাশে বাতাসে ওড়ে লগ্নিপুঁজি, জি-সেভেন, ভেসে আসে রতিজাতমারী ।
নাকি দুর্যোধন চুল ধরে টানছে দ্রৌপদীর, দুঃশাসন টেনে খুলছে শাড়ি ।

কন্যাভ্রূণ

কৃষ্ণা বসু

ভ্রূণহত্যার এদেশে এসেছি হঠাৎ ।
শিশুকন্যা ভ্রূণগুলি খুন হয় নিখুঁত আঙুলে ;
সুসভ্যতা উঠে এসে টিপে ধরে অজাত-কন্যার কচি টুঁটি,

যে মুখ দুধের স্বাদ তখনো পায়নি
তার কচি মুখে তুমি গরল পুরেছ,
সভ্যতা, তোমাকে এক লক্ষ ধন্যবাদ !

না গো, মেয়ে হয়ে জন্মাব না আর
এই সকরুণ উপমহাদেশে, নারী হয়ে
জন্মাব না আর মৃত্যুর চিকণ ফাঁস
পরে নিতে তোমাদের হাতে ।
‘দেবী’ শব্দটির অর্থ অভিধানে ‘পূজনীয়া’—
ব্যবহারে দাসীই জেনেছ ।
এই ভণ্ড মাতৃতন্ত্রের স্বদেশে, তন্ত্রাচারে,
যাকেই সবচেয়ে বেশি হেলা, হেলাফেলা
দিয়ে গেছ সুসভ্যতা তুমি ।
না কোনো অভিমান নয়,
অভিমান অতি মহার্ঘ সঞ্চয়,
ভুল ব্যবহারে তাকে নষ্ট করা ঠিক নয়,
সমস্ত দাবীই প্রত্যাহার করে নিই আজ ।
শুধু একই প্রার্থনা রেখে যাই মহাকালের নিকট :—
—নারীহীন, মাতৃহীন, যোষিত সংসর্গহীন, বান্ধবীবিহীন,
হয়ে বেঁচে থাক আগামী প্রজাতি ।

জেলখানার দিকে তাকালে

প্রদীপচন্দ্র বসু

জেলখানার দিকে তাকালে আমার ভীষণ হাসি পায়,
হাসি চাপতে চাপতে আমি মিনিবাসে উঠে পড়ি—
ওখানে বন্দী আজ আমার মতো অসংখ্য মানুষ,
আমি জানতে চাই কে ওদের বিচার করলো ?

কেউ দাঁড়িয়ে আছে, সামনে খোলারাস্তা নেই, নেমেছে বিশাল ধ্বস
হাওয়া শুধু হাওয়া, আর
ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে টালমাটাল, দেওয়ালে ঠেকেছে পিঠ
যে সামনে পিছনে, পারছে না কোথাও যেতে !
আবার তাকিয়ে দেখি
কেউ হাঁটছে, হাঁটছে আর দেখছে ক্রমশ শ্মশানের দিকে
সোজা চলে গেছে তার পথ,
অগ্নির সম্মোহন তাকে দ্রুত কাছে টেনে নেয় !
সে না চাইতেই বেশি পায় যা কিছু পাবার, সে খুব দুঃখী
তার জন্য আমার সমবেদনা নেই, তাকে ঈর্ষা করি,
গালাগাল দিই সামনে আড়ালে
আর, এভাবেই একদিন রক্তচাপ বেড়ে যায় তার !

এ তিনরকম ছাড়া
আরো যে মানুষ, হাজার হাজার মানুষ, তাদের
হাজার হাজার দুঃখ নিয়ে,
বেঁচে থাকার হাজার রকম সমস্যা নিয়ে পর্যুদস্ত,
মুক্ত জীবন তবু নিজের মধ্যে বন্দী নিজে,
দিন কাটাচ্ছে জেলখানার দেওয়ালের বাইরে
তাদের হয়ে আমি জানতে চাই,
দেওয়াল ঘেরা জেলের বন্দী, কে ওদের বিচার করলো ?
কে ওদের উপহার দিল জটিলতাহীন জীবনযাপন ?

জেলখানার দিকে তাকালে আমার ভীষণ রাগ হয় ।

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

[১৯৩৭—১৯৪৭]

সুস্নাত দাশ

মুখবন্ধ :

শুধু পূর্ববাঙলার (অধুনা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র) নয়, আজ পর্যন্ত অবিভক্ত বাঙলার কোনো জেলারই কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। একমাত্র ছড়ানো-ছিটানো আছে পরাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা—এমন কয়েকজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। খবরের কাগজ হাতড়ালে আঞ্চলিক বা জেলা স্তরের ইতিহাস রচনার উপাদান কতটা পাওয়া যাবে (একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত সংবাদপত্র ছাড়া)—তাতেও আছে যথেষ্ট সন্দেহ। আজকের মতো তখনো প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলি শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রায় কোনো খবরই ছাপতো না। আর রয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরের ফাইল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাঙলার কয়েকটি জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা রচনার জন্য এই লেখক প্রধানত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতাদের স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকারকেই অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করেছে।

আপশোষের কথা, এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পরাধীন ভারতের; কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো তথ্যবহুল ইতিহাস রচনা করা গেল না। ড. গঙ্গাধর অধিকারীর সম্পাদনায় যা শুরু হয়েছিল তাও রয়ে গেল অসম্পূর্ণ। বিদেশী সাহেবরা তাঁদের মর্জি মতো এবং মিনু মাসানীর মতো উৎকট কমিউনিস্ট-বিরোধীরা ইচ্ছাকৃত বিকৃতভাবেই কিছু লেখার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসবোধ তাতে কতটা প্রতিফলিত সে-সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে! কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়াপত্তন অবিভক্ত বাঙলায় কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে গৌতম চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগে ইংরাজী ভাষায় কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন। সম্প্রতি তরুণ অধ্যাপক অমিতাভ চন্দ-ও এই বিষয়ে একটি বই লিখেছেন। কিন্তু উভয়েই প্রথম দিকটা নিয়েই কাজ করেছেন। এই নিবন্ধের

আলোচ্য সময়কালের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্ভবত এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের কাছে অস্পৃষ্টই থেকে গেছে। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে নেহাতই প্রাথমিক পদক্ষেপই মনে করে নেওয়া পাঠকবর্গের উচিত—যদিও এই লেখক প্রণীত 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা' গ্রন্থে উপস্থাপিত কয়েকটি প্রসঙ্গ সামান্য হলেও এই নিবন্ধে অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে।

পরিপ্রেক্ষিত :

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সংঘটিত কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রভাব বিশের দশকের প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণে পিষ্ট ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক চিন্তাধারায় অগ্রসরমান অবিভক্ত বঙ্গদেশেও সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। এর প্রভাবেই বাঙলার যুবসমাজের একাংশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণ-বিপ্লবের ধারায় অগ্রসর করার চিন্তা করতে থাকেন এবং প্রধানত তাঁরাই জনসাধারণের সবচেয়ে শোষিত ও বঞ্চিত অংশ শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন সংগঠিত করার বিষয়ে সচেষ্ট হন। এর ফলে যেমন শ্রমিক-আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল, তেমনি কমিউনিস্ট সংগঠনও গড়ে উঠতে শুরু করে। ফলত, বিপ্লববাদী কর্মীদেরও একাংশ তাঁদের কর্মধারার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে অঙ্গীভূত করার জন্য সচেষ্ট হতে থাকলেন। ১৯৩০-৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার জন্য এবং গান্ধীজীর আপোসমুখী মনোভাবের ফলে সারা দেশের সঙ্গে বাঙলার যুবকর্মীদের মধ্যেও কংগ্রেস সম্বন্ধে আস্থাহীনতা যেমন বাড়তে থাকলো, তেমনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মধারার প্রতি ঝোঁকও ক্রমশ প্রসারিত হতে লাগলো। ১৯৩৩-৩৪ থেকে দেশজোড়া একটা হতাশার মধ্যেই এই নতুন পথ-অনুসন্ধানের ও নতুন কর্মধারা অনুসরণের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। অবিভক্ত বাঙলাতেই এই পরিচয় প্রথম দিক থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং পূর্ববাঙলার কয়েকটি জেলাকে সেইদিক থেকে বিশের উদ্যোগীও বলা চলে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালে ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যেরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে মতাদর্শগত যে-প্রচার চালিয়েছিলেন তা বাঙলার বিপ্লববাদী তরুণদের ও বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ইতিমধ্যে 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি মানি না'—এই ধ্বনি

তুলে শত শত ক্ষুব্ধ ও বিপ্লবী যুবক ঝাঁপিয়ে পড়লেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, কলকাতা-মেদিনীপুর-কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় ব্রিটিশ শাসকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ ছিল এরই জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির 'কলকাতা কমিটি'-র নেতৃত্বে চলতে থাকলো শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সংগঠিত উদ্যোগ।

১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। ফলে, অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। বস্তুত, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই সময় কমিউনিস্টদের প্রভাব একদিকে যেমন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্রমশ বেড়েই চলেছিল, অন্যদিকে তেমনি দেশের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বড় বড় শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনও সংগঠিত হচ্ছিল। এইসব কারণে আতঙ্কিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। বলাই বাহুল্য, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ এতে খুশিই হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর সপ্তম অধিবেশনে ডিমিট্রভের বিখ্যাত 'যুক্তফ্রন্ট-তত্ত্ব' উপস্থাপিত এবং গৃহীত হয়। দেশে দেশে কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়—ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত দল ও ব্যক্তিকে নিয়ে বৃহত্তর জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার জন্য। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিমিট্রভের বক্তব্যের সার কথা ছিল ; ভারতীয় কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ভিত্তি প্রসারিত করতে স্বকীয় সত্তা বজায় রেখেই যেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করা শুরু করে।

এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দুই নেতা রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্রাডলি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির কোন্ রণকৌশল গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে একটি নির্দেশপত্র প্রেরণ করেন। এটি 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস্' (১৯৩৫) নামে সুপরিচিত। ভারতীয় কমিউনিস্টরা পূর্ব থেকেই ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রামরত ছিলেন ; এবার পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার ফলে তাঁরা কমিণ্টার্নের নির্দেশ অনুসারে এবং দত্ত-ব্রাডলি থিসিসের প্রস্তাবানুযায়ী ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। অতঃপর কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট

পার্টির সদস্যরূপেই বেশ সংগঠিতভাবে তাঁরা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এক ইতিবাচক বামপন্থী শক্তির সমাবেশ ঘটে। এঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন আপসহীন সংগ্রামের পথ। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং সমুজ্জ্বল।

সন্ত্রাসবাদ থেকে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে :

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সবচেয়ে গৌরবজনক ও সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। এই ঘটনা দেশপ্রেম ও দুঃসাহসিকতায় অদ্বিতীয় হলেও এটা ছিল মজুর-কৃষক-মেহনতী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক বৈপ্লবিক কর্ম-প্রয়াস। কিন্তু এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিপ্লবী আবেগ ও দেশপ্রেমে, অতুলনীয় ত্যাগ এবং অসীম সাহসে, এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী তরুণেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর থেকেই গোটা ভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই অসংখ্য বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০-এর ২৫ আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা থেকে ১৯৩৪-এর ৮ মে দার্জিলিং-এর ঘোড় দৌড়ের মাঠ লেবং-এ কুখ্যাত গভর্নর এণ্ডারসনের উপর গুলি চালনার ঘটনা পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে শতশত বিপ্লববাদী তরুণ-তরুণী সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন কিংবা কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখে বিপজ্জনক বিপ্লবীদের পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে, ভারতের বাস্তিল রূপে অভিহিত আন্দামান সেলুলার জেলে।

১৯৩০-৩৪ সালে বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল ততই জাতীয় বিপ্লববাদী কর্মীরা সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে কমিউনিজমের পথ বেছে নিতে শুরু করছিলেন। সন্ত্রাসবাদী পথ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করাবার ব্যাপারে যে-সমস্ত রাজবন্দীর অবদান ডিটেনশান ক্যাম্প এবং জেলে ছিল সবচেয়ে বেশি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কালী

সেন, আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জি, আব্দুর রেজ্জাক খান, জালালুদ্দিন বোখারী, রেবতী বর্মণ, ভবানী সেন এবং আন্দামানে ডাঃ নারায়ণ রায় ও নিরঞ্জন সেন প্রমুখ মার্কসবাদে দীক্ষিত নেতৃবৃন্দ।

বিপ্লবী নলিনী দাস আন্দামানে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠন-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ঠিক এই সময়, ১৯৩৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি, কলকাতা থেকে আর এক চালান রাজনৈতিক বন্দী সেলুলার জেলে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবকুমার দাস ও চিত্ত বিশ্বাস। এঁরা বহন করে নিয়ে এলেন আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলের দুই কমিউনিস্ট বন্দী—কমরেড আব্দুল হালিম ও কমরেড সরোজ মুখার্জির একখানা চিঠি এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটি ডকুমেণ্ট—'ড্রাফ্‌ট প্লাটফর্ম অফ এ্যাকশন' এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনামূলক একটি প্রতিবেদন।

"কমরেড হালিম ও সরোজ মুখার্জি সেলুলার জেলে বন্দী সকল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কমরেডদের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা শাখার নামে আবেদন জানিয়ে বললেন যে, তাঁরা যেন জেলের অভ্যন্তরে সবাই একটি কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে সংঘবদ্ধ হয়ে বহির্জগতের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করে সম্মিলিতভাবে পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে সুশিক্ষিত করে তোলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে নিজেদের প্রভাবকে ব্যাপক করে তোলেন।"

১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামান সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন সংগঠিত করা হয় এবং ১লা মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। যে ৩৫ জন বিপ্লবী সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট রূপে নিজেদের কনসোলিডেশনে যুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন : (১) নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (২) ডাঃ নারায়ণ রায় (৩) হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৩) গোপাল আচার্য (৫) কালী চক্রবর্তী (৬) আনন্দ গুপ্ত (৭) লালমোহন সেন (৮) রণধীর দাশগুপ্ত (৯) বঙ্গেশ্বর রায় (১০) হরেকৃষ্ণ কোঙার (১১) রমেশ চ্যাটার্জী (১২) অনন্ত চক্রবর্তী (১৬) ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী (১৪) শচীন করগুপ্ত (১৫) ননী দাশগুপ্ত (১৬) রবি নিয়োগী (১৭) বিজন সেন (১৮) বিজয়কুমার সিং (১৯) জয়দেব কাপুর (২০) কমলনাথ তেওয়ারী (২১) শিব বর্মা (২২) বটুকেশ্বর দত্ত (২৩) ডাঃ গয়া প্রসাদ (২৪) কেদার শুকুল (২৫) যোগেন শুকুল (২৬) বিমল দাশগুপ্ত (২৭), হরিপদ চৌধুরী (২৮) অমলেন্দু বাগচী (২৯) কেশব

চ্যাটার্জী (৩০) জগদানন্দ মুখার্জী (৩১) কুন্দনলাল গুপ্ত (৩২) চিত্ত বিশ্বাস (৩৩) দেবকুমার দাস (৩৪) নলিনী দাস (৩৫) ফকির সেন।

কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠিত হবার পূর্বে কয়েকজন বন্ধুকে অসুস্থতার ফলে ও সাজা কমে যাওয়ার ফলে বাঙলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন :

(১) সিরাজুল হক (২) মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্ত (৩) ধরণী বিশ্বাস (৪) সুধাংশু দাশগুপ্ত (৫) মনোরঞ্জন গুহ (৬) বিধু গুহ (৭) সুশীল দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেতা নলিনী দাসের স্মৃতিকথায় বলা হয়েছে : "কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠনের পর রাজবন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নের বিরাট ব্যবস্থা সংগঠিত করা। কনসোলিডেশন ঠিক করে নিল—আন্দামান সেলুলার জেলকে বিপ্লবী নিকেতন, অর্থাৎ বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। শিক্ষা কমিটি ঠিক করল, কনসোলিডেশন মেম্বারকে সাধ্যানুযায়ী বাধ্যতামূলক পড়াশুনা করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে পড়তে হবে, ক্লাস করতে হবে, অপরকে পড়াবার যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে।"

কার্যত একই ভাবে সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রেসিডেন্সী, আলিপুর, রাজশাহী বা দমদম সেন্ট্রাল জেলে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে যুক্ত হয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে শ্রমিক-কৃষক তথা মেহনতী মানুষের গণ-আন্দোলন গড়ার শপথ নিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই কমিউনিজমে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এমনকি চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও একই পথ অনুসরণ করেন। অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংগঠন গড়ার কাজে যুক্ত হন ১৯৪৬ সালে। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বত্যাগী বিপ্লবী বীরেরাই অবিভক্ত বাঙলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন :

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের এবং অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন খোকা (সুধীন) রায়। তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন :

"আন্দামান জেলে এবং বন্দী-নিবাসগুলিতে যেসব বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সন্তান। ১৯৩৭-৩৮ সালে জেল ও বন্দী-নিবাস থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের অনেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে নিজ নিজ জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের কর্ম-তৎপরতার ফলে ১৯৩৭-৩৮ সাল হতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কমিউনিস্ট সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।" এবার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি এর একটা বিবরণ দানের চেষ্টা করছি।

ময়মনসিংহ ঃ

১৯২৫-এর ডিসেম্বরে ময়মনসিংহের এক গোপন পাহাড়ী কুঠিতে সদ্য রাশিয়া-প্রত্যাগত গোপেন চক্রবর্তী প্রথম চারজন বিপ্লবীকে কমিউনিজমের পাঠ দেন। এঁরা হলেন—প্রভাত চক্রবর্তী, উপেন সান্যাল, শচী সিং এবং মণি সিং (মণীন্দ্র সিংহ)। ১৯৩৭ সাল নাগাদ মণি সিংহ, আলতাব আলি, পুলিন বক্সী, রবি নিয়োগী, নগেন সরকার, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী প্রমুখ জেল থেকে বের হয়ে ময়মনসিংহ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। খোকা রায় পরবর্তীকালে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদ, ধরণী গোস্বামীর উপস্থিতিতে ময়মনসিংহ শহরে ঐ জেলার কমিউনিস্ট কর্মীদের এক বৈঠকে সকলের মত নিয়ে মণি সিংহ, সুধীন (খোকা) রায়, আলতাব আলি, পুলিন বক্সী, রবি নিয়োগী, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ও পবিত্রশংকর রায় এই সাতজনকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহ জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এটাই ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাংগঠনিক রূপ। সুধীন রায় ঐ জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে প্রমথ গুপ্তকেও জেলা কমিটির সদস্য করা হয়। সুধীন রায় প্রাদেশিক কমিটিতে যোগ দিলে তাঁর জায়গায় আসেন সুনির্মল সেন।

১৯৩৮ সালে টঙ্কপ্রথা-বিরোধী কৃষক আন্দোলন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বড় ধরনের সংগ্রাম। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর অঞ্চলে কলমাকান্দা, সুসং দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ি ও শ্রীবর্দি—এই পাঁচটি থানায়

কৃষকদের উপর বর্বর টঙ্কপ্রথার শোষণ চালু ছিল। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও তালুকদারদের এই শোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান-গারো-হাজং-ডালু প্রমুখ-জাতি উপজাতি ও ধর্মের লোকেরাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতি গঠন করে মণি সিংহকে পুরোভাগে রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ক্রমশ ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সভার একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলনে মুসলিম লীগের নানাবিধ বাধা সত্ত্বেও প্রায় ১০ হাজার কৃষক জমায়েত হয়েছিলেন, যার শতকরা ৮০ জন ছিলেন মুসলমান কৃষক। ময়মনসিংহের উত্তরঅঞ্চল থেকে ৫ শত হাজং কৃষকও ৭০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাতিয়ানা নামে এক রুশ-মহিলা, যিনি ময়মনসিং-এর একজন পার্টি-দরদীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি এই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

১৯৪৩ সালে নলিতাবাড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকাশ্য অধিবেশনে জমায়েত হন ১০/১২ হাজার কৃষক। ৪ হাজার স্বেচ্ছাসেবক মাথায় লালটুপি পরে সম্মেলনে সংগঠিতভাবে যোগ দেন। তখন থেকেই সম্ভবত কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির ভলন্টিয়ারদের মাথায় লালটুপি পরার রেওয়াজটি চালু হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তা আরও প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই সময়কালেই কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার নীচে সামিল হন হাজং-কৃষক নেতা ললিত সরকার এবং তাঁর দুই স্ত্রী মনিক ও কলাবতী। নলিতাবাড়ির মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত কমরেডদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—জলধর পাল, শচীন রায়, রাজেন নাথ, শিবাজী মুখার্জী, জিতেন মৈত্র প্রমুখ।

বস্তুতপক্ষে, মাত্র দু' বছরের মধ্যে ও যুদ্ধচলাকালীন সময়ে (ময়মনসিংহ প্রায় তখন ছিল জাপানের নাকের ডগায়, বর্মা পতনের পর) কৃষক সভার একটি রাজ্য সম্মেলন এবং আর একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন মুজফ্‌ফর আহমদ, আবদুল্লাহ রসুল, বঙ্কিম মুখার্জি, পি. সি. জোশী, ভবানী সেন প্রমুখের উপস্থিতিতে সংগঠিত করা ছিল নিঃসন্দেহে একটি বিরাট সাংগঠনিক শক্তির পরিচায়ক। ময়মনসিংহ জেলার পার্টির শক্তি এর দ্বারাই বোঝা যায়।

মহিলা এবং ছাত্র সংগঠনও ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিকাশ লাভ করেছিল। জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণের পর এই জেলার কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও গড়ে ওঠে। জ্যোৎস্না নিয়োগী, তুলসী বক্সী, বেলা পাল প্রমুখ পার্টির কাজেও যুক্ত হন। মণি সিংহের দিদি নির্মলা সান্যাল ছিলেন অন্যতম প্রধান মহিলা সংগঠক। ছাত্র আন্দোলনে কানু রায়, রাখাল দত্তরায় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গণনাট্য সংঘের অন্যতম সংগীত-প্রতিভা নিবারণ পণ্ডিত ও অখিল চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই ছিলেন সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান এবং স্বল্পশিক্ষিত। নিবারণ পণ্ডিত-রচিত লোকগীতি ও অখিল চক্রবর্তীর একতারা বাদন ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় অঙ্গ।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধি ছিলেন জেলাসম্পাদক পুলিন বক্সী এবং মণি সিংহ। কিন্তু একজন তরুণ উচ্চশিক্ষিত মুসলিম কমরেড জহুরুদ্দিন মুন্সীকে মণি সিংহ নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে বলেন। ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট পার্টির সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এর মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ময়মনসিংহে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী মণি সিংহ অবশ্য পরাজিত হন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে, যদিও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তারই প্রমাণ ১৯৪৬-৪৭ সালের ময়মনসিংহ জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জমিদার ও পুলিশী দমন-পীড়ন সত্ত্বেও ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তেভাগা তথা কৃষক-আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিল। তেভাগা আন্দোলন দমনের জন্য দমন-পীড়ন এমন জায়গায় পৌঁছায় যে কলকাতা থেকে জ্যোতি বসু (তৎকালীন এম. এল. এ) ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য এবং সাংবাদিক প্রভাত দাশগুপ্তকে ঘটনার তদন্ত করতে ময়মনসিংহ যেতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, ময়মনসিংহ জেলার প্রায় সব মহকুমার সংগঠিত এলাকা জুড়ে বর্গাচাষীরা জোতদারদের কাছে তেভাগার দাবী করে, ধান কেটে নেওয়া শুরু করে—বড় বড় খামারের ধান আটক করা হয়। অনেক খামার-মালিক ভয়ে পালিয়ে যায়। কৃষকদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে ক্ষিপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাস্টিন

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষকদের উপর। নির্বিচারে লাঠি, গুলি, হত্যা, লুঠপাট, ধর্ষণ, গৃহদাহ সব অপকর্মই তারা চালাতে থাকে। জোতদারদের ষড়যন্ত্রে নলিতাবাড়ী আস্কারু গোপগ্রামের সর্বেশ্বর ডালু নিহত হন। পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ হারান রাসমণি ও সুরেন্দ্র, আহত হন অনেকে। আন্দোলনের অন্যতম নেতা জলধর পাল ও জিতেন মৈত্রসহ আরও অনেক নেতা এবং কর্মীর বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। গ্রেপ্তার করা হয় শত শত কর্মীকে, অনেকে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। একটি ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। পুলিশী নির্যাতনে যখন কৃষকেরা বাড়িতে থাকতে পারছে না, সেই সংকটকালে ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে জ্যোৎস্না নিয়োগী, পূর্ণিমা বক্সী, কণা পাল প্রমুখ স্থানীয় মহিলা কর্মীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা চালান। ব্যাস্টিনের বাহিনী এদের গ্রেপ্তার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। এই সংগ্রামে হাজং মেয়েরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়ঃ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্ট জেলার এক গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে। শ্রীসংঘ, অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস্ (বি. ভি) প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনগুলি শ্রীহট্টের তরুণদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর মধ্যে প্রধানত অনুশীলন সমিতির পরিচালনাধীন সংগঠনগুলিই শ্রীহট্টের তরুণদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। তরুণ সংঘ ছিল শ্রীহট্টের এরকমই একটি শক্তিশালী সংগঠন, যার মাধ্যমে বহু যুবক-যুবতী ও ছাত্র (স্থানীয় মুরারীচাঁদ কলেজ ছিল এ বিষয়ে অগ্রগণ্য) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনেও।

গান্ধীজী যখন আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রেখে আরুইনের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক চালাচ্ছেন তখন দেশের বিপ্লবী তরুণের দল চোরাগোপ্তা সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা তখন নতুন প্রজন্মের তরুণদের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিচ্ছে। এরই সমসাময়িককালে কলকাতায় পড়তে আসা কয়েকজন বিপ্লবী তরুণ আকৃষ্ট হলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি। কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি তখন সাধারণ-

ভাবে পরিচিত ছিল হালিমের দল রূপে। কারণ, দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তি'-র সম্পাদক ছিলেন আবদুল হালিম। 'গণবাণী' তখন পরিচালনা করতেন আর এক সাম্যবাদী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চঞ্চলকুমার শর্মা, দীনেশ চৌধুরী ও অমরেন্দ্রকুমার পাল—শ্রীহট্টের তরুণসংঘের এই তিন সদস্য কলকাতায় তখন বি. এ. পাঠরত। তাঁরা ঐ সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের ক্যানিং হোস্টেলে নৃপেন চক্রবর্তীর (তাঁর বড়দাদা মুকুন্দ চক্রবর্তী ছিলেন ঐ হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট) সঙ্গে পরিচিত হন। শ্রীহট্টেরই দুই বিপ্লবী চিত্তরঞ্জন দাস ও দীনেশ চৌধুরীর (আজমিরীগঞ্জ ডাকলুঠের পর এঁরা কলকাতায় পালিয়ে আসেন) মাধ্যমেই নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে।

ইতিমধ্যে চঞ্চলকুমার শর্মা সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একটি ভাসা ভাসা ধারণা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা ডঃ প্রভাতকুমার শর্মা ছিলেন একজন পড়ুয়া মানুষ। প্রভাতকুমার ছাত্রজীবনেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং রুশ বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশের দশকে তিনিও কমিউনিস্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর সহপাঠী ছিলেন এবং ঐ সময় মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ আলোচনার জন্য কলকাতায় গঠিত পাঠচক্রে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে প্রকাশিত পত্রিকায় লেনিনের মার্কসবাদ সম্বন্ধীয় বিখ্যাত প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তিনি বিশের দশকে তাঁর ছাত্র-জীবনে ও কর্মজীবনে কলকাতা থেকে বাড়িতে এসে মার্কসবাদ ও রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে চঞ্চলকুমার শর্মার সঙ্গে আলোচনা করতেন। এই সময় থেকেই রুশ বিপ্লবের পথই যে ভারতের মুক্তির পথ সে সম্পর্কে তাঁর মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। 'গণবাণী' ও 'গণশক্তি' এই ধারণাকে আরও পরিপুষ্ট করেছিল।

দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার সাঁতগাও গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ দত্ত ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর দ্বারা দীক্ষিত হয়ে মার্কসবাদে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। চঞ্চলকুমার শর্মা লিখেছেন, "...ফণী দত্ত কয়েকদিন মার্কসবাদ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আগে আমাদের সকলেরই কমিউনিজম সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা ছিল। মানবতার দিক থেকেই আমরা কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। কমিউনিজমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রথমে আমরা ফণীবাবুর কাছ থেকেই পেলাম।" শ্রীহট্টের

কমিউনিস্ট পার্টি গড়া প্রসঙ্গে চঞ্চলকুমার লিখেছেন: "ফণী দত্তর সঙ্গে মার্কসবাদী তত্ত্ব নিয়ে কয়েকদিন আলোচনা করার পর আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ফণী দত্ত ছিলেন বেঙ্গল পি. সি-র সভ্য। তাঁর সুপারিশে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ছয় জনকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীহট্ট জেলা অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়। যে ছয় জনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয় তারা হলেন: সর্বশ্রী (১) লালা শরদিন্দু দে (২) দীনেশ চৌধুরী (৩) চিত্তরঞ্জন দাস (৪) দিগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (৫) অমরেন্দ্রকুমার পাল (৬) চঞ্চলকুমার শর্মা। ...এই সিদ্ধান্তও হয় যে আজমিরীগঞ্জ ডাকলুঠের অবশিষ্ট যে টাকা তখনও আমাদের হাতে ছিল তা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার, লিফলেট ও সংগঠনের কাজে ব্যয়িত হবে। প্রথমদিকে পার্টি গড়ার কাজে ঐ টাকাটা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।"

যাইহোক, শ্রীহট্টে কংগ্রেস কমিটিগুলির মধ্যে কমিউনিস্টদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সুনামগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীহট্ট জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লালা শরদিন্দু দে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রার্থী করুণাসিন্ধু রায় আসাম বিধান সভায় নির্বাচিত হন। শ্রীহট্ট জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলাভের ফলে বিপ্লবী তরুণ সংঘ বিলুপ্ত হয় এবং এই সংগঠনের স্বদেশপ্রেমী, সেবাব্রতী, সুশৃঙ্খল ও সংগ্রামী যুবকবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ফলে পার্টির ক্ষমতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একজন দু'জন ছাড়া তরুণ সংঘের সকলেই কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। এঁরা হলেন—শিবেন্দ্রনাথ দাস, নরেন্দ্র মহাপাত্র, অঙ্গিরাকুমার শর্মা, কেশবচন্দ্র দাস, দেওয়ান মহববুর রব চৌধুরী, মানিক চৌধুরী, ষোড়শী ভট্টাচার্য, কুমুদানন্দ ভট্টাচার্য, অনাদি দেব, স্বদেশ রঞ্জন পাল চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর দাস, মনীষ ভট্টাচার্য, মৃণাল দাস, সুকুমার নন্দী, বিনয় গাঙ্গুলি প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীহট্টের বিভিন্ন মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারী ছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এঁরা কংগ্রেসে থেকেই কমিউনিজম্-এর প্রচারে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ঐ সালে পশ্চিম করিমগঞ্জের একটি উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী অংশের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। এই নির্বাচনে

সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ছলে-বলে-কৌশলে বল্লভভাই প্যাটেল ও কিরণশঙ্কর রায় পন্থী কংগ্রেস দমন করার চেষ্টা করে। ফলে, কংগ্রেসের নিচুতলার বহু সংগ্রামী কর্মী শ্রীহট্টে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এদের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক প্রবোধানন্দ কর, করুণাসিন্ধু রায়, রমানাথ ভট্টাচার্য, ভূপতি চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসী ধারার যেমন একটা অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তেমনি ঐ সময় থেকেই বিপ্লববাদী ধারার কর্মীবৃন্দও এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। সুনামগঞ্জে যাঁরা কংগ্রেস আন্দোলন করতেন তাঁদের অনেকেই আবার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার সময়কালেই সর্বশ্রী চন্দ্রবিনোদ দাস, রাজেন্দ্রকুমার নন্দী, দেবেন্দ্র দত্ত এবং পরবর্তীকালে জেলা পার্টির অন্যতম নেতা রোহিণীকুমার দাস, নিবারণ চন্দ্র দত্ত, লালমোহন রায়, শিলং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রেণুবিনোদ চৌধুরী, রবীন্দ্র দাস প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্মীরা প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। অনুশীলন পাটির সদস্য সুরথ পাল চৌধুরীও জেলা সংগঠন কমিটিতে শ্রীহট্ট জেলায় কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীসংঘ, ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন প্রভৃতি সব বিপ্লববাদী পার্টির সক্রিয় কর্মীরা সকলেই তাঁদের পুরনো ধারা ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে থাকেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁরা হলেন বারীন্দ্রকুমার দত্তের দলের সঙ্গে যুক্ত রমাকান্ত দাস (তিনসুকিয়া ডাকলুঠ মামলায় দণ্ডিত), হেমন্তকুমার দাস, সত্যব্রত দত্ত, দেবব্রত বা রাণু দত্ত, অনুশীলনের প্রীতিরঞ্জন দাস (টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত), আশু সেন, শ্রীসংঘ ও ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের বিনয় মজুমদার, শশীন্দ্র দত্ত, হবিগঞ্জের বিপ্লবী দলের নিখিল মিত্র, ত্রৈলোক্য দত্ত, প্রাণেশ বিশ্বাস প্রমুখ। কাছাড় জেলায় স্বদেশরঞ্জন পালচৌধুরী ও দিগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উদ্যোগী হয়ে অজয় ভট্টাচার্য, মহীতোষ পুরকায়স্থ প্রভৃতিকে নিয়ে একটি ইউনিট গড়ে তুলেছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২-এর জনযুদ্ধকাল পর্যন্ত কমিউনিস্টরা কংগ্রেস-সমাজতান্ত্রিকদলের মধ্যে থেকেই কাজ করতে থাকেন। বিয়ানী বাজার কৃষক সম্মেলনে প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক ও লেখক সজ্জাদ জহীর এবং ডঃ জেড.

এ. আহম্মদও এসেছিলেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অথচ জয়প্রকাশ নারায়ণ এঁদেরই সুরমা উপত্যকায় নির্দিষ্ট কাজের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে আলিপুর জেল থেকে মুক্ত হয়ে নেবার পাটির সদস্য জ্যোতির্ময় নন্দী শ্রীহট্টে আসেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তাঁর পার্টিতে যোগদানের ফলে আন্দোলন ও সংগ্রামের উপযুক্ত প্রচারের ক্ষেত্রে যে অভাব ছিল তা দূর হয়। জ্যোতির্ময় নন্দীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'নয়াদুনিয়া' ও 'সংহতি' পত্রিকা পর পর প্রকাশিত হলে পার্টি মুখপত্রের অভাব দূর হয়। পার্টির তরফ থেকে সেই সময় যে সমস্ত লিফলেট প্রকাশিত হতো তারও অনেকগুলির রচয়িতা ছিলেন জ্যোতির্ময় নন্দী।

শ্রীহট্টে ও সুরমা উপত্যকায় কমিউনিস্ট পার্টির সেরা সম্পদ ছিল তার সাংস্কৃতিক সংগঠন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের উত্তাল সময়ে জেলায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের যে সাংস্কৃতিক টীম তৈরী হয় তাতে প্রখ্যাত লোক-সঙ্গীত গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন নেতৃত্বে। নির্মলেন্দু ও আরো অনেকে ছিলেন ছাত্রফেডারেশনের কর্মী। ছাত্রআন্দোলন থেকে তাঁরা এসেছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। অন্যরা হলেন হেনা দত্ত, মায়া গুপ্ত, শান্তা সেন, সন্ধ্যা দাস, হাসি চৌধুরী, পূরবী শর্মা, ইলা সেন, রেবা ধর প্রমুখ। বর্তমানের প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরীও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে গান গাইতেন ও কার্টুন চিত্র আঁকতেন, পার্টি ও গণ আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টারও লিখতেন।

নারী সমাজের মধ্যেও শ্রীহট্ট জেলাতে ১৯৩০ সাল থেকেই বামপন্থী প্রভাবের বিস্তার ঘটেছিল। শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ-র মধ্যেই মূলত কমিউনিস্ট মেয়েরা কাজ করতেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে জনযুদ্ধ নীতি গৃহীত হবার ফলে কমিউনিস্ট পার্টিকে আলাদা সংগঠন তৈরী করতে হয়। ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী কর্মীরা তখন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গড়ে তোলেন। এঁদের মধ্যে অঞ্জলি দাস, হেনা দত্ত, মায়া গুপ্ত, ইলা ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অঞ্জলি দাসের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কল্যাণী দাস ঐ সময়ে সিলেটে রেডক্রসের ডাক্তার ছিলেন। এরা উভয়েই প্রয়াত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের নাতনি। কল্যাণী দাসও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এঁদের কেন্দ্র করেই পরে আরও অনেক মেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করেন। ফলে, শ্রীহট্টের নারীসমাজের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জনযুদ্ধের যুগে (১৯৪২—৪৫)

কমিউনিস্ট পার্টিতে এঁরা যোগ দিয়ে সমস্ত ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও সামাজিক অসহযোগিতার বিরুদ্ধে অটলভাবে দাঁড়িয়ে আদর্শের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

১৯৪২-এ জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করার পূর্বে শ্রীহট্টের কমিউনিস্টরা কংগ্রেস-সংগঠনের মধ্যে থেকেই কাজ করতেন। তাঁদের ছিল নেতৃত্বের ভূমিকাই। কিন্তু নতুন নীতিতে কমিউনিস্টদের পৃথকভাবেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল। তথাপি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে। সম্ভবত ব্রিটিশরা এইসব প্রাক্তন বিপ্লবী ও কংগ্রেস সংগঠনের নেতাদের কখনোই বিশ্বাস করেনি। ১৯৪২ সালে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—চঞ্চলকুমার শর্মা, কেদারনাথ ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত। কাছাড় তখন শ্রীহট্টের মধ্যেই ছিল। ঐ সময় কাছাড়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক পদে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য। তিনি এবং আরো কয়েকজন কমিউনিস্ট সংগঠক নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। সিলেট জেলে বন্দী থাকা কালে কমিউনিস্ট নেতারা কংগ্রেসের অনেক সাধারণ কর্মীকে কমিউনিজমে দীক্ষিত করেছিলেন। মণিপুরের প্রজা আন্দোলনের অন্যতম নেতা সিলেট জেলেই কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ অবসানের পর শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির আসাম প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়, যার প্রথম সম্পাদক হন বীরেশ মিশ্র। ১৯৪৬-এর নির্বাচনেও কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন পেয়েছিল।

চট্টগ্রাম :

চট্টগ্রামে বিপ্লবী ঐতিহ্য থাকার ফলে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী থাকার সময়েই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী বীরদের প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে যোগদান করেন। এর ফলে চট্টগ্রামের সাধারণ যুবসমাজের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আগ্রহ অন্য জেলা অপেক্ষা কিছু বেশিই ছিল। অবশ্য গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত [illegible] প্রমুখ নেতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে মুক্তি দেয়নি।

কিন্তু যাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁদের নেতৃত্বেই ১৯৩৮ সালের শেষে চট্টগ্রাম জেলা সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। রেল ইউনিয়ন নেতা ননী সেনকে সম্পাদক করে যশোদা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সেন, বঙ্কিম সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত ও কমনীয় দাশগুপ্তকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। পরে সুধাংশু দত্ত, রণধীর দাশগুপ্তকে কমিটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ সালে মুজফ্‌ফর আহম্মদ চট্টগ্রামে এক গোপন সম্মেলনে মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে যুক্ত করা হয়। এই পূর্ণেন্দু দস্তিদারের প্রচেষ্টাতেই কল্পনা দত্ত (যোশী) সূর্য সেন-এর বিপ্লবী দলে এসেছিলেন। কল্পনা দত্তও কমিউনিস্ট কর্মী রূপে চট্টগ্রাম সংগঠনে ১৯৩৮-এ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যুক্ত হন। ১৯৩৯-এর কমিটিতে যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি অসুস্থ হলে কল্পতরু সেনগুপ্ত জেলা কমিটির সম্পাদক রূপে কাজ করতে থাকেন, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। মাঝেকিছুদিন বঙ্কিম সেন, কল্পনা দত্ত ও অনন্ত সিংহও জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃদ্বয় গণেশ ঘোষ ও অম্বিকা চক্রবর্তী ১৯৪৬-এ মুক্তির পর প্রাদেশিক কমিটির দায়িত্বে থাকেন। চট্টগ্রামে শ্রমিক সংগঠন তেমন কিছু ছিল না। হরিসাধন দত্ত ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। শক্তিশালী ছিল কৃষক আন্দোলন এবং কিছুটা মহিলা এবং ছাত্র আন্দোলন। 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র সদস্যেরা সেসময়ে সকলেই প্রায় চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। মুজফ্‌ফর আহমদ ও তৎকালীন সর্বভারতীয় সম্পাদক পি. সি. যোশী চট্টগ্রাম জেলার উপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় স্তরের অনেক নেতাকে প্রায়শই চট্টগ্রামে পাঠানো হতো বলে কল্পতরু সেনগুপ্ত জানিয়েছেন।

১৯৩৯ সালে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবদুস সাত্তার ছিলেন অন্যতম কৃষক কর্মী। কল্পনা দত্ত, পুষ্প সেন, জ্যোতি দেবী (দাশ), সৌদামিনী সেনগুপ্ত, মণিকুন্তলা চৌধুরী, অমিয়া সেন, বীনা সেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন। এছাড়া ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী আরতি দাশ (পরে দত্ত), সাধনা মজুমদার, প্রীতি দত্ত, আরতি পালিত (বিশ্বাস), রেণু চৌধুরী (লোকনাথ বলের বোন) প্রমুখ ছাত্রীরাও মহিলা আন্দোলনে নিজেদের সামিল করেছিলেন সক্রিয়ভাবে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর শহীদত্ব বরণ বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার তরুণী এবং মহিলাদের সমস্তপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির পথ যেন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা জনযুদ্ধের যুগে ও মন্বন্তরের সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করা ছাড়াও আশ্রয় কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছেন।

১৯৪২-এর ৮ মে জাপানী বোমারু বিমান চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ করে। এই বোমাবর্ষণে কমিউনিস্ট কর্মী গোলাম শরীফের মৃত্যু হয়। পার্টির ছাত্র ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীরা এই সময় ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রচার ও জনমত গঠনে গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ভূমিকা। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী জেলা ও জাপানের নাকের ডগায় চট্টগ্রামের অবস্থানের ফলে জাপ-বিরোধী প্রচারের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রয়োজন ওখানে খুবই বেশি ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে ও জোরদার কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টি তুলনামূলক বিচারে অবিভক্ত বাঙলার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বেশ শক্তিশালীই ছিল। ১৯৪৩ সালে পার্টির সদস্য সংখ্যা ২২৪ জন হলেও মহিলা সমিতির সদস্য (৪১৬০) সংখ্যার দিক থেকে চট্টগ্রাম জেলা প্রথম স্থান অধিকার করে। ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিল (২, ২৭২) বাঙালায় দ্বিতীয়। তথাপি 'জনযুদ্ধ' সম্পর্কিত নীতি সম্পর্কে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার জনমানসে কমিউনিস্ট পার্টির গ্রহণযোগ্যতায় যে ফাটল ধরিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে কল্পনা দত্ত-র মতো বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেত্রীর পরাজয় বরণের মধ্যে।

দিনাজপুর ঃ

প্রশাসনিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলেও উত্তরাঞ্চলের জেলা রূপে দিনাজপুর জেলার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রমিক আন্দোলন উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও কৃষক আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটি রূপেই সেগুলি চিহ্নিত। দিনাজপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। এই কারণে ১৯৪৩ সালের মে মাসে পার্টি সদস্য-সংখ্যার দিক থেকে সমগ্র

বাঙলায় দিনাজপুর জেলার স্থান ছিল তৃতীয়। কলকাতায় ঐ সময় পার্টি সদস্য ছিল ৬৪৯, ঢাকায় ৩১৯ এবং দিনাজপুরে ২৬৩ জন।

১৯৩৮ সালে দিনাজপুরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে জেল থেকে সদ্যমুক্ত বিপ্লবী রাজবন্দীদের উদ্যোগে। এঁরা জেলের অভ্যন্তরেই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের সদস্য হয়েছিলেন। প্রধানত অনুশীলন সমিতি থেকেই এঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। প্রাদেশিক নেতা সরোজ মুখার্জীর উপস্থিতিতে পার্টির প্রথম যে সংগঠনী কমিটি গড়ে ওঠে তার জেলা সম্পাদক ছিলেন বিভূতি গুহ। পরে জেলা সম্মেলনের মাধ্যম যে কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদক নির্বাচিত হন সুশীল সেন। বিভূতি গুহ প্রাদেশিক দপ্তরে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এছাড়া জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন অজিত রায়, মহী বাগচি, সুবোধ সেন, বসন্ত চ্যাটার্জি, কালী সরকার, শচীন্দ্র চক্রবর্তী, গুরুদাস তালুকদার, হাজী মহম্মদ দানেশ, জনার্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীকালে মুক্ত রাজবন্দী হৃষি ভট্টাচার্য ও ছাত্রনেতা সুনীল সেন জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হন। এখনকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও তৎকালীন ছাত্রনেতা সুনীল সেন-এর বিবরণ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। সরোজ মুখার্জি লিখেছেন, পরে রাজশাহী থেকে যামিনী মজুমদার আসেন এবং তিনি ঘোড়ায় চড়ে সারা জেলায় কাজ করতেন।

দিনাজপুর জেলার কৃষক সভা যাঁরা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন তাঁরা প্রথম থেকেই যে কমিউনিস্ট ছিলেন তা নয়। অনেক প্রাক্তন বিপ্লবী ও বামপন্থী কংগ্রেস নেতা এবং কর্মী, এমনকি জমিদার-পরিবার থেকেও কেউ কেউ ধীরে ধীরে কৃষক সভার সংগঠক রূপে কাজ করতে করতে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। যেমন, হাজী মহম্মদ দানেশ ও সত্যেন রায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ এবং পেশায় আইনজীবী হাজী মহম্মদ দানেশ ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সত্যেন রায় ছিলেন একজন ধনী জোতদারের পুত্র ও গ্রাজুয়েট। এঁরা দুজনেই কৃষকসভার নেতা রূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সত্যেন রায় ঠাকুর গাঁয়ের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সভা-সমাবেশে রাজবংশী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। এঁরা ছাড়াও কয়েকজন কৃষকও স্থানীয় নেতা রূপে কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছিলেন। এঁরা হলেন আটওয়ারি থানার ধনী কৃষক রাজেন সিং এবং দুই দরিদ্র কৃষক রামলাল সিং ও পাথাল সিং। ঠাকুরগাঁও-এর মাঝারি কৃষক

পরিবার থেকে এসেছিলেন বিনোদ দাস। কিষান সভার মধ্যে যাঁরা মুসলিম লীগ ও ক্ষত্রিয় সমাজের বিরোধিতা ও জমিদার জোতদারদের আক্রমণ সত্ত্বেও হাজার হাজার দরিদ্র আধিয়ার কৃষক ও রাজবংশীকে কৃষক আন্দোলনে সামিল করেছিলেন, এঁরা হলেন সেই সব কৃষক কর্মীদেরই প্রথম সারির প্রতিনিধি। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফুলবাড়ি থানার অন্তর্গত লালপুর গ্রামের জনসভা থেকেই আক্ষরিক অর্থে দিনাজপুর জেলা কৃষকসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন কৃষক আন্দোলনের (হাট তোলা বন্ধ, আধিয়ার ও তেভাগা) ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ এবং বঙ্কিম মুখার্জি। রূপনারায়ণ রায় নামে একজন তরুণ কৃষক কর্মী এই সভাতেই প্রথম যোগদান করেন। ইনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ-এর সঙ্গেই প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী রূপে।

যাহোক, কৃষক সভার শাখা দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে দ্রুত প্রসার লাভ করে। সুনীল সেন লিখেছেন, ১৮ মাসে ৩০টি গ্রাম-কমিটি গঠিত হয়েছিল, কৃষক সভা সংগঠিত করে ২৫০টি সভা, বিতরণ করে ৬০০০ প্রচারপত্র। ১৯৪৩ সালে দিনাজপুরের কৃষক সভার স্থান ছিল সমগ্র বাঙলায় দ্বিতীয় (সদস্য সংখ্যা: ১৩ হাজার), রংপুরের পরেই। কিন্তু গুরুদাস তালুকদার প্রমুখের নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁও সহ দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে তা পরবর্তীকালে এক উপকথায় পরিণত হয়েছিল।

রংপুর ঃ

রংপুর জেলা ছিল এককালে বিপ্লবী যুব-আন্দোলনের অন্যতম একটি প্রধান কেন্দ্র। বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়া থেকেই এই জেলাতে অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল। কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশী দীর্ঘকাল ধরে রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করেই পরিচালনা করেছিলেন বিপ্লবী কর্মতৎপরতা। গোপন অবস্থায় তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে গড়ে তোলেন বিপ্লবী সংগঠন। প্রকৃতপক্ষে, বহু আত্মত্যাগী বিপ্লবী বীরের কর্মস্থল ছিল এই রংপুর। ১৯৩০-এর দশকে রংপুর জেলার বহু বিপ্লবী কর্মী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে বিনা-বিচারে আটক বাংলার রাজবন্দীরা ক্রমশ কারামুক্ত

হয়ে বাইরে আসতে থাকেন। বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর পূর্বেকার পলাতক জীবনের অন্যতম সাথী উলিপুরের প্রয়াত যোগেন মজুমদার মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হলেও পার্টি গ্রুপে ছিলেন। পার্টির পক্ষে তিনি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৬-৩৭ সালে মুজফ্‌ফর আহমদ-এর সঙ্গে সতীশ পাকড়াশী, বিজয় রায় এবং শচীন রায় গোপনে যোগাযোগ করে মার্কসবাদী পাঠচক্র সংগঠিত করেন। এই সময়কালে রাজবন্দীরাও মুক্ত হয়ে জেলার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন কৃষক আন্দোলনের কাজে। নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যেরা (এঁরা সকলেই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের সদস্য ছিলেন) অনেকেই কংগ্রেসের জেলা, মহকুমা বা স্থানীয় নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এঁদের মধ্যে দীনেশ লাহিড়ি, অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, মণিকৃষ্ণ সেন, শিবদাস লাহিড়ি, রথীন গাঙ্গুলী, সুরেশ রায়চৌধুরী, নৃপেন ঘোষ, অমৃত মুখার্জি, পরেশ মজুমদার, বিমল ভৌমিক, বীরু চক্রবর্তী, ফণী বক্সী, সুধীর মুখার্জি প্রমুখ ছিলেন অগ্রণী পথিকৃৎ। কুড়িগ্রাম মহকুমায় কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন সুধীর মুখার্জি। অল্পবয়স থেকেই তিনি ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও মহকুমা ও শহর কংগ্রেসের সম্পাদক।

সুধীর মুখার্জি ও নৃপেন ঘোষ লিখেছেন, ১৯৩৭ সালের শেষভাগে আন্দামান প্রত্যাগত পার্টিনেতা কমরেড দেবকুমার দাস প্রাদেশিক পার্টি-কমিটির কাছ থেকে একটি নির্দেশমূলক চিঠি নিয়ে আসেন। তদনুসারে কমরেড অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ি, বিনয় বাগচী ও সুরেশ রায়চৌধুরীকে প্রার্থী সভ্যপদ দিয়ে একটি অস্থায়ী জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। শীঘ্রই সুধীর মুখার্জীকে ঐ কমিটিতে নেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনকে সভ্যপদ দিয়ে এই কমিটিতে গ্রহণ করা হয়।

১৯৩৭-৩৮ সালে রংপুরে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষকসভার নেতৃত্ব বিনা ক্ষতিপূরণে ‘জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ’ ও ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ রণধ্বনি মুখে নিয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হয়। বস্তুত, কৃষকসভার জন্মলগ্ন থেকেই কোর্ফা প্রজাদের স্থায়ী স্বত্বের দাবী, নীলামের মাধ্যমে উচ্ছেদ, ক্রোক বন্ধ আন্দোলন, জমিদারের আবোয়াব, বাজে আদায় বন্ধ, তহরী মহরী বন্ধ

প্রভৃতি দাবী নিয়ে লড়াই শুরু হয়। বিশেষ করে বাজে আদায় ও আবোয়ার বন্ধ আন্দোলন সর্বত্র জঙ্গিরূপ নেয়।

সদর মহকুমার বদরগঞ্জে প্রতি বৎসর শীতে একমাসব্যাপী একটি বড় মেলা বসতো। আলোচ্য সময়ে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ ও বঙ্কিম মুখার্জী রংপুরে পার্টি গঠনের কাজে আসেন। তাঁদের নিয়ে এই জেলায় একটি জনসভা করা হয়। বঙ্কিম মুখার্জী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দেন। তিনি জমিদার-মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান।

এইসময় মণিকৃষ্ণ সেনকে জেলা কংগ্রেস নেতা ও সম্পাদক হিসাবেই মুখ্যত কাজ করতে হতো। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রেখেই তিনি কাজ করতেন। শচীন ঘোষ রংপুর শহরে ছাত্র-শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত আন্দোলনের দায়িত্ব সহ শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই সময় আন্দামান-বন্দীদের মুক্তি-আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। রংপুরের সর্বত্র তীব্র আন্দোলন হয়।

তৎকালীন 'গণশক্তি'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন কুড়িগ্রামের দেবকুমার দাস। সুধীর মুখার্জি ও তাঁর নেতৃত্বে রংপুরের কুড়িগ্রামে ক্রমশ সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সালে মে দিবস উদযাপনের জন্য ব্যাপক প্রচার হয়। এটি কৃষকসভা দিবস হিসাবেও পালন করা হয়েছিল। কুড়িগ্রাম শহরে একটি বেশ বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বক্তা ছিলেন সুধীর মুখার্জি। এই সভার শেষে একজন বয়স্ক দাড়িওয়ালা মুসলমান চাষী প্রাণখোলা হাসিমুখে এসে সুধীর মুখার্জির হাত ধরে বললেন, "আমি গদাই মিঞা, গান্ধীর ভলান্‌টিয়ার। ভাল নাম তমিজউদ্দীন। বাড়ী বুড়াবুড়ি (উলিপুর)।" ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীর আন্দোলনে নেমেছিলেন। জেল খেটেছেন। পরে কৃষক-প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তমিজউদ্দীন কমিউনিস্ট পার্টিতেই যোগ দিয়ে রংপুরের কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

রংপুর জেলা জুড়ে এই সময়ে কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই সদর মহকুমার ৯টি থানার মধ্যে ৭টি থানায়, কুড়িগ্রামে ৭টি থানার মধ্যে ৫টি থানায়, নীলফামারীতে ৬টি থানার মধ্যে ৫টি থানায়, গাইবান্ধায় ৭টি থানার মধ্যে ১টি থানায় কমবেশি আন্দোলন ও

সংগঠনের কাজ হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যেই কয়েকটি থানা বেশ সংগঠিত ও ব্যাপকভাবে কৃষক সমিতির এবং কমিউনিস্ট পার্টির এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র দেশের সঙ্গে রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টিরও মূল রণধ্বনি ছিল—'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে পরিণত কর।' রংপুরে যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ব্যাপক প্রচার করা হয়। বহু পোস্টার দিয়ে সেই প্রচার চলে। এরকম একটি পোস্টার দেওয়া হয় একেবারে শহরের কেন্দ্রস্থলে। ছবিতে দেখানো হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতাকা-চিহ্নিত টুপিপরা এক সাহেব (জন বুল) একটি ভারতীয়কে পায়ের নীচে ফেলে আর একটি ভারতীয়ের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। তার বুকের রক্ত জমা হচ্ছে একটি পাত্রে। পাত্রটির গায়ে লেখা 'যুদ্ধ-ভাণ্ডার'। এই পোস্টার শহরে ও গ্রামের জনগণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

১৯৩৮ সালে রংপুর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন ও ১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ থানার চন্দনপাট গ্রামে রংপুর জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আবদুল্লাহ রসুল ছিলেন সভাপতি। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও নলিনী ঘোষও সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এর মধ্যবর্তী সময়েই নানা দাবি নিয়ে কৃষক আন্দোলন রংপুরে সংগঠিত হয়েছিল।

১৯৪০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস ও দমননীতি-বিরোধী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে জেলার প্রতি কেন্দ্রে সরকারী ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়। এই উপলক্ষে হাট হরতাল, লাঙ্গল বন্ধ্, পোস্টার দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সকল সংগঠনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা পার্টি অফিস সহ ১৬টি গোপন পার্টি কেন্দ্র গঠন করা হয়। ছয়জন গোপন জেলাপার্টি সংগঠক সহ ১৯জন গোপন পার্টি সংগঠক ঘুরে ঘুরে পাটি সংগঠন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পাক্ষিক ভিত্তিতে ২০০ পার্টি বুলেটিন এবং মাসে মাসে পার্টি ইস্তাহার, যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার প্রকাশিত ও প্রচারিত হতো। এরই পাশাপাশি চলতে থাকে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলির মতোই রংপুরের বিভিন্ন হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলন। পাশাপাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অনেকগুলি হাটেই ঐ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সামন্ত-

তন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সেদিন ছিল বিরাট।

পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ার আগেই ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রংপুর জেলা পার্টির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩০০জন পার্টি সদস্যের উপস্থিতিতে। সম্মেলনের সময় জেলা সম্পাদক ছিলেন সুধীর মুখার্জি। সভাপতিত্ব করেন সরোজ মুখার্জি। শচীন ঘোষ, মণিকৃষ্ণ সেন, শিবদাস লাহিড়ি, রথীন গাঙ্গুলি, বিভূতি লাহিড়ি, রবি মজুমদার ও সুধীর মুখার্জিকে নিয়ে জেলা কমিটি গঠন করা হয়।[illegible]

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রংপুরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপকভাবে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। ১৯৪২-এর জুন মাসে ডোমার প্রাদেশিক কৃষক সভার পঞ্চম সম্মেলনে 'জনযুদ্ধ' নীতি ব্যাখ্যা করা হয়। প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘ-র ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন রংপুর জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল। এছাড়া জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে 'জনরক্ষা সমিতি', মহামারী প্রতিরোধে 'পিপলস রিলিফ কমিটি' (P. R. C), নারীদের সংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' প্রভৃতি সংগঠনগুলি কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনকেই সমৃদ্ধ করেছিল। পি. আর. সি.-র নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ বি. কে. বসু, ডাঃ অনিল ব্যানার্জী, ডাঃ অমিয় ব্যানার্জী, ডাঃ বিমল বাগচী প্রমুখ। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' নেতৃত্বে ছিলেন রাণী মুখার্জী, ঊষা দাশগুপ্ত প্রমুখ। কিছুদিন নেতৃস্থানীয়া মহিলাকর্মী শান্তি প্রধান এবং লীলা রায় রংপুরের কুড়িগ্রামে গিয়ে সংগঠনের কাজ করেন।

চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে রংপুর-এর কারমাইকেল কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করা নিয়ে যে আন্দোলন হয় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কথাশিল্পী ননী ভৌমিক। ছাত্র আন্দোলনে শান্তি সান্যালও ছিলেন নেতৃত্বের ভূমিকায়। শচীন রায়, ধীরেন ভটাচার্য প্রমুখ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট কর্মী।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর জনযুদ্ধের যুগে রংপুর জেলার কমিউনিস্ট কর্মীদের একদিকে যেমন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (১৯৪৩) প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল তেমনি গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার

কাজেও অংশগ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে মন্বন্তরের পরেই 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমার 'মৎস্যজীবী আন্দোলন', 'তন্তুবায় আন্দোলন', 'বন্ধকী জমি উদ্ধার' 'মজুত উদ্ধার' ও 'আয়েঙ্গার স্কীম প্রতিরোধ আন্দোলন' প্রভৃতি সংগ্রামে রংপুরের কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে। অবশ্য এর কয়েকটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্মীরাও কমিউনিস্টদের সঙ্গে ছিলেন। যাইহোক, আন্দোলন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আর সফলতার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ওই জেলাকে 'লাল রংপুর' বলে চিহ্নিত করেন।

যুদ্ধের পর ১৯৪৬-এর বিধানসভার নির্বাচনী সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি ভালো ফল করেছিল, যদিও রংপুরের কোনো আসনে তারা বিজয়ী হতে পারেন নি। কিন্তু রেলওয়ে কেন্দ্রে জ্যোতি বসুকে জয়ী হতে রংপুর খুবই সহায়তা করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগার দাবিতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রংপুরের কৃষকসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যুক্ত বাঙলার যে কয়টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয় তার মধ্যে রংপুর ছিল অন্যতম। বিশেষ করে রংপুরের ডিমলা, ডোমার, নীলফামারি থানার তীব্র কৃষক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের শত দমননীতি ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক উস্কানী এবং কংগ্রেসী নেতাদের নিস্পৃহতা সত্ত্বেও সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোরের আঁকা অসামান্য স্কেচগুলিতে এই ঐতিহাসিক আন্দোলন জীবন্ত হয়ে আছে।

ঢাকা :

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম যুগে ঢাকা জেলা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সব থেকে শক্তিশালী একটি কেন্দ্র। ঢাকা শহর, সোনার গাঁও, বিক্রমপুর এবং নরসিংদি অঞ্চলের শত শত যুবক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে থেকে আসা যুবকেরা বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও তারা নানা গ্রুপ বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। এছাড়া তাঁদের সংগঠন গড়ার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক। জনসাধারণের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকার ফলে গণআন্দোলন গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব

হয়নি। তবে অনুশীলন সমিতির কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী ও আরো অনেক বিপ্লবী মার্কসবাদ এবং কমিউনিজমের সম্পর্কে কিছু ধারণালাভ করার চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকার দুই বিপ্লবী নেতা গোপাল বসাক ও নলীন্দ্র সেন ছিলেন এই বিষয়ে পথিকৃৎ। এঁরাই সর্বপ্রথম ঢাকা জেলায় মুজফ্ফর আহ্মদের সাহায্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়াস নেন।

১৯৩৪ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভ করে গোপাল বসাক ঢাকায় আসেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীও কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে নলীন্দ্র সেনও জেলখানা থেকে মুক্ত হন। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজ দ্রুতগতিতে এগুতে থাকে।

১৯৩৭ সালেই কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জেলার সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এর সম্পাদক নির্বাচিত হন নলীন্দ্র সেন। নলীন্দ্রবাবু মার্কসবাদ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বুদ্ধিজীবী মহলেও তাঁর বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। ঢাকায় বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলাই সে সময়ে কমিউনিস্টদের কাছে সর্বপ্রথম কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকার জন্য পার্টির নামে খোলাখুলি কাজ করা যেত না বলে কমিউনিস্টরা সারা দেশের মতো ঢাকাতেও কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্য থেকেই কাজ শুরু করে। কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির সম্পাদকও ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। গোটা কমিটিই পরিচালিত হতো কমিউনিস্ট কর্মীদের দ্বারা।

১৯৩৭-৩৮ সালে আন্দামান ও বিভিন্ন জেল থেকে বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয় রাজবন্দী মুক্তি লাভ করে ঢাকায় আসেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের পূর্ণদাস-গ্রুপের জিতেন ঘোষ, জীবন চ্যাটার্জি-গ্রুপের সত্যেন সেন, প্রবোধ গুপ্ত, সুশীল ঘোষ, ঢাকার শ্রীসংঘের নেপাল নাগ, বিনয় বসু, বঙ্গেশ্বর রায়, যুগান্তর পার্টির জ্ঞান চক্রবর্তী, নারায়ণগঞ্জের অনুশীলন সমিতির অনিল মুখার্জি, ব্রজেন দাস, সুবোধ সেন, বারীন দত্ত, নারায়ণগঞ্জ গ্রামাঞ্চলের সতীশ পাকড়াশী, সতীন রায়, গোপাল গুপ্ত, অন্নদা পাল, মানিকগঞ্জের যুগান্তর পার্টির সমর ঘোষ, যাদব চ্যাটার্জি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এঁদের সকলের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মোটকথা,

১৯৩৮ সালের মধ্যেই ঢাকা জেলায় পার্টি ও গণসংগঠন গুলিকে গড়ে তোলার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়। ফলত, ১৯৩৮ সালের মধ্যেই ঢাকা প্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন, ধাঙড় ইউনিয়ন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, নারায়ণগঞ্জ হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, লক্ষ্মীনারায়ণ টেক্সটাইল মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠে। এছাড়া ঢাকেশ্বরী মিল ও চিত্তরঞ্জন মিলের শ্রমিকদের মধ্যেও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; ছাত্র ফেডারেশনও জেলায় একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে এবং মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার গ্রামাঞ্চলে কৃষক-সভা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে।

সেই সময়ে পার্টির প্রভাব ও কাজের তুলনায় পার্টি সভ্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। যাঁরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে নিয়মিত কাজ করতেন না, তাঁদের পার্টি সভ্যপদ দেওয়া হতো না। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকাতে পার্টির একটি গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সাতজনকে নিয়ে একটি নিয়মিত জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। গোপাল বসাক জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঢাকার শিক্ষিত তরুণ ও বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে এবং কিছুটা গরীব মুসলিম কৃষকদের মধ্যেও কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। নিরঞ্জন গুপ্ত বিক্রমপুরে ও কালিপদ গাঙ্গুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলায় শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৩৯ সালের দুইটি বিশেষ ঘটনা হলো লক্ষ্মীনারায়ণ ও ঢাকেশ্বরী মিলে প্রায় একমাস স্থায়ী দুটি সফল ধর্মঘট। শ্রমিক-ভলান্টিয়ারের দলগুলি সামরিক কায়দায় প্রতিদিন আধঘণ্টা করে মিলে অনুপ্রবেশের বিভিন্ন পথ পাহারা দিতেন এবং মিলের যন্ত্রপাতির যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতেন। ধর্মঘটের সময় পার্টির নেতা ভলান্টিয়ার দলগুলির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। এতে শ্রমিকদের রাজনৈতিক মান যথেষ্ট উন্নত হয়। এই ধর্মঘটগুলি ঢাকার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা ও সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়।

ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনও ১৯৩৯ সাল থেকেই বেশ শক্তিশালী হয়ে

উঠতে থাকে। জেলায় ৬০টির বেশি স্কুল-কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের কমিটি গঠিত হয়। মুন্সীগঞ্জ মহকুমাই ছিল ছাত্র-আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। এই ছাত্রদের মধ্য থেকেই পরবর্তী সময় যথেষ্ট সংখ্যক পার্টি কর্মী বের হন, যারা বিভিন্ন গণ-সংগঠনের এবং কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কৃষক সংগঠন সেরকম সবল তখনও পর্যন্ত না হলেও ১৯৩৯ সালের মধ্যে পার্টি সংগঠন জেলায় প্রায় সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল।

১৯৩৮ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে যেমন কংগ্রেসের ভেতরে থেকে কাজ করতেন তেমনি গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিও অন্যান্য দলের সহযোগিতায় গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আর. এস. পি-র সঙ্গে, কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে এবং ছাত্র ফেডারেশনের ক্ষেত্রে আর. এস. পি, শ্রীসংঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা একযোগে কাজ করতেন। ঢাকা জেলার কংগ্রেস কমিটিতে এবং বিভিন্ন গ্রাম ও মহকুমা শহরগুলিতে কমিউনিস্টরাই কংগ্রেসের নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁরা কংগ্রেসের মধ্য থেকেই জনসাধারণের স্বার্থমূলক কাজগুলির প্রতি সমর্থন জানান এবং তাদের জঙ্গী আন্দোলনের পথে এগিয়ে নেন।

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হতে আরম্ভ করে এবং অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়। ঢাকা জেলা কমিটি যুদ্ধকালীন সময়ে গোপন প্রচারের জন্য গোপন সাইক্লো কেন্দ্র এবং গোপন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। এই গোপন কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসেই হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপিয়ে জেলার সর্বত্র বিলি করা হতো এবং সেইসঙ্গে হাজার হাজার পোস্টারও জেলার সর্বত্র লাগানো হতো। এই ইস্তাহার ও পোস্টারগুলির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনোরকম সাহায্য না করা। ঢাকা শহরে সভা-সমিতি প্রভৃতি জমায়েতে, সিনেমা হলগুলিতে এবং সাইকেল করে নিয়মিত ইস্তাহারগুলি বিলি করতেন কমিউনিস্ট কর্মীরা। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মী গ্রেপ্তার হন। সূতাকল শ্রমিকরা এই সময়ে নানা কাজে কমিউনিস্টদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন।

১৯৪০ সালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 'ঢাকা প্রগতি লেখক

ও শিল্পী সঙ্ঘ-'র প্রতিষ্ঠা। অন্যান্যদের সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ এবিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই সোমেন চন্দ এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি গ্রহণ করেন ঢাকা রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদকপদ। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ একটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার পথে উগ্রজাতীয়তাবাদী একদল দুর্বৃত্তের দ্বারা সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে নিহত হন। এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ২৮ মার্চ (১৯৪২) কলকাতায় এক সভা থেকে গড়ে ওঠে 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি'র ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তখন পাল্টা আক্রমণ হানতে থাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি। এঁদের অনেকে হিটলার প্রেমীও হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ বিদ্বেষের সূত্র ধরে। এদের হাতে নিহত হন জগন্নাথ কলেজের কমিউনিস্ট ছাত্র প্রদ্যোৎ সরকার (১৯৪২) এবং কচি নাগ (১৯৪৪)। গুরুতর আহত হন ঢাকার বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রূপে পরিচিত রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে।

১৯৪১-৪২ সালে ঢাকায় দুটি দীর্ঘ স্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে নতুন নতুন কর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। রেলওয়ে ইউনিয়ন ও ঢাকার সূতাকলে জোরদার শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। বিক্রমপুর ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় কৃষক আন্দোলনও জোরদার হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২-এর জুলাই মাসে যখন কমিউনিস্ট পার্টি'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় তখন ঢাকা জেলায় পার্টি সদস্য সংখ্যা একশো জনের মতো (সারা ভারতে চার হাজার)।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে যেমন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করতে হয়েছিল, একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি এবং কংগ্রেস অনুগামীদের সুতীব্র আক্রমণ। জনযুদ্ধনীতির সারবত্তা এরা হয়তো অনুধাবন করতে পারেননি। জনমানসে তাই সাময়িকভাবে হলেও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল। তথাপি এই পর্যায়ে জনরক্ষা ও জনস্বার্থমূলক কার্যকলাপের দ্বারা কমিউনিস্টরা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে থাকে। মন্বন্তর মোকাবিলা, মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক আন্দোলনে সামিল হয়ে কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতারা

পার্টির ভিত্তি মজবুত করেন। যাঁরা এসময়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারিতে ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন ঢাকার গোপাল বসাক, নলীন্দ্র সেন ; নারায়ণগঞ্জে ব্রজেন দাস, বারীন দত্ত, বেনুধর ; মুন্সীগঞ্জে জিতেন ঘোষ, প্রবোধ গুপ্ত, সুশীল ঘোষ ; নরসিংদিতে সতীশ পাকড়াশি, যতীন রায়, অজিত চ্যাটার্জি ; চালাকচরের অন্নদা পাল ; মাণিকগঞ্জের সমর ঘোষ, যাদব চ্যাটার্জী প্রমুখ ; ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জি, ধরণী রায়, মৃণাল চক্রবর্তী ; কৃষক ফ্রন্টে জিতেন ঘোষ, প্রবোধ গুপ্ত, অন্নদা পাল, প্রমথ নন্দী, অজিত চ্যাটার্জি ; মহিলা নেত্রী রূপে হিরণবালা রায়, নিবেদিতা নাগ, ইচ্ছাময়ী চক্রবর্তী, নিবেদিতা ঘোষ, রাণী দাস প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন তরুণ ছাত্র আন্দোলনের কর্মীও উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন। এঁদের মধ্যে কালীপদ গাঙ্গুলি, অজিত রায়, রবি গুহ, ফণী গুহ, অনন্ত দাস, সন্তোষ চৌধুরী সুনীল ঘোষ, রঞ্জিত ভৌমিক, নারু মুখার্জি, অমর গাঙ্গুলি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পার্টির ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিনয় বসু বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। এই স্বেচ্ছাসেবকেরা ঢাকা জেলার ভয়াবহ মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করে জনসাধারণের সমর্থন ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। সত্যেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায়। এই সময় অন্য যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন তাঁদের মধ্যে নৃপেন গোস্বামী, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, অজিত গুহ, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক এবং গণসঙ্গীত শিল্পী সাধন দাশগুপ্ত-র নাম উল্লেখযোগ্য। কালীপদ গাঙ্গুলী ও অজিত রায়-এর পরে ছাত্র-আন্দোলনে বিশিষ্টভূমিকা পালন করেন সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, রবি গুহ প্রমুখ ছাত্রনেতৃবৃন্দ।

১৯৪৬-৪৭ সাল জুড়ে সমগ্র বাঙলায় শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্র-আন্দোলনের যে জোয়ার বয়ে যায় ঢাকার কমিউনিস্ট পার্টি তাতে পূর্ণশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করে, কোথাও কোথাও নেতৃত্বের ভূমিকাতেও তারা ছিলেন। '৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে কমিউনিস্ট প্রার্থী ব্রজেন দাস অবশ্য ৬ হাজারের বেশি ভোট পাননি। কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছিলেন ৩০ হাজারের বেশি ভোট। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, আন্দোলন ও সংগ্রাম

পরিচালনা করা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি তখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, 'রুটি-রুজির লড়াইয়ে লাল ঝাণ্ডা কিন্তু স্বাধীনতার জন্য তেরঙা'—এই ছিল সাধারণ মানুষের বড় অংশের মনোভাব। এই সময় ঢাকা জেলায় সব থেকে বড় ঘটনা ছিল জেলার সুতাকলগুলিতে শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক ধর্মঘট। ঢাকেশ্বরী ২নং মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ মিলে পুলিশের গুলিচালনা ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪৬-এর এই দাঙ্গা-প্রতিরোধেও কমিউনিস্টরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়। শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে পার্টির প্রভাব বাড়ে, যদিও গ্রামাঞ্চলে লীগ ও কংগ্রেসের প্রভাবই ছিল বেশি।

১৯৪৭-এর এপ্রিল মাসে নারায়ণগঞ্জে জেলা কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির সদস্যসংখ্যা তখন একশত থেকে বেড়ে আটশত হয়েছে। তবুও এই বৃদ্ধি আশানুরূপ ছিল না। ঢাকার কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী লিখেছেন, কংগ্রেস ও লীগের পরস্পরবিরোধী প্রচারের এবং উভয় সংগঠন কর্তৃক উগ্র পার্টি-বিরোধী মনোভাব নেওয়ার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে পার্টিতে নূতন লোক আসবার হারও কিছুটা কমে যায়। যাই হোক, নারায়ণগঞ্জ সম্মেলনে প্রাদেশিক কমিটির নেতা খোকা (সুধীন) রায়ের উপস্থিতিতে ৩০ জনের জেলা কমিটি ও ৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী তৈরী হয়। পার্টির জেলা সম্পাদক হন অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা ফণী গুহ।

যশোর ও খুলনা ঃ

যশোর ও খুলনা দুটি পৃথক জেলা হলেও এর সীমারেখা এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক এতই পরস্পর-নির্ভরশীল যে উভয়কে পৃথক করা বেশ কঠিন। এই কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং গণ-আন্দোলনে জেলা দুটির ভূমিকার আলোচনা একত্রেই করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক—সর্বস্তরেই যশোর ও খুলনাকে ব্রিটিশ আমলে প্রায় একটি ইউনিট রূপেই দেখা হতো। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার যুগে যদিও দুটি পৃথক জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছিল তথাপি আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি কমিটিই নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলতো।

১৯৩২-৩৩ সালে যশোর জেলায় সুকুমার মিত্র যখন হিজলী স্পেশাল জেলে বন্দী তখন সেখানে একটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মদন দাস (পরবর্তীকালে অন্যতম কৃষক নেতা) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রধানত তাঁরই পরামর্শে ১৯৩৫ সালে কারামুক্তির পর সুকুমার মিত্র যশোরের কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে যশোর-খুলনায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হন। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৫ সালে তিনি ও সোমনাথ লাহিড়ি গোপনে যশোরে এসে কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং খুলনার শচীন (খোকা) বসু পার্টি-সদস্য হন। খুলনার প্রমথ ভৌমিকের মতো নেতৃস্থানীয় বন্দীরা তখনও মুক্তি পাননি। ১৯৩৭ সালে যশোর-খুলনা যুবসংঘের অন্যতম নেতা কৃষ্ণবিনোদ রায় খুলনায় ঐ সংস্থার সকল কর্মীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে যশোর ও খুলনার দুটি স্বতন্ত্র জেলা কমিটি গঠিত হয়। যশোর জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং এই কমিটিতে শচীন মিত্র, অধীর ঘোষ, অধীর ধর, অমল (বাসু) সেন, রাধারঞ্জন চ্যাটার্জী প্রমুখ ছিলেন। কিছু দিন পর শান্তিময় (বাচ্চু) ঘোষও এর অন্তর্ভুক্ত হন।

খুলনা জেলা কমিটিতে ছিলেন শচীন (খোকা) বসু, সন্তোষ ঘোষ, অনিল ঘোষ, প্রবোধ দত্তচৌধুরী, হরিপ্রসাদ দাস প্রমুখ কর্মীরা। একবছর পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রমথ ভৌমিক, নির্মল দাস ও বিষ্ণু চ্যাটার্জী জেলা কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন। প্রমথ ভৌমিক হন সম্পাদক।

এইভাবে দুটি জেলা কমিটি তৈরী হলেও সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি এই দুটি জেলায় তুলনামূলক বিচারে সেই সময় তেমন কিছু ছিল না। যশোরে পার্টি সদস্যের সংখ্যা ৫০ জন ও খুলনায় ছিল ১৪ জন। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠার পরেই কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন গণআন্দোলন সংগঠিত করার কাজ শুরু করে।

যশোর-খুলনায় শিল্প কারখানা তেমন কিছু না থাকায় শ্রমিক আন্দোলনও জোরদার ছিল না। কিন্তু দুই জেলারই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট

পার্টি ছিল নেতৃত্বের ভূমিকায়। বলা যায়, যশোর ও খুলনার কৃষক আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটির উদ্যোগে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। এই সভায় খুলনা জেলা থেকে শচীন বসু, অনিল ঘোষ, সহদেব মণ্ডল, কানাই বিশ্বাস, বিমল রানা, বিভূতি রায়, সুবল মিত্র, মহেন্দ্র খাঁ, মধু মোল্লা প্রমুখ এবং যশোর থেকে সুশীল বসু, অধীর ঘোষ, অধীর ধর এবং আরও কয়েকজন কৃষক কর্মী যোগ দেন। ১৯৩৭-এ কৃষক সভার মৌভোগে অনুষ্ঠিত প্রথম জেলা সম্মেলনেই আহ্বান ওঠে—'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ চাই', 'লাঙ্গল যার জমি তার'। যশোরেও অনুরূপ সম্মেলন হয়। কমিউনিস্ট-কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃত্বে প্রথম দিকে কৃষক আন্দোলনের বড় মঞ্চ গড়ে উঠলেও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরাই কৃষক সভার এবং আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলনগুলি হলো—হাটতোলা বন্ধ আন্দোলন (১৯৩৯-৪০), চুকনগরে সিনেমা বন্ধের আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন বিষ্ণু চ্যাটার্জী ; খুলনায় পাটচাষ-আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৪০), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪০), খুলনার শোভনা অঞ্চলে জমি পুনর্দখলের দাবিতে বাঁধ বাঁধার আন্দোলনেও (১৯৪০) অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জী নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যশোরে সংগঠিত হয় বাঁধ বাঁধার আন্দোলন (১৯৪২-৪৩), খাল কাটার আন্দোলন ও ফসল বাড়াও আন্দোলন (১৯৪২-৪৪) ; খুলনার বড়জলায় খাল কাটার আন্দোলন (১৯৪৫-৪৬) সত্যিই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে প্রখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য রচনা করেন 'জনপদ' উপন্যাস। এছাড়া খুলনার প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সাতক্ষীরা মহকুমাতেও গড়ে ওঠে কৃষক আন্দোলন (১৯৪০-৪৪)। ১৯৪৬ সালে খুলনার মৌভোগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন থেকেই ঐতিহাসিক 'তেভাগা আন্দোলন'-এর ডাক দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণবিনোদ রায়। সভায় কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন, মুজফ্‌ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সাহিত্যিক গোপাল হালদার, সজ্জাদ জহির, মনসুর হবিবুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কবি বিষ্ণু দে এই সম্মেলন উপলক্ষে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'মৌভোগ'। যশোর-খুলনায় তেভাগার সংগ্রাম সারা দেশে

এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই সময় খুলনার কৃষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সমর মিত্র, কুমার মিত্র, সতীশ হালদার, মণীন্দ্র বসু, অক্ষয় মণ্ডল, হীরালাল বাইন প্রমুখ নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

এরই পাশাপাশি চলেছিল ছাত্র-মহিলা ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের আন্দোলন। কৃষক আন্দোলনের সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে 'জনযুদ্ধ'-র যুগে এই দুই জেলা ১৯৪৪-এর মহামন্বন্তর মোকাবিলায় এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার আন্দোলনে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করেনি, বহু উদারপন্থী অকমিউনিস্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কমিউনিস্ট নেতারা এই আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। যেমন, কমিউনিস্ট পার্টি যশোরের ব্যারিস্টার স্বয়ম্ভুগোপাল মজুমদার, বিশিষ্ট মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা সৈয়দ নৌশের আলি, উকিল আব্দুল খালেক, খুলনার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী আব্দুল হাকিম, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেন, অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী প্রমুখের সহায়তাও লাভ করে। খুলনা জেলায় জনরক্ষা আন্দোলনে (যুদ্ধকালীন সময়ে) ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা বিশেষ গৌরবের। মজুত উদ্ধারে, কালোবাজার-বিরোধী আন্দোলনে, মন্বন্তরের সময় লঙ্গরখানা পরিচালনায়, সরকারী দপ্তরে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলনে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল কমিউনিস্ট ছাত্র ও মহিলা সংগঠকেরা। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতা হলেন— অজিত ঘোষ, অশোক মিত্র, সুনীল ঘোষ, সুধীর চ্যাটার্জি, পীযুষ কর, পুলিন পিপলাই, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অমিয় ব্যানার্জি, সন্তোষ দত্ত, রতন সেনগুপ্ত, সন্তোষ দাশগুপ্ত, স্বদেশ বসু, উমাপদ গাঙ্গুলী, সুধাকর দাশ, আনোয়ার হোসেন, ধনঞ্জয় দাশ, পরিতোষ দাশগুপ্ত, পরমেশ ব্যানার্জি, কৃষ্ণ ব্যানার্জি প্রমুখ। দৌলতপুর কলেজ ও বাগেরহাট কলেজে ছাত্রফেডারেশন ছিল খুবই শক্তিশালী। এই সময়কালে যশোরে কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী ছাত্রদের পুরোভাগে ছিলেন অনন্ত মিত্র, সুধাংশু মিত্র, অনিল সিংহ, গৌরব মজুমদার, খুদু মজুমদার, আব্দুল হক, সুবোধ রায়, সুধীর চক্রবর্তী প্রমুখ।

খুলনা শহরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কর্মীরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র কাঞ্জিলাল ও দন্ত-চিকিৎসক অতুল দাশ।

খুলনার মহিলা সংগঠকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানে ছিলেন শ্রীমতী ভানু দেবী,

চারুলতা ঘোষ, অনু সেন, রেবা ঘোষ এবং যশোরে মহিলা-নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন মনোরমা বসু. রাইপ্রিয়া ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, গিরিবালা ঘোষ, প্রতিভা দত্ত, রাণীবালা ঘোষ, ননীবালা বসু, নড়ালের সরোজিনী ঘোষ. হেমলতা ঘোষ. রাজঘাটের কনকলতা মজুমদার সহ চারুশীলা ধর, লীলা বসু প্রমুখ। কমিউনিস্ট নেত্রী অনিলা দেবী, গীতা মুখার্জি (রায়চৌধুরী) ও কনক মুখার্জির (দাশগুপ্ত) জন্মস্থান যশোর।

চল্লিশের দশকে খুলনার প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন হিমাংশু চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, কেশব ভৌমিক, উমাপদ গাঙ্গুলি, ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের খুলনা শাখার গণসঙ্গীত হিমাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসঙ্গীত পরিবেশনে তিনি অবিভক্ত বাঙলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এছাড়া প্রচার-আন্দোলনে, বিশেষ করে নানা বর্ণের সদৃশ্য পোস্টার আঁকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন লক্ষ্মণ কংসবণিক ও অনিল বিশ্বাস। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি এই দুই জেলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, যদিও তার প্রভাব জনমানসে খুব ব্যাপক ছিল না।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যশোর জেলার অবদানও স্মরণযোগ্য। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে এবং পার্টির অনুগামী রূপে এই জেলা থেকে আগত অনেক প্রখ্যাত সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিকও বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে সুকুমার মিত্র. শচীন মিত্র, অরুণ মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল. জগন্নাথ চক্রবর্তী, অরুণাচল বসু প্রমুখ অন্যতম।

১৯৪৬-৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সমগ্র দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয় কমিউনিস্ট পার্টির এই গণসংগঠনগুলি তাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, বিশেষ করে ছাত্র ফেডারেশন। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যশোর এবং খুলনা দুটি জেলাই ছিল দুর্বল। যশোরে কয়েকটি চিরুণীর কারখানা ছাড়া আর কোনো শিল্প ছিল না। খুলনাতেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিল ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা ছিল না। এখানে প্রাক্তন ছাত্র নেতা সুধীর (বুধু) চ্যাটার্জীর প্রচেষ্টায় শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এই দুটি জেলায় যুদ্ধপরবর্তী কালেই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কংগ্রেস ও পুরনো বিপ্লবীদের একটা অংশে এই দুই জেলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানও করেন।

রাজশাহী ঃ

রাজশাহী জেলার মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবেন বলে স্থির করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন একদা 'অনুশীলন' দলের বিপ্লবী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। 'যুগান্তর' দলের কিছু প্রাক্তন কর্মী ঐরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও 'যুগান্তর' দলের কর্মীসংখ্যা তুলনায় ছিল কমই। এই জেলায় ১৯৩৮-এর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী, যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগ নেন তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন-এর সদস্য। এঁরা হলেন—কানু ভট্টাচার্য, নগেন দাস এবং তারাপদ দেব। পার্টির একমাত্র সদস্য ছিলেন সন্তোষ (কানু) ভট্টাচার্য। তাঁকে কেন্দ্র করেই পার্টি গঠনের সূচনা ঘটে রাজশাহী জেলায়। প্রাদেশিক কমিটি থেকে কখনও আব্দুল মোমিন, কখনো আবদুল্লাহ রসুল জেলার পার্টিগত কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে রাজশাহী যান পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি। পাঁচুবাবুর উপস্থিতিতে সন্তোষ (কানু) ভট্টাচার্যকে কনভেনর করে মোট সাত জনকে নিয়ে একটি কণ্ট্যাক্ট কমিটি গঠন করা হয়। এঁরা হলেন ঃ কানু ভট্টাচার্য, নগেন দাস, তারাপদ দেব, সুনীল চৌধুরী, নির্মল মৈত্র, গোপাল সরখেল এবং অরুণ চৌধুরী। এছাড়া পুরনো বিপ্লবীগোষ্ঠী থেকে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এসেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন ঃ ত্রৈলোক্য সেন, অনিল বটব্যাল, যামিনী মজুমদার, কালিদাস সান্যাল, অটল চক্রবর্তী, মণি সরকার, দুঃখহরণ খান, কালু রায়, হরিমোহন সান্যাল, সন্তোষ মৈত্র, অমূল্য চৌধুরী (টোনা), অমিয় মৈত্র, দীনেশ চক্রবর্তী, নরেন বিশ্বাস, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই সন্ত্রাসবাদী যুগের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন নি বলে রাজশাহী জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম দিকে কিছু 'উপদলীয়' সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪০ সালে জেলা পার্টির সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয় অরুণ চৌধুরীকে সম্পাদক করে। ১৯৪২ সালে গঠিত হয় পূর্ণ জেলা কমিটি। এই সময়ে গোপালপুর চিনিকল অঞ্চলের কালী সিকদার, গজেন সরকার, শ্রমিক কমরেড বসন্ত দাস, জগন্নাথ সিং, বানারসীলাল

প্রমুখের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে রাজশাহী জেলার ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা স্মরণীয়।

নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমেই তিনটি খুব মূল্যবান সাংগঠনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। (১) নাটোর প্রদেশ কংগ্রেস-এর রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিস্তার করা—যার ফলে পরবর্তীকালে অনেক কংগ্রেসকর্মী ওই জেলায় কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। (২) জেলায় কৃষক সম্মেলন করে 'কৃষক সভা' প্রতিষ্ঠা করা। এই সম্মেলন হয় আবদুল্লাহ রসুলের উপস্থিতিতে নাটোর মহকুমার বাসুদেবপুর রেল স্টেশনের পাশে বেলঘরিয়া গ্রামে। মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও জেলা কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এই সময় থেকেই। (৩) রাজশাহী শহরের টাউন হলে বঙ্কিম মুখার্জি, আব্দুল মোমিন এবং নিরাপদ মুখার্জিকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক সভা করা হয়, এর প্রভাব শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী. বিশেষ করে ছাত্র সমাজের উপর পড়েছিল। পরবর্তীকালে ঘোড়ামারা পোস্টাপিসের কাছে স্বর্ণকার পট্টিতে এক চিলতে ঘরের ছাত্র ফেডারেশনের অফিস ক্রমশই বেশ জমজমাট হয়ে উঠে। সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে হরেকৃষ্ণ রায়, শুভ্রাংশু মৈত্র, বিনয় ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, সুধাংশু চক্রবর্তী, প্রণব চক্রবর্তী প্রমুখ ছাত্রনেতাদের সক্রিয়তায় রাজশাহী কলেজ ও স্কুলগুলিতে ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাবই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, জনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার এবং মন্বন্তর মোকাবিলায় তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও পালন করেন। গণশিক্ষা প্রচারের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন শুভ্রাংশু মৈত্র। তিনি ১৯৪৪ সালে পার্টির জেলা সম্পাদকের দায়িত্বও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। রাজশাহীতে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাছে যেসব পার্টি সদস্যা বিশেষ সক্রিয় ছিলেন তাঁরা হলেন : চারুবালা দেবী, অনুপমা বাগচী, স্নেহলতা সরস্বতী, প্রীতি সরকার ব্যানার্জী, বাসন্তী চক্রবর্তী, পঙ্কজ আচার্য, রেখা চৌধুরী, বীণা দেবী প্রমুখ। এঁদের নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রাজশাহীতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রীতি সরকার (ব্যানার্জী) ছিলেন গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রধান গায়িকা। রাজশাহী জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল শক্তিশালী।

রাজশাহীতে যাঁরা পার্টি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই বর্ণহিন্দু পরিবার থেকে আসা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। প্রথম দিকে

কৃষক আন্দোলন তেমন শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করে আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে রমেন মিত্র, ইলা মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের আগেই কৃষক-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪২-এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টদের অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু ১৯৪৬-৪৭ সালে সেই সাংগঠনিক দুর্বলতা কমিউনিস্ট পার্টি অনেকটাই কাটিয়ে ওঠে।

বরিশাল ঃ

বরিশাল জেলা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবিভক্ত বাঙলায় ছিল যথেষ্ট উন্নত। সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনও এই জেলায় প্রথম থেকেই 'যুগান্তর'-গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সক্রিয় ছিল। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠকে কেন্দ্র করেই প্রধানত বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হতো। স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা অশ্বিনীকুমারদত্ত,চারণকবি মুকুন্দদাসসহ অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের জন্মস্থানরূপে এই জেলা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর. সি. পি. আই নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর রাজনৈতিক প্রভাব ও সংগঠনের ফলে বহু শিক্ষিত তরুণ তরুণী এবং 'যুগান্তর' দলের অনেক কর্মী তাঁর রাজনীতিতে আস্থাশীল হন। এই কারণে বরিশালে কমিউনিস্টপার্টি গঠনের ইতিহাস কিছুটা দীর্ঘ ও জটিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকেই সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি প্রস্তুত হলেও প্রথম দিকে সৌম্যেন ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে অনিল দাশগুপ্ত, মুকুল সেন, সুধাংশু মজুমদার, অমৃত নাগ প্রমুখ স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এঁরা সৌম্যেন ঠাকুরের পার্টি করতে থাকেন। কমরেড রণেন সেন, জগজ্জিৎ সরকার প্রমুখ নেতারা ১৯৩৭ সালে বরিশালে গিয়ে ঠাকুরের দলের সঙ্গে কমিউনিস্টপার্টির আদর্শগত ও রাজনৈতিক পার্থক্য যেমন ব্যাখ্যা করেন, তেমনি সুধাংশু দাশগুপ্তও কারামুক্তির পর বরিশালের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ ঘটে। ফলে, সৌম্যেন ঠাকুরের দল ছেড়ে নীরেন ঘোষেরা মার্কসবাদী লীগ গঠন করেন। মুকুল সেন, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী আরো কিছুদিন পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে আসেন।

বরিশালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জেলা সংগঠনী কমিটি ১৯৩৯ সালে

গঠিত হয়—নীরেন ঘোষ, সতীপ্রসন্ন (কালু) গাঙ্গুলি, দেবেন্দ্রবিজয় (কালাচাঁদ) সেন, অমৃত নাগ, জ্যোতি দাশগুপ্ত, সুরেশ গাঙ্গুলি, কুঞ্জ বসু, যূঁইফুল বসু প্রমুখকে নিয়ে। নীরেন ঘোষ এই জেলা কমিটির সম্পাদক হন। পরবর্তীকালে এই জেলায় শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠে, বিশেষ করে ছাত্র ফেডারেশন আর মহিলা সমিতির প্রভাব ও মর্যাদা জনমানসে বেশ ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ফণী রায়, বীরেন রায়, কিষাণ দাশগুপ্ত, অমিয় দাশগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী, অজয় দাশগুপ্ত, কানাই রায়, প্রশান্ত দাশগুপ্ত. স্বদেশ বসু প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৪২ সালের শেষ দিক থেকেই সারা বাঙলায় চোরাবাজারী ও মজুতদারী প্রকট হয়ে ওঠে। জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত থাকে না। সমস্ত জেলায় জনরক্ষা ও মজুত উদ্ধার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, রংপুর, কলকাতা এবং অবশ্যই বরিশাল জেলায়। প্রতিটি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গড়ে ওঠে। আত্মরক্ষা সমিতিও ছাত্র ফেডারেশন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক টীমের পাশাপাশি জাপ-বিরোধী ও ফ্যাসিবিরোধী প্রচার-আন্দোলন যেমন চালায়, তেমনি আবার লঙ্গরখানায় খিচুড়ি রান্না করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষকে ক্ষুধার অন্নও দিতে থাকে। বরিশালে ১৯৪২-এর ১৬ জুন, টাউনহলে স্নেহলতা দাসের সভানেত্রীত্বে বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আহূত এক সভায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। শান্তিসুধা ঘোষ ও যূঁইফুল বসুকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ১৭ জনকে নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। বরিশালের কিংবদন্তী 'মাসীমা' নামে পরিচিত মনোরমা বসু ছিলেন এর প্রধান চালিকাশক্তি। বরিশালে কৃষক আন্দোলন এই সময় তেমন শক্তিশালী না হলেও কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ও মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করে জেলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। জনরক্ষা আন্দোলনের কাজও জেলায় অগ্রাধিকার পায়। হীরালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শিশির গুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, শোভা সেন, যূঁইফুল বসু. মনোরমা বসু, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, অধীর চক্রবর্তী প্রমুখ ছাত্রনেতা এবং অসংখ্য কৃষক কর্মী খাদ্য আন্দোলনে সামিল হন। এই সময় পার্টি সদস্য, মহিলা ও ছাত্র ফ্রন্টের সদস্যের সংখ্যা জেলায় ছিল যথাক্রমে ১৮৫, ১৪৯১ এবং ৮৫৯ জন মাত্র।

উপসংহার ঃ

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারী এবং সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণের মধ্যে পূর্ব-বর্ণিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও তাঁর সঙ্গে গাঁটছড়া বাধা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাদের গণ-ভিত্তি সত্যিই মজবুত করতে পেরেছিল।

পূর্ববঙ্গের যে-জেলাগুলি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষণীয়। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে কৃষক আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে শক্তিশালী। আবার পার্বত্য জেলাগুলিতে বিরাট সংখ্যক নিম্নবর্গের উপজাতীয় বা তপশিলী জনগণ পার্টির মধ্যে এসেছিলেন। কৃষক-আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলিতে, যেমন দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুরে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে খুব একটা সফল হয় নি। নবজাগ্রত শ্রেণীচেতনা সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দিয়েছিল। এসব অঞ্চলে মুসলিম কৃষক ব্যাপক সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সমবেত হলেও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলাগুলিতে যেখানে কমিউনিস্টদের প্রভাব দুর্বল, সেখানে মুসলিম লীগ নানা অপকৌশল প্রয়োগ করে মুসলিম কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। আবার, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের 'জনযুদ্ধ'-নীতি বিভিন্ন জেলার মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে অনেকটাই পার্টি-বিরোধী করে তোলে, যদিও ছাত্র ও মহিলা সংগঠন বেশ কিছুটা জনপ্রিয় হয় ১৯৪৩-এর মহামন্বন্তরের সময়ে ত্রাণ কাজের মাধ্যমে। জেলাগুলিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছাড়াও ফরোওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, এমনকি তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের জাতপাত ভিত্তিক আন্দোলনের মুখে আক্ষরিক অর্থেই স্রোতের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। এর উপর ছিল জমিদার-জোতদার ও ব্রিটিশ সরকারের সাঁড়াশী আক্রমণ। এই সবকিছু বিবেচনা করলে সেই সময়কালের ছোট পার্টি রূপে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে গৌরবজনক ও ঐতিহাসিক।

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল দিনাজপুর, রংপুর,

ময়মনসিংহ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম—এই পাঁচটি জেলায়। এগুলি সম্পর্কে তাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে পার্টি গঠনের সময় ময়মনসিংহে পার্টিসদস্য ছিলেন মাত্র ৮ জন কিন্তু ১৯৪৭-এ তা বেড়ে হয় সাড়ে তিন হাজার। রংপুরে ছিল মাত্র ৬ জন, ১৯৪৭-এ হয় আড়াই হাজারের মতো। দিনাজপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রামেও পার্টি সংগঠনের অনুরূপ প্রসার হয়েছিল।

ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুরের পার্টি সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক। ঢাকা জেলার পার্টি সদস্যদের একটা বড় অংশ ছিল শ্রমিক। চট্টগ্রামে পার্টি-সভ্যদের বড় অংশ ছিল মধ্যবিত্ত। ছাত্র ও মহিলাদের মধ্য থেকে সদস্য অল্প বিস্তর সকল জেলাতেই ছিল।

ওই পাঁচটি জেলা ছাড়া যশোর, খুলনা ও বরিশাল—এই তিনটি জেলাতেও তখন কমিউনিস্ট পার্টি কিছুটা শক্তিশালী ছিল। কিছু শক্তি ছিল বগুড়াতেও। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে না থাকায় শেষোক্ত জেলাকে আলোচনার বাইরে রেখেছি। পূর্ববঙ্গের বাকি ৬টি জেলার মধ্যে একমাত্র রাজশাহী জেলাতেই পার্টি সংগঠকেরা কিছুটা তৎপর ছিলেন। অন্য জেলাগুলি যেমন পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ায় (যুক্ত বঙ্গে নদীয়ার মহকুমা) তখনও কমিউনিস্টরা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি বলে তাদের আলোচনার বাইরেই রাখা হয়েছে। তবু বলা যায়, জনযুদ্ধের যুগে এবং তেভাগা সংগ্রামে ওই জেলাগুলিও একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের মধ্যে না হলেও অবিভক্ত আসাম প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত শ্রীহট্ট (সিলেট) কাছাড় নিয়ে যে সুরমা উপত্যকা অঞ্চল—সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি তুলনামূলকভাবে বেশ কিছুটা শক্তি অর্জন করেছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই জেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসামের মধ্যে হলেও কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটির মাধ্যমেই এখানকার পার্টি পরিচালিত হতো। সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের ১৫টি জেলার পার্টি সদস্য ১৯৪৩ সালে ছিল ২০০০-এর মতো এবং ১৯৪৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ হাজার। এর দ্বারাই পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধি সব গণসংগঠনেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির এই প্রভাবকে কাজে লাগাতে এবং সংগঠিত করতে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই। এটা না ঘটলে চট্টগ্রামে কল্পনা

দত্ত (যোশী) এবং ময়মনসিংহে মণি সিংহ-র মতো প্রার্থীর পরাজয় হয় কিভাবে ?

তবে যাই হোক, সমগ্র ১৯৪৭ সাল জুড়ে (এমনকি ১৯৪৮ সালেও) কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতৃত্বে পূর্ববাঙলার লক্ষ লক্ষ আধিয়ার ও টংক চাষীরা তেভাগার দাবিতে মারণাস্ত্রে সজ্জিত সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে দাবানল জ্বেলেছিল—অসংখ্য মৃত্যু, কারাযন্ত্রণা, বর্বর অত্যাচার, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ এবং প্রতিক্রিয়ার চরম আঘাতও তাকে নির্বাপিত করতে পারেনি। তেভাগার দাবি শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী কৃষকেরা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর, এখানেই পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সার্থকতা।

সহায়ক গ্রন্থাদি :

* ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (১খণ্ড) / সরোজ মুখোপাধ্যায়। * সংগ্রামের তিন দশক / খোকা রায়। * ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ / জ্ঞান চক্রবর্তী। * রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি / সুধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ। * শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন / চঞ্চল শর্মা। * বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ / রণেন সেন। * বাংলার কৃষক সংগ্রাম / সুনীল সেন। * ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা / যুব সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থ। * দিনের আলোর গভীরে / অরুণ চৌধুরী। * উজান গাঙ বাইয়া * হেমাঙ্গ বিশ্বাস। * তেভাগা সংগ্রাম / বাংলাদেশ কৃষক সমিতি। * Life is a Struggle / Moni Singh. * কৃষক সভার ইতিহাস / আবদুল্লাহ রসুল। * সেদিনের কথা / মণিকুন্তলা সেন। * মুক্তি-সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রসমাজ / বরুণ দে সম্পাদিত। * নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা / কনক মুখোপাধ্যায়। * গণনাট্য কথা / সজল রায়চৌধুরী। * দ্বীপান্তরের বন্দী / নলিনী দাস। * অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় / অশোক মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনযুদ্ধ (১৯৪২-৪৫) ও স্বাধীনতা (১৯৪৬-৪৭), সংখ্যা।

পরিশিষ্ট—১

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠনগুলির সদস্য-সংখ্যা ও সাংগঠনিক চিত্র। ১৯৪৩ সালের মে দিবসের হিসাব :

(ক) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

জেলা ইউনিট	১ পার্টি সদস্য সংখ্যা	২ সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী, মার্চ ১৯৪৩ পর্যন্ত	৩ ভাতাপ্রাপ্ত সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী ৩০.৪.৪৩	৪ শ্রমিক পার্টি সদস্য	৫ কৃষক পার্টি সদস্য	৬ ছাত্রফ্রণ্টে পার্টি সদস্য	৭ মহিলা ফ্রণ্টে পার্টি সদস্য	৮ মুসলিম পার্টি সদস্য	৯ অন্যান্য শাখায় কর্মরত সদস্য
ঢাকা	৩১৯	৭৭	৩৪	১০০	১০	৪৭	৩০	—	১৬৯
দিনাজপুর	২৬৩	৭	২০; ১মহিলা	—	২০৬	২১	১৬	১০	২৬
রংপুর	২৩০	৪৬	২৩	—	৯৮	৩৯	১৯	২৪	৮১
চট্টগ্রাম	২২৪	৩৪	৬০	—	৪০	৪৫	৪৫	?	৮১
ময়মনসিংহ	১৮৪	৯১	২২	১	৬৮	২৯	২০	১৬	৯১
বরিশাল	১৪৯	২২	১৩	—	৪	২৪	৩৮	২	৯৫
রাজশাহী	১০৭	১৯	১০	৬	১১	৩৯	২১	৮	৩৫
যশোর	১০০	২৮	৮	৩	২০	১৯	২	১৫	৫৭
ফরিদপুর	৯৩	১২	৮, ১মহিলা	৩	৬	১৭	৮	১	৪৮
নোয়াখালি	৭৫	১৯	১৭	—	২১	৪	৯	৫	৪৫
খুলনা	৭৩	২৮	২	২	১৫	১০	৭	—	২৪
পাবনা	৬৮	১৩	৪	—	৫	২৯	২৮	৬	১৮
সুরমা উপত্যকা	১৭২	৪৮	৬	—	—	—	—	—	—
ত্রিপুরা	১০২	২০	৬	—	—	—	—	—	—

বিঃ দ্রঃ একই পার্টি-সদস্য তখন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলা বা সাংস্কৃতিক ইত্যাদি একাধিক ফ্রণ্টে একই সঙ্গে কাজ করতেন।

(খ) শ্রমিক-কৃষক-মহিলা ও ছাত্র ফ্রন্টের রিপোর্ট

(কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন সমূহ)

জেলা সমূহ	শ্রমিক ফ্রন্ট		মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি	কৃষক ফ্রন্ট	ছাত্র ফ্রন্ট		মন্তব্য
	সদস্য	ইউনিট			সদস্য	ইউনিট	
ঢাকা	২৭৪৫	৫	২২৭৫	৭০০০	১২০০	২৫	
দিনাজপুর	—	—	৬০০	১৩,০০০	৩৭৫	৪	
রংপুর	১৩৭	১	১৩৮৪	২৬,১৯৭	১০০০	৫	
চট্টগ্রাম	২৭৬	—	৪১৬০	৪,০০০	২২৭২	৪২	
ময়মনসিংহ	২৯৫	৩	২০৭৫	১২,৮৫২	১০০০	৩৫	
বরিশাল	—	—	১৪৯১	২০৬২	৮৫৯	৮	
রাজশাহী	২০৪	২	৮৩০	২১৭৬	৬৬১	৭	
যশোর	২২৫	২	৩৪০০	৮	৮০৫	২৫	
ফরিদপুর	—	—	৮১২	১২৩৩	৬৯৫	২০	
নোয়াখালি	—	—	১১০	৩৬৫২	৪০০	৭	
খুলনা	৩৫৮	৩	৫৩৫	৯১৬০	৭৫০	২৫	
পাবনা	২০০	১	৭০০	৭৩৩	৪৬৫	৯	
সুরমা উপত্যকা	১৫০৬	১২	৭০০	৩,০০০	৯৫২	১০	
ত্রিপুরা	—	—	—	৮,৫০০	৪০০	—	
মোট	৫,৯৪৬	২৯	১৯,০৭২	৯৩,৫৭৩	১১,৮৩৪	২২২	

- * শ্রমিক ফ্রন্ট—বি. পি. টি. ইউ. সি-তে ৬টি প্রধান জেলায় ৬৭ জন সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী ছিলেন।
- * কৃষক ফ্রন্ট—সারাভারত কৃষক সভায় ৪২৫ জন সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী ছিলেন। প্রাথমিক শাখা ছিল ৬৩৪।
- * মহিলা ফ্রন্ট—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে কাজ করতেন ৩৯৩ জন পার্টি-সদস্য। গার্লস স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,০৫০ জন। কিশোর বাহিনীর সদস্য ছিল ২,৫০০ জন।
- * ছাত্র ফ্রন্ট—বি. পি. এস. এফ.-এ ১৬টি জেলায় ৯৭ জন সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী কাজ করতেন।

বিঃ দ্রঃ পূর্ববঙ্গে কৃষক সংগঠন ছিল সবথেকে মজবুত। পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিক সংগঠন ছিল শক্তিশালী।*

পরিশিষ্ট—২

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার পার্টি সম্পাদকের তালিকা:

[পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যাঁরা বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁদের নাম দেওয়া হলো। কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলেও এই তালিকা মোটামুটি সঠিক ও শুদ্ধ। তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর / নুরুল ইসলাম, ২১/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা—১১০০]

ঢাকা:

১৯৩৭ সালে ঢাকা জেলায় পার্টির সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময় সম্পাদক হয়েছিলেন: নলীন্দ্র সেন (১৯৩৭), গোপাল বসাক (১৯৩৮), নিরঞ্জন গুপ্ত (১৯৪৩), জ্ঞান চক্রবর্তী (১৯৪৩), ফণী গুহ (১৯৪৭)।

ময়মনসিংহ:

১৯৩৮ সালে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা সম্পাদক হয়েছিলেন: খোকা রায় (১৯৩৮), পুলিন বক্সী (১৯৪২), মণি সিংহ (১৯৪৩), ক্ষিতীশ চক্রবর্তী (১৯৪৭)।

---

* সূত্র: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা / সরোজ মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৮৬; পৃঃ ৪৩৮—৪৪১।

রংপুর :

১৯৩৭ সালে প্রথম পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক হয়েছিলেন ঃ অবনী বাগচী (১৯৩৮), সুধীর মুখার্জী (১৯৪০), মণিকৃষ্ণ সেন (১৯৪৩), অবনী বাগচী (১৯৪৪)।

সিলেট ঃ

১৯৩৫ সালে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক হয়েছিলেন : চিত্তরঞ্জন দাশ (১৯৩৫), বারীন দত্ত (১৯৪০), সত্যব্রত দত্ত (১৯৪২), বারীন দত্ত (১৯৪৬)।

চট্টগ্রাম ঃ

১৯৩৮ সালে জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা সম্পাদক হন : ননী সেনগুপ্ত (১৯৩৮-৩৯), বঙ্কিম সেন (১৯৪০-৪৩) যশোদা চক্রবর্তী (১৯৪৩-৪৪) কল্পতরু সেনগুপ্ত (১৯৪৪-৪৮), অনন্ত সিংহ ও রণধীর দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সালে কিছুদিন দায়িত্বে ছিলেন।

নোয়াখালি :

১৯৩৮ সালে প্রথম পার্টি গঠিত হয়। ১৯৪০ সালে জেলা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক ছিলেন : রসময় মজুমদার, মণি রক্ষিত ও কমুদ দত্ত।

বগুড়া ঃ

বগুড়ায় ১৯৩৮ সালের দিকে পার্টি গঠিত হয়। তবে বগুড়া জেলা ১৯৪২ পর্যন্ত রংপুর জেলা পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথম সম্পাদক ছিলেন : ডাঃ আব্দুল কাদের চৌধুরী (১৯৪৩-৪৮)।

কুমিল্লা :

১৯৩৮ সালে জেলা পার্টি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ের সম্পাদকগণ : সুবোধ ঘোষ (১৯৩৮-৪২), অনিল অধিকারী (১৯৪২)।

দিনাজপুর ঃ

দিনাজপুর জেলায় ১৯৪৩ সালে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সুশীল সেন (১৯৪৩-৫০)।

বরিশাল :

১৯৩৪ সালের ৭ নভেম্বর মুকুল সেনের নেতৃত্বে ১০ জন তরুণ কমিউনিস্ট সংগঠন গঠন করেন, সম্পাদক হন : জ্যোতি দাশগুপ্ত। ১৯৩৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা কমিটি গঠনের সময়ও সম্পাদক হন জ্যোতি দাশগুপ্ত (১৯৩৬), সুহৃদ দত্ত (১৯৩৭-এর প্রথম কয়েক মাস), অনিল দাশগুপ্ত (১৯৩৭-এর শেষ কয়েক মাস), নীরেন ঘোষ (১৯৩৮-৪০), নৃপেন সেন (১৯৪১), নীরেন ঘোষ (১৯৪২-এ কিছুদিন) মুকুল সেন (১৯৪২), জ্যোতি দাশগুপ্ত (১৯৪২-এর শেষ দিক)।

খুলনা :

১৯৩৬ সালে পার্টি গঠিত হয়। প্রথম সম্পাদক হন : প্রমথ ভৌমিক, পরে নির্মল দাস। আবার প্রমথ ভৌমিক। ১৯৪৩-এ সম্পাদক হন সন্তোষ ঘোষ।

রাজশাহী :

রাজশাহী জেলায় ১৯৪২ সালে জেলা কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক হন—ঘুলু লাহিড়ী, বিজন সেন, রমেন মিত্র, শুভ্রাংশু মৈত্র।

পাবনা :

১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে পার্টি গঠিত হয়। তবে পার্টির জেলা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়ায় ১৯৪১ সাল থেকে। বিভিন্ন সময় সম্পাদক হন—অবনী সান্যাল (১৯৪১), সুধীন মৈত্র (১৯৪২-৪৩), হেমেন্দ্র (ঘটু) চক্রবর্তী (১৯৪৪-১৯৫০)।

যশোর :

১৯৩৫ সাল থেকে পার্টি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সময় যাঁরা জেলা সম্পাদক হয়েছিলেন : কৃষ্ণবিনোদ রায় (১৯৩৫), বাচ্চু ঘোষ নুর জালাল (১৯৪৫-১৯৫০)।

ফরিদপুর :

১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে পার্টি গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন : অনুকূল চ্যাটার্জী (১৯৩৮-৪২), শ্যামল ভট্টাচার্য (১৯৪৩-৪৪), অনুকূল চ্যাটার্জী (১৯৪৪-৪৮)।[*]

---

[*] এই রচনাটি ইতিহাস সংসদ-এর উলুবেড়িয়া অধিবেশনে পঠিত আমার নিবন্ধের (দ্র. ইতিহাস-অনুসন্ধান, ৮ম খণ্ড) পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। —লেখক।

এক নম্বরের তফাৎ

অমৃতা প্রীতম

দেবকীদির সঙ্গে প্রথম দেখা ওর বাড়িতে বিজলী লাইন দিতে গিয়ে। রূপনগরে একটি ছোটবাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত দেবকীদি। আমি অন্য এক মিস্ত্রিকে নিয়ে ওর বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইন টানতে গেছিলাম। বাড়ির উঠোনে পোস্ট পুঁতে রাস্তার পোল থেকে তার টেনে জুড়ে দিয়েছিলাম।

বাড়ির দেওয়ালে একের পর এক বিট্ লাগাতে লাগাতে হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই—এক একটি বিট্ লাগানো হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে যেন আলো জ্বলে যাচ্ছে। ভাবি, বাড়িতে আলো আসার আগেই ওর মুখে এত আলো কি করে? হঠাৎ দেবকীদি বলে—"আজ রাতে যখন ও আসবে, দেখবে ওঁর ঘর কেমন ঝলমল করছে আলোতে।" দড়ি বেয়ে লাইট পোস্টে উঠছি, নীচে তাকিয়ে দেখি—শঙ্কিত মুখে দেবকীদি এমনভাবে তাকিয়ে, যেন ওরই ভাই বা ছেলে ঐ বিপদের মুখে ঝুলে আছে। বিজলিলাইন জুড়ে দেবার পর পরই আমাদের দু'জনের জন্যে দেবকীদি চা নিয়ে আসে। বলে—"তোমরা আমার ঘর আলো করে দিলে, একটু চা খাও ভাই। দড়িতে ঝুলে ঝুলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি আলো বিলি কর তোমরা। ঘর আলো করা কি সোজা কথা? এর আগেও কত লোকের বাড়ি লাইনের কানেকশন দিয়েছি কিন্তু এমন করে তো কেউ আমাদের বলেনি যে আমরা আলো বিলি করি, ঘর আলো করি। বড় ভালো লাগে। আমাদের প্রতি মুহূর্তের অন্ধকার জীবনে এই প্রথম যেন কেউ একরাশ আলো ঢেলে দিল।

তার জুড়ে দেবার পর দেবকীদিকে বলি—সব আলোগুলো জেলে দেখে নিতে। দেবকীদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, অনায়াসে হাত বাড়িয়ে বারান্দার স্যুইচটা টিপে দিতে পারত। কিন্তু সে বলে—"দাঁড়াও, সবচেয়ে আগে ওর ঘরে আলো জ্বালি।" বলে একটি ঘরের দরজা দেবকীদি এমনভাবে খোলে যেন কোনও মন্দিরের দরজা খুলছে। যেন আলো নয়, এক

সাজি ফুল নিয়ে মন্দিরে উৎসর্গ করে তারপর সব ঘরে-বারান্দায় প্রসাদীফুল ছড়িয়ে দিতে থাকে। আমি সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। এক সবুজ গালিচা মোড়া ঘর, এক কোণে হলুদ রঙের ডিভান, যেন সবুজ ঘাসের উপর হলুদ ফুলের বেড। একদিকে লম্বা লম্বা তিনটে হাল্কা সবুজ রঙের চেয়ার, পিঠটা এত লম্বা যে দেখলে মনে হয় তিনটে সরু সরু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মাঝে একটি ছোট টেবিল তার ওপর একটি ফটো—কোনো পুরুষ মানুষের। আলো জ্বালতেই ঘরে যেন দুধের বান ডাকল। কী অদ্ভুত! মন্দিরের পবিত্রতা আর বাগানের সজীবতাকে এক সঙ্গে দেবকীদি কেমন করে একটা ঘরে বেঁধে ফেলেছে। দেবকীদির ঘরের চৌকাঠে পা দিলে আমার কেমন যেন মন্দিরের চৌকাঠে পা দেওয়ার অনুভূতি হতো। মনে হতো, আমার হাত-পা বড় নোংরা, আগে ধুয়ে তবে ভেতরে যেতে হবে। সে পবিত্রতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, যেন যুগযুগান্তের মূর্তির মতো, পুরনো আবার নিত্যপুজোর মতো নতুন।

দেবকীদির সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা বেশ কিছুদিন পর। তার এক প্রতিবেশী বাড়ির পিছনে একটা ঘর তুলছে। অফিস থেকে আমায় পাঠানো হলো দেবকীদির বাড়ির লাইট পোস্টটা তুলে অন্য জায়গায় পুঁততে—না হলে প্রতিবেশীর ঘরের ওপর দিয়ে তার যাওয়া নাকি বেআইনি। দেবকীদি বলল—"আচ্ছা ভাই, যেখানে সুবিধা হয় পুঁতে নাও।" বাইরের দেওয়ালে গর্ত করতে গেলে দেবকীদি বলে—"ভাই, ঘরের ভেতরেও গর্ত হবে না তো?"

—"হ্যাঁ তা তো হতেই পারে. কারণ আপনার দেওয়ালও ন'ইঞ্চি আর আমাদের বিজলি বোর্ডও ন'ইঞ্চি।"

—"কিন্তু ঘরের দেওয়াল খারাপ হয়ে যাবে যে, চার জায়গায় চারটে দাগ হবে।"

—"চুনকাম করিয়ে নেবেন"

—"কিন্তু এ ঘর তো আমি ডিস্‌টেম্পার করিয়েছি।

আবার করানো তো অনেক টাকার ব্যাপার।"

সেই ঘর, যে ঘরকে আমি ভেবেছি—মন্দির।

আমি চিন্তায় পড়ি। আমার সাথী বলে—

"সামান্য পলেস্তরা ঝরবে দিদি। এক কাজ করবেন, একটা ক্যালেণ্ডার টাঙিয়ে দেবেন, ব্যস আর বোঝা যাবে না। সবাই তো তাই করে।"

দেবকীদি কেমন যেন হাসে—"লোকে যেমন মনের পাপ ঢাকার জন্য ধর্মের ক্যালেণ্ডার বা সমাজ-সেবার ক্যালেণ্ডার টাঙায় সেরকম ?"

আমার খুব খারাপ লাগে, ছেনি হাতুড়ি তুলে নিয়ে বলি, "আচ্ছা. চেষ্টা করব যেন দেওয়ালের এদিকে কিছু না হয়। তবুও কিছু বলা তো যায় না, আপনি এদিকে বরং একটা কাপড় বিছিয়ে দিন. যদি পলেস্তরা ছাড়ে তো জিনিস যেন খারাপ না হয়।"

—"না ভাই, তোমার মনে যদি একটুকুও শঙ্কা থাকে তবে দেখো ঠিক কিছু হবেই।"

আমি কিছু না বলে চুপ করে চেয়ে থাকি। দেবকীদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে,—"জান, বিশ্বাসে যদি একবার একটুও চিড় খায় সে চিড় একেবারে ফাটল হয়ে যায়। বিশ্বাস যে বড় অদ্ভুত জিনিস ভাই।" আমি একবার দেবকীদির মুখের দিকে চাই একবার হাতুড়ির দিকে। তার পর হাত দিয়ে নয়, বিশ্বাস দিয়ে হাতুড়িটাকে আঁকড়ে ধরি। ভাবলে অবাক হয়ে যাই যে কেমন করে আমার হাতুড়ি দেওয়ালে সাত ইঞ্চি গর্ত করে ওপিঠে একটুও চিহ্ন না রেখে, আট ইঞ্চি লম্বা লোহার শিক একটু মুড়ে সাত ইঞ্চি গর্তের মধ্যে পুঁতে দিই। দেবকীদি খুশি হয়ে বলে—"বলিনি এই বিশ্বাস বড় অদ্ভুত জিনিস ? একে যদি একটুও ছুট দাও তো এক চিমটি পলেস্তরা নয় বিশ্বাসের পুরো চাঙড়ই ভেঙে পড়বে।" কদিন ধরে সব ভুলে বিশ্বাসের ফিলজফি নিয়ে মশগুল হয়ে থাকি। কথাটা মনে ধরেছে।

দেবকীদির সঙ্গে তৃতীয়বার দেখা আরও কিছুদিন পর—ভাড়া বাড়ির খোঁজে। আমার মায়ের চিঠি পেয়েছি, মা আর গাঁয়ে তার বড়ছেলের কাছে থাকতে রাজি নয়, আমার কাছে শহরে আসতে চায়। আমরা দুই বন্ধু একটা ছোট ঘর নিয়ে থাকি। সেখানে মাকে রাখা যায় না। আরও একটা ঘর অন্তত ভাড়া নিতে হবে। ঘরের ঠিকানায় আবারও যেতে হল দেবকীদির কাছে। দেবকীদি একটু ভেবে বলে—"এক কাজ করা যাক্, আমি পিছনের ঘরটা তোমায় দিয়েই দিই, পুরো বাড়িটির জন্যে অনেক ভাড়া। এতে আমারও একটু সুরাহা হবে।"—"কিন্তু দেবকীদি, উনি এলে ?"

—"উনি এখানে নেই, বাইরে গেছেন।" আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত না ভেবে চুপ করে যাই। তারপর একমাসের ভাড়া দেবকীদির সামনে রেখে

চলে আসি। তিনদিন পর মা এলে জিনিসপত্র নিয়ে সেই পিছনের ঘরটিতে গিয়ে উঠি।

একটা বিশ্বাস মানুষকে কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে তা ওকে না দেখলে বোঝা যায় না। দেবকীদি রান্না করে রোজ রাতে এমনভাবে খাবার নিয়ে বসে থাকত যেন এখ্খুনি কেউ এসে খেতে বসবে। খাবার আগলে কত রাত অবধি বসে থেকে সেই খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে সকালের ঠাণ্ডা-খাবার নিজে খেয়ে শুয়ে পড়ত। দেবকীদির এইভাবে প্রতীক্ষা করে যাওয়া দেখে একদিন থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করি—"আচ্ছা উনি কি তোমাকে বলে যাননি যে কবে আসবেন?" —"না কালও যখন আসেনি আজ নিশ্চয়ই আসবে।" কী দৃঢ় বিশ্বাস—কী অটুট বিশ্বাস—দিনের পর দিন এই প্রতীক্ষা আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কিছুদিন পর বোধ হয় আর্থিক অনটন শুরু হয় দেবকীদির, তাই স্কুলে চাকরি নিতে হয়। স্কুলে যাবার সময় প্রতিদিন একটি চিঠি তালায় গুঁজে দিয়ে যায়—ও কটায় যাচ্ছে আর কটায় আসবে সেকথা লিখে আর ঐদিনের তারিখ দিয়ে। একদিন অধীর হয়ে আমি দেবকীদিকে জিজ্ঞেস করি ব্যাপারটা কি? সে বলে—"দেখো ভাই ও এমন করে বহুবার আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আবার ফিরে ফিরে এসেছে। সে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না।"

—"তার মানে? উনি বেশ কয়েকবার চলে গেছেন?"

—"হ্যাঁ প্রথমবার তো একমাস পরেই ফিরে এল, তার পরের বার কিছুদিন পর তার পর…"

—"কোথায় যান? কোনও ঠিকানা জান না?"

—"না। শুধু এটুকু জানি ওর মনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কি যেন হয়।"

—"অন্য কোনোও ব্যাপার মানে অন্য কেউ?"

—"পাগল? আমি ছাড়া আর কেউ ওকে জানবে কি করে? বুঝবে কি করে যে ওর কি চাই?"

—"বেশ, কিন্তু তুমি ওকে কোনদিন কিছু বলনি কেন?"

—"হ্যাঁ, বলেছি, কি বলেছি জান? বলেছি—তুমি আমাকে ছেড়ে যতবার যেতে চাও যেও, কিন্তু তার চেয়ে অন্তত: একবার বেশী ফিরে এসো।"

দেবকীদি হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে, বোধ হয় ব্যথা হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

আজকাল বুঝি কষ্ট হয় প্রায়ই। তুলোর সেঁক নিলে কমে যায়। একটু থেমে আবার বলে—

—"মানে আমি বলেছি যদি দশবার যাও এগারবার ফিরে এসো, পঞ্চাশবার গেলে একান্নবার। আমার ভালবাসাকে এক নম্বরে জিতিয়ে দিও। ছেড়ে যাওয়ার বিচ্ছেদ যেন এক নম্বর কম পায়।"

—"এ কিরকম গোলমেলে অঙ্ক দেবকীদি? এ অঙ্কের মানে কি? এ তোমার কেমন অদ্ভুত বিশ্বাস? এ বিশ্বাস কখনোও ভেঙে যায় না?"

—"ভাঙে কিন্তু আবার জোড়া দিয়ে দিই। ঐ যে বললাম, পঞ্চাশবার ভাঙলে একান্নবার জোড়ে। এক নম্বরে বিশ্বাসকে জিততেই হবে যে ভাই।" দেবকীদির নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাকে বলি তুলোর সেঁক দিয়ে দিতে। বুকে ব্যথার জন্য দুই-এক দিন পরপরই স্কুল কামাই হত দেবকীদির। কিন্তু সেই মন্দিরের মত ঘরটিকে রোদ ঝকঝকে পবিত্র করে রাখা রান্না করে থালা সাজিয়ে অপেক্ষা করা আর মাঝ রাতে বাসি খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ায় কোনও কামাই ছিল না। শরীর যতই ক্লান্ত হোক, ফুসফুস যতই পচে যাক, দেবকীদির বিশ্বাস আগের মতই তরতাজা সবুজ। ভাই নিতে এসেছিল, দেবকীদি যায়নি কারণ, সে আসবে—আসবেই।

ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে কিন্তু দেবকীদির ফুসফুস জানে, শেষ হবার আগে সেই এক নম্বরের গোলমেলে অঙ্কটা তাকে মেলাতেই হবে—তাই নিজেকে নিজে বয়ে চলেছে। অবিশ্বাস পঞ্চাশ তো বিশ্বাস একান্নবার—এক নম্বরে জিততেই হবে। একদিন শ্বাস ওঠে। দেবকীদি হাত থেকে চুড়ি, গলা থেকে হার খুলে আমাকে দেয়। বালিশের নীচে থেকে একতাড়া নোট বের করে বলে—"একটা কথা রাখবে ভাই?" —"নিশ্চয়ই রাখব।"

"তুমি এখন অনেক বেশী মাইনে পাও, প্রোমোশন হয়েছে। আমার মৃত্যুর পরও এ বাড়ি ছেড়ো না। আমার ঘরে তুমি থেকো আর ওর ঘরটা যেমন আছে তেমনি রেখে দিও। এ টাকায় তোমার বছর দুই-এর ভাড়া হয়ে যাবে। ও কবে আসবে তা তো জানি না—হয়তো বা আজই আসতে পারে"-এবার জোরে শ্বাস টানে দেবকীদি, হেঁচকি উঠতে থাকে। নাড়ী খুব ধীরে ধীরে চলছে।

হঠাৎ কেউ যেন দ্রুত পায়ে এসে, দরজা হাট করে খুলে দেয়। ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত থমকে থেমে যায় তারপর দৌড়ে গিয়ে দেবকীদির চারপাইয়ের

ওপর বসে পড়ে তার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নেয়। দেবকীদি চোখ খোলে—দুচোখে ফিরে পাওয়ার আলো জ্বলে ওঠে—দেবকীদি ঠোঁট খোলে, দু-ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ভরে যায়। এক শরীর তার কম্পনে আর স্পর্শে বলে ওঠে—"আমি এসেছি"। আরেক বিশ্বাস আর দৃঢ়তায় জবাব দেয়—"আমি জানতাম তুমি আসবে"।

তার জীবন চলে যেতে গিয়েও মৃত্যুর হাত ছাড়িয়ে নেয় এক মুহূর্তের জন্য—থমকে থেমে গিয়ে অঙ্কটা মিলিয়ে দিয়ে যায়। এক নম্বরের জন্য হারিয়ে দিয়ে যায় মৃত্যুকে। শুধু এক নম্বরের জন্য বিশ্বাস আরেকবার জেতে।

দেবকীদের টাকায় ওর প্রেমিকের বহু চিকিৎসা করিয়েছিলাম—কিন্তু বাঁচাতে পারিনি। সে হয়তো জানত, দেবকীদি যেখানেই থাক, মন্দিরের মত ঘর সাজিয়ে খাবার সাজিয়ে আবার প্রতীক্ষা করে চলেছে। পবিত্রতা বড় ছোঁয়াচে অসুখ। আমারও আজকাল এই অসুখ ধরেছে, আমি রোজ সেই মন্দিরকে ঝেড়ে মুছে পবিত্র করে বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখি। সারা জীবন কতবার আমার কত বিশ্বাস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে, আবার তাকে জুড়ে দিয়েছি কারণ দেবকীদির সেই 'এক নম্বর" আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্বাসের ঘরটিকে পাহারা দিয়েছে বারবার। অবিশ্বাস যদি পঞ্চাশবার হয় বিশ্বাস অবশ্য একান্নবার—ব্যস শুধু এক নম্বরের তফাৎ।

অনুবাদ—মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখবন্ধের খেলা

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

আশ্বিনের মাঝামাঝি। ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও ক'দিন বাকি। বিকেল ফুরোতে সুরু করেছে। নিখিল বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। রেলের অফিস থেকে রিটায়ার করার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাঁর দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের স্ট্রোকে বেশী কাবু হয়ে পড়েছেন। প্রথমবারে ঘরের বাইরে বেরুনোর খানিকটা স্বাধীনতা তাঁর ছিল, কিন্তু এবারের ধাক্কায় ঘরের ভেতরে থিতু হয়ে বসেছেন। চলাফেরা নামে মাত্র। হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে হয়। দুই মেয়ে-জামাইকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ওরা এসেছে। বিয়ের পর থেকে পুজোর সময় দুই মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনীদের কখনো একসঙ্গে কাছে পাননি নিখিল। এবার পেয়েছেন অসুখে পড়ে। বেহালায় বড় জামাই সুশান্তর এক্সপোর্টের ব্যবসা। ভাল-পয়সা করেছে। এক ছেলে এক মেয়ে। বেশ ছিমছাম সাজানো গোছানো সংসার। জয়াকে সুখে রেখেছে। ছোট মেয়ে লতার অভাবের সংসার। জামাই অখিল তারাতলায় একটা প্রাইভেট কনসার্নে হিসেবপত্তর দেখাশোনা করে। সামান্য আয়। দুই মেয়ে, বৌ, বিধবা মা, বেকার ভাই, আইবুড়ো বোন নিয়ে সংসার। খুব বুঝেশুনে চালাতে হয়।

পাশের ফাঁকা প্লট থেকে হৈ-হল্লোড় ভেসে এল। নিখিল ঘাড় ফেরান। নাতি-নাতনীরা কুমীর-কুমীর খেলছে। এবাড়ি-সেবাড়ির দু'চারজন কচি-কাঁচাও জুটেছে ওদের সঙ্গে। আশেপাশে সব জায়গায় বাড়ি উঠে গেছে। ঘাসে ঢাকা এই একফালি জমি ফাঁকা পড়ে আছে। এখানে ছোটরা সকালে কি বিকেলে নিয়মিত খেলে। ষ্টেশন থেকে অনেকটা ভেতরের দিকে হলেও এ এলাকায় ফাঁকা জায়গা খুব কমই পড়ে আছে। এখন আর সেদিন নেই। খানাডোবা ভরাট করে বাড়ি তুলছে লোকে। এ পাড়ার বেশীর ভাগ বাসিন্দাই কলকাতার। বিষনগর থেকে খানিকটা তফাতে সরে এসে একটু সবুজের ছোঁয়া. একটু নিরিবিলি কে না চায়? কিন্তু এখানেও সে বিষের

জ্বালা! শোনা যাচ্ছে, কাছেই লাটদের বাগানে একটা কাগজকল বসছে। ওটা চালু হলে ঘরে তিষ্ঠানো যাবে কিনা কে জানে। না, ভেবে লাভ নেই। সবই সয়ে যায় সময়ে। মানুষের শরীর বলে কথা। নিখিল ছোট করে শ্বাস ফেলেন। কচিকাঁচাদের হৈ হৈ ছাপিয়ে সামনের নেবুগাছের ডালে-বসা একঝাঁক ছাতারে পাখীর ক্যাচম্যাচ কানে আসছে। ভারী বেসুরো গলা ওদের। শালিক কি চড়ুইয়ের ওপর দিয়ে যায়। লাটবাগান ছাড়িয়ে তাল-সুপুরির মাথায় বিকেলের রং ক্রমে গাঢ় হচ্ছে। তারপর ফিকে হতে থাকবে যত ফিকে হবে তত গাঢ় হবে ঘরে ফেরা পাখির ডাক।

নিখিল চেয়ারের হাতলে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে হাতের তেলোয় থুতনি রাখলেন। দেখতে দেখতে এদিকটায় কত বাড়ি উঠে গেছে। বছর পনেরো আগে ভবানীপুরের বাসাভাড়া ছেড়ে চলে আসার কথা উঠতেই কল্যাণী এমন অসহায় চোখে তাকিয়েছিল, যেন ওকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হচ্ছে। ও নেই। পাঁচ বছর আগে চলে গেছে। ওর নেফ্রাইটিস হয়েছিল। ও থাকলে দেখত, বনবাদাড় সাফ হয়ে কেমন জমজমাট পল্লীর চেহারা ফিরেছে এখানটা।

ওপাশের ঘর থেকে দুধের বাচ্চার গলাফাটানো চীৎকার ভেসে এল। অজয়ের বাচ্চাটা কাঁদছে। অজয় ভয়া, লতার ছোট। রিষড়ায় একটা বেসরকারী কেমিক্যাল কোম্পানীর সুপারভাইজার। নিখিল ভুরু কোঁচকালেন। বৌমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওভাবে বাচ্চাকে ধমকে-ধামকে মেরেধরে দুধ খাওয়াতে আছে! অজয়ের বড় ছেলে রঞ্জুর বেলায় কোনো ঝক্কি পোহাতে হয় নি। কল্যাণী সামলে দিয়েছে। ও বেঁচে থাকলে দেখিয়ে দিত বাচ্চাকে কি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়। নিখিল মনে মনে হাসেন, যে হাসি এই সং সাজা সংসারটাকে উদোম করে দেখার ব্যাপারে বড় নির্মম! অজয়, বৌমা যতই লুকোছাপা করুক, নিখিলের নজর এড়ায় নি। দু'বার স্ট্রোক হবার পর একটা বুড়ো হাবড়ার আয়ু কত দিনের—তার আনুমানিক হিসেব ধরে নিয়ে ওরা দুটিতে মিলে যে যত্নআত্তি দেখাশোনা নিক্তিতে মেপে সুদিনের আশায় আছে কবে এই বাড়িঘর, জমিজমা, ব্যাঙ্কের জমানো টাকা ভোগদখল করবে— সে গুড়ে বালি। নিখিল সলিসিটারের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ পাকা করে রেখেছেন। মেয়েদের বঞ্চিত করেন নি। বেতের চেয়ারের হাতলে দু'কনুইয়ের ভর রেখে সোজা

হলেন তিনি। চোখ সরু করে তাকালেন। ছেলেমানুষের মতি ক্ষণে ক্ষণে পালটায়। এই তো খানিক আগে ওরা কুমীর কুমীর খেলছিল। এখন সসার ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। বেশ লাগে দেখতে। লালরঙের সিনথেটিক চাকতি বাতাসে ভাসতে ভাসতে ওড়ে। যেন ডানা মেলে দেয়। দেখ কাণ্ড! উড়ন্ত সসার ধরতে গিয়ে জয়ার মেয়ে তিন্নি পা পিছলে পড়ে গেছে। সাবাস! এই তো চাই। একফোঁটা কান্নাকাটি নেই। ঝটপট উঠে পড়ে ফ্রকের ধুলো ঝাড়তে লেগে গেছে তিন্নি। ওর চোখমুখের গড়ন চোখে পড়ার মত। বাপের ধাত পেয়েছে। তবে পড়াশোনায় ভাল নয় মোটেই। বইয়ের সঙ্গে আড়ি পাতাতে ওস্তাদ। কিন্তু নতুন কিছু ভাবাটাবার বেলায় ওর মাথা খোলে। ভারী একটা মজার খেলা বার করেছে। নিখিল এর নাম দিয়েছেন চোখবন্ধের খেলা। ক'দিন ধরে এ খেলা চলছে ঠিক সন্ধ্যের মুখটায়। সামনের ফাঁকা জমি থেকে খেলাধুলা সেরে নাতি-নাতনীরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে-বসা দাদুর কাছে আসবে। ওদের মধ্যে একজন কেউ পেছন দিক থেকে দাদুর চোখ টিপে ধরবে। চোখবন্দী আঙুল ছুঁয়ে দাদুকে বলতে হবে সে কে। প্রথম দুদিন পাশ মার্ক পান নি নিখিল। একটা কি দুটো বাদে সবকটা উত্তরই বেঠিক হয়েছে। দাদুর মুখ থেকে ভুল নাম শুনে লালটু, তিন্নি, রন্টু, পিঙ্কি, লুনা 'যখন হল না, হল না'—বলে হো হো করে হেসে উঠেছিল, তখন লতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধমকেছিল, এই তোরা কি আরম্ভ করেছিস বল তো? আর বুঝি খেলা নেই? একটা অসুস্থ মানুষ, তার কানের কাছে অমন চীৎকার করতে আছে!' নিখিল হা হা করে উঠেছেন। বলেছেন, 'আমি ওদের কাছে বেশ আছি। তুই তোর কাজ করগে যা।' লতা কচিকাচাদের মুখের ওপর তীব্র চোখের ভ্রূকুটি হেনে ঘরে চলে গেছিল। তৃতীয় দিন পাশ মার্ক পেয়েছেন নিখিল। এবার আর আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া নয়। চোখের ওপর কচিহাতের নরম, উষ্ণ চাপের কম-বেশী হিসেব করে নাম বলেছেন। যেমন—লতার ছোট মেয়ে পিঙ্কির হাতের টিপুনিতে বেশ চাপ পড়ে চোখের মণিতে। আবার জয়ার ছেলে লালটুর হাতের টিপুনি তুলনায় অনেক আলগা। চোখবন্ধের খেলা খেলতে খেলতে আফসোস করেছেন নিখিল। ভাটির টানে ইন্দ্রিয়গুলোর ধার কত দ্রুত ক্ষয়ে যাছে—চোখ, কান, নাক, জিভ, চামড়া, সবকিছুর। যৌবনবেলা থাকলে একবার চেষ্টা করে দেখতেন বন্ধ চোখের

ওপর কচি নরম আঙুলগুলোর ডেলি ও মসৃণতার সূক্ষ্মতর ভেদ আর রক্ত-মাংসের উষ্ণতার তারতম্য পরোখ করে সবকটা উত্তর সঠিক দিতে পারেন কিনা। 'বাবা, এই নাও, জয়া সাদা ধবধবে পোরসিলিনের প্লেট এগিয়ে দেয়। প্লেট ভোকলা—ছাড়ানো আপেলের টুকরো। নিখিল ঘাড় ফেরান। জয়াকে নিয়ে খুব ভাবনা ছিল। রঙ ময়লা। একহারা গড়ন। পার করতে গিয়ে ভুগতে হবে। কিন্তু কপালগুণে ও ভাল ছেলের হাতেই পড়েছে। সুশান্ত যেমন রোজগেরে, তেমনি নম্র, বিনয়ী। জয়াকে এখন বেশ লাগছে দেখতে। শরীর ভরে উঠলে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় ময়লা রঙ অনেকটা কেটে যায়। 'কৈ-ধর, উনুনে দুধের কড়া চাপিয়ে এসেছি,' প্লেটটা নিখিলের হাতের কাছে আরও এগিয়ে আনে জয়া। নিখিল হাত সরিয়ে নেন, 'এখন নিয়ে যা, এই তো খানিক আগে হরলিকস খেলাম।' তার গলায় বিরক্তি গোপন থাকে না।

'না, তোমাকে খেতে হবে। ডাক্তারকাকু কি বলেছে শুনেছ তো, ঘড়ি ধরে ওষুধ—পথ্য খাওয়ানো চাই।'

'ডাক্তাররা অমন অনেক কথাই বলে। সারাদিন ঐ ফর্দ মিলিয়ে কত আর খাওয়া যায়।'

'দেখ বাবা, অবুঝের মত কথা বোলো না। তোমার শরীরের যা অবস্থা. ডাক্তারকাকুর কথা না শুনলে চলবে কেন,' ধমক দেয় জয়া।

হাল্কা গলায় নিখিল বলেন, 'এত চিন্তা করছিস কেন ? এখন তো দিব্যি আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, পুরোপুরি রেস্টে আছি। কোনো কষ্ট নেই।'

'না, ওসব কথায় ভুলছি না। খেতে তোমাকে হবেই।'

'দে তবে খাই। তোর পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন কি আর না খাইয়ে ছাড়বি,' নিখিল জয়ার হাত থেকে প্লেট তুলে নেন।

'এই তো লক্ষ্মীছেলের মত কথা,' জয়ার মুখে হাসি ফোটে।

'হ্যাঁরে, সুশান্ত কখন ফিরবে বলে গেছে ?'

'বলেছে তো সন্ধ্যের আগেই ফিরবে। কিন্তু মাছ ধরার যা নেশা! ফিরতে কত রাত হয় দেখ।' জয়া রান্নাঘরে চলে যায়।

নিখিল আপেলের টুকরো বাঁধানো দাঁতে কাটতে থাকেন। বড় জামাইয়ের খুব মাছ ধরার বাই। এখানে এলে কোথাও না কোথাও ছিপ ফেলতে চলে যায়। অসুবিধে কিছু নেই। ওর মতই আর একজন নেংড়ে আছে

ও পাড়ায়। সে নম্বর জ্যাঠামশাই হবেন মিস্তির। বিয়ে-থা করেন নি। ঝাড়া হাত-পা। এখন রিটায়ার করার পর সর্বক্ষণ মেছো নেশায় মজে আছেন। মিস্তিরমশাই সুশান্তকে মাছ ধরার সরঞ্জাম, এমন কি যেখানে মাছ ধরতে যাওয়া হবে, সেখানে যাওয়ার একটা সাইকেলেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওরা যাবে বীজপুরের তালপুকুরে ছিপ ফেলতে। বীজপুর এখান থেকে পাক্কা দশ মাইলের রাস্তা। নেশার স্যাঙাতদের জন্যে লোকে কি না করে! সুশান্ত থাকলে ভাল হত। খোশগল্পে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু ছোট জামাই অনিল অন্য ধরনের। কথাটথা খুবই কম বলে। বড় কাঠখোট্টা। হয়ত অভাবের সংসারে দায়-দায়িত্ব বেশী থাকায় এমন গোমড়া মুখ করে থাকে। ওর ছুটিছাটা পাওনা নেই। তাই থাকতে পারে নি। অষ্টমীর দিন আসবে বলেছে। সুশান্তরও থাকার কথা নয়। ওর ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। দেখাশোনার লোকজন থাকলেও নিজে না দেখলে চলে! কিন্তু মাছধরার নেশায় আটকা পড়ে আছে। শূন্য প্লেটটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ঢেকুর তোলেন নিখিল। কচিকাঁচাদের হাঁকডাক হুল্লোড়ে সারা বাড়ি গমগম করছে। অথচ ক'দিন আগে এ বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করছিল। বাড়িতে যে একটা ছেলেমানুষ আছে, বোঝাই যেত না। বোঝার কথা নয়! সুজয়ের বড় ছেলে রঞ্জুটা বড় রোগাভোগা; নির্জীব। একটা না একটা রোগ লেগেই আছে ওর। এই কচি বয়েস, এখনই হাড্ডিসার, ফর্সা হাতে নীলচে শিরা ফুটে বেরুচ্ছে। এত প্রোটিন, ভিটামিন, টনিক কোথায় যে যায়! তবে পড়াশোনায় ওর মাথা সাফ। ফি বছর প্রথম হয় পরীক্ষায়। কিন্তু তাতে লাভটা কি? ক্লাস ফাইভে পড়ে, এখনই হাই পাওয়ারের চশমা উঠেছে চোখে। সারাটা জীবন তো পড়েই আছে। খেলাধুলার জগতছাড়া এসব পড়ুয়া ছেলেদের দিয়ে কি হবে! ঐ যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। ওদের মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হুড়োহুড়ি করতে পারে না? যে বয়সের যা—তাই তো করতে হবে। এজন্যে বৌমাই দায়ী। ছেলেকে বইয়ের পোকা বানাতে চায়, মানুষ নয়।

উঁচু আকাশ দিয়ে জেট প্লেন যাচ্ছে নিঃশব্দে। নীল আকাশের বুকে সাদাটে ধোঁয়ার রেখা টানতে টানতে। নিখিল মাথা তুলে তাকিয়ে আছেন। নাতি-নাতনীরাও খেলা বন্ধ করে মাথা তুলে আছে। প্লেনটা দেখা যাচ্ছে না। বুড়ো বয়সে অত দূরে নজর পৌঁছবে না। তবে ওটা যে ক্রমে আরও

উঁচুতে উঠে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে ধোঁয়াটে রেখার গতিপথ দেখে। নিখিল আপন মনে হাসেন। যদিও কচিকাঁচাগুলো জেট প্লেন আগে দেখেছে, তবু এই এঁকেবেঁকে চলা সাদা রেখা ধরে অনেকক্ষণ চোখ ছোটানো যায়, ক্লান্তি লাগে না। এ এক ভারী মজার খেলা। ছোটদের মন কাড়ার মত। শুধু ওদের বোন, বড়দের মনও। লালটু ধোঁয়ার রেখা বরাবর আঙুল তুলে কি যেন বলছে। তাই শুনে বাকি সবাই হাসছে। নিখিল পলক ফেলতে ভুলে যান। নীল শূন্যে আঁকা ঢেউ খেলানো সাদা রেখা বাতাসে আঙুলে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। নাতি-নাতনীরা আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে নিয়েছে। ওদের হাতে হাতে ফের লাল চাকতি উড়ছে। নিখিল চোখ নামাচ্ছেন না। একভাবে তাকিয়ে আছেন। পেঁজা তুলোর আঁশের মত ধোঁয়ার রেখা কিভাবে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়ছে দেখছেন। দেখতে দেখতে তাঁর মনে পড়ল বালক বয়সে প্রথম প্লেন দেখার কথা। মেয়েটির নাম মনে নেই, শুধু তার রোগাটে ছিপছিপে ধরণের একটা আবছা অবয়ব স্মৃতিতে ধরা আছে। সেই খেলার সাথীর সঙ্গে ওপার বাংলার সাতমুড়া গাঁয়ের কিনারে সরু জলের রেখার মত এঁকেবেঁকে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে, সে নদী পেরিয়ে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে আলের রাস্তা ধরে কোথায় যে যাবার ছিল, মনে নেই তাঁর। শুধু মনে আছে, দিগন্তছোঁয়া ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্লেনের গমগম শব্দে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ায় মৃত্যুভয়ে দু'জনে দু'জনকে কিভাবে আঁকড়ে ধরে পাথর বনে গেছিল। প্লেনের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও দু'জনের একাকার বুক-ধড়ফড় শ্বাস থিতিয়ে আসতে সময় লেগেছিল। রুদ্ধ-নিশ্বাসে নেশা সেই প্রথম প্লেন দেখা নিখিলের। বাঁ কপালের পাশে শিরাটা দপদপ করছে। আঙুল দিয়ে সেখানটা টিপে ধরলেন তিনি। যাবার বেলায় এত বেশী করে মনে পড়ছে কেন সেই নামহীনা খেলার সাথীটিকে? হয়ত সে বেঁচে নেই। তাই মরণ-খেলা খেলতে ডাকছে। কত চেষ্টা করেছেন তিনি তার মুখ মনে করার, সময়কীটের উদর চিরে তার রক্তমাংসের শরীর বার করার; কিন্তু প্রতিবারই কৃপণ স্মৃতি তাঁকে শূন্য হাতে ফিরিয়েছে। ঐ কচি বয়সের কত ঘটনা ধুয়েমুছে গেছে। কিন্তু দেশগাঁয়ের বাড়ির পেছনে পুকুরধারে মেয়েটির সঙ্গে গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোলার কথা তো মনে আছে—সেই যে দোলায় চেপে মেয়েটির হাতের ঠেলায় আকাশের দিকে একবার পা তুলে, আর একবার

ঘাসের দিকে পা নামিয়ে দুলতে দুলতে পুকুরের জলে গাছের ছায়া, মেঘের ছায়া, নীলাভ রোদের উথালপাথাল দেখতে দেখতে খুশীর শিহরণ রোমকূপ বেয়ে কোমন রক্তে মিশে যেত! বড় করে শ্বাস টানতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল নিখিলের। আর বেশী দিন নেই। পাততাড়ি গুটোনোর সময় হয়ে এল—এই ভয় এখন মাঝেমধ্যেই চোখের আলো নিভিয়ে বুকের ধড়ফড়ানি দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। তখন নিখিল হাতের কাছে যা পান—দেয়াল, টেবিলের কোনা, দরজার পাল্লা, বারান্দার গ্রিল—তাই ধরে সামলান। তারপর থেকে অন্ধকার সরে গেলে, বুক ধড়ফড়ানি থিতিয়ে এলে তিনি ঘাসের ওপর উড়ন্ত প্রজাপতি দেখতে দেখতে, গাছের পাতার ঝুরঝুর শুনতে শুনতে, না হয় তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে চান। এই ভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার সময় কেন জানি ক'দিন ধরে যার নাম মনে নেই, অথচ যার সুর করে গলা চড়ানোর শব্দ 'এলাডিন বেলাডিন সইলো' মনে আছে, যার মুখ মনে নেই, অথচ যার ফুলের তেলের গন্ধ, না ঠিক গন্ধ নয়, যেন গন্ধের একটা ঝাপসা—সুদূর মায়া মনে আছে—সেই নাম হীনা মনের ভেতরটাকে এলো করে দিচ্ছে। কত বার স্বপ্নে দেখা দিয়েছে সে। কথা কয়েছে। হেসেছে। মেলার মাঠে, কি যাত্রার মাঠে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে। ভাঙা মন্দিরের পাঁচিলে গা ঢাকা দিয়ে 'টুকি' দিয়েছে। 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পারিস তাকে ছো' বলতে বলতে রুমাল-বাঁধা দু'চোখের মাঝখানে টোকা দিয়ে পালিয়েছে। ভারী অবাক হন নিখিল। যে মুখ চোখের আড়ালে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, সে মুখই চোখের আলোয় মিলিয়ে যায়। শুধু মনে থাকে তার হাসির ঝলক, তার অন্ধকারে সাগরের ফেনিল ঢেউয়ের যেমন ফসফরাস জ্বলে। ছেঁড়া স্বপ্নের টুকরোটোকরা জুড়ে সেই মুখের একটা আদল পাবার কত চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু কিছু ধরে রাখতে পারেন নি। হাতের মুঠো থেকে বালুর মত ঝরে গেছে রক্তমাংসের আকার। যা রয়েছে তা আয়তাকার অস্পষ্টতা—দেয়াল থেকে ফটো সরিয়ে নিলে যেমন দেখায়।

বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমের রাঙা মেঘ একটু একটু করে ফিকে হচ্ছে। বাইরে কচিকাঁচাদের হল্লা ছাপিয়ে ঘরে-ফেরা পাখির ডাক ঘন হচ্ছে। এখুনি ওরা বাইরে থেকে ছুটে আসবে হাঁপাতে হাঁপাতে। হুড়মুড় করে বারান্দায় উঠে আসবে লালটু, তিন্নি, রঞ্জু, পিঙ্কি, লুনা। দাদুকে ঘিরে

হৈ হৈ করে উঠবে। সুরু হবে চোখবন্ধের খেলা। নিখিল বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু বিকেলের রঙ এত দ্রুত বদলাচ্ছে কেন? ফিকে থেকে হাঠাৎ কেমন ধূসর হয়ে গেল। কোনোদিন তো এমন হয় না! হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন নিখিল। তাঁর চোখের সামনে বিকেলের রঙ-রেখা সব মুছে নিয়ে একটা অন্ধকারের পর্দা দুলতে থাকে। দুলতে দুলতে পর্দাটা বারান্দা পেরিয়ে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে মেটে রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে লাটবাগান, লাটবাগানের ধারে তাল-সুপুরির মাথা ডিঙিয়ে দিগন্তে গিয়ে ঠেকে। বুক-ধড়ফড় শ্বাসে জড়ানো অন্ধকারের পর্দাটাকে চোখ থেকে সরাবার জন্যে নিখিল হাত তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাত তাঁর বশে নেই। একটু কেঁপেই ঝুলে পড়ে। যেন বুকের দুপাশে বাঁধসংলগ্ন হয়ে থাকা ছাড়া ওদের আর কিছু করার নেই।

দাদু দাদু, দেখো দেখো—

নিখিল শোনা না শোনার রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে, যেন, শব্দগুলো কানে গুঞ্জন তুলতে এবার মাথা কাত হয়ে স্থির হয়ে যায় তখন।

সোয়েটার শিল্প

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কার দুঃখ বুনে চলেছে কাঁটা ও কুরুশ
কার দুঃখ ধরে রাখছে ওই সোয়েটার
সেকি ওই শিল্পী নারীর ?
যার পুরুষ মেরেছে তাকে লাথ
সেই লাথই খুঁজে দিয়েছে পথ…

ওগো দুঃখি মেয়ে
বোনো, তোমার দুঃখকে বোনো শিল্পীর মতোই
আর সেই শিল্প চলে যাক সুখের ঘরেই…
তবেই তোমার জুটবে রুটি
ছেঁড়াখোড়া রুটি
যে রুটির জন্য তুমি শিল্প উপাসক…

জ্বলন্ত অস্পষ্টতা

অজিত বসু

যা দেখা যায় না
তেমনি এক অন্ধকারে
দেখাকে পরখ করতে গিয়ে ত্যাখে—
বিন্দু বিন্দু জ্বলন্ত অসংখ্য অস্পষ্টতা
কি বলতে চাইছে !…

কান পেতে শুনতে পেল না
দিল বুক পেতে
অনুভূতির সমস্ত তন্ত্রীকে তীক্ষ্ণ সজাগ ক'রে
শূন্যের বিস্ময়ে গেল উদাসীন পা—

শব্দ পেরিয়ে, দেখা পেরিয়ে
স্থূল সূক্ষ্ম পেরিয়ে
রহস্যের একাকারে আকর্ষিত সর্বাঙ্গে—

বিপন্ন অশ্রুজলে ভেসে যায় দর্শনের উজ্জ্বল প্রবাহ !…

বয়ন

রূপা দাশগুপ্ত

বন্ধুদের শুভেচ্ছা নিয়ে সেরে উঠছি অতএব। জেগে উঠছি একটি ঘাসফুলের জন্য।

অতিবৃত্তের এককোণে সরে ছিলাম একফালি লয়ের পায়ে পায়ে। তার এপাশে ওপাশে ওপাশে ত্রিভুজ আলোর দাপাদাপি।

শীৎকার আর শুধুই শীৎকার। অথচ, কথাগুলিকে ক্ষেপণ যোজন যোজন স্বাভাবিকতার তাঁবুতে আগুন লাগাবার শত্রুতায়।

কেননা, এক ফোঁটা চোখ ঝরে পড়লেও পৃথিবীকে নড়তে চড়তে দেখিনি তেমন। পৃথিবী হাই তোলে মসৃণ পরোয়ানায়।

দুনিয়া বদলের ব্যাখ্যা আমাকে রোগা করতো দিনরাত। এবং আমি ছিঁড়ে ফেলতাম কেতাসর্বস্ব কুঁচিকাজ।

জন্মদিনের উপহার পড়ে থাকতো পরিত্যক্ত ঠিকানায়। আর, বন্ধুর ম্লানমুখ মনে করে অযত্নে ছড়িয়ে দিতাম নিজের পোশাক আশাকে।

নিজের পরিধান যা আমাকে মুগ্ধ করেনি কোনদিন। করেনি ক্লিষ্ট বা বিনত চলতি ঝোঁকের দিকে।

বরং, ঝোঁক বলতে বুঝেছি আমার অন্তর্মুখীনতা। আর, রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে গেছি স্বভাব মুর্ছনায়।

দু'পাশ দিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির খেলা। দু'পাশ দিয়ে করুণাপ্রার্থীর যাওয়া আসা।

খই কুড়ানো বা অনুদান কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীকেই দিতে পারে না নিরম্বু ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু। দিতে পারে না রক্তশূন্যতায় ক্ষীণ হতে হতে পাঁজরে আকাশ উচাটন।

অবশ্য আকাশের সংজ্ঞা কারো কারো নোটখাতায় এক দেওয়াল থেকে আরেক দেওয়ালে পৌঁছতে হাত কয়েকের ফারাক মাত্র। আর, এমন দেখতে দেখতে প্রয়োজন হয়েছে এই প্রহসনের।

নাট্য-উপশমের দীর্ঘতা দেখে সেরে উঠছি অতএব। সেরে উঠছি নিজস্ব মাত্রাবোধে, বন্ধুদের নিচুমুখে এবং একটি ঘাসফুলের জন্য।

দুঃখ-দুটি

বিজয় মাখাল

দুঃখ-দুটি সুতোয় বাঁধা
বৃষ্টিমাখা নিমের পাতায়
তোমার মুখে কিছুটা আঁকা
কিছু আমার বিষণ্ণতায়

দুঃখ-দুটি নিমের পাতা
এঁটো-ছায়ায় মেলছে ডানা
এক গোধূলি পায়ে মাড়ায়
তোমায় যেতে ওখানে মানা

রাত্রিমোড়া মেঘের বাড়ি
মেঘ জানো কি মৃত্যুমুঠি ?
আকাশে মুখ আর দেখি না
ঝুলছে ঝুলুক দুঃখ-দুটি !

চোলি কে পিছে

মুরারী ভট্টাচার্য

কী ভাবে কী ভীষণ ক্লান্ত পায়ে চলেছি সবাই
ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে শরীর ও মন।

চেনা লোকগুলি কোথায় কখন নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে
কেউ নদীর ধারে, গভীর জঙ্গলে
কেউ আস্তাকুঁড়ে, ভন্‌ভনে মাছির জঞ্জালে।
হঠাৎ অন্ধকার চিরে 'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়'
কানফাটা নয় চিৎকারে
আকাশ ও তার নিচে দাঁড়ানো এক দঙ্গল মানুষ
দ্যাখো, কেমন হতচকিত, বিহ্বল হয়ে পড়ছে,
তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে
তারা সকলে ঘরে ফিরে, সারা রাত
সদর দরজায় খিল এঁটে বসে আছে,
জানলা খুললে হু হু ঢুকে পড়ে দলা পাকানো হিমেল হাওয়া।

কারা যেন ঘুড়িতে বঁড়শি গেঁথে বিদেশি পাখি ধরছে
এসবের কী প্রয়োজন বুঝি না,
এখন দরজা খুললেই টের পাওয়া যায়
বিদেশি হাওয়ার গন্ধে ম ম করছে পুরো বাড়ি,
ঘরের মধ্যে বিছানা মশারি শিলিং কড়িকাঠ
লুকোচুরি খেলছে পরস্পর খুশিতে লুটোপুটি,
শুধু হাওয়া নয়; তার সাথে আরও অনেক কিছু
অন্দর মহলে ঢুকে পড়ছে হুটহাট।

ভিড়ের মধ্যে কে যেন অপুষ্ট বাসনায় হাত নেড়ে বলে উঠল
'থামুন মশাই, এসব এখন চলবে চলুক'।

মুক্ত বাজারে রঙ মেখে উড়ছে হরিয়াল সুখ,
কুব্জার পিঠে কথা কাঁপছে, শুকছে প্রভুর মুখ।

যখন সে পুরোটাই মানবিক

কৌশিক মিত্র

দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল নৌকোর গলুই-এ। জলের লাবণ্যের সঙ্গে মিশেছিল নীলকণ্ঠ মানুষের যন্ত্রণা। পরিসংখ্যানগুলো এলোমেলো করে দিয়ে, এক বালক সামনের বারান্দাটায় ছুটে এল। সম্ভবত ঐ বাদামওয়ালাকে ডাকবে বলে। ওকে যে কোনো রূপকথার দেশে নিয়ে যাবো, সে সামর্থ্য আমার নেই। ওর চোখের পাতায়, কীভাবেই বা আঁকতে পারি, ঘননীল আকাশ ছাপিয়ে ওঠা মায়াবী কাজল? ফুর্তিতে ডগ-মগ কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মনে মনে লজ্জাবোধ করেছি। ধানগাছের মাথায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি, একের পর এক প্রশ্নবিহ্বল অতিক্রান্ত দুপুরের অভিজ্ঞতা। আমার পরাজয় গ্যালিলিওর আত্মসমর্পণের মতো মানবিক মনে হয়েছিল।

অহল্যা কেন পাথর হয়ে গেলেন? সে প্রসঙ্গ থাক। শেষমেষ, কুকুর-ছানার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে বলে, আসরে অবতীর্ণ হলেন, এক বনেদী ব্রাহ্মণ। সকলেই সম্ভবত একমত হবেন। হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাটক্ষেতে যে কিশোরীকে ধর্ষণ করা হল, আমরা তার আত্মহত্যার জন্যে দায়ী।

আমাদের জন্যে কোনো উপদ্রবহীন শান্তিনিকেতন নেই। কালেভদ্রে বোটানিকাল গার্ডেনস বা চিড়িয়াখানা ঝুল-কালিমাখা ভুশুণ্ডি চেহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি থাকে আউট্রামঘাট থেকে গঙ্গার ধার বরাবর হেঁটে যাওয়া।

বাসের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীর সঙ্গে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেলে? ফাঁকে ফাঁকে কিছু মস্করাও যে হয় না, তা নয়। পর্বতের মুষিক প্রসব নিয়ে বিড়ম্বনার শেষ নেই। আর মান্টিস্টোরিড বিল্ডিং, গা গুলানো আবর্জনার স্তূপ, খইনি টেপা দারোয়ান কিংবা রাজনৈতিক নেতা? মহিলাটি ফুটপাতের ওপর বসে বসে পান চিবোচ্ছিলেন। আমি খেয়াল-ই করিনি। 'নর' শব্দের পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ আমি কোনোদিনই মুখস্থ বলতে পারিনি।

তবু এরই আনাচে-কানাচে। সম্ভাব্য সকালের আগে, আবীরে উশকো-খুশকো হয়ে ওঠা বসন্ত উৎসবে। হন্যে হয়ে কখনো আস্তানা খুঁজিনি কি? হেলায় হারাইনি কি টলোমলো দীঘির মতো যৌবন? কে জানে একাম্নটা পীঠই হয়তো আজ শ্যাওলায় ভরে গেছে। তুমিই হয়তো ঠিক, সময় মুছিয়া ফেলে সব।

কাকভেজা বৃষ্টির পর, একফালি রোদ্দুরের মতো যদি ফুঁসে ওঠা যেতো। দুপুরবেলা, উচ্চারিত ডাহুকের মতো। ধীরে ধীরে সংগঠিত হওয়া বরফ-টুকরোর মতো···কেউই জানে না, একজন মানুষ দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের দিকে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল ।

একদিন বাকি

কৃষ্ণা রায়

ছিলে শেষের কবিতায়
আনত মুখ, হৃদয় ভালবাসা ভার
বাতাসী ছন্দ আকাশী মেঘ
এলোমেলো করছিল রডোডেনড্রন ।
এবার পর্যটনে পাহাড়ী বাঁকে বুনো বিস্ময় ।
পরিচিত পাখির আদলে ঘুঘুর আনাগোনা ।
কুয়ুর কোলাহলে সরে যায়
প্রিয়মুখ প্রিয় অভিমান ।
কুয়াশা ঢেকেছে পথ
নিঃশব্দে উৎরাই ভেঙে ভেঙে চলেছে পর্যটক
শুরুর কবিতা শেষ হতে একদিন বাকি
কৃপণ চাহনী ফেরে করতলে—
ইউক্যালিপটাস গন্ধ মেখে ক্যামেলিয়া
রাডোডেনড্রন রঙ ।

সমুদ্ররথ

অরূপ পান্তী

আমার এ ছদ্মবেশী শরীরে দ্যাখো
নগ্ন হাড় শূন্যতা কঙ্কালরূপ
পৃথিবী-মান্দাসে ভেসে যাই জন্মজন্মান্তর
মান্দাসে কেউ জেগে থাকে
তাকে বলি 'ভালোবাসা'।
আমাদের নিরুপায় করুণ যাত্রাপথে
জাগতিক উত্থান পতন, সমুদ্রঝড়
মাথার ওপর শকুনের ঝাঁক,
নিচে কুমীরের দল, মৃত্যুদেবতা।

মান্দাস ভেসে চলে একই দিকে
মৃত্যুর আগে তার মুখ ফেরানো যাবে না ॥

মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ : একটি প্রত্যুত্তর

সমীরকুমার দাস

পরিচয় শারদ সঙ্কলনে (১৪০০) 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ' শিরোনামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি।[১] তারই সূত্র ধরে পরবর্তী সংখ্যায় শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক অমিতাভ চন্দ্র যথাক্রমে একটি 'লম্বা চিঠি'[২] এবং 'সংযোজন'[৩] লেখেন। এই দুটিতেই এমন কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে—যা আমার তরফে প্রত্যুত্তরের দাবি রাখে। মূল পর্বে যাবার আগে ভূমিকার ছলে দুয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম : '…অন্তর্নিহিত যুক্তি এবং বক্তব্যগুলো যদি বিতর্কের সূচনা করে তাহলে সেটাই আমার লাভ।" এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। সেজন্যে মাননীয় সম্পাদকের প্রতি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শ্রীদাশগুপ্ত চিঠিতে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু যে কারণে তিনি আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন তাতে বড়ই বিপন্ন বোধ করছি। তাঁর ভাষায় : "…তিনি আমায় আত্মপ্রচারের যে-সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।" আমি সত্যিই জানিনা, আমার লেখায় এমন কি ছিল—যা তাঁকে 'সুযোগের সদ্ব্যবহার' করার নাম করে স্বরচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের এক বিস্তারিত (?) ফর্দ পেশ করতে প্রবৃত্ত করেছে। আত্মপ্রচারের বহর অবশ্য এখানেই থেমে থাকেনি। তাঁর লেখায় যে 'দুখানা বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের উল্লেখ' অথবা 'দুখানি এনসাইক্লোপেডিয়া ও সাত খানি বিদেশী বইয়ের নামোল্লেখ' রয়েছে—সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নি। কবে কার সঙ্গে তাঁর 'টক্কর' লেগেছিল এবং এই 'টক্করের' বিবরণ জানিয়ে কার কার সঙ্গে তাঁর চিঠি-চাপাটি হয়, কে কে তাঁর সময়োচিত সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন এবং কে কে করেন নি—এসবের ইতিবৃত্তান্তই তাঁর চিঠিকে দীর্ঘায়িত করেছে। এই প্রতিটি তথ্যই আমার প্রবন্ধের নিরিখে সম্পূর্ণ অবান্তর। সুতরাং এব্যাপারে আমি কোন মন্তব্যই করবো না। 'আত্ম-পরিচয়ের' সুযোগ দেওয়ার জন্যে পরিচয়-এর সম্পাদক কৃতজ্ঞতার পাত্র হতে

পারেন—আমি কোনভাবেই নই। আমি এই দায়িত্ব-গ্রহণে অস্বীকার করছি। শুধু একটা কথা। এইরকম আত্মপ্রচার পিপাসু মৌলবাদবিরোধীই আমার প্রবন্ধে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু ছিল। আর বিদেশে প্রকাশিত বইয়ের উল্লেখ বা নামোল্লেখ আমাদের নিজস্ব চিন্তার দৈন্যকেই অনাবরিত করে। বিদেশে প্রকাশিত হলেই যে তাকে মাথায় তুলে নাচতে হবে এবং স্বদেশে প্রকাশিত হলে তাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে হবে—আমি এমন মনে করিনা। চিন্তার উপনিবেশিকতা এদেশীয় মৌলবাদবিরোধীদের পেয়ে বসেছে। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। বলা বাহুল্য, আত্মপ্রচারের উদগ্র বাসনা সর্বদা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা ; অপূর্ণ বাসনা থেকে জন্ম নেয় একধরণের অভিমান : "উপেক্ষা পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।" আত্মপ্রচারমুখীনতা, চিন্তার উপনিবেশিকতা এবং অভিমান—এ তিনটিই আমাদের দেশে মৌলবাদবিরোধিতার প্রায় অপরিহার্য প্রাকশর্ত।

বিপরীতদিকে অমিতাভর লেখা ঢের বেশি শাণিত, পরিশীলিত, সর্বোপরি প্রাসঙ্গিক। শ্রীদাশগুপ্তের চিঠির পাশে তাঁর সংযোজন তাই বেশ বেমানান ঠেকে অমিতাভর কাছে আমি কৃতজ্ঞ করেন তাঁর সংযোজনে তিনি এমন কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন যা আমায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট অবকাশ করে দিয়েছে। মূল প্রবন্ধে অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত কচকচির আশঙ্কায় ওপথে পা বাড়াই নি। বলতে দ্বিধা নেই, অমিতাভর সংযোজন আমায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রত্যুত্তর পর্বে যাবার আগে দুটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা বিশেষ প্রয়োজন : এক, অমিতাভ বলেছেন যে তিনি আমার প্রবন্ধের প্রথম অংশের (যেখানে আমি আলোচনা করেছি প্রচলিত মৌলবাদ নিয়ে, বিশ্লেষণ করেছি তার স্বরূপ, প্রয়োজনমত সমালোচনার ও বিরোধিতার শরে বিদ্ধও করেছি এই মৌলবাদকে') সঙ্গে 'সহমত' পোষণ করেন কিন্তু দ্বিতীয় অংশের (যেখানে 'প্রচলিত যুক্তিসিদ্ধ মৌলবাদবিরোধিতার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে) ওপরে তাঁর 'কিছু বক্তব্য' আছে। বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যগুলো মোটের ওপর তাঁর মতানৈক্যের পরিচায়ক। এথেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, প্রবন্ধের দুটি অংশ বুঝি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আদতে তা কিন্তু নয়। কেন নয়—তা একটু স্পষ্ট করে বলে নেওয়া প্রয়োজন। মৌলবাদ আমার কাছে কিন্তু কোন বিশেষ চিন্তার স্ফূরণ নয়—বরং তা একটা বিশেষ চিন্তা পদ্ধতি (মোড অফ থট), এই পদ্ধতি অবলম্বন করে যাকিছু চিন্তার স্ফূরণ ঘটে তাই

মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত। মনে রাখতে হবে, এই স্ফুরিত চিন্তা প্রচলিত অর্থে মৌলবাদী হতে পারে; আবার তা না হয়ে তথাকথিত 'যুক্তিবাদী' বা 'বিজ্ঞানমনস্ক' হতে পারে। কিন্তু এই দুই চিন্তার কেন্দ্রে যদি মৌলবাদী পদ্ধতি অবস্থান করে তাহলে এদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে মৌলবাদ নামক চিন্তাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলোকেই পর্যালোচনা করতে চেয়েছি। দ্বিতীয় অংশে আসার জন্যে এই পর্যালোচনা জরুরি ছিল কারণ আধুনিক 'যুক্তিবাদ' এবং 'বিজ্ঞান' কিভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আত্মসাৎ করেছে—তাই দ্বিতীয় অংশে দেখানোর চেষ্টা করেছি। অমিতাভ স্বয়ং অবশ্য এই দুটি অংশের পরস্পর-বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ তোলেন নি।

দ্বিতীয়তঃ সংযোজনে অমিতাভ অনেকগুলো প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা মতো, এই সংযোজন শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'সুচিন্তিত অভিমতে' সমৃদ্ধ। এতৎসত্ত্বেও সংযোজনকে অমিতাভর একক কণ্ঠস্বর বলে ধরে নেবো। আমি মনে করি, আমরা কেউ কারো হয়ে (বকলমে) কথা বলতে পারিনা। অন্যের হয়ে আমরা যে কথা বলি তা আসলে আমাদেরই কথা—আমাদের মতো করে অন্যেকে নির্মাণ করার প্রয়াস। অমিতাভ যেমন করে মার্কসকে নির্মাণ করেছেন। এটা অবশ্য অভিনব কিছু নয়। মার্কসের জীবদ্দশাতেই নির্মাণের এই বিশেষ ধারাটির সূত্রপাত ঘটে। আজকের দিনে মার্কসবাদের 'পুনরুজ্জীবন' নির্ভর করে আছে এই ধারাটির সচেতন অব-নির্মাণের ওপর। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। পরিশেষে একটা কথা। মূল প্রবন্ধে ছাপার অক্ষরে অনেকগুলি বানান ভুল পাঠের সাবলীলতায় ব্যাঘাত ঘটায়। তার মধ্যে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধের 'ফুশে' বা 'ফুশো'—এই দুটোই আসলে হবে ফুকো। উত্তর-কাঠামোবাদী চিন্তার অন্যতম পথপ্রদর্শক মিশেল ফুকো আধুনিক কালে এক সুপরিচিত নাম। তাঁকে নতুন করে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখিনা। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় (অভ্র) ঘোষের সরস ভাষায়, 'ছাপার অক্ষরে ফুকো ফুঁসে উঠেছেন।'

রামচরিত্রের মূল্যায়ন

শ্রী দাশগুপ্তের বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, সংঘপরিবার আজ

যে রামকে পাদপ্রদীপের তলায় নিয়ে এসেছে সে রাম 'জনতাতোষণকারী রাজবেশী রাম'। এই রামের জনপ্রিয়তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন 'সত্যপালনকারী বনবাসী রাম'। কিন্তু সংঘপরিবারের বিরোধিতা করতে গেলে যে আবার 'সত্যপালনকারী বনবাসী রামের' প্রতিরূপকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে—আমি এমন মনে করি না। 'কোমল-সরল রামের' স্থানে যদি 'কঠোর-চতুর রামকে' প্রতিস্থাপন করাই মৌলবাদবিরোধিতার সারমর্ম হয়, তাহলে আমি সেই মৌলবাদবিরোধীদের দলে পড়ি না। চিঠিতে পুস্তিকার পুনরুদ্ধৃত অংশকে আবার পড়েও আমি আমার পূর্বতন সিদ্ধান্তকে পাল্টাবার কোন কারণ দেখি না।

বিপরীত প্রতিস্থাপনের (ইনভার্সান) যে যুক্তি ইদানীন্তন মৌলবাদ-বিরোধীদের লেখায় ক্রমেই ফুটে উঠছে তা আসলে এক স্বতঃসিদ্ধের জায়গায় আর এক স্বতঃসিদ্ধকে আঁকড়ে ধরতে চায়—স্বভাবতঃই এখানে যুক্তিবাদসুলভ সংশয়ের কোন স্থান থাকে না। আজকের দিনে প্রশ্নটা 'সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ' নয়। প্রশ্নের মূল আরো গভীরে। সেটা হল ; 'সত্যপালন বনাম জনতাতোষণ'—এই বৈপরীত্যের সাহায্য নিয়ে রামচরিত্রের মূল্যায়নটা আদৌ এতো প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লো কেন ? এই বৈপরীত্যের সাহায্য নিয়ে রামচরিত্রের মূল্যায়ণ তো রামায়ণ রচনার প্রথম হাজার বছরে হয়নি। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত রামচরিত্রের যে মূল্যায়ণ হয়েছে তার মধ্যেই প্রথম এই বৈপরীত্যের ছায়াপাত ঘটেছে।[৪] সেই সময়ের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেও এই ধরণের দ্বিভাগাশ্রয়ী মূল্যায়ণ জরুরি বলে বিবেচিত হয়েছিল। সে অবশ্য অন্য এক প্রসঙ্গ। তবে মনে রাখতে হবে এই বৈপরীত্যের আলোকে চিন্তার প্রবণতা মৌলবাদী চিন্তাপদ্ধতির একটি অপরিহার্য লক্ষণ। এই প্রবণতা সাবেকী ভারতীয় চিন্তাধারায় মোটেই প্রতিফলিত হয়নি।[৫]

তাই, বৈপরীত্যের একতরফা ফয়সালা নয়—এর ইতিহাসটা খতিয়ে দেখাই মৌলবাদবিরোধী ইতিহাসচর্চার পূর্বশর্ত। আর তা করতে গিয়ে এমন মূল্যায়ণকে গুরুত্ব দিতে হবে যেখানে বৈপরীত্যকে আদৌ আমল দেওয়া হয়নি। বরং তা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই লুপ্তপ্রায় মূল্যায়ণের ঐতিহ্যকেই সঞ্জীবিত করেছেন। তাঁর লেখায় রাম অবিমিশ্র অর্থে 'সত্যপালনকারী বনবাসী' বা 'জনতাতোষণকারী রাজবেশী'

—কোনওটাই নয়: "রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে, সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যতবড়ো সমালোচকই হই-না কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস-প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয় তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জার বিষয়।"[৬] তিনি যে 'বিচারের' কথা বলেছেন তার পথ ধরে এগোলেই আমরা বুঝতে পারি দোষে-গুণের সমন্বয়ে রাম এক 'নরচন্দ্রমা'—'রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে'। এই 'বিচার' কেবল মৌলবাদী আক্রমণ থেকে রামচরিত্রকে রক্ষাই করে না, বৈপরীত্য বা দ্বিভাগের যে প্রশ্নটি নতুন করে সাম্প্রতিককালে উঠেছে তাকেও অনবদ্য কুশলতায় অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। আজকের দিনে যথার্থ মৌলবাদবিরোধিতা আমাদের কাছে এই কুশলতাই দাবি করে। এই দাবি না মিটিয়ে যদি আবার সংশয়ের অবকাশ না রেখে দ্বিভাগাশ্রয়ী প্রশ্নের একতরফা মীমাংসা করতে চাই তাহলে নিঃসন্দেহে মৌলবাদী চিন্তাপদ্ধতির জালে জড়িয়ে পড়বো। শ্রী দাশগুপ্ত সেই জালেই জড়িয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, মূল প্রবন্ধে রামচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে আমি কখনোই 'মৌলবাদের পরিপোষক' বলে মন্তব্য করিনি। এই শব্দযুগল তাঁর আরোপিত। মৌলবাদী চিন্তাপদ্ধতিকে অবলম্বন করে প্রচলিত মৌলবাদের বিরোধিতা করা যে 'কার্যকরী' বা 'ফলপ্রসূ' হতে পারে না—আমি কেবল সেকথাই বলেছি। মৌলবাদবিরোধিতা 'কার্যকরী' বা 'ফলপ্রসূ' না হওয়া এবং মৌলবাদের 'পরিপোষণ' করা নিশ্চয়ই এক কথা নয়।

মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা

আমার 'অভ্রান্ত', 'স্বতঃসিদ্ধ' 'যুক্তি', 'সংশয়' ইত্যাদি শব্দ আশ্রিত মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ দেখে শ্রী দাশগুপ্তের ধারণা হয়েছে সমীরবাবু 'মৌলবাদ' শব্দটার অর্থ ঠিক ভাবে অনুধাবন করেননি"। এই প্রসঙ্গেই মৌলবাদের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে তিনি চারটে সূত্রের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এই অংশের আলোচনায় কোথাও এটা খুঁজে পেলাম না, কেন আমার দেওয়া মৌলবাদের সংজ্ঞা 'ঠিক' নয় বা আমি ঠিক কি অর্থে মৌলবাদ

শব্দটার অর্থ অনুধাবন করতে পারিনি। পক্ষান্তরে, তাঁর দেওয়া মৌলবাদের সংজ্ঞা দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি এর সঙ্গে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের একাংশের' সাম্প্রদায়িকতাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িকতাও যে সবসময়ে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের একাংশের' মধ্যে আবদ্ধ থাকবেই—এমন কোন কথা নেই। ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুর একাংশের সাম্প্রদায়িকতাও বিরল নয়। যাই হোক, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য করা সম্ভব। এই পার্থক্যকে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে দেখা যেতে পারে ঃ প্রথমতঃ, যখন ধর্মকে একটা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থপূরণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন আমরা তাকে বলি সাম্প্রদায়িকতা। মার্কসবাদী মহলে যেমন একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে—সাম্প্রদায়িকতা কেবল মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থসাধন করে। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী বা কৃষকের কোন স্বার্থ রক্ষিত হয় না। হিন্দু এবং মুসলমান—এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে ভেদাভেদের বিষ শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ফাটল ধরে তাদের শ্রেণীগত ঐক্যে—ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মজবুত হয় মধ্যবিত্তের শাসন এবং শোষণ। বিপান চন্দ্র তাই সাম্প্রদায়িকতাকে শ্রমিক এবং কৃষকের 'ভ্রান্ত চেতনা' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে মৌলবাদে এই ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থপূরণের ব্যাপারটা অবধারিতভাবে উপস্থিত থাকে না। একজন 'ক্ল্যাসিকাল' মৌলবাদী এই ধরণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়েও তাঁর সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থে মৌলবাদী হতে পারেন। সম্প্রদায়ের স্বার্থে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন। অর্থাৎ এখানে তাঁর সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, তাঁর সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থ অন্য সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থের থেকে কেবল আলাদাই নয়—তাঁর দৃষ্টিতে অনেক জরুরি এবং আদরণীয়। অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা ভেবে তিনি ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে রাজি হবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, যিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তিনি অন্যের (অর্থাৎ, অন্য সম্প্রদায়ের কোনো সদস্যের) বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। সময়বিশেষে অন্যের ক্ষতিসাধনে উদ্যত হন বা ক্ষতিসাধন করে ফেলেন। এমনও হতে পারে যে অন্য কেউ বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে, ক্ষতিসাধনে উদ্যত হলে বা ক্ষতিসাধন করে ফেললে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

কিন্তু, একজন মৌলবাদী অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও ক্ষতিসাধন নাও করতে পারেন। এমনকি নাও চাইতে পারেন। নিজের সম্প্রদায়ের সামগ্রিক এবং বৃহত্তর স্বার্থে অন্যের সাথে সহাবস্থানের পথ বেছে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে যে উদাহরণের কথা বলছি তা শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শোনা। ডিসেম্বর ১৯৯২তে অযোধ্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উদাহরণ : "মল্লিকবাজারে প্রথমে ছেঁড়া হয়েছিল কিছু বিজেপি পোস্টার, পরে ছিন্ন হলো লাল পতাকাও। উন্মত্ত জনতা তেড়ে গেল একটি দুর্গামন্দিরের দিকে ; মন্দির আড়াল করে দাঁড়িয়ে তাদের বাধা দিলেন স্থানীয় জামা মসজিদের ইমাম কোয়ারী মহম্মদ নামাজুদ্দিন।"[৭] বলা বাহুল্য, ইমামের কথায় কাজ হয় ; উন্মত্ত জনতা মন্দিরস্থান পরিত্যাগ করে। কিছু ইমাম মনে করেন, অযোধ্যায় উন্মত্ত 'করসেবকরা' যা ভেঙেছে তা নিঃসন্দেহে একটা 'মসজিদ'। ঐ 'মসজিদের' জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা বা ওরকম কোনো কিছুই গড়ে উঠতে পারেনা—মন্দির তো দূরের কথা। তাঁর ভাষায়, 'ওটা আল্লাহর সম্পত্তি'। 'মসজিদ' ভাঙা গর্হিত জেনেও তিনি স্থানীয় মন্দির যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তার জন্যে এরকম একটা ঝুঁকি নিলেন কেন? কেন তিনি সশস্ত্র, উন্মত্ত জনতার সামনে নিরস্ত্র অবস্থায় এসে দাঁড়ালেন? কেন তাঁদের নিরস্ত করলেন? কারণ তাঁর মাথায় ছিল তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ এবং সুরক্ষা : 'আমি জানতাম, মন্দিরের ক্ষতি হলে দারুণ ফ্যাসাদ হবে, তখন এলাকার মুসলমানরাই বেশি মার খাবে। আমি তাই ওদের বলি, মন্দিরে হাত দেওয়ার আগে আমার গায়ে হাত দিতে হবে। ওরা চলে যায়। আমি জানতাম ইমামের গায়ে হাত তুলতে ওরা সাহস পাবে না।'[৮] সামগ্রিক স্বার্থের প্রশ্নে মৌলবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ

অধ্যাপক চন্দ্রের 'বিনীত নিবেদন' হল : " যুক্তি যদি একবার অকাট্য বলে প্রমাণিতই হয়, তবে সেই অকাট্য যুক্তি মানা এবং সেই যুক্তির পথ অনুসরণ করাটা কিভাবে চরম অসহিষ্ণুতা হল, সেটা ঠিক পরিষ্কার হলনা।" এই বক্তব্যের দুটো অনুসিদ্ধান্ত আছে : প্রথমতঃ, যুক্তি যখন 'একবার'

অকাট্য বলে প্রমাণিত হয় তখন তা স্বতঃসিদ্ধের মর্যাদা পায়। আর যা 'একবার' অকাট্য বলে প্রমাণিত হতে পারলো না তা 'অন্ধবিশ্বাসে' পর্যবসিত হয়ঃ "স্বতঃসিদ্ধ বলে তো কিছু থাকবেই। অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বও এই স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়েই পড়ে।' এই অনুসিদ্ধান্ততকে মেনে নিতে হলে আমাদের অন্ততঃ দুটো বিপদের সম্মুখীন হতে হয় যার উল্লেখ এখানে মোটেই, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অমিতাভ সম্ভবতঃ তাঁর 'বিনীত নিবেদনে' একবার কথাটা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন নি। এই 'একবার' কথাটা আমার মূল প্রবন্ধেও ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্যটা হল আপেক্ষিক। আজ ('একবার') যা 'অকাট্য যুক্তি' বলে প্রমাণিত হল কাল তাই 'অন্ধবিশ্বাসে' পর্যবসিত হতে পারে। 'অকাট্য যুক্তি' এবং 'অন্ধবিশ্বাসের' এই পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তনের ইতিহাসটার প্রতি আজ আর উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালের জনবিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যেও এই ইতিহাসের প্রতি স্পর্শকাতরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর একটা উদাহরণ না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে পারে: "এই ব্যাপারটার সবথেকে ভাল উদাহরণ গ্যালিলিও বা ব্রুনোর বিচার। এ্যারিষ্টটল একজন প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন, বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল পৃথিবী স্থির, সূর্য তার চারদিকে ঘোরে। পরে দেখা গেল সে সিদ্ধান্ত ভুল। কিন্তু ততদিনে অন্ধবিশ্বাসীদের কাছে এ্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় মৌলবাদী সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। তাই গ্যালিলিও বা ব্রুনোর বিচার···।"[৯] কাজেই দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিব ধারণা বা সিদ্ধান্তও আবার মৌলবাদী অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হতে পারে। কিন্তু জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্যায়েও এই বক্তব্যের সম্যক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। তা যদি করা হত তাহলে গ্যালিলিও বা ব্রুনোর সিদ্ধান্তও ভবিষ্যতে যে 'অপরিবর্তনীয় মৌলবাদী সিদ্ধান্তে' পরিণত হতে পারে—তার স্বীকৃতি থাকতো। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। কিন্তু যতদূর জানি, বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্যালিলিওর পরেও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে যদি এই 'সংশয়ের অবকাশ' না থাকে তাহলে তা আবার বিজ্ঞান কি?

এক্ষেত্রেই শ্রীদাসগুপ্তের নিম্নোক্ত বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে: "সমীরবাবুর 'আক্রান্ত' 'স্বতঃসিদ্ধ', 'যুক্তি', 'সংশয়' ইত্যাদি শব্দ আশ্রিত

মৌলবাদের সংজ্ঞার্থ অনুসারে The history of all hitherto existing societies is the history of class struggles ঘোষণা দিয়ে শুরু Manifesto of the Communist Party পুস্তকখানির জাতনির্ণয় কীভাবে করা যাবে?” এ নিছক প্রশ্ন নয়—পত্রলেখকের মতে এই ঘোষণাও স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়েই পড়ে। কেন স্বতঃসিদ্ধ? যেহেতু মার্কস ‘ইহা ঘোষণা করিয়াছেন’? বলতে বাধ্য হচ্ছি, মার্কসবাদকে এহেন আপ্তবাক্যের স্তরে নামিয়ে আনাটা সত্যিই একধরণের মৌলবাদী অবক্ষয়। আজকের দিনে অনেকেই (যেমন, গেইল ওমভেৎ প্রমুখ) শ্রেণীবিশ্লেষণকে মার্কসবাদের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনে করেন না। এরকম চরমপন্থী মনোভাব পোষণ না করলেও নিখাদ শ্রেণী বিশ্লেষণযে ভারতীয় সমাজের গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে অন্ততঃ অপর্যাপ্ত—সে স্বীকৃতি অনেকের লেখাতেই মিলবে। যেমন গৌতম ভদ্র লিখেছেন: “বহুক্ষেত্রেই শ্রেণীর লড়াইয়ের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায় সত্তার অন্যান্য লড়াইয়ের সঙ্গে, জট ছাড়ানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শ্রেণীর প্রকাশ তখন ‘বিশুদ্ধ’ থাকেনা অন্যতর প্রকাশেই সে লীন থাকে।”[১০]

তাছাড়া, যুক্তিকে অকাট্য বলে প্রমাণ করতে গেলে এক যুক্তির সঙ্গে আর এক যুক্তির তুলনা করার মতো সাধারণ মানদণ্ড থাকার দরকার। বলা বাহুল্য, এই সাধারণ মানদণ্ডের নিরিখেই আমরা এক যুক্তির তুলনায় আর এক যুক্তির উৎকর্ষ বুঝতে পারি। যে যুক্তি অকাট্য বলে প্রমাণিত হতে পারলো না তা অবশ্য বর্জনীয়—অন্ধবিশ্বাসের তকমা এঁটে, তাকে অন্ত্যজ করে রাখি। যুক্তির তুলনার ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতব্যবস্থার ছুৎমার্গের বিচার ভয়াবহ হলেও অব্যাহত আছে। কথা হল, এক যুক্তির তুলনায় আর এক যুক্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করার মতো কোন সাধারণ মানদণ্ড আমার হাতে নেই। এই মানদণ্ড না থাকার দরুণ আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারিনা (ক) যুক্তির তুলনায় (খ) যুক্তি উৎকৃষ্ট; সুতরাং (খ) যুক্তিবাদের স্বীকৃতি পাবে এবং (ক) মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেরকম কোন শিরোধার্য মানদণ্ড থাকলে সমাজ পরিচালনার কাজ বোধ হয় অনেক বেশি সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের হাতে কোন মানদণ্ড নেই —নেই যে সেকথা অমিতাভও স্বীকার করেন: “…যেহেতু মূল্যায়নের কোনও সাধারণ মানদণ্ড নেই এবং যুক্তিবাদী মূল্যায়ণ ও মৌলবাদী মূলায়ণ দুই ভিন্ন ধরণের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে…।” সাধারণ

মানদণ্ডের অভাবে এক যুক্তির তুলনায় আর এক যুক্তি যখন অকাট্য বলে মনে হয় তখন তার পেছনে তুলনামূলক বিচার বা প্রমাণ থাকেনা—যা থাকে তা হল নিছক আবেগ (ইমোশন)। অকারণ উদ্ধৃতিতে কণ্টকিত করতে চাইনা আমার বক্তব্য। কিন্তু নিচের উদ্ধৃতিটা ইংরেজিতেই ব্যবহার করার জন্যে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। বাংলায় তর্জমা আমার সামর্থ্যে কুলোল না : "…comtions act autonomously, or at least appear to do so, in giving sense to an interpretation, not through comparison whith other possible decisions but by making that particular interpretation seem fitting."[১১] মৌলবাদী যেমন আবেগতাড়িত, যুক্তিবাদীও তেমনি। মৌলবাদীর ওপরে যুক্তিবাদীর প্রভুত্বের ভিত্তিও এই আবেগ। আবেগ থেকেই জন্ম নেয় গায়ের জোর ফ্যাসিবাদ। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি।

প্রথম পর্বে অমিতাভর তরফে যা ছিল 'বিনীত নিবেদন' পরে তা দুর্বিনীত অসহিষ্ণুতার অধিকারে পরিণত হয়েছে : "পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, অন্ধবিশ্বাসের জোরে এটাও তো কেউ না মানতেও পারেন, এবং সেই মতের লোকও একেবারে নেই, এমনও নয়। তবে কি চরম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে সেই মতকে মূল্য দিতে হবে ?" যুক্তিবাদীর তরফে অসহিষ্ণুতার অধিকার হল স্বতঃসিদ্ধের আর এক পিঠ—অমিতাভর দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত। যুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য যখন কেবল অস্পষ্টই নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল, তখন অসহিষ্ণু আমরা কেউই হতে পারিনা। সহিষ্ণুতার পক্ষে আমি কোন নীতিবাগীশের বুলি আওড়াচ্ছি না—আমার মনে হয়েছে, সহিষ্ণুতাই যুক্তিবাদী ফ্যাসিবাদ থেকে আমাদের বাঁচার একমাত্র রাস্তা। সেই জায়গাতেই মৌলবাদীর সঙ্গে কথোপকথনের একটা প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

যুক্তি এবং ফ্যাসিবাদ ঃ

অমিতাভ লিখেছেন : "এতদিন তো জানতাম যুক্তির বিরোধী হচ্ছে অযুক্তি, যুক্তিবাদের বিরোধী হচ্ছে অযুক্তিবাদ, আর গণতন্ত্রের বিরোধী হচ্ছে একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ…এই মত বদলানোর এখনও কোনও কারণ দেখছি না।" যুক্তিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র এবং অযুক্তিবাদের সঙ্গে একনায়কতন্ত্র বা

ফ্যাসিবাদকে ধাপে ধাপে মিলিয়ে দেওয়ার ইতিহাস অবশ্য এই শতাব্দীর গোড়ায় ফ্যাসিবাদের উত্থান পর্ব থেকে শুরু হতে দেখা গিয়েছে। এই প্রয়াসের পাশাপাশি অন্য আর এক ধরণের প্রয়াসও চোখে পড়বে, যেখানে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের' (এনলাইটেনমেণ্ট) বৌদ্ধিক কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত আছে বলে মনে করা হয়েছে। এব্যাপারে যে গ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তা হল, থিয়ডোর এ্যাডোর্নো এবং ম্যাক্স হরখাইমারের ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেণ্ট। 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তর' যে বৌদ্ধিক কাঠামোকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে তাতে যুক্তির একমুখী গতিই স্বীকৃত হয়েছে। গোটা বিশ্বে যেমন ইউরোপই কেবল মুক্তি বা 'নব নব চিন্তার পথপ্রদর্শক' ঠিক তেমনি তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যন্ত সমাজগুলিতেও মুক্তি এবং 'নব নব চিন্তার' অধিকারী কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। যুক্তির প্রসার যেমন ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যন্ত সমাজগুলিতে ঘটতে থাকবে। ঠিক তেমনি তৃতীয় বিশ্বে যুক্তির প্রসার ঘটবে ঐ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের থেকে সমাজের বৃহত্তর অংশে। এইভাবে ইউরোপ নিজের আদলে গোটা পৃথিবীকে গড়ে নেবে। (এই প্রচেষ্টাকে মৌলবাদী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে—আমি জানিনা। এই জায়গায় যুক্তিবাদ এবং মৌলবাদের অদ্ভুত গলাগলি লক্ষ্য করা যাবে।) যুক্তির এই ওপর থেকে নিচে চুঁইয়ে পড়াকে এ্যাডার্নো এবং হরখাইমার 'প্রতিস্থাপন' ('প্রজেকশন') বলে মন্তব্য করেছিলেন। স্বভাবতঃই এখানে যুক্তির বিপরীত গতি স্বীকৃত হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের থেকে ইউরোপের বৌদ্ধিক দিক দিয়ে পাওয়ার কিছু নেই (মেকলের সেই দাম্ভিক উক্তির কথাই বারবার মনে পড়ে যায়), তৃতীয় বিশ্বে যুক্তির অধিকারী কিছু মানুষের যেমন সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে পাওয়ার কিছু নেই। যুক্তির একমুখীতাই তাঁদের মতে, ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে—বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিবাদ ইউরোপীয় 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের' উত্তরাধিকার যা একই সঙ্গে এই 'যুগান্তরের' সীমাবদ্ধতাগুলিকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে।[১২] অমিতাভ ভালোই জানেন, গণতন্ত্র কখনো একমুখী নয়।

যুক্তি এবং মার্কসবাদ :

আমি লিখেছিলাম : "আধুনিক যুক্তিবাদ বলতে আমি সেই বিশেষ ধরণের যুক্তিবাদের কথা বলছি যার স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের 'আলোকপাত

যুগান্তরের' ('এনলাইটেনমেন্ট') পর্ব থেকে উদ্ঘাটিত হতে দেখা যাচ্ছে।* উদ্ধৃতাংশে 'বিশেষ' শব্দটার একটা তাৎপর্য আছে—আমি 'যুক্তির রূপভেদ' সম্পর্কে অনবহিত নই, শব্দটি তারই, দ্যোতক। এখন মার্কসবাদ এই 'যুগান্তরের' বৌদ্ধিক কাঠামোর অন্তর্গত কিনা—মূল প্রবন্ধে আমি সেই বিতর্কে প্রবেশ করিনি। আমার মনে হয়, এই বিতর্কে অমিতাভর অবস্থান বেশ গোলমেলে। একবার তিনি মার্কসবাদকে 'যুক্তিবাদের রূপভেদ' বলে মনে করছেন এবং আমি এই ভিন্ন রূপকে অস্বীকার করেছি—এমন অনুযোগ করেছেন: "যুক্তিবাদেরও রূপভেদ আছে, যে রূপভেদকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে।" আবার অন্যত্র বলেছেন এই 'রূপভেদ' এতোটাই ভিন্ন নয় যে তা 'যুগান্তরের' বৌদ্ধিক কাঠামোকে 'পুরোপুরিভাবে খারিজ' করবে: "মার্কসবাদ প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে এইভাবে পুরোপুরি যান্ত্রিকভাবে খারিজ করে না।"

উল্টোদিকে মিশেল ফুকো মনে করেন, মার্কসবাদ ইউরোপের 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের' বৌদ্ধিক কাঠামোকে আদৌ অতিক্রম করতে পারেনি। তিনি মার্কসবাদকে তুলনা করেছেন মাছের সাথে। এই মাছ 'যুগান্তরের' জল ছাড়া একমুহূর্ত বাঁচতে পারবে না। আমি মার্কসবাদের কোন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো না। বরং বলার চেষ্টা করবো, অমিতাভর নির্মিত মার্কসবাদের যে চেহারা সংযোজনটিতে পরিস্ফুট তা 'আধুনিক যুক্তিবাদের আদিরূপ বা যান্ত্রিক রূপের' থেকে বেশিদূর এগোতে পারেনি। অমিতাভর মতে, মার্কসবাদ যান্ত্রিক নয় কারণ '...মার্কসের লেখায় যখন reason ('যুক্তি') কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন তা স্থান-কাল-মাত্র-নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না'। বলা বাহুল্য, যুক্তিবাদের 'আদিরূপে' স্থান-কাল-পাত্রের স্বীকৃতি মেলে না। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের কতটা স্বীকৃতি আছে অমিতাভ-নির্মিত মার্কসবাদে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এক অভিধানের শরণাপন্ন হয়েছেন অমিতাভ। উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পুনরায় বিবৃত করছি :—"Rationalism...does not recognise the dialectics of transition of knowledge from the lesser universality and neccessity to the greater and absolute ones. This limitation of Rationalism was overcome by Marxism ......"। উদ্ধৃতাংশে 'ক্ষুদ্রতর' ('লেসার') এবং 'বৃহত্তর আর অমোঘ'

('গ্রেটার এ্যাণ্ড এ্যাবসলিউট') শব্দকয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যখন বলা হল যে, জ্ঞানের গতিধারা 'ক্ষুদ্রতর' থেকে 'বৃহত্তর আর অমোঘের' দিকে প্রবাহিত হয় তখন তো পরিষ্কার ফরমান চাপিয়ে দেওয়া হল, এর কোন ব্যত্যয় হতে পারে না।' অর্থাৎ, জ্ঞানের গতিধারা যদি বিপরীত দিকে চলে তবে তা জ্ঞান পদবাচ্য নয়—তা হল অ-জ্ঞান বা অমিতাভর ভাষায়, 'অযুক্তিবাদ'। এই ফরমানে স্থান-কাল-পাত্রের স্বীকৃতি কোথায়? এই ফরমানের সঙ্গে মৌলবাদীর ফরমান বা ফতোয়ার তফাৎই বা কোথায়? মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস বহুমুখী—এখানে 'এগিয়ে চলা' বা 'পিছিয়ে পড়ার' কোন নিরবচ্ছিন্ন ধারা নেই। সব ধারাই যুগপৎ চলতে থাকে। এই বহুমুখীনতা অগ্রাহ্য করলে আমরা ইতিহাসের এক অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে থাকবো। এইরকম ব্যাখ্যা ইতিহাসের এক 'নিরবচ্ছিন্ন ক্রমকে' ('আনইন্টারাপটেড কন্টিনিউটি' [১৩]) আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিশ্ব ইতিহাসের কক্ষপথ আগেভাগে নির্দ্ধারণ করে দেওয়ার বিধ্বংসী প্রয়াস 'যুগান্তরের' সময়কাল থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। অমিতাভর মার্কসবাদও এর ব্যতিক্রম নয়।

আর একটা কথাও অমিতাভকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। অসহিষ্ণুতার অধিকার দাবি করে যখন ইতিহাসের কক্ষপথ আগেভাগে নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয় তখন হাত-পা গুটিয়ে কেবল আশাই করা হয়না যে বিশ্ব ইতিহাস এই পূর্বনির্দ্ধারিত কক্ষপথ ধরেই অগ্রসর হবে বরং সর্বতোভাবে ইতিহাসকে পূর্বনির্দ্ধারিত পথে চালানোর চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি ফ্যাসিবাদী চেষ্টা। বিশ্বকে বোঝবার এবং পরিবর্তন করার নাম করে পরিকল্পিত হিংসাপ্রয়োগের উদাহরণ নিকট ইতিহাসেও কড় কম নেই। এমতাবস্থায় জ্ঞান আর বিশুদ্ধ থাকে না—তা হয়ে যায় কর্তৃত্বের নামান্তর। জ্ঞান কর্তৃত্বের এই লুকোচুরি খেলার কথা ফুকো বলেছিলেন।

যুক্তি এবং জাতিরাষ্ট্র

আমি লিখেছিলাম: "আমরা যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে জাহির করি তাঁরা মুক্তির আড়ালে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান গাই।" এই বক্তব্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলা, একজন যুক্তিবাদীর কাছে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান না গেয়ে কোন উপায় নেই। যুক্তিবাদের সঙ্গে জাতি-রাষ্ট্রের এক প্রয়োজনীয় সম্পর্ক আছে—মুক্তিবাদী অমিতাভও এক বিশেষ অর্থে

জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান গেয়েছেন। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। আগে যুক্তিবাদের সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের যে প্রয়োজনীয় সম্পর্কের কথা বলছি—তার প্রকৃতি অনুধাবন করে দেখা যাক। অমিতাভ অবশ্য এই প্রয়োজনীয় সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন নি ঃ "মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীদের একটা বড় (?) অংশই ভারতীয় জাতির ও ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান তো গানই না, বরং এই চাপিয়ে দেওয়া অলীক তত্ত্বটির বিরোধিতাই করে থাকেন।"

যুক্তিবাদ আমাদের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাগতিক ঘটনাগুলিকে বিচার করার এক 'সাধারণ মানদণ্ড' (কমন মেজার') দিয়েছে। যেমন এই মানদণ্ডের নিরিখেই 'অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব' প্রমাণ করা যায়। আবার এই মানদণ্ডের নিরিখেই 'সত্য' এবং 'মিথ্যার' মধ্যে তফাৎ করা সম্ভব হয়। এই মানদণ্ড 'সাধারণ' এই অর্থে যে তা স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভর করেনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই মানদণ্ড এই অর্থে 'সাধারণ' নয় যে তা মৌলবাদীও গ্রহণ করতে চাইবে। আগেই সে কথা বলেছি। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এই 'সাধারণ মানদণ্ডের' দুটি সামাজিক প্রতিফলন আছে ঃ এক, এর ফলে সমজাতীয় ঘটনাগুলিকে, সমজাতীয় নয়—এমন ঘটনাবলী থেকে পৃথক করে ফেলা সম্ভব হয়। এই শ্রেণীবিভাজন (ক্লাসিফিকেশন) প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ। পুঁজিবাদ বিকশিত হবার সাথে সাথে শ্রমবিভাগ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। এর ফলে, শ্রেণীবিভাজন প্রক্রিয়া এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু যুক্তিবাদ যে 'সাধারণ মানদণ্ডকে' আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে, তার একটা নেতিবাচক প্রতিফল আছে—যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনা। সমাজে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাই একক, অনন্য বা বিচ্ছিন্ন নয়—এমন কোন ঘটনাই নেই যা অলৌকিক, অসাধারণ, অশ্রুতপূর্ব অথবা বিশিষ্ট—যার কোন বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। শ্রীপ্রবীর ঘোষের অলৌকিক নয়, লৌকিক—এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রন্থটিতে লেখক 'প্রমাণ করেছেন কোথাও অলৌকিক কিছু ছিলনা, অলৌকিক কিছু নেই'।[১৪] বস্তুতঃ জনবিজ্ঞান আন্দোলন এই নেতিবাচক প্রতিফলেরই এক বিশেষ বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু যুক্তিবাদ-প্রদত্ত এই 'সাধারণ মানদণ্ডের' সঙ্গে জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সম্পর্কটা কি? আমরা আগেই বলেছি, 'সাধারণ মানদণ্ডের'

উদ্ভব এবং ব্যবহার বৌদ্ধিক স্তরে জাগতিক ঘটনাকে স্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে শিখিয়েছে। আর বৌদ্ধিক স্তরে যা ঘটেছে, তাই সামাজিক গোষ্ঠী-বিভাজন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করেছে। ভাষা, ধর্ম বা অনুরূপ কোনো জনগোষ্ঠীগত ভিত্তিকে আশ্রয় করে সমজাতীয় মানুষেরা, সমজাতীয় নয়—এমন মানুষদের থেকে তাঁদের পৃথক করেছেন। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে জনগোষ্ঠী (বা জাতীয়তা)। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীই কালক্রমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেছে—রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে পরিচিত হয়েছে জাতিরূপে। জাতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত না হতে পারলে তীব্র আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছে। সামাজিক গোষ্ঠীবিভাজনকে বৌদ্ধিক শ্রেণীবিভাজনের 'সমতুল' ('ইকুইভ্যালেন্ট') বলে মন্তব্য করেছেন অগ্রগণ্য সমাজতাত্ত্বিক আরনেস্ট গেলনার।[১৫]

সুতরাং, যুক্তিবাদী যে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান করবেন—এতে আর আশ্চর্য কি! মনে রাখতে হবে, এই জয়গান দুই অর্থে করা যেতে পারে: প্রথমত মৌলবাদ যে 'জাতীয় সংহতির' হন্তারক—তা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা যেতে-পারে। অমিতাভর মতে: 'বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশই নিজেদের প্রয়োজনে 'জাতীয় সংহতির নামে' এক অখণ্ড ভারতীয় জাতির তত্ত্বে 'তাল মিলিয়ে থাকেন।' আমি এব্যাপারে কোন মন্তব্য করবো না; বিষয়টি অমিতাভর পূর্ণ অধিগত বলেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল ইতিবাচক অর্থে ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের জয়গান করা। দ্বিতীয় যে অর্থে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান করা যায় তা অবশ্য নেতিবাচক। এই অর্থে ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের 'বিরোধিতা' করে ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির তরফে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। অমিতাভ এই অর্থে ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের বিরোধী। তাঁর ভাষায়: "প্রকৃতপক্ষে ভারত হচ্ছে বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, যেখানে প্রতিটি জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার থাকা উচিত।" উচিত কি উচিত নয়—তা নিয়ে ব্যক্তিগত অভিমতকে তড়িঘড়ি প্রকাশ করার কোন কারণ দেখিনা। পরে সুযোগ হলে করা যাবে। ঔচিত্যের প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হল ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোকে অতিক্রম করতে পারলেও অমিতাভর এই অবস্থান জাতি-রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক কাঠামোকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। 'আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার', গৃহীত হলে

বর্তমান পৃথিবীতে অনুমানিক ১৭০টির জায়গায় হয়তো (!) হাজারখানেক জাতি-রাষ্ট্র জন্ম নেবে কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। উপমহাদেশে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ পৃথক জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি—তা বোধ করি অমিতাভও মানবেন। এই অধিকার বলাই বাহুল্য, জাতি রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে কোনমতেই প্রশ্ন করেনা।[১৬]

যুক্তি এবং বিপ্লব

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো, ১৯৭৮ সালে সংঘটিত ইরাণের শিয়াপন্থী বিপ্লবকে আমি 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার' মডেল হিসেবে খাড়া করতে চাইনি. অমিতাভ গোড়াতেই ভুল করেছেন। আমি লিখেছিলাম : "আমাদের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের যা কিছু তার 'মূল'-এ ছিল ঐ যুক্তিবাদ। ১৯৭৮—এর সেই বিপ্লব প্রগতি-সম্বন্ধীয় আমাদের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠলো।" সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং যুক্তিবাদবিরোধিতার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য আছে। ইরাণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা পরে কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে—তা নিয়ে আমার কোন মোহ নেই। কিন্তু, এই বিপ্লবের প্রতিবাদী চিত্র (তা যতই সাময়িক হোক না কেন !) যে যুক্তিবাদবিরোধিতার মধ্যে নিহিত ছিল—তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা। ইরাণের বিপ্লবে যুক্তিবাদবিরোধিতাই ছিল মুখ্য—সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাটা গৌণ।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা হয়তো ইরাণের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হবে ভিয়েতনাম এবং কিউবার বিপ্লবে। এই দুটি বিপ্লব সম্বন্ধেই আমার ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, অমিতাভও এই শেষোক্ত দুটি বিপ্লবকে যুক্তিবাদবিরোধিতার মডেল হিসেবে খাড়া করতে রাজি হবে না : "সতেজ আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সাথে সাথে ভিয়েতনাম-কিউবাও প্রগতির যাবতীয় বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে···বর্জন করেনি, আর মধ্যযুগ থেকেও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের বিকল্পের সন্ধান করেনি।" তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার সঙ্গে যুক্তিবাদ বিরোধিতার অনিবার্য কোন সম্পর্ক নেই : যুক্তিবাদবিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল অনুসঙ্গ করে নিলেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা যে যুক্তিবাদবিরোধিতার থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে—তার

উপযুক্ত উদাহরণ হল ভিয়েতনাম-কিউবা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দুটি বিপ্লবের অবস্থানই যুক্তিবাদী জাতি-রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর মধ্যে।[১৭] এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাই বা কতদূর সাফল্যলাভ করতে পারে—তাও লক্ষণীয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং যুক্তিবাদ-বিরোধিতারই মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য সাধন করাটাই আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ইরাণের বিপ্লব এই সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেনি।

বিজ্ঞান এবং ব্যবহার ঃ

বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাপক চন্দ্রের ধারণা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ "…বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের উপকরণ হিসাবে দেখে ও ব্যবহার করে, রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শাসকশ্রেণী. বিজ্ঞানকে অমানবিক ও জনবিরোধী রূপ দেয় তারাই, কিন্তু বিজ্ঞানের এই শাসকশ্রেণীর দেওয়া রূপ আমরা গ্রহণ করব কেন? আমাদের কাছে তো বিজ্ঞানের মানে অন্য। আমাদের কাছে বিজ্ঞান একটা চেতনা, একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গী।" একনজরে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এই উদ্ধৃতির পেছনে এমন দুটো অনুমান কাজ করছে যা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা সেই অনুমান দুটোর ওপরেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাইছি ঃ প্রথমতঃ, আজকের দিনে বিজ্ঞান যে ক্রমশঃ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে. তার পেছনে বৈজ্ঞানিকদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এই দায়িত্ব 'রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রচালনাকারী শাসকশ্রেণীর' কাঁধে চাপানো হয়েছে। বিজ্ঞান যে মানবজাতির অস্তিত্বকে আজ বিপন্ন করে তুলেছে তার জন্যে এই 'শাসকশ্রেণী' নামক এক নৈর্ব্যক্তিক গোষ্ঠীকে দায়ী করা হয়েছে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজস্ব কৃতকর্মের দায়িত্ব দিব্যি এড়াতে পারেন, সামাজিক দায় থেকে নিষ্কৃতি পান। এইরকম ভাবলেশহীন, নিরাসক্ত, নিষ্কাম বৈজ্ঞানিকের চেহারা আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারাকেই পুনঃসংস্থাপিত করতে চায়।[১৮] কিন্তু এর উল্টো কথাটা আবার সত্যি নয়। মানবজাতির কল্যাণে যে বিজ্ঞান নিয়োজিত—তার বাহবাটা সচরাচর বৈজ্ঞানিককেই দেওয়া হয়—'রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শাসকশ্রেণী' পায়না। বিজ্ঞানকে ঘিরে আমাদের যে মনোভঙ্গী তার মধ্যে এই দ্বৈততা অতি সহজেই চোখে পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ কেবল বৈজ্ঞানিকই নন—বিজ্ঞানের যে 'অমানবিক ও জনবিরোধীরূপ' আজ আমরা দেখতে পাই, তার শেকড়ও আধুনিক বিজ্ঞানের বৌদ্ধিক পরিকাঠামোর মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। অমিতাভ লিখেছেন, বিজ্ঞান তাঁর কাছে 'একটা চেতনা, একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গী'। খুব ভালো কথা! কিন্তু, সে কেমন 'চেতনা', কেমন 'দর্শন' বা কেমন 'দৃষ্টিভঙ্গী'? চেতনা-দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গী তো আর একরকমই নয়—তারও রূপভেদ আছে। অমিতাভর মতে, এই চেতনা-দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নাতীতভাবে 'স্বতঃসিদ্ধ' হিসেবে মেনে নেয় : "স্বতঃসিদ্ধ…বলে তো কিছু থাকবেই। অন্ধবিশ্বাসের তুলনায় যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বও এই স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়েই পড়ে।" এই শ্রেষ্ঠত্বের অনুমানটি আধুনিক বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—একে বাদ দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানকে বোঝা অসম্ভব। অমিতাভও বুঝতে চাননি, কিম্বা পারেন নি। এটা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার সাময়িক ভুল বা নিছক বদমায়েশি নয়—বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত জীবনবোধ। শ্রেষ্ঠত্ববোধ বা উচ্চমন্যতা অমিতাভকে অসহিষ্ণুতার অধিকার দাবি করতে প্রবৃত্ত করেছে এবং আপন দম্ভের বশবর্তী হয়ে মৌলবাদীর সঙ্গে কথোপকথনের সম্ভবনাটুকু প্রত্যাখ্যান করতে শিখিয়েছে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে কথোপকথনের সম্ভবনা নিয়ে দুয়েকটা কথা বলতে চাই।

রেওয়াজ এবং কথোপকথন :

যুক্তিবাদ এবং মৌলবাদের মধ্যে ভেদরেখা যখন বিপজ্জনকভাবে অন্তর্হিত হয়েছে তখন কথোপকথনই মৌলবাদ থেকে পরিত্রাণের পথ। মূল প্রবন্ধে আমি এই কথোপকথনের পক্ষেই আর্জি জানিয়েছিলাম।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই প্রশ্নে অমিতাভর অবস্থান আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে। বেশ কয়েকবারই তিনি বলেছেন, 'যুক্তিবাদীর' সঙ্গে মৌলবাদীর কথোপকথন অসম্ভব : "মৌলবাদীর অন্ধবিশ্বাস যুক্তিবাদীর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, আবার যুক্তিবাদীর যুক্তি মৌলবাদী কখনোই মানবে না। সুতরাং কথোপকথন অসম্ভব।" এর ঠিক অব্যবহিত পরেই তিনি বলেছেন : "আর মৌলবাদবিরোধী যুক্তিবাদীর কাছে প্রশ্নটা মৌলবাদের সঙ্গে কথোপকথনের নয়, প্রশ্ন মৌলবাদবিরোধিতার।" মৌলবাদবিরোধিতাও যে একপ্রকার কথোপকথন হতে পারে—একথা

বোধ করি অমিতাভ বুঝতে পারেন নি। আমি এমন কোনো কথোপকথনের পক্ষে ওকালতি করিনি যেখানে মৌলবাদবিরোধিতা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। প্রশ্নোত্তরও তো কথোপকথনেরই একটা ধরণ। কথোপকথনের এমন সীমিত অর্থ আমার কাছে অকল্পনীয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন, কথোপকথন যত 'অসম্ভবই' হোক, যুক্তিবাদীকে তার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে: "তাঁর (যুক্তিবাদীর!) মত মৌলবাদীরা মেনে নেবে, বা এমন কি সাধারণ মানুষও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবেন, এমন কোনও কথা নেই, তবে তিনি চেষ্টা করবেন না কেন?" এ থেকে মনে হয়, অমিতাভর মতো 'যুক্তিবাদীরাও' কথোপকথনে আগ্রহী। অসম্ভব জেনেও আগ্রহ প্রকাশ করার কি কারণ থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য হল না—সেই কারণেই বলেছিলাম, শ্রীদাশগুপ্তের প্রশ্নগুলি তোলা 'বৃথা'। এই নিষ্ফলতাই সম্ভবতঃ অমিতাভর মনে এক ট্র্যাজিক ব্যর্থতাবোধ এনে দিয়েছে—যেজন্য পল ব্যারাণকে উদ্ধৃত করে মোটাদাগে বলেছেন, 'পশুর' সঙ্গে মানুষের বিষয়ে কথা বলা, সময় নষ্ট করারই নামান্তর। মৌলবাদীকে 'পশু'—জ্ঞান করা এক প্রকার অব-মনুষ্যীকরণ (ডি-হিউম্যান ইজেশন) ছাড়া কিছু নয়। আড়কাঠি বর্ণহিন্দু মহাজনও আদিবাসী ঝাড়খণ্ডীকে পশু জ্ঞান করেন। এই অব-মনুষ্যীকরণ আমাদের সমাজে শোষণকে একপ্রকার বৈধতা দান করে কারণ আমরা মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে পাপ মনে করলেও পশুর ওপরে মানুষের শোষণকে পাপ মনে করিনা। মৌলবাদীর ওপর যুক্তিবাদীর শোষণের ধরণটা হুবহু একইরকমের। অমিতাভ লিখেছেন: "মৌলবাদ নির্বিচারে দমন করে সমস্ত প্রতিবাদ পদদলিত করে সব-প্রতিবাদী শক্তিকে, কণ্ঠরোধ করে সকল বিরোধিতায়। ...এই হচ্ছে মৌলবাদের প্রকৃত রূপ—রক্তপিপাসু, নিপীড়ক রূপ...।" অমিতাভর যুক্তিবাদের রূপও এর থেকে কম 'রক্তপিপাসু বা নিপীড়ক' নয়।

যুক্তিবাদের সুউচ্চ মিনারে চড়ে মৌলবাদীর সঙ্গে কোন কথোপকথনই সম্ভব নয়—যে 'অসম্ভব' হ-য-ব-র-ল কথোপকথন চলে তা অকারণ হাসির উদ্রেক করে। যথার্থ কথোপকথন তখনই চলতে পারে যখন কথোপকথনকারী দুই (বা ততোধিক) প্রতিপক্ষ ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতকগুলি রীতি বা 'রেওয়াজ' ('কনভেনশনস') মেনে চলে। এই রেওয়াজগুলি একদিনে তৈরি হয় না; যে কোন সমাজেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠে।

এই রেওয়াজগুলি রপ্ত এবং 'আত্মস্থ' না করতে পারলে আমরা কোন কথোপকথন চালাতে পারি না।[১৯] কথা হল, এগুলিকে 'আত্মস্থ' করতে হলে মৌলবাদের ফাঁদে না পড়ে যুক্তিবাদের পরিসীমা অতিক্রম করার মতো কুশলতা থাকার প্রয়োজন হয়। এর অর্থ কখনোই প্রশ্নহীন সহিষ্ণুতা নয়। ভাষার অলঙ্ঘনীয়তাকে ভাঙতে গেলে ভাষারই শরণাপন্ন হতে হয়। এটা কি করে সম্ভব—তার একটা আংশিক উত্তর দিয়েছিলাম মোটামুটি সাম্প্রতিক এক বাংলা প্রবন্ধে।[২০] সেখানে যা বলেছিলাম তার মর্মার্থ হল, 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাই ধর্মের নামেই ; ধর্মকে নাকচ করে নয়'। ধর্মই হল ভারতবর্ষে যে কোনো কথোপকথনের রেওয়াজ। আসামের পরিপ্রেক্ষিতে আলফার রাজনীতি (১৯৭৯-৯১) এই লক্ষ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। আশ্চর্য অধ্যবসায়ের পরকাষ্ঠা দেখিয়ে এই সংগঠনটি সমাজের প্রচলিত রেওয়াজগুলিকে আয়ত্ত এবং 'আত্মস্থ' করেছে—মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার জন্যে। আলফা ভারতীয় রাজনীতিতে যে নতুন ধরণের সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করেছে তার নান্দনিক (ইস্থেটিক) উৎকর্ষ ঠিক এই জায়গাটায়।[২১]

ঠিক এই ধরণের মৌলবাদবিরোধিতাই আমাদের কাছ থেকে রেওয়াজগুলিকে 'আত্মস্থ' করা কেবল সহিষ্ণুতাই নয়—কুশলতাও দাবি করে।

বলা বাহুল্য, প্রত্যুত্তরের ছোট পরিসরের বাইরেও রয়ে গেল আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—যা অমিতাভ তুলেছেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচরিত্র নির্ণয়ে অমিতাভর প্রশ্ন যেমন খুব প্রাসঙ্গিক। তাঁর ভাষায়, "ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র মৌলবাদবিরোধী, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক কোনওটাই নয়, মৌলবাদ তোষণ এবং মৌলবাদের সঙ্গে আপস আমাদের রাষ্ট্রের শুরু থেকে আজ অবধি ইতিহাস।" আমি এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা 'মৌলবাদী বনাম যুক্তিবাদী'—এভাবে আসেনি। যেখানে মৌলবাদ এবং যুক্তিবাদ অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করছে সেখানে এই প্রশ্নের এককাট্টা মীমাংসার চেষ্টা করা নিরর্থক। এই বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে বিশদভাবে লেখার ইচ্ছে পোষণ করছি।

সূত্রনির্দেশ :

১। সমীর কুমার দাস, 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ', পরিচয়, ৬৩ (১-৩), শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০০, পৃঃ ৬৫-১০৭

২। সুরজিৎ দাশগুপ্ত, 'প্রসঙ্গঃ 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ,' পরিচয়, ৬৩ (৪-৫), অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৪০০, পৃঃ ১৫-২২।

৩। অমিতাভ চন্দ্র 'মৌলবাদ বনাম যুক্তিবাদরূপ' মৌলবাদ বিরোধিতা 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ' প্রবন্ধের সংযোজনে', ঐ, পৃঃ ১৪৫-৫৮।

৪। শেলডন পোলক, 'রামায়ণ এ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল ইম্যাজিনেশন ইন ইণ্ডিয়া', দ্য জার্নাল অফ এসিয়ান স্টাডিজ, ৫২ (২), মে, ১৯৯৩।

৫। ম্যাককিম ম্যারিয়ট, 'কনস্ট্রাকটিং এ্যান ইণ্ডিয়ান এথনোসোসিওলজি', দ্রষ্টব্য, ম্যার্ককিম ম্যারিয়ট (সম্পাদিত), ইণ্ডিয়া থ্রু হিন্দু ক্যাটেগরিজ (নয়াদিল্লী : সেজ, ১৯৯০), পৃঃ ৮।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯), পৃঃ ১১০।

৭। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলকাতার জীবনে দাঙ্গা', অনুষ্টুপ, ১৭ (৪), ১৯৯৩, পৃঃ ২।

৮। ঐ, পৃঃ ২-৩।

৯। আশিস চ্যাটার্জী, মৌলবাদ : বিজ্ঞানের চরমতম শত্রু (কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ১৯৯৪), পৃঃ ৬।

১০। গৌতম ভদ্র : 'প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ২'. নাইয়া, ২ (১), বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯৯. পৃঃ ১৯।

১১। ডেভিড পার্কিন, রিজন, ইমোশন, এ্যাণ্ড দ্য এমবডিমেণ্ট অফ পাওয়ার', দ্রষ্টব্য, জোয়ানা ওভারিং (সম্পাদিত), রিজন এ্যাণ্ড মরালিটি (লণ্ডন : ট্যাভিস্টক, ১৯৮৫), পৃঃ ১৪২।

১২। থিয়ডোর এ্যাডোর্নো এবং ম্যাক্স হরখাইমার, ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেণ্ট, জন কামিং অনূদিত (লণ্ডন : ভার্সো, ১৯৭৯), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪, 'এলিমেণ্টস অফ এ্যান্টি-সেমিটিজম : লিমিটস অফ এনলাইটেনমেণ্ট'।

১৩। ব্যারি স্মার্ট, ফুকো, মার্ক্সিজম এ্যাণ্ড ক্রিটিক (রুটলেজ এ্যাণ্ড কেগান পল, ১৯৮৩), পৃঃ ১৬।

১৪। প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (কলকাতা : এ-মুখার্জী, ১৯৮৬)।

১৫। আরনেস্ট গেলনার, নেশনস এ্যাণ্ড ন্যাশনালিজম (অক্সফোর্ড : ব্যাসিল ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৮৩), পৃঃ ২২ ,

১৬। ইউরেসিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এই একই যুক্তির অবতারণা করেছেন এরিক হবসবম। দ্রষ্টব্য, এরিক হবসবম, 'দ্য পেরিলস অফ দ্য নিউ ন্যাশনালিজম', ম্যাথু এ. ক্র্যালজিচ (সম্পাদিত), দ্য ব্রেকডাউন অফ ন্যাশনালিজম : দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এ্যাণ্ড ইস্টার্ন ইউরোপ (নিউ ইয়র্ক : দ্য এইচ. ডব্ল্যু উইলসন কোম্পানি, ১৯৯৩), পৃঃ ৬৫-৮।

১৭। জন ডান, মডার্ন রেভলিউশনস : এ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য এ্যানালিসিস অফ এ পোলিটিক্যাল ফিনোমেনন (কেম্ব্রিজ: কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯), পৃঃ ১৫৫, ২২৫।

১৮। আশিস নন্দী, অলটারনেটিভ সায়েন্সস : ক্রিয়েটিভিটি এ্যাণ্ড অথেনটিসিটি ইন টু ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিসটস (নয়াদিল্লীঃ এ্যালায়েড, ১৯৮০), পৃঃ ১০।

১৯। ফার্দিনান্দ সাস্যুর, 'সাইনস এ্যাণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ,' জেফ্রি সি. এ্যালেকজাণ্ডার এবং স্টিভেন সেইডম্যান (সম্পাদিত), কালচার এ্যাণ্ড সোসাইটি : কনটেমপোরারি ডিবেটস (কেম্ব্রিজ: কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০), পৃঃ ৫৫।

২০। সমীর কুমার দাস, 'সাম্প্রদায়িকতা বনাম স্বীকারোক্তি,' প্রতিক্ষণ এপ্রিল, ১৯৯৩।

২১। সমীর কুমার দাস, আলফা-এ পোলিটিক্যাল এ্যানালিসিস (দিল্লীঃ অজন্তা, ১৯৯৪), চতুর্থ অধ্যায়, 'দ্য ক্রিটিক'।

যুক্তি, বিশ্বাস ও জীবন

প্রদীপ বসু

“মৌলবাদ বিরোধিতার যে চরিত্র ইদানীং লক্ষ্য করছি তার সঙ্গে প্রচলিত মৌলবাদের বড় একটা ফারাক আছে বলে আমার মনে হয় না। সেও আর এক ধরণের মৌলবাদই বলা চলে।”[১]

সম্প্রতি পরিচয় (শারদ সঙ্কলন, ১৪০০)-তে প্রকাশিত তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধে শ্রী সমীর কুমার দাস উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছেন এবং ঐ মন্তব্যের সমর্থনে তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তাঁর প্রবন্ধটির উপর ইতিমধ্যেই পরিচয়-এর অপর একটি সংখ্যায় শ্রী সুরজিত দাশগুপ্ত[২] এবং শ্রী অমিতাভ চন্দ্রের[৩] দু'টি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এরূপ বিতর্ক সৃষ্টির জন্য সমীরকে ধন্যবাদ।

সমীরের প্রবন্ধের বহু অংশই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। এমনকি কোথাও কোথাও স্ব-বিরোধিতা আছে বলেও মনে হয়েছে। কিন্তু স্থানাভাবে সবিস্তারে সেই সবকিছুই নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হল না। তাই কেবল তাঁর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বলে যেগুলিকে আমার মনে হয়েছে, বর্ত্তমান আলোচনাকে সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

সমীরের মূল বক্তব্য হল, মৌলবাদ-বিরোধিতা একধরণের গোঁড়ামীপূর্ণ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তার ভিত্তি হল আধুনিক যুক্তিবাদ “যার স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের ‘আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের’ (এনলাইটেনমেন্ট) পর্ব থেকে উদ্‌ঘাটিত হতে দেখা যাচ্ছে” (পৃ ৯০)। ঐ আধুনিক যুক্তিবাদের তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন সমীর “যার সঙ্গে মৌলবাদ স্থূলত বিশ্বাসের কোন পার্থক্য নেই” (পৃ ৯০)।

সমীরের মতে প্রথম উপাদানটি হল এই যে, (ক) উক্ত আধুনিক যুক্তি “স্থান-কাল-পাত্রের ওপরে নির্ভরশীল নয়”। তাছাড়া, (খ) যুক্তিবাদীরা যুক্তির আড়ালে জাতি-রাষ্ট্রের জয়গান গেয়ে থাকেন। ঐ জাতি-রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা স্থান-কাল পাত্রের ওপরে নির্ভর করে না।

(ক) আমাদের মতে, সমীরের প্রথম অভিযোগটি অতি সরলীকৃত।

এটা ঠিক যে ঐ আধুনিক যুক্তি তার জন্মের আদিপর্বে একটি বিমূর্ত, আধিবিদ্যক, যান্ত্রিক ও অনৈতিহাসিক ধারণা ছিল। সতেরো শতকেই কার্তে যে যুক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করেন, তার মধ্যে এই যান্ত্রিকতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার রূপান্তর ঘটেছে। স্থান-কাল-পাত্র, ইতিহাস শ্রেণী চরিত্র, সাংস্কৃতিক প্রভাব ইত্যাদি বিবিধ মাত্রার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে তার বহুরূপ প্রকাশ পেয়েছে। মাইকেল স্যাণ্ডেল যাকে 'de-ontological liberalism' বলেছেন, তা কাণ্টের বিমূর্ত ও ভাববাদী যুক্তি এবং 'transcendental self'-এর পথ অতিক্রম করে উপনীত হয়েছে Rawls-এর আধুনিক উদারনীতিবাদে যেখানে 'Thin Theory of Justice'-এর মত একটি 'empirical theory'-র সাহায্যে উদারনীতিবাদকে অধিবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আবার, অন্যদিকে পোষ্ট-এনলাইটেনমেণ্ট রিজন-এর Critique হিসেবে উদ্ভব ঘটেছে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর দ্বান্দ্বিক যুক্তির। Anti-Duhring গ্রন্থে Engels-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

"···in its theoretical form, modern socialism originally appears ostensibly as a more logical extension of the principles laid down by the great French philosophers of the eighteenth century···everything must justify its existence before the judgement-seat of reason or give up existence. Reason became the sole measure of everything. ...Every form of society and government then existing, every old traditional notion was flung into the lumber-room as irrationality···.

We know today that this kingdom of reason was nothing more than the idealised kingdom of the bourgeoisie ···that the government of reason, the Contrat Social of Rousseau, came into being, and only could come into being, as a democratic bourgeois republic. The great thinkers of the eighteenth century could, no more than their predecessors, go beyond the limits imposed upon them by their epoch.'[৪]

মার্কস-এঙ্গেলসের' দ্বান্দিক যুক্তি শেষ পর্য্যন্ত আঠারো শতকের যুক্তিবাদকে tnanscend করে যায়, তার negation of negation-এর মধ্যে দিয়েই দ্বান্দিক যুক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ দ্বান্দিক যুক্তি-বস্তুবাদী, এটি ঐতিহাসিক সুনির্দিষ্টতায়, বিশেষত শ্রেণীগত চরিত্রের নির্ণায়ক ভূমিকায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ যুক্তিবাদ ক্রমশঃ স্থান-কাল-পাত্র-নির্ভর হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করুণ, ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি, উৎস মানুষ পত্রিকা এঁরাও মূর্ত ও ইতিহাস-নির্ভর যুক্তিবাদের স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছেন।[৫] সুতরাং এখানে সমীরের ধারণাটি সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট।[৬]

(খ) জাতি-রাষ্ট্রের সঙ্গে সমীর যেভাবে পোষ্ট-এনলাইটেনমেণ্ট রিজনকে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন সেটাও প্রশ্নযোগ্য। প্রথমে ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যাক্। এটা ঠিক যে আলোচ্য আধুনিক যুক্তির ধ্যান-ধারণাগুলি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র দ্বারা বহুক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে তা সত্য, জাতি-রাষ্ট্রের সংবিধানে, আইন-আদালতে, প্রশাসনে ঐ যুক্তিবাদের ঘোষিত স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির অভ্রান্ততা দাবী করে জাতি-রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী করে তোলে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে সে পদানত করে, দমন করে, appropriate করে, স্ব-আরোপিত স্বাভাবিকতার (normal standard) মানদণ্ডের নিরিখে, বলপ্রয়োগ দ্বারা সে তাদের একধর্মী করে তোলে (homogenises)[৭]। এসবই সত্য, কিন্তু এগুলি বাস্তব ইতিহাসের বিষয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা অসঙ্গতিপূর্ণ, বাস্তবে তা থাকবে না এমন কথা বলা যায় না।[৮] বিশেষত সেখানে যখন এক মহাশক্তিধর শাসক শ্রেণী থাকে। তার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে যায় অন্যদের, তার ক্ষমতা তার অযুক্তিকে যুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করে, সত্যের একমাত্র প্রতিনিধি হয় সে, তাত্ত্বিক অসঙ্গতিকে সে নিশ্ছিদ্র যুক্তিনিষ্ঠরূপে পরিচয় দেয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর দায়িত্ব ঐ যুক্তির নয়, বরং জাতি-রাষ্ট্রের ও তার শাসক শ্রেণীর।

বরং আমরা এবার তাত্ত্বিক দিক থেকে জাতি-রাষ্ট্র ও আলোচ্য যুক্তির সম্পর্কটিকে বিবেচনা করতে পারি। ঐ যুক্তিবাদ তত্ত্বগতভাবে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সার্বজনীন যুক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সতেরো শতকের শেষেই

লক প্রতিটি ব্যক্তির self interest ও instrumental reason-এর কথা বলেন। আঠারো শতকের শেষার্ধের কান্টীয় দর্শনে রয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির moral autonomy-র ধারণা, বস্তুত যুক্তি-নির্ভর উদারনীতিবাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ atomic individual-দের নিয়ে বিশ্বজুড়ে একটাই Civil Society ও একটাই সীমিত রাষ্ট্র গড়ে ওঠাটাই কি যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হবে না? এখানে তত্ত্বগতভাবে জাতি-রাষ্ট্রে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কারণ সেখানে ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই সার্বজনীন, অনৈতিহাসিক, সংস্কৃতি মুক্ত, শ্রেণী নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বারা চালিত। নেশান হল একটি কমিউনিটি, যার সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তি ভিত্তিক যুক্তিবোধের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। ঐ কমিউনিটির ভিত্তি হতে পারে অভিন্ন ভাষা, ধর্ম, রক্তের আত্মীয়তা, ভালবাসা, মানসিক একাত্মতা, ঐতিহ্য ইত্যাদি। নেশানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য, ঐতিহাসিক কারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন ইত্যাদির উপস্থিতি থাকা সম্ভব। কিন্তু সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠে যুক্তিবাদী, স্বার্থসচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে, ব্যক্তির rights-এর ভাষায় সেখানে কথা বলা যায়, ব্যক্তিদের পরস্পরের সাথে চুক্তির স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত। সুতরাং জাতি রাষ্ট্রের সদম্ভ আস্ফালনের জন্য তত্ত্বগতভাবে যুক্তিবাদকে দায়ী করা চলে না। সমীরের অভিযোগ ঠিক নয়।

সমীরের মতে, আলোচ্য যুক্তিবাদের দ্বিতীয় মৌলবাদ সুলভ উপাদান হলো এই যে, এটি বিশ্বাস করে নেয় যে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী যুক্তির মধ্যে এমন সাধারণ নিয়ম আছে যার নিরিখে তাদের তুলনা করে তাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ সেটা নির্দ্ধারণ করা চলে। তাই ভিন্‌দ্রাণওয়ালে যেভাবে বলেন একজন শিখ সওয়া লাখ হিন্দুর সমকক্ষ, একইভাবে যুক্তিবাদীরা বলেন যে নির্বাচনী প্রচারে প্রভূত অর্থব্যয় না করে খরাপ্রবণ গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসানো ভাল। সমীর আরও দেখান যে, একইভাবে সুরজিৎ দাশগুপ্ত হিন্দু মৌলবাদের বিরোধিতা করেন নিজস্ব স্বতঃসিদ্ধ বা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হবার ফলে। সমীরের মতে, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, মৌলবাদ বা মৌলবাদ-বিরোধিতা—দুইয়ের ভিত্তিতেই আছে বিশ্বাস। পরস্পর-বিরোধী বিশ্বাস কোন সাধারণ নিয়মের আওতায় পড়ে না" (পৃ ৯৪)।

সমীরের বক্তব্যের উক্ত অংশকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ তিনি ভিন্‌দ্রাণওয়ালের বিশ্বাস এবং নলকূপের প্রশ্নটিকে একই চরিত্রের

বলে মনে করেছেন। সমস্যাটি এখানে আসলে জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) ।আমার মনে হয় এখানে 'যুক্তি' (reason) শব্দটিকে আরও সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। এটা ঠিক যে সাম্প্রতিক কালে পোষ্ট মডার্নিষ্ট ও পোষ্ট-স্ট্রাকচারালিষ্ট চিন্তা ঘরানার প্রভাবে, যুক্তির আপেক্ষিকতা (relativism) নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। ফরাসী দার্শনিক ফুকো থেকে শুরু করে বাঙালী ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী পর্য্যন্ত অনেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যুক্তির সাথে ক্ষমতা, dominant discourse জাতি-রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে পর্য্যালোচনা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, যে অর্থে পাশ্চাত্যের আধুনিক যুক্তিকে সর্বজনীন সত্য বিজ্ঞান, অভ্রান্ত, ইত্যাদি বলে এযাবৎ দাবী করে আসা হয়েছে তার মধ্যে বহুবিধ অসংগতি ও মিথ্যা অনুপ্রবেশ করেছিল। যুক্তিবোধের মূলে এক একটি সমাজের সংস্কৃতির ভূমিকা কম নয়। তাই পাশ্চাত্ত্য ঐ যুক্তিই এক-মাত্র যুক্তি নয়। বহু অবদমিত, পার্শ্বস্থ, সীমান্তবর্তী (marginalised) যুক্তি থাকা সম্ভব। তাদের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ তার বিচার এত সহজ নয়। এককথায় বলা যাবে না যে পাশ্চাত্ত্য ঐ যুক্তির মাপকাঠিতেই পৃথিবীর সব গোষ্ঠীর, সব লোক-সমাজের যুক্তির মূল্যায়ণ সম্ভব। যা কিছু পশ্চিমী ঐ যুক্তিসম্মত, তাই সত্য, অভ্রান্ত ও প্রগতি এমন দাবী করা যায় না। এটাকে অনুধাবন করতে না পারলে আজকের বিশ্বে কমিউনিটারিয়ান তত্ত্বচিন্তা, ফেমিনিজম বা পরিবেশবাদী আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতাকে বোঝা দুষ্কর। সমীরের বক্তব্য তাই এদিক থেকে ভুল নয়।

ভুলটা অন্য জায়গায়। সে ভুল পোষ্ট-মডার্নিষ্ট ও পোষ্ট-স্ট্রাক্‌চারালিষ্ট ধারার অনেক রচনাতেই লক্ষ্য করা সম্ভব। সেটা হল যুক্তির কোন বাস্তব ভিত্তি যে থাকতে পারে সেটাকেই অস্বীকার করা। যুক্তিকে নিছকই বিমূর্ত্ত কল্পনা ও বিশ্বাসের বিষয় করে তোলা হয়। বাস্তব সম্মত কোন যুক্তির অস্তিত্বের সম্ভবনাকেই নাকচ করে দেওয়া হয়। সব যুক্তিই বিশ্বাসের ফসল, বিভিন্ন লোক-সমাজের সংস্কৃতি অনুসারে তাই যুক্তিও বিভিন্ন। ,সুতরাং যুক্তি-অযুক্তির মধ্যে কোন্‌টা উৎকৃষ্ট তা নিয়ে বিচার চলে না। যুক্তি-অযুক্তি বলে কিছু নেই। সবগুলিই হল বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস প্রক্রিয়া। এভাবে সৃষ্টি হয় এক চরম আপেক্ষিকতা, 'সব কিছুই মায়া' এমন এক চিন্তাগত অবস্থান। পোষ্ট এন্‌লাইটেন্‌মেণ্ট যুক্তির 'বৈজ্ঞানিকতা' ও 'অভ্রান্ততা'র বাড়াবাড়ির

পরিণামে তার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজ এরূপ চরমপন্থী ও বিপরীত মেরুর অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে। একে বলা চলে philosophical nihilism-এর আধুনিক রূপ। এর চরম প্রকাশ ঘটে দেরিদার রচনাতে। 'text'-এর বহুবিধ অর্থ (দেরিদা), 'grand narrative' হিসেবে ইতিহাসকে বর্জন (ফুকো), চিন্তার অনির্দ্দিষ্টতা, 'fixed identities and boundaries এর বিরোধিতা, 'unilinearity'-এর ধারণাকে ত্যাগ করা ইত্যাদির মাধ্যমে কান্টীয় যুক্তির চরম কর্তৃত্ববাদের যেমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সম্ভব হয়েছে, তেমনি আবার দার্শনিক নৈরাজ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার চরমপন্থী প্রবণতাও বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হল বাস্তব জগতটাতো ঠিক এরকম নয়। বাস্তব দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কতকগুলি প্রাথমিক যুক্তিকে মেনে নিয়ে তবেই কিন্তু ঐ বেঁচে থাকাকে, তার প্রাথমিক যুক্তিকে প্রশ্ন করা চলে। বাস্তবে অস্তিত্ব থাকা ও ঐ অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা—এ দুইয়ের মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিকতার সম্পর্ক রয়েছে। সজীব, চিন্তা করতে সক্ষম মানুষের মধ্যে জৈব অস্তিত্ব, বাস্তবতা, চিন্তন প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে সংশয় ও সন্দেহ জাগবে নিশ্চয়ই। কিন্তু একইসাথে এটাও সত্য যে, বাস্তবতার যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রাক্-শর্ত [প্রাক্-শর্ত না বলে সমকালীন বা সহ বিদ্যমান (simultaneous) শর্ত বললে আরও যথার্থ হবে] হল বাস্তবতার যুক্তি মান্য করে নিয়ে বাস্তবে বিদ্যমান থাকার সামর্থ্য। একটিকে বর্জন করে অপরটি হয় না। একটি হয়ে থাকে অপরটির সমকালীন অপরিহার্য্যতার মধ্যে দিয়ে। একটির মধ্যে দিয়েই অপরটিকে ধরে নিতে হয়। জীবন ও জীবন-ভাবনা এদুইয়ের মধ্যে একধরণের অভিন্নতা আছে, একধরণের ভেদ আছে, একের মধ্যে অপরের মিলে যাওয়া আছে ও আবার বেরিয়ে আসাও আছে, একটির মধ্যে অন্যটির জীবন ভোমরা লুকিয়ে আছে, একটির সাথে অপরটির দ্বন্দ্ব, সংঘাত ওবিরোধ আছে। জীবনের বিরোধিতার ভাবনা নিশ্চয়ই করা চলে। কিন্তু ঐ ভাবনা নিজে সম্ভবপর হয় জীবনের সাথে যুক্ত থেকে, জীবনের মধ্যে থেকে। কেউ বলতে পারেন তাঁর ভাবনা জীবন ও বাস্তবতার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ঐ বলাটাও সম্ভব হয় ঐ 'কেউ' এর বাস্তব জীবন ও অস্তিত্বের সম্ভবপরতার মধ্যে দিয়ে।

যারা বাস্তব নিয়ে চিন্তাকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন, তাঁরা ঐ

দুটির দ্বান্দ্বিক এই সম্পর্কটিকে বিস্মৃত হয়েছেন। ঐ সম্পর্কটি যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার, ঐক্য ও সংগ্রামের, একথা তাঁরা বুঝতে চান না। বাস্তব কী? সত্য কী? মূল অস্তিত্ব, মানুষ, ভাষা—এসব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন একান্তই কাম্য এতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে বদ্ধ, সূত্রায়িত, 'অভ্রান্ত' সত্য নিয়ে অন্ধ জীবনযাপন করতে হবে। তাই প্রশ্ন তোলা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রশ্ন তোলার মত বাস্তবতাটাকে মেনে নিয়েই ঐ প্রশ্ন তোলা চলে, 'মানুষ' বলে কিছু নেই, 'সত্য নেই', 'জ্ঞান নেই', 'শব্দ নেই', 'লেখক নেই' 'লেখাও নেই', —প্রশ্ন আকারেই শুধু একথাগুলির দার্শনিক মূল্য আছে। উত্তর হিসেবে নয়, প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ববাদী 'অভ্রান্ত' জ্ঞান-চর্চাকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রেই এগুলির সার্থকতা, বিকল্প জ্ঞানের সন্ধান দেবার ক্ষেত্রে নয়। কারণ 'কোন কিছু নেই' এটাই যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা বলার জন্যেও কেউ থাকতে পারে না। অর্থাৎ সত্য উদ্‌ঘাটনকারী কেউ থাকতে পারে না। ফলে 'কোন কিছু নেই' এ সত্যটা জানাটাও সম্ভব হতে পারে না। 'কোন কিছু কি আছে?' এ প্রশ্নটা বরং তোলা চলে। কিন্তু 'কোন কিছু নেই,' মানে আমিও নেই, তুমিও নেই। কে তাহলে বাস্তবতাকে প্রশ্ন করছে? প্রশ্ন করতে গেলে প্রশ্নকর্তাকে থাকতে হয়। এটা তার প্রাক্-শর্ত বা সমকালীন শর্ত। 'বাস্তব' বা 'সত্য' নেই, এরূপ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে বা তার প্রাক্কালে বলা বরং সঙ্গত হবে যে, 'বাস্তব' বা 'সত্য' সংক্রান্ত প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে বহু ফাঁক ও ফাটল আছে। ব্যাপারটা হল, আমি বলে উঠছি—"আমি কিছু বলছি না।" ডেকার্তের বিখ্যাত উক্তিটিকে উল্টে-পাল্টে নিয়ে বরং বলা চলে—"I think as I am"। আমি আছি ও চিন্তা করতে পারছি যে 'আমি চিন্তা করতে পারি না'।

বস্তুত Post Enlightenment Reason ছাড়াও চেতনার জগতে আর এক ধরণের মৌলিক যুক্তির অস্তিত্ব আছে যাকে আমরা বলতে পারি Reason of Life বা জীবন-ধর্মীযুক্তি। এর চরিত্র প্রায় সর্বজনীন। এন্‌লাইটেন-মেন্টের বহু পূর্ব থেকে এর প্রায় সর্বব্যাপী অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয়। প্রাক্‌আধুনিক যুগে, কমিউনিটির মধ্যে, অথবা, জন-সাধারণের Common Sense-এ, প্রায় সর্বপ্রকার যুক্তি ও বিশ্বাসের পিছনে, কান্টীয় যুক্তি, হেগেলীয় যুক্তি, মার্কসীয় যুক্তি, এমনকি বহু ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে, সেগুলির গভীরে বা মর্মমূলে, ঐ জীবন-ধর্মী যুক্তির উপস্থিতি সম্ভব, এটা ঠিক যে, মার্কসীয় তত্ত্বে কিন্তু বিশুদ্ধ,

অনৈতিহাসিক, সার্বজনীন ও ভাববাদী রিজনের ধারণাটি বর্জিত। সেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব যুক্তি-নির্ধারণে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তার ফলে একশ্রেণীর যুক্তি অপর এক শ্রেণীর যুক্তি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। মতাদর্শগতভাবে যুক্তির চরিত্র নির্ধারিত হয়। কিন্তু সেখানেও নিঃসন্দেহে মূলে উপস্থিত রয়েছে জীবন-ধর্মী যুক্তি। না হলে মার্কসবাদ শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির কথা বলতো না, বলতো না যে কমিউনিষ্ট সমাজে প্রতিটি মানুষ জীবনের পরিপূর্ণতম বিকাশ ঘটাতে পারবে। মার্কসবাদ নির্দ্বিধায় সর্বহারার যুক্তিবোধকে বুর্জোয়া বা সামন্ততান্ত্রিক যুক্তিবোধের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। কিসের নিরিখে এটা সে মনে করে? আরও গভীর মর্মমূলে প্রবাহিত কোন জীবন-ধর্মী যুক্তি ব্যতীত আর কোন্ নিরিখ তা হতে পারে?

বাস্তবিকই এটা ভুলে যাওয়া সঙ্গত নয় যে মানুষের জীবনে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিপুল ভূমিকা থাকলেও মানব-সত্তার একটি জৈব ভিত্তি আছে। তার অস্তিত্বের একটি মূলগত মাত্রা হল এই সত্য যে সে একটি জৈব সত্তা (biological being)। বর্ত্তমান মানব হল একটি প্রাণী যার বয়স দশ লক্ষ বছর। সুতরাং মানুষের যুক্তি নির্দ্ধারণে জৈব মাত্রাটিকে উপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আজ প্রয়োজন হল ঐ জৈব ভিত্তিটির পুনঃসন্ধান। সকল প্রকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সংশয়, আপেক্ষিকতা, ভাষাগত বন্ধন, শ্রেণীগত সীমা ইত্যাদি সত্ত্বেও এমন একটি স্থানকে সন্ধান করে নেওয়া সম্ভব যেটি সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং যেখানে শ্রেণী ও সংস্কৃতির প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুপস্থিত। অর্থাৎ, কোথাও এক স্থানে মানুষের চেতনার 'প্রায় বিশুদ্ধ' এক রূপকে খুঁজে নেওয়া যায়, যেখানে বলা যায় যে ক্ষিদেটা আমার নয়, সাংস্কৃতিক চেতনায় নয়, বরং ক্ষিদে আমার পাকস্থলীতে। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক্।

আমরা এখন মানব-জীবনের একটি নির্দ্দিষ্ট space কে বেছে নেব। তা হল ভ্রূণাবস্থা থেকে প্রথম শৈশব। এই অবস্থাকে আমরা সচেতনভাবে খুঁজে নিয়েছি কারণ এর সার্বজনীন চরিত্র আছে। শুধু তাই নয়, এসময়ে সংস্কৃতি, সভ্যতা, শ্রেণী-চেতনা ইত্যাদির প্রভাব নিতান্তই উপেক্ষণীয়। কোন শিশুই হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বাঙালী নয়, বিহারী নয়। সামাজিকভাবে তার এরকম

অন্তর্ভুক্তি নেই তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ শিশু জন্মায় কোন বুর্জোয়া বা শ্রমিক পরিবারে, কোন হিন্দু বা মুসলিম ঘরে। কিন্তু আমরা বলতে চাইছি শিশুর চেতনার ক্ষেত্রটিকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ঐ শিশু অবশ্যই ভবিষ্যতে একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ হবে, তখন তার চেতনা অনুসারে সে হয়তো হিন্দু হবে, অথবা মুসলমান। হয়তো ব্রাহ্মণ, অথবা হরিজন, অথবা নিরীশ্বরবাদী কোন কমিউনিষ্ট। কিন্তু আলোচ্য পর্য্যায়টির কথা ভাবা যাক্। এসময় শিশুর নিজস্ব চেতনার জগতে ঐ ধ্যান-ধারণাগুলি থাকা অসম্ভব। তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে তখন তার মধ্যে কোন চেতনাই নেই। বরং চিকিৎসাশাস্ত্র সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে মাতৃগর্ভে যখন মানবশিশু থাকে, তখনও তার মধ্যে এক অস্ফুট চেতনা থাকে। ঐ ক্রমশঃ স্ফুটনোন্মুখ চেতনা ও ভ্রূণের জৈব অস্তিত্বের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতির নিয়মে তার জৈব চাহিদাগুলি মেটানোর তাগিদ সৃষ্টি হয়। তার নার্ভাস সিস্টেমের স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই তার ঐ অস্ফুট চেতনাতে ঐ তাগিদ-বোধ সৃষ্টি হয়। আবার এই চাহিদাগুলি না মিটলে তার যন্ত্রণা-বোধ হয়। মায়ের শরীরে অপুষ্টি, রোগ, খাদ্যের অভাব ইত্যাদির ফলে ভ্রূণেরও কষ্ট হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা একে foetal distress বলেন। তখন ঐ ভ্রূণ গর্ভের মধ্যেই হাত-পা ছোঁড়ে, ছটফট করে। অর্থাৎ এসময়ে তার চেতনায় দু'টি উপাদান থাকে : (ক) জৈব চাহিদাবোধ এবং (খ) জৈব চাহিদা না-পূরণ-জনিত যন্ত্রণা-বোধ।

এই স্তরে তার চেতনা প্রায় 'বিশুদ্ধ' অবস্থায় থাকে। কারণ তখনও কোন সাংস্কৃতিক, শ্রেণীগত, ক্ষমতা-জাত কোন প্রভাবের সামনে সে প্রত্যক্ষভাবে উন্মোচিত হয়নি। এটা ঠিক যে সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজ-জীবন, শ্রেণী, ক্ষমতা ইত্যাদির পরোক্ষ প্রভাব থাকে। সেগুলির উপর নির্ভর করে তার পিতা-মাতার রোগ, মায়ের স্বাস্থ্য, খাদ্যাভাস, ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়া ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি ইত্যাদির ভূমিকাও থাকে। ফলে বিশ্বের সকল শিশু ভ্রূণাবস্থায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও ধ্রুবক, সার্বজনীন, চরমও শূন্যসম কোন চেতনা নিয়ে থাকে একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই কোন শিশুর অন্যের চেয়ে যন্ত্রণা বোধ বেশী বা কম হতে পারে। খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষন দ্বারা তা নির্ণয় করা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষে কঠিন না হতেই পারে। কিছু শিশু জড়বুদ্ধি বা পঙ্গু, কালা ও বোবা হয়ে জন্মাতে পারে। এভাবে এমনকি

ভ্রূণ স্তরেও চেতনার পার্থক্য থাকতে পারে, থাকে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো যে, এ ধরণের বৈচিত্র্য ও অনিশ্চিয়তা সত্ত্বেও, একটি স্বাভাবিক সাধারণ প্রবণতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নির্দ্বিধায় তাই এটা বলা যায় যে বিশ্বের যে কোন শ্রেণী, সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, জাতির ক্ষেত্রেই, স্বাভাবিক অবস্থাতে গর্ভস্থ শিশুর চেতনায় উল্লিখিত উপাদান দু'টি উপস্থিত থাকে। আমরা এখানে সচেতনভাবে স্বাভাবিকতার মানদণ্ডকে ব্যবহার করছি। মানব-শিশুর চেতনায় এমনকি ভ্রূণাবস্থার চেতনায় ঐ উপাদান দু'টি থাকতে বাধ্য। বস্তুত শুধু মানব শিশু কেন, বিশ্ব জুড়ে প্রাণী জগতের মধ্যে instinct হিসেবে ঐ দুই উপাদান বিদ্যমান। অস্বীকার করার তো উপায় নেই যে মানুষ বিশাল এক জীব-জগতেরও সদস্য। তার সত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল তার ঐ প্রাণী-সত্তা, জৈব অস্তিত্ব।

ভ্রূণাবস্থায় যে চেতনা অস্ফুটভাবে বিদ্যমান, শিশুর জন্মের পর থেকে তা ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করতে থাকে। তাই চার মাসের শিশু খিদে পেলে কাঁদতে থাকে, হাত পা ছোঁড়ে, চীৎকার করে ওঠে। সে হিন্দু হোক্ বা মুসলমান হোক্, নারী হোক্ পুরুষ হোক্ ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না কেন। তার এই বৈশিষ্ট্য মোটামুটি সার্বজনীন। প্লেটোর গ্রীক নগর রাষ্ট্রে, মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কৃষক সম্প্রদায় বা চার্লস টেলরদের কমিউনিটিতে, লকের সিভিল সোসাইটিতে, হেগেলের রাষ্ট্র বা মার্কসের কমিউনিষ্ট সমাজে—সর্বত্রই মানুষের চেতনা এই পর্য্যায়ে সাধারণ ভাবে একই। পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী চেতনার জগতে, অথবা কমিউনিষ্ট চৈতন্যের আবহে, অথবা প্রাচ্যের নিম্নবর্গীয় চেতনায়, প্রাক্-আধুনিক, আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবন-ধারায়—সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মানুষের চেতনার এই সার্বজনীনতা লক্ষ্যনীয়। এই ঘটনার গুরুত্ব কিন্তু নেহাত কম নয়।

কারণ চেতনার এই প্রাথমিক জৈব ভিত্তি থেকেই, কিন্তু জন্ম নেয় ক্রমশঃ জীবন-ধর্মী যুক্তি (reason of life)। যা কিছু শিশুর জৈব চাহিদাকে মেটায় তাই তাকে এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য। ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি ক্রমশঃ তার মধ্যে সৃষ্টি করে স্বাধীনতার উপলব্ধি, তা সে যতই প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ হোক না কেন। আবার যা কিছু শিশুকে তার জৈব চাহিদাগুলি না মেটার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়, তাও তার কাছে স্বাধীনতার আরেকটি দিককে পৌছে দেয়।

এভাবে স্বাধীনতার দু'টি দিক তার অনুভূতিতে গ্রাহ্য হয়: (ক) চাহিদা মেটানোর—কিছু পাবার—অর্থাৎ পূর্ণতালাভের দিক্ এবং (খ) যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তি, কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসার দিক্। প্রথমটি ইতিবাচক আর দ্বিতীয়টি নেতিবাচক চরিত্রের। এই স্বাধীনতাবোধ থেকেই গড়ে উঠতে থাকে মানুষের প্রার্থমিকতম যুক্তিবোধ যাকে আমরা জীবন-ধর্মী যুক্তি বলছি। যা কিছু তার প্রাথমিক জৈব চাহিদা মেটায়, তাই তার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হতে থাকে। যা কিছু তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় তাই তার কাছে কাম্য, সঙ্গত। ক্রমশঃ সে বড় হয়ে উঠতে থাকে। তার যৌক্তিক চেতনার মর্মমূলে, পরতে পরতে, গভীর অন্তঃস্থলে প্রোথিত থাকে ঐ জীবন-ধর্মী যুক্তি যার ভিত্তি হল জৈবধর্ম। ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে কোন প্রকার 'জীবন-বোধ', 'জীবনের প্রতি ভালবাসা' এসব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু উপরোক্ত উপাদান দু'টি তার চেতনায় থাকবেই। বড় হওয়ার সাথে, সাথে তার মধ্যে 'জীবন' সম্পর্কে একটি ধারণা, 'জীবনের প্রতি অনুরক্তি' গড়ে উঠতে থাকে। জৈব চাহিদা ও যন্ত্রণা-বোধের দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়িত করে আজীবন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, সামাজিক বাস্তবতা, অন্যের অভিজ্ঞতা—এসব কিছুর সাথে মিলে মিশে যায় ঐ শৈশব-স্মৃতি। তার সাথে বড় হওয়ার পরেও তো জাগ্রত থাকে ঐ জৈব চাহিদা ও যন্ত্রণাবোধ। কারণ মানুষ সর্বদাই জৈব সত্তা।

স্পষ্টতই যুক্তির একটি জীবন-মুখী চরিত্র, একটি বাস্তব ভিত্তি, একটি জৈব ভিত্তি আছে। যুক্তিমাত্রেই নিছক বিশ্বাসের বিষয় নয়। যে যুক্তি জৈব ভিত্তির বিরোধী তা যুক্তি নয়, অর্থাৎ প্রাথমিক জীবন-ধর্মী যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা অযুক্তি। এই জীবন-ধর্মী যুক্তি আর পোষ্ট-এনলাইটেনমেণ্ট আধুনিক যুক্তিবাদ এক নয়। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান কিন্তু নিঃসন্দেহে তারা ভিন্ন। আধুনিক যুক্তিবাদ যতটা পরিমাণে উদার চিন্তাকে উৎসাহ দেয়, মানবতাবাদকে সমর্থন করে, ততটা পরিমাণে এটি জীবন-ধর্মী যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আবার যতটা মাত্রায় এটি অনৈতিহাসিক, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও অনমনীয়, ততটা মাত্রায় এটি মূল জীবন-ধর্মী যুক্তির বিরোধী। আজকের ভারতে মৌলবাদ সৃষ্টি করেছে রক্তাক্ত দাঙ্গা, অর্থহীন মৃত্যু, লুণ্ঠন, ভয়াবহ হত্যালীলা। এটি নিঃসন্দেহে জীবন-মুখী প্রাথমিক যুক্তিরই বিরোধী। যাঁরা আজ এই ভয়ঙ্কর মৌলবাদের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা সকলেই কিন্তু ঐ পশ্চিমী আধুনিক যুক্তিবাদী নন, বরং জীবনধর্মী এক প্রাথমিক যুক্তিতে তাঁরা

বিশ্বাসী। তাঁরা মানুষকে ভালবাসেন, জীবনকে মূল্যবান মনে করেন, যন্ত্রণাবোধকে জীবন থেকে নির্বাসিত করতে চান। তাঁরা জীবনধর্মী মূল কোন যুক্তিবাদের অনুসারী। সমীর তাঁদের সবাইকেই ধরে নিয়েছেন ঐ আঠারো শতকের যুক্তিবাদী, এটাই তাঁর ভুল।

বস্তুত, ঐ জীবনধর্মী যুক্তি হল সর্বপ্রকার মানবতাবাদের সম্ভবপর মূল ভিত্তি, তা সে এভাবে স্বীকৃত হোক্ বা না হোক্। ভবিষ্যতের কোন মানবতাবাদী, জীবনধর্মী তত্ত্ব বা আদর্শের ভিত্তি হতে পারে এটাই। আর এটা নিঃসন্দেহে কোন নতুন কথা নয়। বিভিন্ন মতাদর্শ, তত্ত্ব ও আন্দোলনের গভীরে এই জীবন-মুখী যুক্তি নীরবে লুকিয়ে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তা-ভাবনায়, তত্ত্বে ও প্রয়োগে, সংগ্রামে, এই জীবনমুখী যুক্তির অন্তঃসলিলা ধারা প্রবহমান। সকল মানবীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ, দর্শন, তত্ত্ব, মতাদর্শকে জীবন-মুখী যুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে হয়। যেখানে তারা ঐ সঙ্গতি রেখে চলতে অক্ষম, সেখানেই তারা মূলত অযুক্তি, পরিত্যাজ্য। যতই সাংস্কৃতিক প্রভাবে মানুষ বিভিন্ন ধারণাকে প্রশ্ন করুক না কেন, শ্রেণী-চেতনার দ্বারা বিশেষ কোন শ্রেণীর যুক্তির সমর্থক হয়ে উঠুক না কেন, এটা তাকে মেনে নিতে হয় যে জৈব অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটি স্বতঃসিদ্ধ। জীবনের মূল্য সর্বোচ্চ। তাই মার্কসবাদ শ্রেণী চেতনা, শ্রেণীগত যুক্তি ইত্যাদি যেসব ধারণাকে সৃষ্টি করে ও গুরুত্ব দেয়, তাদের গভীরে কিন্তু ঐ জৈব ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান প্রাথমিক জীবন-মুখী যুক্তি বিদ্যমান থাকে। তাই মার্কসবাদ শোষণ থেকে মুক্তি, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ এসবের কথা বলে। কান্টীয় যুক্তিবাদও তার ভিত্তিমূলে জীবন মুখী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তাবাদী তত্ত্বগুলি চায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের জোয়াল থেকে জাতিগুলিকে মুক্ত করতে। পোষ্ট-মর্ডানিষ্ট ও ও পোষ্ট-স্ট্রাকচারালিস্টরা এই ‘জীবন’, ‘মানুষ,’ ‘স্বাধীনতা,’ মুক্তি’—এসব ধারণাকেই প্রশ্ন করেন। সবকিছুই ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, ভাষা-নির্ভর, ভাষা-জাত। সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল। সমস্ত ধারণাগুলিই আপেক্ষিক, কেন্দ্র বিহীন (decentred)। চরম সত্য বলে কিছু নেই। লিওটার্ডের চোখে ‘Universality,’ ‘Unity,’ এগুলি অন্যদের পদানত করে রাখার অস্ত্র। ফুকো ‘standardization’-এর বিরোধী। জ্ঞান বা সত্য সবই আপেক্ষিক ও ক্ষমতার সাথে অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। ফুকো যখন ক্ষমতার সর্বব্যাপী প্রকৃতির

স্বরূপ উন্মোচন করেন, তখন কি তাঁর রচনাতে প্রচ্ছন্ন থাকে না ক্ষমতার দমনমূলক চরিত্রের উদ্‌ঘাটন যা মানুষের সামর্থ্যকে বাড়ানোর সাথে সাথে তার স্বাধীনতাকে পিষ্টও করে? প্রচ্ছন্ন থাকে না জীবনের পূর্ণতম স্বচ্ছন্দ বিকাশের প্রতি তাঁর নীরব আগ্রহ? নইলে তিনি কেন বলেন—"···there is indeed always something in the social body, in classes, groups and individuals themselves which in some sense escapes relations of power, something which is by no means a more or less docile or reactive primal matter, but rather a centrifugal movement, an inverse energy, a discharge"[৯] তাঁর মতে, "···there are no relations of power without resistances; the latter are all the more real and effective because they are formed right at the point where relations of power are exercised;···" ।[১০] প্রশ্ন হল ক্ষমতা হল সর্বব্যাপী ও তা সর্বত্র সৃষ্টি করে প্রতিরোধকে—কিন্তু কেন? তার ভিত্তি কী? জীবনমুখী যুক্তির ভিত্তিকে স্বীকার করতে না পারার মধ্যে কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যায় স্ব-বিরোধিতা। স্বীকার করুন বা না করুন, দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর সাম্প্রতিক একটি Interview-তে যা বলেছেন তাতে ঐ. প্রচ্ছন্ন জীবন-মুখী যুক্তির অস্তিত্বই কিন্তু প্রমাণিত হয়। দীপেশ বলছেন: "ধরো একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে, আমার মনে হচ্ছে যে এখুনি একটা কিছু করা উচিত। তো যে আমিটা তা ভাবছে, সেটা কিন্তু আমার একাডেমিক সত্তা, তত্ত্ব করা সত্তা নয়। আমার তত্ত্ব নিরপেক্ষেই সেখানে একটা কিছু তক্ষুনি করতে হবে। একটা উদাহরণ দিই। ধরো দেওরালার রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনা। একজন অ্যাকাডেমিক হিসেবে আমি সতী নিয়ে যাই-ই লিখি বা ভাবি না কেন, তা নিয়ে আমার ক্যাটেগরাইজেশন যাই-ই হোক না কেন. দেওরালায় সেই মুহূর্তে থাকলে, প্রাথমিকভাবে আমি সতীর বিরোধিতা করতাম এবং যে জায়গা থেকে করতাম সেটা আমার সত্তা নয়। তার মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে—আমার শৈশব আছে, বড় হওয়া আছে। আমিও ইতিহাসের প্রোডাক্ট, শুধু ইতিহাস লেখক নই" [১১]।

একই কারণে রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড আর্নল্ড প্রমুখেরা সাব-অলটার্নদের প্রতিরোধ, ক্ষমতার বিরোধিতা ও প্রতিরোধী চেতনাকে

গুরুত্ব দেন। স্পষ্টতঃই এগুলির গভীরে নিহিত আছে একটি প্রাথমিক জীবনমুখী যুক্তি। পোষ্ট-মডার্নিজম, পোষ্ট-স্ট্রাকচারালিষ্ট ঘরানায় কেউ কেউ তবুও ঐ প্রাথমিক রিজন অফ লাইফকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে যুক্তির কোন বাস্তব বা জৈব ভিত্তি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতির ফসল, যুক্তির কেন্দ্রে থাকে নিছকই বিশ্বাস। এই সমস্যার কথা ভেবেই বোধহয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থের ভূমিকায় বলছেন :

“By now knowledgeable people all over the world have become familiar with the charges leveled against the subject-centred rationality characteristic of Post-Enlightenment modernity. …Against this arrogant, intolerant, self-aggrandizing rational subject of modernity, critics in recent years have been trying to resurrect the virtues of the fragmentary, the local, and the subjugated in order to unmask the will to power that lies at the very heart of modern rationality and to decenter its epistemological and moral subject.… However, a persistent difficulty has been that by asserting an inseparable complicity between knowledge and power, this critique has been unable adequately to vindicate its own normative preferences and thus to provide valid grounds for claiming agency on behalf of persons, groups, or movements.”[১২]

সমীরের ভুল এখানেই যে তিনি জীবন মুখী যুক্তির প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেছেন। তাই তাঁর চোখে ভিনদ্রানওয়ালের মন্তব্য আর নলকূপের প্রয়োজনীয়তা—এদু'টি একই status-এর প্রশ্ন, এরা নিছকই দুটি বিভিন্ন বিশ্বাসের ফসলমাত্র। কারণ যুক্তির কোন বাস্তব মানদণ্ড নেই। তাহলে সমীর নিজে কেন দাঙ্গা, মসজিদ-ধ্বংস, রক্তপাত এসবের বিরোধিতা করেছেন? কেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফুকোর অনুসরণে সমীর ইরাণের মৌলবাদী সংগ্রামকে সমর্থন করলেন? কেন তাহলে পোষ্ট-মডার্নিস্টরা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিকের প্রতিরোধকে celebrate করেন? কেন সমীর যুক্তিবাদী কর্তৃত্ব, জাতি রাষ্ট্রের দমন-পীড়ন ইত্যাদির বিরোধিতা করছেন?

যে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ-সাধন না করে যুদ্ধ, ধ্বংস ও জীবনহানি, যন্ত্রণাবৃদ্ধি ঘটায়, তার নিন্দা করেন? একি তাঁদের নিছক বিশ্বাসের প্রশ্ন? বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তি? তিনি সেরকম ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলবো আসলে তাঁর চিন্তা ও যুক্তির গভীরেও ঐ প্রচ্ছন্ন জীবন-ধর্মী যুক্তিবোধ ক্রিয়াশীল। ঐ জীবনমুখী যুক্তির সুদূর গভীরে, দূরবর্তী মর্মমূলে একটি জৈব ভিত্তি রয়েছে। সেটাকে অনুভব করতে না পারাটাই তাঁর ভুল। সব যুক্তিই একধরণের বিশ্বাস মাত্র নয়, কিছু যুক্তির একটি বাস্তব ভিত্তি আছে, সেখানেই তার উৎকৃষ্টতা।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, মানুষের সংস্কৃতি, নীতিবোধ, তর্ক-বিতর্ক, যুক্তিবোধ ইত্যাদি সরলরৈখিক ও যান্ত্রিকভাবে reason of life-এর ফল নয়। তেমনি reason of life-ও সরলরৈখিক যোগসূত্রে জৈব ভিত্তির ফসল নয়। এগুলির মধ্যবর্তী বহু স্তর থাকে। বহু জটিলতা ও বহুমাত্রিক মিথস্ক্রিয়া থাকে। শিশুর জন্মের পর থেকেই তার চেতনায় সংস্কৃতি ও শ্রেণীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তে থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক. সাংস্কৃতিক কারণগুলির সামনে সরাসরি উন্মোচিত হয় সে। তার মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যুক্তিবোধ, জ্ঞানচর্চা, সত্য সম্পর্কে ধারণা, যুক্তির মানদণ্ড, বিশ্বাস এসবকিছুই যথেষ্ট পরিমাণে নির্দ্ধারিত হতে থাকে তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ক্ষমতার পারিপার্শ্বিক ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। এ এক জটিলতম প্রক্রিয়া সন্দেহ নেই। ব্যক্তির একক, বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসৃষ্ট (self-determined) কোন স্বার্থ, কোন অনৈতিহাসিক, বিশুদ্ধ যুক্তি থাকা সম্ভব নয়। লকের 'ব্যক্তি', কান্টের rational autonomy সত্যকে প্রকাশ করতে অক্ষম। ব্যক্তি-সৃষ্টির মূলে থাকে সমষ্টি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, সমাজ, সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। ব্যক্তি সৃষ্টিই হয় ঐ সমষ্টির একজন হয়ে। ব্যক্তিকে ভাবা সম্ভব একই সাথে সে যার অন্তর্ভুক্ত সেই সমষ্টিকে ভেবে নেওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি, জীবধর্ম, সংস্কৃতি, শ্রেণী, সমষ্টি জীবন—এসবের জটিলতম এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলমান অবস্থাতেই, দ্বান্দ্বিকতার অবস্থাতেই ব্যক্তির যুক্তিবোধকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ে চিহ্নিত করা চলে। আবার, সমষ্টিগত সংস্কৃতি. যৌথ চেতনা, শ্রেণী চেতনা ইত্যাদি নিজেকে বিভিন্ন পৃথক পৃথক ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে মূর্ত ও সুনির্দিষ্টরূপে বিশেষরূপে (particular) প্রকাশ করে। ফলে সৃষ্টি হয় বহুবিচিত্র ব্যক্তি, মূল্যবোধ, তত্ত্ব-

দর্শন ও আদর্শ। বহু সময়েই নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শ্রেণীগত চাহিদাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। সেগুলি না মিটলে তীব্র যন্ত্রণাবোধের জন্ম দিতে পারে। সাংস্কৃতিক ও শ্রেণীগত চাহিদার অনুগামী যুক্তির অবশ্যই কিছুটা স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা থাকতে পারে। বিপ্লব, আদর্শ, নীতিবোধ, শ্রেণীমুক্তি, জাতীয় স্বাধীনতা বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। ফলে হয়তো তাৎক্ষণিক জৈব চাহিদার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সবটুকু নিশ্চয়ই মূল কোন জীবন-ধর্মী যুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তাই সমীরের মনে হয়, বিভিন্ন প্রকার যুক্তির গভীরে আছে বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস। যখন বিভিন্ন যুক্তির অস্তিত্ব আছে, তখন সমীরের মতে সাধারণ মানদণ্ডের অভাবে তাদের তুলনামূলক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা বলবো যে বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে তুলনা করা সম্ভব, উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করা সম্ভব। এটা দেখা সম্ভব যে বিশেষ কোন যুক্তি মূল জীবন ধর্মী যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। আমরা যখন বিভিন্ন যুক্তি ও তর্কের মধ্যে বিতর্ক থেকে উৎকৃষ্টতর যুক্তিকে নির্বাচন করি, তখন ঐ প্রক্রিয়ার গভীরে নিহিত থাকে একটি মূল মানদণ্ড। তা হল শেষ বিচারে কোন্ যুক্তিটি জীবন-ধর্মী তাকে সনাক্তকরণের প্রচ্ছন্ন চেতনা। তাই যদি উপরিতলের বিবাদমান যুক্তিগুলিকে ক্রমাগত প্রশ্ন করা যায়—'কেন? কেন? কেন?' যদি বলি উপরের ঐ স্তরের আপাত-স্বাধীন ধারণাগুলি দাঁড়িয়ে আছে নীচের কোন্ ধারণাগত ভিত্তির উপর? তারও নীচে, আরও মূলে প্রচ্ছন্নরূপে প্রোথিত আছে কোন্ ধারণা? ক্রমাগত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষে এসে পৌঁছবো এই উত্তরে যে—একটি জীবনের জন্য প্রয়োজন আর অন্যটি ডেকে আনবে বিনাশ। Common sense-এর মূলেও নিহিত আছে এই জীবনধর্মী যুক্তি। বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক সংস্কৃতিগুলির তলদেশে রয়ে গিয়েছে এক জীবনধর্মী প্রবণতা। সেজন্য আজ কয়েক সহস্র বছর অতিবাহিত হবার পরে মানুষের সংস্কৃতির নিজস্ব ক্ষেত্রেও জীবনের একটি স্বতন্ত্র মূল্য গড়ে উঠেছে। জীবন-বোধ তার একটি প্রধান সাংস্কৃতিক চাহিদা হয়ে উঠতে পেরেছে। সংস্কৃতি ও শ্রেণী চেতনা যতই বিমূর্ত্ত ও জটিল হয়ে উঠুক না কেন, যতই তারা তাদের মূল জৈব ভিত্তি থেকে দূরে চলে যাক্ না কেন, মূল জৈব উৎসকে বিস্মৃত হোক না কেন, যতই স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন হোক, তারা কখনই জীবনধর্মী যুক্তি ও তার জৈব ভিত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তি হয়ে ওঠে না। তা যদি হত,

তাহলে মানুষ কবেই নিজেদের জৈব অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। বরং এর উল্টোটাই সত্যি। তাই সংস্কৃতির গভীরে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হয়েছে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক জীবন মুখী যুক্তি। সাধারণভাবে ও স্বাভাবিক অবস্থা এটাই সত্য। Post—Modern এবং Post—Structuralist ধারার অনেকে অবশ্য এই 'স্বাভাবিকতা' (normal standard)কেই প্রশ্ন করবেন। আমরা সচেতন, সুচিন্তিতভাবেই তবু ঐ স্বাভাবিকতার মানদণ্ডকে গ্রহণ করেছি। কেন সেকথা অন্যত্র কখনও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সমীরের বক্তব্যে আবার ফিরে যাই। তাঁর মতে, আধুনিক যুক্তিবাদের মৌলবাদ-সুলভ তৃতীয় উপাদান হল এই যে যুক্তি একবার অকাট্য বলে প্রমাণিত হলে সে চরম অসহিষ্ণু ও সর্বময় কর্তৃত্বশালী হয়ে ওঠে।

এটা ঠিক যে অসহিষ্ণু ও কর্তৃত্বশালী যুক্তিবাদ নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, শেষ পর্য্যন্ত গজদন্তমিনারে বসে 'অভ্রান্ত জ্ঞান' নিয়ে তৃপ্ত থাকে ও লক্ষ লক্ষ 'অজ্ঞতম' জনগণকে ইতিহাসের নিয়ম মানছে না বলে গালি-গালাজ করে। এরকম প্রবণতা নাক-উঁচু পশ্চিমী যুক্তিবাদী, সেকুলারবাদী ও গোঁড়া মার্কসবাদীদের অনেকের মধ্যে দেখা গেছে বটে। জ্ঞান ও যুক্তির সাথে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যোগসূত্র নিয়ে ফুকোর বক্তব্য আমরা জানি। নিঃসন্দেহে মূল জীবন মুখী যুক্তির সাথে সবরকমের দমনকারী ও স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব অসংগতিপূর্ণ।

কিন্তু প্রশ্নটা হল শুধু আধুনিক যুক্তিবাদ আর গোঁড়া মার্কসবাদ কেন, মৌলবাদী যুক্তিও কি কম কর্তৃত্ববাদী? বরং আমরা বলবো যে মৌলবাদের তত্ত্বগত চরিত্রের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী ও দমনকারী কর্তৃত্বের সপক্ষে যৌক্তিক অনুমোদন উপস্থিত। মৌলবাদের যে সংজ্ঞা সমীর নিজেই তাঁর প্রবন্ধের প্রথমাংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, তাতে কর্তৃত্ব ও অসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসের দিকটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, জীবনযাপনের স্বাধীনতা ইত্যাদি যদি আদৌ মূল্যবান হয়, তাহলে বাস্তবে যে মৌলবাদী-ফ্যাসিবাদী শক্তি ঐ সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে দমন করতে প্রয়াসী, তাকে নির্মূল করাটাই কি জীবনমুখী মূল যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? হ্যাঁ, বাস্তব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এমন উদাহরণ আছে যেখানে স্বাধীনতাকে দমন করা হয়েছে। মার্কসবাদের এক প্রধান ধারাতে এরূপ দমনের যৌক্তিক অনুমোদন আছে তাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু

একইসাথে এটাও সত্য যে, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ধারায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের গুরুত্বও স্বীকৃত। মাও সে তুং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব, 'from the masses to the masses', রোজা লুকসেমবুর্গের সমালোচনা, গ্রামশ্চির চিন্তা ইত্যাদিতে এই ধারাটির প্রতিফলন ঘটেছে। আর যদি পোষ্ট-এন্‌লাইটেনমেন্ট যুক্তিবাদের কথা ওঠে, তাহলে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, তার মধ্যে কর্তৃত্ব-বিরোধিতার উপাদানটিও যথেষ্টভাবে যৌক্তিক অনুমোদন লাভ করেছে। জীবনমুখী যুক্তির অনুসারী কিছু উপাদানও তার মধ্যে আছে যা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। তত্ত্বগতভাবে ঐ যুক্তিবাদ সকল মানুষের মধ্যে যুক্তির অস্তিত্বে, ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতায়, মতপ্রকাশের অধিকারে বিশ্বাসী। চিন্তার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উদারনীতি, বিতর্ক, মুক্ত মন, জিজ্ঞাসা, সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি সেখানে স্বীকৃত। সেখানে Rights-এর ভাষায় কথা বলা চলে। শুধু পাশ্চাত্য বলেই তাকে বর্জন করা চলে কি? প্রাচ্যে, প্রাক্-আধুনিক সমাজে, কোন কমিউনিটিতে যখন কোন বিশেষ যুক্তি বা বিশ্বাসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেখানে পশ্চিমী যুক্তিবাদের প্রতিনিধি অবদমিত হয়, তসলিমা নাসরিন যখন মৌলবাদের হাতে দংশিতা হন, তখন শুধু প্রাচ্য বলেই তার সব দোষ মাপ করতে হবে? প্রশ্নটা প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্যের নয়, প্রশ্নটা কর্তৃত্ববাদ বনাম স্বাধীনতার।

পরিশেষে এটা বলেই শেষ করতে চাই যে, মৌলবাদের সাথে কথোপকথন সম্ভব কিনা এ প্রশ্নটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে শতপুষ্পের বিকাশ ঘটতে দেওয়াই কাম্য, যাতে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আগাছা বেছে ফেলে দেওয়া চলে। কিন্তু যখন বাস্তবে অযুক্তি হয়ে ওঠে সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তার চরম শত্রু, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী, ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক হাতিয়ার, মানুষের জীবনমুখী যুক্তির বিপরীত, জৈব ভিত্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, তখন তার সাথে dialogue হলো কি হলো না তা বড় কথা আর থাকতে পারে না। যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দাঁড়ায় তা হল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, যাঁরা মৌলবাদের অযুক্তি দ্বারা চালিত, তাঁদের সাথে dialogue-এর প্রশ্ন। তাঁদের চেতনার নিজস্ব জগতটিতে (subaltern consciousness) ঢুকতে পারা, interact করতে পারা প্রয়োজন। আর এটা সম্ভবও। কারণ তাদের যুক্তির মূলেও শুধু বিশ্বাস আছে, তা নয়। বরং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকের চিন্তার গভীরে রয়ে গেছে সেই একই সার্বজনীন

জীবন-ধর্মী যুক্তিবোধ। মৌলবাদের সাথে dialogue অবশ্য তখনও চলতে পারে, তবে তা হবে মাও সেতুং-এর ভাষায়, একটি নিছক রণকৌশলগত প্রশ্ন—যুদ্ধের সময় শত্রুর সাথে মানুষ যেভাবে কথা বলতে পারে।

সূত্রনির্দেশ

(১) সমীর কুমার দাস, ‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ’, পরিচয় ৬৩ বর্ষ, ১—৩ সংখ্যা, শারদ সঙ্কলন, ১৪০০, (আগষ্ট—অক্টোবর, ১৯৯৩), কলকাতা, পৃ ৬৫।

(২) সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ‘প্রসঙ্গ : ‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ’’, পরিচয়, ৬৩ বর্ষ, ৪—৫ সংখ্যা, (নভেম্বর—ডিসেম্বর, ১৯৯৩) পৃ ১৫—২২।

(৩) অমিতাভ চন্দ্র, ‘মৌলবাদ বনাম যুক্তিবাদরূপ মৌলবাদ বিরোধিতা : ‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ’ প্রবন্ধের সংযোজনে’, তদেব, পৃ ১৪৫—১৫৮।

(৪) F. Engels, Anti-Duhring, Introduction, ‘General’, in Karl Marx and F. Engels, Collected Works, Vol. 25, (Moscow Progress Publishers : 1987). PP. 16—19.

(৫) প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতিঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৩) ; এবং
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), প্রতিরোধ, উৎসমানুষ বিশেষ সংকলন (কলকাতা : ১৯৯১)।

(৬) অমিতাভ চন্দ্র তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে যুক্তির এই বিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছেন।

(৭) পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments : Colonial and Post-Colonial Histories (New Delhi : Oxfored University Press, 1994).

(৮) এ বিষয়ে অধ্যাপক সঞ্জীব মুখার্জীর সাথে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

(৯) M. Foucault, Power / Knowledge, edited by C. Gordon (New York : Pantheon Books, 1980), P. 138.

(১০) ibid, P. 142.

(১১) 'নামগুলোকে ভেঙে দিতে হবে', 'অঙ্গন', যুগান্তর, ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩, দীপেশ চক্রবর্তীর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।

(১২) Partha Chatterjee, op. cit., 'Preface and Acknowledgements', P, XI.

তসলিমা নাসরিন ঃ আলোড়নে-সম্ভাবনায়

শিবাশিস দত্ত

[তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য আমাদের দেশে ও সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাবনা নিয়ে এ নিবন্ধের আলোচনা। দেশ ও সমাজ বলতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ও তার পরিসর এক্ষেত্রে বিবেচ্য। নিম্নবর্গের শোষিত নিরক্ষর মানুষ ও তার সমাজ তসলিমার বক্তব্যে আলোড়িত হয়নি, হবার কথাও নয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই তসলিমার কণ্ঠস্বর কলমুখরিত বলে আলোড়ন ও তার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য—নিবন্ধকার]

তসলিমা-ঢেউ পশ্চিমবাঙলায় ছড়িয়ে পড়বার পর পাঠকমহলে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এরকম উত্তেজনা উপভোগের সুযোগ বহুকাল পাঠকের সামনে আসেনি। উত্তেজনার ব্যাপ্তি, মেয়াদকাল এবং গুনাগুণ বিচার করে বলা যায় বিষয়টি পাঠককে যেমন আন্দোলিত করেছে সে কোন স্পষ্টবাক্, নির্ভীক চরিত্রগুণসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তা ঈর্ষণীয়। তসলিমা আমাদের একটা বড় মাপের ধাক্কা দিয়েছেন। ফলে আমাদের মনের সংশয়-ক্লিষ্ট, খণ্ড, অসংলগ্ন ও লুক্কায়িত অনুভূতিগুলো আক্রান্ত হয়ে প্রকাশমত্ত আচরণে প্রলুব্ধ হয়েছে, গূঢ় ভাবনাগুলো বেগার্ত হয়েছে, অব্যক্ত স্বরধ্বনি শব্দমুখর হয়েছে। তসলিমা প্রসঙ্গে আলোচনা সহজ ; কিন্তু তার প্রাণখোলা মেজাজ কিংবা দুঃসাহসকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। জীবনের নিরাপত্তাহানি বা খ্যাতির বিড়ম্বনা স্বীকার করে নেবার অভিপ্রায় আছে এমন লেখক বিরল। তসলিমা সেজন্য বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নিজের পথ নিজে খুঁজেছেন বলে প্রতিষ্ঠানের ঘেরাটোপ অগ্রাহ্য করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও নির্মম সত্যকে উপস্থিত করেছেন পাঠকের কাছে। তিনি এ কারণে অনন্য, অভয়দাত্রী।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তা নতুন নয়। প্রাণবন্ত মেজাজে কথা বলবার ভঙ্গীটাই এক্ষেত্রে অভিনব। "নির্বাচিত কলাম" পড়বার পর "নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য" পড়লে একই বই দ্বিতীয়বার পাঠের কথা মনে

হতে পারে। এতদসত্ত্বেও শাণিত শব্দগুচ্ছের আঘ্রান ও আস্বাদ অর্জনের তাগিদ দুটি বই-ই বহন করায় পড়বার মেজাজ ক্ষুন্ন হয় না। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অসহায় জীবনের বেদনা যখন প্রায়শঃই বিরুদ্ধবাদিতার পরিবর্তে বাগ্‌বিমুখতাকেই লালন করে তসলিমা তখন আমাদের জড়প্রকৃতিকে কশাঘাত করেন। নিজের পথ নিজেই যিনি গড়ে তোলেন তার প্রকাশভঙ্গীমা রুক্ষ হওয়া বিচিত্র নয়। তসলিমা ঝাঁঝালো শব্দের ছোবলে তার প্রতিবাদের স্বরকে অনমনীয় করে তুলেছেন। নিজস্ব dialect-এ নিজের কথা বলার সাহস-সংকল্প মেজাজ তার বক্তব্যকে রসবন্ত করেছেন। তার লিখিত বক্তব্য নিজ অভিজ্ঞতার নির্ভেজাল দলিলস্বরূপ। কথার ভাঁজে কথা নেই, এমন একটি প্রতিবাদের স্বর এক্ষেত্রে ধ্বনিত হয়েছে যা নগ্ন, আবরণহীন হলেও সত্যভাষণে আলোকিত হয়েছে এবং আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল জীবনযাত্রার ভণ্ডামিকে তর্জন করেছে। স্পষ্টকথনের বাসনা এত প্রবল যে কাল, সময় বিবেচনা করে কৌশল অবলম্বন করে কথা বলতে তিনি নারাজ। মৌলবাদী রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়ে সরাসরি মৌলবাদকে আক্রমণ করবার মনোভাব জীবন-নাশের কারণ হতে পারে একথা জেনেও তসলিমা তার বক্তব্যকে মুহূর্তের জন্য আড়াল করেননি। এ রকমের কৌশল বিমুখতা এবং অনমনীয় আচরণ বিপজ্জনক হলেও তার এই ডাকাবুকোভাবকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় কারণ তিনি মূঢ়, ম্লান মূককে শব্দমুখর করে তুলতে চেয়েছেন। তসলিমার কথায় তাই এত উত্তেজনা।

শাস্ত্রের অনুশাসন, রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক আইন ভেঙ্গে পূর্ণ মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক গড়ে তোলবার স্বপ্ন তসলিমা আমাদের দেখিয়েছেন। নারী তার আত্মমর্যাদা যে কোন মূল্যে ছিনিয়ে নেবে এটা তসলিমার দৃঢ়মত। নারী দাম্পত্য-জীবনে একান্ত ভাবেই পুরুষ-নির্ভর; বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনে নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা নারীর কাছে পতিধর্ম পালনের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে অন্ধ পতিসেবা তার কাছে অবশ্য কর্তব্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হিন্দু-বিবাহ সম্পর্কে মন্তব্য পাঠকের মনে পড়বে। বিবাহিত স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে কিনা এ প্রশ্নে স্ত্রী ভালবাসে বলে উত্তর দেয়। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে বিবাহ করলে সেক্ষেত্রে সে উক্ত পুরুষকে ভালবাসার পাত্র বলে গ্রহণ করতেন কিনা এ প্রশ্নেও স্ত্রী তার সম্মতি নিঃসংশয়ে জানায়। পুরুষ-মানুষটি ভালবাসার

যোগ্য কিনা স্ত্রী নামাঙ্কিত নারীর কাছে তা বিবেচ্য নয়। স্বামীকে ভালবাসা স্ত্রীর কাছে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা। হিন্দু-বিবাহ রীতিকে শাস্ত্রী মহাশয় এভাবে কটাক্ষ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর গুণাগুন বিচারে স্বামীর অধিকার রক্ষার জন্য তৎপরতা আমাদের সমাজে বহুকাল বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণচরিত' রচনায় লিখেছিলেন :…"যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্থ বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোনমতেই সংসার ধর্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তর পরিগ্রহ পাপ এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা, কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না।" [কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩] রবীন্দ্রনাথ এরূপ মন্তব্যের সুযোগ্য সমালোচনা করেছিলেন। অধিকারের প্রশ্নে স্ত্রী কেন পিছিয়ে থাকবে তা প্রশ্ন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। "…জিজ্ঞাস্য এই যে স্বামীকে যে যুক্তি অনুসারে যে সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কিনা, এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই সকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে অনেক স্ত্রী 'অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হয় কিনা।" [রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, আধুনিক সাহিত্য পৃঃ ৫৭১] আজ যখন তসলিমা নারীকে জীবনযাত্রার প্রতিটি আচরণ-মুহূর্তে পুরুষের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানাল তখন তা অন্ধ পুরুষবিদ্বেষ বলে অভিযুক্ত হলেও যুগযুগব্যাপী পুরুষশ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখার নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণবিধি কোনভাবেই লঘু করে দেখা চলে না। এখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন এসে যায়। আত্মমর্যাদা অর্জনের অর্থ শ্রমের ন্যায্য মূল্য অর্জন। পুরুষের আধিপত্য যখন রাষ্ট্রের দমনমূলক শোষণ-নীতির একটা কৌশল হয়ে বেঁচে থাকে, সেখানে সবল (?) পুরুষ কিংবা দুর্বল নারীর বৈষম্য তো রাষ্ট্র ব্যবস্থাই গড়ে তোলে।* স্কুল-কলেজ সহ পারিবারিক-সামাজিক শিক্ষাবিধি যখন নারী-পুরুষ অসাম্যকেই গড়ে তুলতে সাহায্য করে তখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সার্বিক সংগ্রাম এবং তাতে

---

* পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদেই পুরুষ আধিপত্য অবসিত হবে এরকম ভাবার কোন কারণ নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ ঘটাবার সাথে সাথে নারীকে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে। তসলিমা একথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

নারী-পুরুষের যুগপৎ অংশগ্রহণ জরুরী। তসলিমা যদি শুধুমাত্র পুরুষ-বিদ্বেষকেই তার বক্তব্যের হাতিয়ার করতেন তাহলে এক্ষেত্রে তার সমালোচনা সঙ্গত ছিল। কিন্তু তিনি যখন তার আক্রমণকে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে শাণিত করেন তখন আমরা অযথা পুরুষ-বিদ্বেষের অভিযোগ তুলে তসলিমাকে নিন্দা-জর্জর করে তুলতে ভরসা পাই না; মূল সংগ্রামের দিশা আমাদের গোচরে তসলিমা হাজির করেন বলে তার যৌন-বিষয়ক আলোচনা আমাদের কুরুচিপূর্ণ মনে হয় না, অবাধ যৌন স্বাধীনতার মন্ত্র আওড়ানো হচ্ছে বলে কোন উদ্বেগ আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে না।

তসলিমা নারীকে বদলাতে চান, সে সঙ্গে পুরুষকেও। এ কাজ তিনি সাহসের সঙ্গে শুরু করেছেন। তা সত্ত্বেও তার কথায় প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানাতে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে তাকে দোষারোপ করতে পারেন। "তোমার পেছনে একপাল পুরুষ লেগেছে, জেনে রেখো সিফিলিস"—তসলিমার এ জাতীয় কথা তার বক্তব্যের সমগ্রতা (মর্যাদার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক রচনা) বিস্মৃত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ যদি গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে নারী বা পুরুষ কারও প্রতিক্রিয়া সুখকর হবে না। তখন আধিপত্যের জবাবে পাল্টা-আধিপত্য প্রদর্শনের অভিলাষ, নারী স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিকৃত মানসভঙ্গী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নতুন করে বাসা বাঁধতে পারে। বেশ্যাবৃত্তিতে নারীদেহ ব্যবহারের কথা আমাদের জানা। বর্তমানকালে বোম্বাইয়ের মত শহরে এরূপ বৃত্তিতে পুরুষদেহও ব্যবহৃত হচ্ছে না কি? রূপ-কানোয়ারের মৃত্যু বা আদিবাসী রমণী চুনী কোটালের ওপর নির্মম অত্যাচার ও প্রাণনাশের ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। আবার চিত্ত দৌর্বল্যের হেতুজনিত আচরণে কিংবা অতিমাত্রায় সরল ও কর্তব্যজ্ঞানবোধের পরিচয় প্রদানে কোন কোন্ স্বামী স্ত্রীর আধিপত্য (অন্যায় আবদার) সহ্য করে চলেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এসব ভুল নিরসন করতে হলে পুরুষ-নারীর মিলিত প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করেই এগোতে হবে। মূঢ় চেতনা বা অন্ধ আচরণ সহজে দূর হয় না। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বললেও না। শ্রদ্ধেয়জনকে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানানো যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন-আচরণে তাকে গ্রহণ করা কঠিন কাজ। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সংস্কার আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় আমরা এ শিক্ষা পাই। এরকম দৃষ্টান্ত নেহাৎ কম নয়।

তসলিমার রণং দেহি মূর্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের তাই সুবিবেচনার পথে অগ্রসর হতে হবে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে অগ্রসর হওয়া যাবে না। তার বক্তব্যকে জীবন-প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে ফেলতে না পারলে পুরুষ বা নারীর প্রচলিত ভাবনার খুব বেশি রদবদল হবে বলে মনে হয় না। পুরুষ-নারী কখনও সমান নয়, হতেও পারে না। সামাজিক-মর্যাদা বোধ যেন উভয়ের অধিকারভুক্ত হয়, শ্রমের ফল যেন উভয়ের মধ্যে যথাসম্ভব ন্যায্যভাবে বণ্টন করা যায়—এরকম সামাজিক পরিস্থিতি নির্মাণের জন্য সচেতন সংগ্রাম গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প নেই। তসলিমা এ পথে এগোবার রাস্তায় একটা বিন্দু এঁকে দিয়েছেন। তার জীবন ও বক্তব্যকে রক্ষা করে, সে পথের সম্ভাবনাকে আমাদের খুঁজতে হবে।

বিতর্ক, তসলিমা নাসরিন

সম্প্রতি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের লেখা বিশেষতঃ তাঁর দুটি বিস্ফোরক রচনা—লজ্জা এবং নির্বাচিত কলাম এবং গত শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতার উপর উভয় বাংলার বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া এবং মতামত পড়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম চিন্তার স্রোতহীনতা এবং অবক্ষয় উভয়বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সামাজিক রাজনৈতিক সাহিত্য (Socio Political literary) বর্তমান যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের লেখায় তসলিমা যে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন এই সৃজনশীলতাকে স্বাগত জানাবার মত মানসিকতা অন্ততঃ কিছু বুদ্ধিজীবী দেখিয়েছেন এটা আমার কথা।

'চতুরঙ্গে' (বর্ষা, ১৪০০) শিবনারায়ণ রায় উল্লেখ করেছেন যে শৈলবালা ঘোষ জায়া প্রথম বাঙ্গালী লেখিকা যিনি মুসলমান নায়ক এবং হিন্দু নায়িকা নিয়ে প্রথম উপন্যাস, 'শেখ আন্দু' রচনা করে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'শেখ আন্দু' রচিত হয়। আটাত্তর বছর পর মুসলমান বাঙ্গালী লেখিকা তসলিমা নাসরিন হিন্দু নায়ক নিয়ে 'লজ্জা' উপন্যাস লেখেন। শৈলবালার চেয়ে তসলিমার কৃতিত্ব অনেক বেশী কারণ তিনি নিজে মুসলমান হয়েও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম মৌলবাদের আক্রমনের এক দলিল চিত্র এঁকেছেন। বাংলাদেশে Islamisation প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছেন। শিবনারায়ণ তসলিমা সম্পর্কে লিখেছেন, "তাঁর আপসহীন র‍্যাডিকালিজম, তাঁর সাহস এবং সততা, তাঁর ক্ষিপ্র নির্মেদ তড়িন্ময় গদ্য আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে···বিশের দশকে যেমন নজরুল ইসলাম তাঁর বৈপ্লবিক প্রাণ প্রাবল্যে এবং গোষ্ঠীমুক্ত কল্পনার সামর্থে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন, শতাব্দীর শেষ দশকে তসলিমা নাসরিন তেমনি আমাদের দেখালেন সাম্প্রদায়িকতার ট্রাজেডি কত ভয়ঙ্কর হয়ত বা অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু বিবেকবান চেতনা তার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম।"

পরিচয় পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৪০০) রঞ্জন ধরের প্রবন্ধ—তসলিমা নাসরিন বনাম মৌলবাদ একটি সুচিন্তিত ব্যতিক্রমী রচনা। রঞ্জন ধর তসলিমার বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা এবং বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে "তসলিমার লেখা জ্যামুক্তীরের মত সামাজিক মানুষের আজীবন লালিত অনেক অন্ধ বিশ্বাস ধ্যান ধারণা সংস্কারের মূলে অব্যর্থ আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্য লেখকদের লেখা পারেনি। এর ফলেই আজ নানা প্রতিক্রিয়া। রঞ্জনবাবু সত্য কথাটি অনেক মোলায়েম করে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে তসলিমার iconoclasm মোহগ্রস্থ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের বহু myth এবং fetishism কে ভেঙ্গে দিচ্ছে। cultural relativisim এবং ethical relativism এর মানে কিছু কিছু নৃতত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী ধর্মীয় এবং ধর্মাশ্রিয় কিছু সংস্কার এবং বিশ্বাস অপরিবর্তিত থাকে বলে যে মতবাদ তৈরী করছেন তার ফলে ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজকে অপরিবর্তিত রাখার এক [illegible] intellectual support পেয়ে যাচ্ছেন তসলিমার iconoclasm এই ধরণের relativism তাত্ত্বিক ভিত্তিকে অনেকটা দুর্বল করবে। নরনারীর বৈষম্য মূলক সম্পর্ক, পুরুষ প্রাধান্য নারীর উপর পুরুষ শাসিত সমাজের নিপীড়ন এবং বঞ্চনা এবং যৌন সম্পর্কে নারীর স্বাধীনতা প্রভৃতি যে প্রশ্নগুলি তসলিমা তুলেছেন তা নতুন নয়। উনবিংশ শতকে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস সর্বপ্রথম এই মৌলিক প্রশ্নগুলি তোলেন এক 'The origin of the family, Private Property and the State' গ্রন্থে—"What for the woman is a crime entailing grave legal and social consequences is considered honourable in a man or at the worst a slight moral blemish which he cheerfully bears." এঙ্গেলস বলেছেন উৎপাদনের উপকরণের উপর যৌথ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটবে তার ফলে নর নারীর বৈষম্য মূলক সম্পর্ক ও দূর হবে। এই সামাজিক বিপ্লব এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সোবিয়েত মডেল ভেঙ্গে গেলেও তার মধ্যে এই প্রক্রিয়া সফল ভাবেই শুরু হয়েছিল। যাই হোক তসলিমা এঙ্গেলস-এর গ্রন্থটির দ্বারা প্রভাবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তসলিমা ছাড়াও আজকাল Gender bias, Gender ideology, Gender discrimination নিয়ে বহু আলোচনা হচ্ছে। বিরাটি, বানতলার

Rape case নিয়ে Economic and Political Weeklyতে কয়েকটি গবেষণামূলক লেখাও বেরিয়েছে। তসলিমা বাংলা সাহিত্যে এই সব চিন্তার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছে। দুঃখের বিষয় তসলিমার লেখার অনেককেই সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করছেন না। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত হয়েছিল তা পরিণত হয়েছিল স্বতন্ত্র বাঙ্গালী পরিচয়ে (Bengali national identity.)। এই বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মের বিশেষতঃ ঐস্লামিক চেতনার প্রভাবমুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে দ্রুত Islamisation এর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলেই শুরু হয় বাংলাদেশে এক identity crisis. Linguistic homogenisation-র বদলে শুরু হল Islamic identity-র ভিত্তিতে communal homogenisation. এর দ্বারা এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে। শ্রেণী ভিত্তিক সমজাতীয়করণ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সমজাতীয়করণ বন্ধ হবে। বাংলাদেশের আধা সামন্ত এবং আধা বুর্জোয়া সামাজিক কাঠামো বজায় থাকবে। তসলিমা এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ঐস্লামীয় সমজাতীয়করণের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী অভিযানে নেমেছেন। ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একুশের বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তা হলে তসলিমা কী প্রতিক্রিয়াশীল ?

রঞ্জন ধর সখেদে লিখেছেন, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা নারীমুক্তি ইত্যাদি নিয়ে সুস্থসমাজ জীবন ও রাষ্ট্রনীতির পক্ষে আজ প্রধান বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ ; শুধু বাংলাদেশে নয়, এদেশেও। অথচ এর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন যখন মৌলবাদীদের হাতে বিপন্ন হতে চলেছে তখন তথা কথিত প্রগতিবাদীরা, বুদ্ধিজীবীগণ মামুলীভাবে কাগজে বিবৃতি দিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করছেন। এটা তাদের বোধ, বুদ্ধি এবং আদর্শনিষ্ঠার দৈন্যই প্রকাশ করেছে।

সুভাষ বসু

এক

পরিচয়ের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় সেরিনা জাহানের লেখা "খাদের সামনে দাঁড়িয়ে" প্রবন্ধ-খানা পড়লাম। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র।

বর্তমান সমাজে নারীদের হালহকিকত নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধ। প্রসঙ্গতই এসে যায় তসলিমা নাসরিনের নাম। তিনিও একই বিষয়ে লিখে খুব হৈচৈ বাধিয়েছেন। এপারের সেরিনা আর ওপারের তসলিমা দুজনই নারীজাতির দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন ধর্ম ও পুরুষ জাতির অশুভ আঁতাতকে। কিয়দংশে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করার জন্য নারীকূলকেও দায়ী করেছেন তাঁরা।

সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীজাতিকে জেহাদ ঘোষণা করতে আহ্বান জানিয়েছেন তসলিমা। তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু নিদানও দান করেছেন। তাঁর নিদানগুলি উগ্র ভাবাবেগে পূর্ণ। যা দ্বারা রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ বরং বিতর্কিত হওয়ার জন্যই লিখিত বলে মনে হয়। সেইদিক থেকে সেরিনা অনেক সংযত এবং দায়িত্বশীল। তাঁর লেখাতেই আসছি।

লেখিকা মেঘালয়ের খাসিয়া সম্প্রদায় এবং আদিবাসী সমাজের, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথা বলেছেন যেখানে নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত এবং নারীরা পণ্য বলে বিবেচিত হন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন আধুনিক শিক্ষা এবং ধর্মের চোরাগলি দিয়ে আদিবাসী সমাজেও "পুরুষ-দূষণ" ঢুকছে এবং মায়ের গুরুত্ব কমছে। প্রথমত "পুরুষ দূষণ" কথাটায় আমার ভীষণ আপত্তি। কথাটা অসংসদীয় এবং অসম্মানসূচক। দ্বিতীয়ত, আদিবাসী সমাজে মায়ের গুরুত্ব কমার জন্য ধর্মের চোরাগলিকে দায়ী করেছেন তিনি। এখানেও লেখিকার সঙ্গে আমি একমত নই। ধর্মের চেয়ে অর্থনৈতিক কারণই এরজন্য দায়ী। আদিবাসী সমাজে রোজগারের চাবিকাঠি ছিল মেয়েদের হাতে। বর্তমানে সেই চাবিকাঠি চলে আসছে পুরুষদের হাতে। কমছে মেয়েদের প্রভাব। মেয়েদের রোজগারের হাত শক্ত না করে

আধুনিক শিক্ষা ও চিরায়ত অভ্যাসের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা অসম্ভব। তবে নিঃসন্দেহে নৃতাত্ত্বিক বা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার সুন্দর বিষয়বস্তু হতে পারে।

অতীতের রুশ সমাজও বর্তমান রুশ সমাজের নারীদের কথাও এসেছে এই প্রবন্ধে। সোভিয়েতের ঘরে ঘরে তৈরী হয়েছিল "মানুষ মহিলা"। এর পেছনে ছিল রাষ্ট্র শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্ নড়বড়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশি নারীরা আবার ধীরে ধীরে মানুষ মহিলা থেকে মাত্র মহিলায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। এবার আমাদের দেশের নারীদের কথা চিন্তা করুণ তো? তাদের মধ্যে কয়জন আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর। পুরুষেরা টিঁকে রয়েছে কারণ তার অর্থ, আর পেশীতে বল। ধর্মের কলতো আছেই।

ধর্ম। প্রতিটি মানুষই গায়ে ধর্মের ছাপ নিয়ে জন্মায়। তাই-ধর্ম জিনিসটাকে খুব সহজে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। নজর দিতে হবে নারীদের শিক্ষা এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার দিকে। আদায় করতে হবে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা। সেরিনা নিশ্চই অস্বীকার করবে না আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হলে মেয়েরা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বেশী করে সোচ্চার হতে সাহসী হবেন।

তাই বলছি শুধু সমস্যাগুলির কথা লিখে দায়িত্ব খালাস করলে চলবে না। মেয়েদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য এবং লড়াই-এর ময়দানে টেনে আনার জন্যও কলম ধরতে হবে। তা না হলে খাদের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

নিতাই চক্রবর্তী

দুই

শারদীয় পরিচয় খুবই ভাল হয়েছে। এখানে যাঁদের হাতে এই সংখ্যাটি পড়ছে, তাঁরা এক কথায় এর উৎকর্ষ সম্পর্কে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করছেন। আমার তো ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষতঃ বিশেষ নিবন্ধগুলি। তত্ত্ব তথ্যে সমৃদ্ধ প্রায় তিনটি প্রবন্ধই অকাট্যভাবে যুক্তিনির্ভর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

সমীর কুমার দাসের 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ' ও বাসব সরকারের

'রাজনীতি, সমাজ ও মূল্যবোধ' রচনাদুটির সংযোজন খুবই সময়োচিত ও বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

গল্প কবিতাগুলিও যথারীতি পরিচয় পত্রিকার মানকে কোথাও খর্ব করেনি। কবিতা তো সাহিত্যের সূক্ষ্মতম শিল্প, তাকে 'সর্বত্রগামী' হওয়ার আশা বড় একটা কেউ করেও না, তবে গল্পের ক্ষেত্রে বোধহয় জটিলতার ব্যারিকেডকে আর একটু আলগা করা যায় যাতে সে 'সর্বত্রগামী না হোক' অন্ততঃ বেশী সংখ্যক পাঠকের মনকে তো অনায়াসে ছুঁয়ে যেতে পারে। যেহেতু গল্পের ক্ষেত্রে সে অবকাশ ও সুযোগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমার তো মনে হয় না, তাতে গল্পের মানের তেমন কোন ইতরবিশেষ হবে। এবারের শারদ সংকলনে যে গল্পকারগণ স্থান পেয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের রচনার গুণমান সম্পর্কে কারোরই সন্দেহ নেই, তাঁরা এক একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। সেই সুবাদে তাঁদের গল্পের সংবেদনশীলতার ছোঁয়া পেতে আমরা অনেক বেশী প্রত্যাশী।'

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' সম্পর্কে স্বয়ং লেখকেরই পরবর্তীকালীন এমন আশ্চর্য অভিমত পোষণের তথ্যটা আমাদের কাছে একেবারেই অজানা ছিল। দেবীপ্রসাদবাবুর নাতিদীর্ঘ লেখায় তা পেয়ে উপকৃতই হলাম। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ জাতীয় উপন্যাসই তো এক একটা বিশেষ সময়ের প্রামান্য দলিলের কাজ করে। দুঃসহ সময়ের অভিঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা যে কর্তব্যচ্যুত হন না. বা দায় এড়িয়ে ঘাপটি মেরে থাকেন না, এ তো তারই প্রমাণ। প্রসঙ্গতঃ দুর্ভিক্ষের সে অবিস্মরণীয় চিত্র প্রয়াত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তাঁর '৪৩' নামক গল্পে এঁকেছেন, যা তাঁর গল্প-সংকলন 'কলিযুগের গল্পে' রাখা হয়েছে, আমার তো মনে হয় দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে অমন প্রাঞ্জল মর্মস্পর্শী ও সংবেদনশীল গল্প বড় একটা চোখে পড়ে না। গল্পটি কালের নিরিখে রসোত্তীর্ণ বলেই বোধ হয় দেশী বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

'চাতলের কৃষক আন্দোলন—সূচনাপর্ব থেকে তেভাগা' স্মৃতিনির্ভর এই দীর্ঘ লেখাটি এবারকার শারদসংকলনের এক মূল্যবান দলিল বিশেষ। তত্ত্ব-তথ্যে ঠাসা লেখাটি যেমনি প্রাঞ্জল তেমনি মর্মস্পর্শী। লেখাটি পড়তে পড়তে

আত্মকেন্দ্রীকতার কারাগারে আবদ্ধ আমাদের মতো মানুষের শির, অতীত দিনের আত্মত্যাগী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যাওয়া উচিত। রঞ্জন ধরের এই দীর্ঘ রচনায় গোড়ার দিককার সাম্যবাদী আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন যে কত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেছে তার পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। পাওয়া যায় আত্মত্যাগী অসংখ্য চরিত্রের দেখা। আদর্শের জন্য পিতা-পুত্রের দুই বিপরীত মেরুবিন্দুতে মুখোমুখি দাঁড়ানো, এক কাপড়ে-এক কথায় সুখ-সম্পদ, সম্পর্ক পরিত্যাগ করা, কিম্বা আদর্শনিষ্ঠ আন্দোলনের বিন্দুতম ক্ষতির আশংকায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীকে শেষ দেখার মতো অন্তিম ইচ্ছেকে পূরণ না করে এক আশ্চর্য দৃঢ়তায় অবদমিত করে নিজেকে আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ করে রাখা ইত্যাদি ঘটনাগুলি তো একালের আত্মসর্বস্ব মানুষের কাছে বিরল দৃষ্টান্তস্বরূপ। লেখাটার জন্য রঞ্জনবাবুকে বিশেষভাবে অভিনন্দন। তাঁর কাছ থেকে এ জাতীয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আরো অনেক লেখা পেতে আমরা আগ্রহী। এ চিঠির গোড়ায় যে 'সর্বত্রগামীতার' কথা বলা হয়েছে, রঞ্জনবাবুর লেখাটি এক কথায় সেই 'সর্বত্রগামীই হয়েছে।'

সমীর সেন
হিন্দুস্থান কেবল্‌স্‌

তিন

পরিচয় (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০০) পেয়েই আপনার লেখাটি পড়ে ফেলেছি। অসাধারণ হয়েছে লেখাটি। তসলিমা নাসরিনকে আপনি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন আপনার লেখায়। লেখিকাকে বোঝার জন্য লেখাটি খুবই সহায়ক হবে। এবং সংস্কৃতিমনস্ক দুই বাংলাকে পরস্পরের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে। 'একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমি যে শ্রদ্ধা করি, একজন পতিতাকে তার চেয়ে কম করি না' এরকম কথা যিনি বলতে পারেন, তাঁর মধ্যে যে আগুন কাজ করবে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আজকের বাংলাদেশের পটভূমিকায় একজন তসলিমার প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একজন যুগান্তকারী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রূপেই স্থান পাবেন। মানুষের চিন্তাভাবনা যে শেকল বাঁধা থাকবে না। তার

পেছনেও বোধ হয় ইতিহাসই কাজ করবে। তবে মনে হলো বইটিকে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস না বলে বাস্তবভিত্তিক বা বাস্তবে স্থাপিত দলিল ভিত্তিক উপন্যাস বলাই ঠিক হবে।

সুবীর রায়চৌধুরীকে আমি নতুন সাহিত্য অফিসে দেখেছি। এবারে অমিয় দেবের কাছেও তাঁর কথা শুনি। পূর্বোত্তর সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে আমার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি? প্রীতিসহ

সুধাংশু গুপ্ত

চার

পরিচয়ের অগ্রহায়ণ পৌষ ১৪০০ সংখ্যায় শ্রীঅজেয়া সরকারের 'সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন: একটি মূল্যায়ন' পাঠ করলাম। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের ভূমিকা কেমন হবে, এটা যথার্থই একটি ভাবনা ও ভাবনা-উত্তরণের বিষয়। এই সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। আমার অবশ্যই মনে হয়। দেশের বর্তমান অবস্থায় বামপন্থী রাজনীতি ও তৎসংলগ্ন চিন্তাধারা একটি আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চলমান কোনো দর্শনে পৌঁছানো যাচ্ছে না। তারজন্য ব্যাপক বাস্তব সমীক্ষা ও আশানুসন্ধানের প্রয়োজন। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় সে আলোচনা আহ্বান ও প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত। বর্তমান দুর্বল অবস্থা অবশ্যই কাটিয়ে ওঠা দরকার। আশা করি এ ব্যাপারে পরিচয় এর পথসন্ধানী দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই পালন করবে। পরিচয়ের সঙ্গে দীর্ঘকালের সম্পর্ক থাকার জন্যই এ রকম প্রস্তাব উপস্থাপনে সাহসী হয়েছি। পরিচয় আমাদের কাছে জরুরি হয়ে পড়েছে।

শুভেচ্ছান্তে—

সুধাংশু গুপ্ত

কানোরিয়ার স্বপ্ন

শিবাশিস দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের শহরঘেঁষা শিল্পাঞ্চলে বিশেষতঃ চটকল সমূহের আশেপাশে শ্রমিক জনসমষ্টির যে বিন্যাস গড়ে উঠেছে উৎপাদন সম্পর্কসূত্রে তা গ্রথিত হলেও শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ চেতনা একসুরে বাঁধা নেই। ভিন্ রাজ্য থেকে আগত অ-বাঙালী শ্রমিকের ভীড় স্থানীয় বাঙালী শ্রমিকের সঙ্গে বিভিন্ন সংগ্রাম ও আন্দোলনে তাল মেলালেও বছরের কয়েকমাস বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকেরা নিজেদের কৃষি-উৎপাদনের কাজে জড়িয়ে রাখে। চটকলে কাজ করেও পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করেও এরা মিলের রোজগারের ওপর একমাত্র নির্ভরশীল না হয়ে একই সঙ্গে কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্প শ্রমিকের দ্বৈত ভূমিকায় বিচরণ করে। সে কারণে চটকল এদের প্রাণ হয়ে ওঠে না, কারখানার যন্ত্রপাতিকে এরা সন্তানতুল্য ভাবতে পারে না। তাছাড়া ট্রেড-ইউনিয়নের আখড়ায়, রাজনৈতিক দলের আখড়ায়, বস্তী-মহল্লায় এরা যে জীবন কাটায় তার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর নির্দিষ্ট ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হবার কথা এদের ভাবনায় স্থান পায় না। উৎপাদনকে হাতিয়ার করে শ্রমিক যে চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বা একসুরে নিজেদের বাঁধে তা এরূপ শ্রমিকমহলে গড়ে ওঠা তাই সহজ নয়।

হাওড়া জেলার ফুলেশ্বর এলাকার কানোরিয়া জুট মিল ও তার শ্রমিক বিন্যাস সম্পর্কে এসব কথা খাটে না। ৯২ শতাংশ বাঙালী শ্রমিক আশেপাশের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং এদের অনেকেই কৃষক পরিবারের সন্তান। সিজবেরিয়া, কোটালঘাটা, বৈকুণ্ঠপুর, জামবেড়িয়া, জগৎপুর, বাণীভবন, খালিসানি প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ৪৫০০ জন শ্রমিকের ঘরবাড়ী। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক যেন এক পরিবার ভুক্ত, কৃষক এবং গ্রামবাসীর মিলিত এক অখণ্ড জনসত্তা নিজেদের সমসুরে বেঁধে রেখেছে। কানোরিয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম এরকম পরিপ্রেক্ষিতে থেকে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

শিল্প-কারখানায় শুধুমাত্র মালিকী স্বত্ব (ownership) নয়, দখলি-স্বত্ব (possession) চাই, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায়-বিস্মৃত এবং

অবহেলিত এ দাবী কানোরিয়ার শ্রমিকদের কণ্ঠে তাই শোনা গেল। কারখানা দখলের ঘটনা নূতন নয়, উৎপাদন যন্ত্র দখলের যে স্বপ্ন সামনে থাকলে শ্রমিকশ্রেণী সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, কানোরিয়ার শ্রমিক তার একটা সংকেত ঘোষণা করলেন। শ্রমিক আন্দোলনের পথ বা পদ্ধতির অভিনবত্ব নয়, কানাগলি-আশ্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডইউনিয়নসমূহের কাছে কানোরিয়ার ঘটনা এক অশনি-সংকেত বলা যায়। এ সংগ্রাম সফল হবে কিনা তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক গতিশীল অভিব্যক্তি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে। সম্ভাবনা গড়ে উঠলেই তা থেকে শ্রমিক লাভবান হবেন এমন কোন কথা নেই। মালিকশ্রেণী শ্রমিকের সংগ্রামী মনোভাবকে কৌশলে ব্যবহার করে শ্রমিক নেতৃত্বকে অকেজো করে দিতে পারেন। নেতৃত্ব শ্রমিকের মনে আস্থা ও বিকল্প পথের সন্ধান দিতে না পারলে শুধুমাত্র আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত শ্রমিক আন্দোলনকে সাফল্য এনে দেবে এ এক আত্মপ্রবঞ্চনামূলক ধারণা।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী আজ এত মধুময় এবং তার ফলাফল এমন মর্মান্তিক যে শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড-ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সতর্ক বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। বহু সংগ্রামে পরীক্ষিত হয়েও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এবং কমিউনিষ্ট পার্টি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তার শিক্ষা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। কানোরিয়া শ্রমিক ট্রেড-ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যস্থতা করে শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ করবার মাধ্যমে এদেশে যে শ্রমিক-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন বাবু-শ্রেণী। পরবর্তী সময়ের বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রাম সংগঠিত হলেও নেতৃত্বের বদল হয়নি—বাবুশ্রেণীর নেতৃত্বই বহাল আছে। বাবুশ্রেণী সর্ব্বাংশে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নয় ঠিকই কিন্তু এরূপ দুই শ্রেণীর মধ্যে একাত্মতা গড়ে ওঠেনি বলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনে গণতন্ত্রের বিষয়টি অবহেলিত হয়ে আছে। শ্রমিকের মধ্য থেকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা আজও স্বপ্ন হয়ে আছে। কানোরিয়ার শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ হল: পুরনো শ্রমিক ইউনিয়ন ও তার বাবু নেতৃত্বকে খারিজ করে নূতন সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় এমন এক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা যার কাছে প্রতারণের বদলে সুবিচার আশা করা যায়। কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব

এযাবং শ্রমিকের এরূপ প্রত্যাশা-পূরণে সমর্থ হয়েছে বলেই শ্রমিকের ইজ্জৎ রক্ষার লড়াই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

'ছত্তিশগড়ে আমরা যে বীজ পুঁতেছিলাম, এখানে তার অঙ্কুর ফুটেছে। আমার বিশ্বাস, কানোরিয়ার, এই আন্দোলন গোটা দেশের শ্রমিকদের নতুন পথের সন্ধান দেবে।'[১] —ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চার নেত্রী আশা গুহনিয়োগীর এ মন্তব্য প্রয়াত শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীর "সংঘর্ষ ও নির্মাণ" মডেলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মডেলের প্রতিফলন কানোরিয়ার সংগ্রামে অবশ্যই আছে। মডেল অনুকরণ নয়, ছত্তিশগড়ের লড়াই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন কানোরিয়াক শ্রমিক। যেমন আন্দোলনে আইনের ব্যবহারের প্রশ্ন। '···ভারতে আইনের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করার পরিপ্রেক্ষিতেই আইনকে দেখতে হবে।'[২] —শঙ্কর গুহনিয়োগীর আইনি পথ সম্পর্কে এরূপ মতামত সংগ্রামী ইউনিয়নের ১৪ দফা ঘোষিত নীতির ["এই লড়াই আইনি অধিকার রক্ষা এবং ইজ্জতের সাথে মানুষের মতো বাঁচার জন্য শ্রমিকদের লড়াই বলে বিবেচিত হবে"[৩]] সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাইকোর্টের অর্ডার প্রথমে অমান্য করলেও পরে উৎপাদন বন্ধ রাখার আদেশ সত্ত্বেও সংগ্রামী ইউনিয়ন তা মেনেছেন; এর অর্থ হাইকোর্টের আইনী আদেশ চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হয়ে গেল তা নয়। আন্দোলনের বিস্তার ঘটিয়ে শ্রমিক-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কানোরিয়া নেতৃত্বের একটা কৌশল।

পুরনো শ্রমিক ইউনিয়ন দখল করে লড়াই, না নূতন ইউনিয়ন গঠন করে সংগ্রাম-এ প্রশ্নেও কানোরিয়া নেতৃত্ব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত নন। নূতন ইউনিয়ন গঠনের পর আইনী স্বীকৃতি (রেজিষ্ট্রেশন) পাবার সমস্যা আছে। এরকম ইউনিয়ন গড়লে ট্রেড-ইউনিয়ন ভাঙবার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত হবার ঝুঁকি আছে। বিশেষত বর্তমান সময়ে মালিকপক্ষের যে আক্রমণ ট্রেড-ইউনিয়নের ওপর নেমে এসেছে তা ট্রেড-ইউনিয়নকে De-unionise করবার ষড়যন্ত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। মালিকপক্ষের এই চক্রান্তের সঙ্গে কানোরিয়ার সংগ্রামী ইউনিয়ন গড়ে ওঠার সংযোগ আছে কিনা তা অনুসন্ধানে কেউ কেউ সচেষ্ট হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও সংগ্রামী ইউনিয়ন 'বিনাশের প্রক্রিয়াকে নির্মাণের সৃজনশীলতা' দিয়ে মোকাবিলা করার জন্য নূতন ইউনিয়ন গড়েছেন শ্রমিকের ইচ্ছায় ও কল্যাণে। ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার প্রক্রিয়ায় যে কৌশল অবলম্বিত হয়েছে তা কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশনামায়

বাধা পড়ে নি। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাইনবোর্ড টাঙানোর ঘোরতর বিরোধী সংগ্রামী ইউনিয়ন। শ্রমিকের মনোভাব স্বতঃস্ফূর্ততার শিকার না হয়ে সংগঠিত রূপ পেয়েছে বলেই কানোরিয়া মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে।

কর্মশ্রমই প্রকৃত মূলধন। প্রতিটি শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে এক জায়গায় মেলাতে পারলে তা শক্তিশালী মূলধন হয়ে ওঠে। মালিকশ্রেণী যে শ্রমকে আত্মসাৎ করে শ্রমিক-উচ্ছেদ এবং শ্রম-বিযুক্তির খেলায় মাতে তাকে পরাস্ত করতে না পারলে শ্রমিক পরাজিত হয়, শ্রমিকের মন derailed হয়ে যায়। কোর্ট-নির্দেশে উৎপাদন বন্ধ রেখে সে ব্যবস্থাই পাকা হয়েছে যাতে শ্রমিক মুখ থুবড়ে পড়ে। আশার কথা হল বিগত তিনমাস উৎপাদন বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকের মনোবল ভাঙেনি। কেউ চাষের জমিতে খেতমজুরের কাজে মন দিয়েছেন কেউ বা জরির কাজে। কেউ তহবিল সংগ্রহে ও প্রচারে ব্যস্ত, কেউবা যৌথ রান্নাঘরের দায়িত্ব পালন করছেন। 'জলের মাছ জলে থাকতে পারলে মরবে না'—এ বিশ্বাস কানোরিয়া শ্রমিক অর্জন করেছেন। তাই অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে শ্রমিক নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছেন। ৭/৮টি গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শ্রমিকের মনোবল বৃদ্ধি করেছে। গ্রাম-সমাজ বলতে সে সমাজবদ্ধ গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্ব-নির্ভর এবং স্ব-শাসিত বলে মনে করা হতো তার অস্তিত্ব আজ নেই একথা সত্য। রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতা, আমলাতন্ত্রের কূটজাল এবং শহুরে ফ্যাশানের চোলাই গ্রাম জীবনকে বিধ্বস্ত করেছে। বাস্তুঘুঘুদের প্রতাপ, পঞ্চায়েত পৌরসভার খবরদারি, সমাজ বিরোধী চক্র সবই স্বার্থচক্রের জাল বিছিয়ে আছে। এতদসত্ত্বেও কানোরিয়ার শ্রমিক লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন তার কারণঃ কানোরিয়া মিল ফুলেশ্বর এলাকার মানুষের রুজি-রোজগারের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বলে গ্রাম-শহরের মানুষের স্বার্থের অভিন্নতা গড়ে উঠেছে এর মাধ্যমে। এভাবেই গোষ্ঠিবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবনের একটা আদল গড়ে উঠেছে এখানে। কানোরিয়ার সংগ্রামে এটা একটা বড় হাতিয়ার।

প্রযুক্তি বিপ্লবকে হাতিয়ার করে আই. এম. এফ বিশ্বব্যাঙ্ক যে নীতি, কলাকৌশল, আইনকানুন, ধ্যানধারনা এমনকি রাষ্ট্রিয় গঠন-প্রক্রিয়া চাপিয়ে দিচ্ছে আমাদের দেশে, তা দেশজ প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণে এক উদ্ভট চেহারা নিচ্ছে। নিম্নমানের পাট, সেকেলে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উৎপাদনের কাজে পাট ব্যবহারের বদলে কখনও কখনও বিক্রি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে মালিক

নামধারী ফড়েরা যখন চটকলের মাতব্বর হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিদেশী মূলধন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্প কাঠামোকে মুনাফাসর্ব্বস্ব করে গড়ে তোলবার পাল্টা মহড়া চলে। বিভিন্ন শিল্পে বিশেষতঃ চটশিল্পে শ্রমিকের ওপর আক্রমণ তাই এত প্রবল। অর্থনীতি, রাজনীতির ছক ভেঙ্গে দিয়ে যখন রাজনৈতিক দল (বিশেষতঃ রামপন্থী) কেই অকেজো করে দেয় রাজনীতির লড়াই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তখন প্রবেশাধিকার পায় না—একই দলের রাজনীতি এবং অর্থনীতি পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে। দেশের বামপন্থী দলের আচরণ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যে দেশের শ্রমিক-কৃষক কিছুদিন আগেও রামমন্দির নির্মাণের জন্য করসেবকের ভূমিকা পালন করেছেন সেদেশের সমাজব্যবস্থায় কোন অগ্রসর ভিত গড়ে ওঠা দূরে থাক শ্রমিক শ্রেণী যে তার অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে হিমসিম খাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

কানোরিয়ায় শ্রমিক নেতৃত্ব দেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে লড়াইয়ের যে কৌশল বেছে নিয়েছেন তা হল অংশ থেকে সমগ্রতে পৌছনো, সংঘর্ষের পাশাপাশি ছোটো ছোট নির্মাণ। "মৃত্যুর আতঙ্ক মাখা বন্ধ রুগ্ন কারখানায় মজদুরদের জীবনে হাজারো সংঘর্ষের মাঝে এক স্বপ্নের নির্মাণ।"

রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে টেড-ইউনিয়ন শ্রমিকের যে কোষবদ্ধ জীবন গড়ে তুলেছিল, স্বার্থ-মগ্নতায় নিকৃষ্ট অর্থনীতিবাদের ফাঁদে পড়ে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল ক্রমশঃ। কানোরিয়ার শ্রমিক ঠিক সে সময়েই স্বপ্ন গড়ে দিতে চেয়েছেন শ্রমিকের বুকে। শ্রমিক এতে জেগে উঠবে, পঙ্গু অস্তিত্বের বাহক মধ্যবিত্ত কর্মচারীকূল এতে ভরসা পাবে। কানোরিয়ার স্বপ্নে শ্রমিক কর্মচারীর নবজন্ম হোক।

উদ্ধৃতিসূত্র :

১. কানোরিয়া জীবনের জয়গান—কানোরিয়া জুটসংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন -পৃঃ ৯
২. ঐ পৃঃ ৫৫
৩. সংঘর্ষ ও নির্মাণ—সম্পাদনা : পূর্ণেন্দু বসু, শংকর সান্যাল পৃঃ ১২৬

অনুভবী মন ও মানবিকতার ছোঁয়া

যতদূর জানি 'ভালোবাসার ডালপালা' সুদর্শণ সেনশর্মার প্রথম গল্প গ্রন্থ, হয়ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রয়াসও। যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে সুদর্শণ সেনশর্মা বাংলা কথা সাহিত্যে একটি স্থান করে নিলেন প্রথম গ্রন্থেই। 'ভালোবাসার ডালপালা'-র গল্পগুলি ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে লেখা, এবং গল্পগুলি প্রকাশের-কালঅনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এরকমভাবে পরপর লেখা পেয়ে গেলে লেখকের বিকাশ ও পরিণতির একটা রূপরেখা পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু যাঁর ১৯৮০ সালের গল্প যেখানে পরিণত লেখা বলে মনে হয়, সেখানে ঐ নিয়ম বোধ হয় ঘটে না। তাছাড়া গল্পগুলি "পরিচয়", "প্রতিক্ষণ", "রক্তকরবী"-র মত সিরিয়াস পত্রিকায় বের হয়। এতেও প্রমাণিত হয় যে 'ভালোবাসার ডালপালা'-র গল্পগুলি—বেশ উচ্চমানের পরীক্ষায় উতরে গেছে গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগেই।

তবে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প যখন সংকলিত হয়ে বই হয়, তখন অন্য এক আমেজ পাওয়া যায় পড়ার সময়। আস্তে আস্তে আমরা লেখক সম্বন্ধেও একটা ধারণা করে নিতে পারি, যেমন—আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় লেখক হয় নিজে চিকিৎসক, নয়ত চিকিৎসা জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাস্তবে সুদর্শণ একজন চিকিৎসকই বটে। এথেকে আরো ধারণা করা যায়, পেশায় আর্তপীড়িত মানুষের শারীরিক মানসিক পীড়ার বোঝা হালকা করতে চান বা যিনি ঐসব মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন এমন কি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর লেখায় পাওয়া যাবে মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য মানুষের জন্য ভালোবাসা, তাদের আপদে বিপদে পাশে দাঁড়াবার সাহস।

এইজন্য সুদর্শণ সমাজ-সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন না কখনো। গল্প লিখছেন নিশ্চয় তিনি, কিন্তু আঁকড়া বাস্তবকে তুলে আনছেন শিল্পিত

আবেগে। হাসপাতাল নিশ্চয়ই আরোগ্যশালা, মানুষ সেখানে আসে আরোগ্যের আশায়,জীবনের আশায়। আতুর মানুষ জানে,ডাক্তারবাবু তাকে ছিনিয়ে আনবেন মৃত্যুর হাত থেকে। দূর দূর থেকে গ্রাম গঞ্জ থেকে সেই আশা নিয়ে আসে মানুষ হাসপাতালে। কিন্তু যাঁর কাছে পৌছুতে পারলে রোগ নিরাময় হতে পারে, সেই চিকিৎসকের কাছে পৌছুবার আগে সে নিঃস্ব হয়ে যায় এক,শ্রেণীর প্রতারকের প্রবঞ্চনায়। শোষণ শুধু শোষক শ্রেণীর মানুষই করে না, স্বশ্রেণীর মানুষও প্রবঞ্চনা করে, যার আলেখ্য সুদর্শন তুলে আনেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এটা এক পরিহাসই বটে, নির্মম হলেও বাস্তব পরিহাস। সুদর্শন সেই চিত্র তুলে ধরলেও সৎ মানুষরা তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায় না। তিনি সৎ মানুষকে খুঁজতে থাকেন ঐ পঙ্কিল পরিবেশেও। সাধারণ মানুষের আশা-আশঙ্কা সুখ-দুঃখ প্রেম-অপ্রেম লেখকের উপজীব্য বলেই সুদর্শন বলার ভঙ্গিটি অযথা জটিল করেন না, সহজভাবে বলতে চেষ্টা করেন গল্প, তাই মুখের কথা অনায়াসে এসে যায় তাঁর কথন ভঙ্গিতে। বাস্তবকে ধরতে চান বলে লেখক একই গল্পে বহু চরিত্র এনে থাকেন প্রায়ই। হয়ত বাস্তবের স্বাভাবিকতা আনতে এ-রকম ভঙ্গি বেশ কাজের হয়। তবে কখনো কখনো একের পর এক চরিত্র আসার ফলে গল্পের মূল ধারাটি ধরতে একটু ধৈর্য্যের দরকার হয়, তবে সেটি ধরতে পারলে পাঠক-লেখকের লক্ষ্য ও বক্তব্য বুঝতে পারেন সহজে। "পায়ের তলার মাটি", "পায়ের তলার মাটি—দুই", "ভালোবাসার ডালাপালা" পড়লে চমকে যেতে হয়। ভিতরে-ভিতরে মানুষ যে কত জটিল নিজের কাছে নিজেই কত অপরিচিত—গল্পগুলো পড়লে বোঝা যায়। ধরা-বাঁধা, রাস্তায় মানুষকে জানা যায় না সব সময়, সর্পিল মনের বিচিত্র গতি—তেমনই একটি আলেখ্য পাই "অন্ত্যেষ্টি, অনন্ত্যেষ্টি" গল্পে। কোনো তত্ত্ব কথা নয়, সহজ ভাবে বলতে বলতে সুদর্শন হদিশ করতে চান মনের অলিগলিতে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার আশাকে।

আর ব্যাঙ্গের কশাঘাত প্রায় প্রতিটি গল্পের খাঁজে খাঁজে ভরা আছে। সুদর্শণ সেনশর্মা তাই বলে মানুষকে ধ্বস্ত করেন নি, সমাজের স্তরে-স্তরে যে দুর্নীতি, ভেজাল আছে, তাকেই তুলে আনেন নির্মম চাবুকের ঘায়ে, সেই আঘাত থেকে কেউ-ই রেহাই পায় না। "দাম্পত্য" "সমাধি-পর্বে কুশীলব"

প্রভৃতি গল্পের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আমাদের বিচলিত ক'রে খুব সেই ব্যঙ্গের ভিতরে এগিয়ে যেতে যেতে।

'ভালোবাসার ডালপালা'-র প্রায় সব গল্পের চরিত্র পটভূমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছে চিকিৎসা জগতের সঙ্গে। ঐ জগৎ বর্ণময় খুবই, যেখানে সৎ অসৎ ধান্দাবাজ প্রবঞ্চক ইত্যাদি নানা ধরণের চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। সুদর্শন সেনশর্মা সেই জগৎ কাছ থেকে দেখেছেন বলে তিনি ঐ জগতের আলেখ্য নিপুণভাবে তুলে আনতে পেরেছেন পাঠকের সামনে, কিন্তু লেখক সেই ছবি দেখতে দেখতে বিচলিত ও চিন্তিতও হয়ে পড়েন। তাঁর গল্পে সেই উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখা যায়।

সুদর্শন সেনশর্মার দক্ষতার উপর আস্থা আছে এই জন্য বলতে ইচ্ছা করে, লেখক কি চিকিৎসা জগতের বাইরে তাকাবেন না একটু এরপরে? সুদর্শন সেনশর্মা চিকিৎসক, অসুস্থ হলে লোকে তাঁর কাছে যাবেই, কিন্তু সুস্থ লোক তো পড়বে সাহিত্যিক সুদর্শন সেনশর্মার কথা-সাহিত্য। আমরা তাঁকে একজন ডাক্তার-সাহিত্যিক হিসেবে দেখতে চাই না, পেতে চাই কথা-সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। তাঁর অনুভবী মন ও মানবিকতার কাছে আমাদের প্রত্যাশার কথা জানিয়ে রাখতে পারি শুধু, তিনি সেই আশা পূরণ করবেন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই। *

কার্তিক লাহিড়ী

---

* 'ভালোবাসার ডালপালা'। সুদর্শণ সেনশর্মা। রক্তকরবী। পঁয়ত্রিশ টাকা

কবিতার উত্তরণ

১·

নিজস্ব বিদ্রোহ মুক্তি পায় কবিতায়। আর তাই কবিতা হল এক মানস-সঞ্জাত প্রতিবাদী-অস্ত্র। সে অস্ত্র আঘাত করে মননে, বোধে, অহংকারে। আঘাতে আঘাতে জন্ম নেয় পরিবর্তন, নির্ণীত হয় নতুন দিগন্ত। সেখানেই কবিতার মুক্তি, কবির বিশ্বাস। কবিতা এক অর্থে ভিত্তিভূমিও, সহজ মানবিক-বোধের সাবলীল বিকাশ—যা ধরা দেয় তাই সত্য, যা প্রকাশিত তাই সুন্দর।

কবি নীরদ রায়ের সাবলীল উচ্চারণ—‘এখনো স্বদেশ আমার মধ্যরাতের ; মুখোমুখি। এখনো প্রিয় শব্দের কণ্ঠস্বরে কেউ শেকল পরিয়ে রাখে।’

(এখনো স্বদেশ আমার / ২৭)

প্রতিবাদের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সত্যকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরা, কবির বৈশিষ্ট্য। সহজ কথাকে পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে, তখন তা শুধু কবিরই ফসল নয়; আমাদেরও তাতে অধিকার জন্মায়। নীরদ রায়ের ‘তিরিশ বছর অদ্ভুত অরণ্যের পাশে’—কাব্যগ্রন্থে ব্যক্তিগত কথন ভঙ্গীতে কবি নানা বিষয়কে তুলেছেন। স্বদেশপ্রীতি যে শুধু সারগর্ভ বাক্য নয়, তা বাস্তব সত্য তা যেমন উদাহরণ রয়েছে, তেমনি নিজের প্রতি বিদ্রোহ ও আঘাত—এও কবিরই স্বকীয়তা।

‘শোকে তাপে ভারতবর্ষ এখনো আগের মতোই রয়ে গেছে। যেমন প্রতীক্ষায় রক্তশূন্য ভালোবাসা। অপেক্ষমান শব্দে গন্ধে তোবড়ানো সঞ্চয়ে। বহুদিন একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। (ঠিক থাকা। ৪৬)। কবি লেখেন—‘তবুও মানুষ একদিন কবিতা হবে, গল্প হবে। এবং রাত্রি শেষের সকাল…!’

(কখনো কখনো। ৪৭)

কিংবা ‘আমার অহংকার শোকে তাপে ভারতবর্ষ হয়ে যায়’—

(তোমার আকাশ থেকে। ২৮)

টুকরো টুকরো অজস্র পংক্তির ভেতরে কবির এই নিজস্ব-নির্মাণ লক্ষ্য করা যায়। দু একটি অংশ—

'তবুও সময় এক অবাধ্য মলিন প্রেমের মতো।
সরাসরি জননী জন্মভূমি। কতখন তোমার কাছে।'
(তবুও সময় এক। ৯)

কখনো প্রতিবাদ, কখনো নির্মাণ-প্রজ্ঞা ইত্যাদি নিয়ে কবির কাব্য রচনা।

তিরিশ বছর অদ্ভুত অরণ্যের পাশে / নীরদ রায় /
বিশ্বজ্ঞান—৯/৩ টেমার লেন : কলি-৯।
দাম পাঁচ টাকা।

২.

'তুমি আমার দুঃখী স্বদেশ ঘোলাটে ভোর ময়লা আকাশ। তুমি আমার সন্ধ্যারাতের একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস। অপেক্ষার এই শান্ত ছবি। সারাজীবন নিরবধি। মাতাল আমার বুকের মধ্যে বিছিয়ে যাচ্ছে পবিত্র ঘাস। হাজার ছোটাছুটির মধ্যে তুমিই আমার নীল অবকাশ।'—মনে করিয়ে দেয় 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন…।'—কবি সুরজিৎ ঘোষ ষোল আনা নিজস্ব-কথা লিখতে জানেন, আর তাই কথাগুলি কারো কারো কাছে, কখনো কখনো একেবারে নিজের হয়ে ওঠে। কবিতার ক্ষেত্রে এই 'সহৃদয়-হৃদয়-সম্বাদী'—ভূমিকাটি কবি শ্রীঘোষের করায়ত্ত।

'যত ভাবছি। জন্মদিনের উপহার। ততই বিশ্বাস হয়ে উঠছে।
জল বাড়ছে। হাঁটুর কাছে ময়লা ঘোলাজলের ঠাণ্ডা হাতছানি'
(জন্মদিনের উপহার। ২৭)

পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'ভাসান চলে জলে স্থলে'-তে এরকমই অজস্র পংক্তি সুরজিৎ ঘোষ লিখেছেন।

'চোখের কোলে কেবল গভীর দাগ। প্রশ্ন করলে হেসে
ওড়ার জীবন নয় তো খোলাম কুচি। নখের নিচে গোপন
রাখে রাগ।' (অহংকার। ২৫)

অনেক বলা কথার মধ্যেও যে না-বলা কথাগুলি থাকে, তাকে কবি খোঁজেন; প্রকৃত অর্থে, অনেক কিছুই হারিয়ে যায়, এই হারানোর দিনে পুরোনোকে নতুন করে কাছে নেওয়া—ভালোবাসার বাঁধ দিয়ে বন্দর গড়ে সাগরকে কাছে নেওয়া—এক মূল্যবোধের ফসল। দ্রুত পরিবেশনার মধ্যে না গিয়ে বিলাসী-কথকতার ভঙ্গিতে কবি লিখছেন—

'পুরনো পৃথিবী আরো বুড়ো হোক আমি তো নবীন
জন্মান্তরে যেন পাই বিস্ময় আয়ত গাঢ় চোখ
আমার মাথার চুল দীঘল শরীর বেয়ে নেমে যাবে,
যেমন সহজ জল ঝাঁঝি নেমে যায় নিরালা পুকুরটির
গভীর অতলে।'—(জন্মান্তর। ৩৩)

অথবা, মেদুর ভাষণ—

'যা তুমি গেয়েছ আগে তবু আজ নতুন শোনাবে!
যদিও শরীরে কোনো প্রণামের ভাষা নেই, মন্দিরে
বিগ্রহ নেই কেউ।'

মাঝে মাঝে গদ্যগন্ধী দু-একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবু কবিতার স্বার্থে তা গ্রহণযোগ্য, সহজ ভাষা এবং সুরুচি পরিবেশন মুগ্ধ করে।

ভাসান চলে জলে স্থলে। সুরজিৎ ঘোষ। রক্তকরবী ১০।২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। দাম বারো টাকা।

৩.

এই সময়ের কবিতা ধারায় জয়দেব বসু ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। সরল বাগ্‌ভঙ্গীমার চাইতেও বস্তুজীবন ও পারিপার্শ্বিকতা, এই সময়, স্বদেশ, সমাজ, এমনকি অতিব্যক্তিগত ভাবনাও পংক্তিবদ্ধ করেন জয়দেব। সাহসী হতে চাইলেও পরিনামে স্বচ্ছ রোম্যান্টিক মন তার কবিতায় এক অন্যদিক বয়ে আনে। 'ভবিষ্যৎ' কবিতার বইটিতে তিনি লিখেছেন—'আমাদেরও বেঁচে থাকবার কথা ছিল। কোনোদিন আগে ছুটি পেলে বুকের দারুণ শব্দে কেঁপে ওঠে পৃথিবীর মাটি···ওহে ভাই, আমাদের মত রোগা মানুষেরা, লেদের প্রচণ্ড শব্দে টুকরো টুকরো করো রাত।''

(ভূমিদাস, ৫।২০)

শ্রমিক-মুক্তি-বিপ্লব ও মেহনতী মানুষের কথা তাঁর অজানা নয়, অবশ্য তিনি অনুপ্রাণিত। তবে তা অন্ধত্ব নয়, শিল্প বিচারে যোগ্য মননশীলতা। নাম-কবিতায় জয়দেবের এক সহজ আহ্বান '···জাগো নিশানেরা, জাগো মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছার স্রোত, নীতি থেকে শব্দ তুলে আনতে জাগো।'

(ভবিষ্যৎ। ৫২)

জয়দেব আত্মদহনে বিশ্বাসী নন, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিবাদ প্রবণতা তার

লক্ষ্য। 'লিখনি কিছু তেমন ইতিহাস। লিখনি, কোনো মানুষ আছে কিনা'—অন্যত্র প্রত্যন্ত অনুভব সীমান্তে '…আমি বলতে পারতাম ; ও বৃষ্টি থেমো না। ঝরে যাও সারারাত্রি, শীতার্ত হরিণের চোখ। যেরকম ছলছল করে ওঠে, ঠিক সেইভাবে। এ শহর ফুঁপিয়ে উঠুক।' সমকালীন বিষন্নতার চিত্র আঁকতে কবি যতটা ক্লান্তি অনুভব করেন তার চাইতেও তিনি বিশ্বাসী ভবিষ্যতের দিনের কথা ভেবে—'হাত থেকে হাতে পৌঁছে দিতে পারব ভবিষ্যৎ।'

ভবিষ্যৎ। জয়দেব বসু। প্রমা। ৫ ওয়েষ্ট রেঞ্জ, কলি-১৭। দাম বারো টাকা।

৪

'শস্যফলনের হাসি'-তে বিশ্বজিৎ পাণ্ডা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কুপার্স ক্যাম্প পর্বে একটি কবিতায় লিখছেন—'মহাদেশের পর মহাদেশ পেরিয়ে যায় তারা। আমাদের সবল হৃদয়ে ছায়া পড়ে না।'

(বধ্যভূমি।-৩৪)

শব্দ নির্বাচনে বিশ্বজিৎ পাণ্ডা খুব দক্ষ না হলেও বিষয় নির্বাচন ও সহজ বক্তব্য তাঁর আয়ত্তে। '—মরেই চলেছে শুধু হাসিগুলো আমি তোমাদের বলেছিলাম। এই সেই শস্যফলনের হাসি।' (শস্যফলনের হাসি, ২।১৪)

অথবা—

'তাছাড়া একটি মেয়ের কাছে তোমারই বা কি পাওয়ার আছে।
এই নয়ের দশকে, তারচেয়ে লোক মতামতে ভিড়ে যাওয়া ভালো।
মৃৎগত দাবি নেই তার পক্ষপাত নেই, দ্যাখো। তবুও তো একদিন
কালো হয়ে আসে গ্রামদেশ সূর্যশিশির গোমেদ প্রবাল।'

(কলসপত্র। ২১)

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা কবিতায় গদ্য ভাষা ব্যবহারে ও অবয়ব নির্মাণে সচেতন। একটি-দুটি উদাহরণ—

'হে রোমশ পাহাড়, আমাদের সমস্যার সমাধান নেই।
হে রোমশ পাহাড়, শোকের বশ্যতা তুমি স্বীকার করো না।'

(ডানা গজানোর পদ্ধতি ও পরিণাম, ৪।৪০)

অথবা,

'অবসর জড় হতে হতে বুকের নরম আঁশে অভিভূত হব একদিন
ধর্মভ্রষ্ট কুকুরের মতো। আলো ধার নিতে আমি এখানে এসেছি
হে রোমশ প্রবাল প্রাচীর'—

(ডানা গজানোর পদ্ধতি ও পরিণাম, ৬। ৪১)

এ ধরণের বহু কবিতা রয়েছে এ বইটিতে। নিরাভরণ প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। শস্তুকলনের হাসি, বিশ্বজিৎ পাণ্ডা। প্রমা ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কল-১৭। দাম বারো টাকা।

'আনতবজ্রা' সুতপা সেনগুপ্তর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। সুতপা কবিতায় নিজেকে বিভিন্ন ভাবে বদলে নিয়েছেন। সহজ শিল্পমন ও সহজ বক্তব্য তাঁর আয়ত্তে। তাই সুতপা ভাবের প্রতি অধিক সচেতন, প্রকাশেও।

'ও ডানায় ভর করে শান্তি হলে এই ঝোড়ো হাওয়া
ও উত্থান জানে ক্রমে বিন্দুতে মিলিয়ে যেতে সিন্ধু সিন্ধু
করে…।' (বিন্দুমালিনী / ১৪)

অন্যত্র তিনি লেখেন—'এই অঙ্গীকার হোক, স্মৃতি থেকে মুছে ফেলো জরা।
নূপুরের মতো বাজে অবেলার এলোমেলো পথ। তুমি
আর্যরাজা, তুমি বিস্মরণপ্রিয় তবু আর্যপুত্র আজো।
অভিজ্ঞান দেবে তুমি, আমি শুধু বল্কল খসাব।'

(নির্মোহ / ২৭)

প্রেমবাসনা ও কারুভাবনা সুতপার কবিতায় কোথাও মিশে গেছে। এ প্রেম শুধু নিবেদনের নয়; সমর্পণেরও। তবু স্বকীয়তা বর্তমান, যা নারীরই থাকে—

'তোমাকে তো চিনিয়াছিলাম। কবে সেই ধূসর বিকেলে
আজও চেনা শেষ হয় নাই। খুলিয়া দিয়াছি বাজুবন্ধ।'

(মঙ্গলকাব্য, ২ / ৫৮)

কিংবা; '…তীব্রতম সে পুরুষকে দিতে চেয়েছি কোলছড়ানো শিশু'

(গর্ভিণীমালা ১ / ২৯)

'…তুমি হে তৃষ্ণার জল তুমি হে আমার অতীত। তোমার
আঙুল পাতাগুলি ছুঁচল শিরশির করে আমার। শরীর আমার

চেতনা খুলে খুলে যায় অতলের মতো অতলস্পর্শী গুহার
মতন অন্ধকার। বাঁকে বাঁকে।’

(লুম্বিনী, ৪ / ১৯)

আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এ বইটির অন্য আকর্ষণ।

আনতবজ্র। সুতপা সেনগুপ্ত। প্রমা ৫, ওয়েষ্ট রেঞ্জ, কলি-১৭
দাম বারো টাকা।

সব্যসাচী সরকার

পুস্তক-পরিচয়

নজরুল ইসলাম : পুনর্বিবেচনা

নজরুল ইসলাম অনেক ধরনের গান রচনা করেছিলেন। তাঁর শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তনের পাশাপাশি ছিল কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, আবার অন্তর্ন্যাশনাল সঙ্গীতের মতো গান। শেষোক্ত গানগুলি আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকাকে ‘আরেক নজরুল’-এর অস্তিত্ব আবিষ্কারে সক্ষম করে তুলেছে। নজরুলেরই একটি কবিতার শীর্ষক ব্যবহার করে তিনি লিখেছেন—“এইসব গান তো শুধু নান্দনিক ক্ষুধা মেটাবার সামগ্রী নয়, এইসব গান ঐ অন্নবস্ত্রহীন পরাধীন মানুষগুলোকে দেয় জীবনের দুশমনের সাথে লড়াই করার প্রেরণা, দেয় শিরদাঁড়াটা টান টান করে বাঁচবার প্রেরণা। সত্যিই বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গান আগে ছিল না। নজরুলই তার পথকার। স্বভাবতই এই ধরনের গানের স্রষ্টা নজরুল তো শুধু গীতিকার, সুরকার নন, তার আড়ালে রয়েছেন আরেক নজরুল।’ এই আরেক নজরুলের সন্ধান করতে গেছেন আমাদের লেখিকা। তার ফলস্বরূপ আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি-বর্তমান গ্রন্থ ‘নজরুল : একটি রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব’।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো তাড়াহুড়ো করেন নি। দ্রুত মন্তব্য বা সিদ্ধান্তে যাবার জন্য চেষ্টা করেননি। বরং সুচিন্তিতভাবে গুছিয়ে কাজ করারই তিনি সর্ববিধ চেষ্টা করেছেন। চারটি অধ্যায়ের মধ্যে তাঁর মূল কাজ সম্পন্ন হলেও, অধ্যায়গুলি তিনি সুশৃংখলিত ভাবেই গ্রথিত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ নজরুল ইসলামের মতাদর্শ তিনি ধরে আলোচনা করেছেন। এতে পাঠকদের কাছে তা যেমন মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে, তেমনি যুক্তিগ্রাহ্য হয়। একটি জিনিস উল্লেখ করতেই হবে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নজরুল ইসলামের মনের গতি বা ভাবাবেগ ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন, বা কেন হয় তাঁর সৃষ্ট কর্ম সেই সেই অনুযায়ী, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখিকা কোনো মনোগত ধারণার ওপরে তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেন না, বরং তিনি পারস্পেকটিভ বা যথাযোগ্য পশ্চাদ্‌পট পাঠকের চোখের সম্মুখে উন্মোচন করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশ যার থেকে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষই সযত্নে দূরে সরে থাকতে পারেন না, বিশেষ করে নজরুলের মতন সংবেদনশীল ব্যক্তি, সেটা শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো ক্ষেত্রেই ভোলেন না; এবং এজন্য তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ নন। এ খুব দুরূহ কাজ। কিন্তু শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তা সম্পন্ন করেন। পাঠক হিসাবে তার গুণমুগ্ধ না হয়ে থাকার, বা তাঁকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় থাকে না।

তাঁর লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। বিশিষ্ট গবেষকদের মন্তব্য উল্লেখ করার পর তিনি নিজের বক্তব্যে অগ্রসর হয়েছেন। এতে তিনি যুক্তির দিকে এগুতে পেরেছেন। এজাতীয় গ্রন্থে এই গুণের সাক্ষাৎ সচরাচর পাওয়া যায় না। এই যে কৃত্রিমতা পরিহারের আন্তরিক প্রচেষ্টা একে প্রশংসা করতেই হয়। সমালোচনাত্মক মনোভাব না থাকলে সে সত্যমিথ্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয় লেখিকার রচনাশৈলী থেকে আমরা সে-জ্ঞান লাভ করে থাকি।

নজরুলের 'ধূমকেতু' সম্পাদনার ভূমিকা আমাদের সাধারণের অগোচরে থাকে। সম্পাদকীয় লেখার মধ্য দিয়ে তিনি যে শুধু দেশপ্রেমের জ্বালা-যন্ত্রণাই প্রকাশ করেন তাই নয়। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে নজরুল যে একটি মুখ্য ভূমিকা নেন, প্রবন্ধকার নজরুল যে কবি নজরুল থেকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষণীয় নন, অনেক রাজনীতিবিদ্ দেশপ্রেমিক নেতার থেকে অনেক বেশী অগ্রবর্তী হয়ে নজরুলই

যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে হাজির হন, এমন অনেক সব সাধারণের অজানা তথ্য পরিবেশন করে লেখিকা শুধুমাত্র ধন্যবাদই হন না; তিনি মূলতঃ কৃতজ্ঞতাপাশে আমাদের আবদ্ধ করেন এটা আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

এ গ্রন্থ রচনায় যাঁরা তাঁর মূল সহায়ক হন তাঁদের কথা লেখিকা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। এঁরা হলেন ঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (এঁর গ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা), প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (এঁর গ্রন্থ, কাজী নজরুল এবং সাংবাদিক নজরুল), আজহারউদ্দীন খান (এর গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যে নজরুল), এবং ডঃ সুশীল গুপ্ত (এর গ্রন্থ, নজরুল চরিত মানস)।

একটি আপত্তি হয়তো উঠতে পারে। সে-আপত্তি নান্দনিকদের। কিন্তু সে-আলোচনায় লেখিকা যে আবার কেন প্রবৃত্ত হননি, তা বুঝতেও আমাদের অসুবিধা হয় না। লেখিকা যেহেতু নজরুলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আলোচনাতেই পদক্ষেপ করেছেন, সেইহেতু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ারও কোনো অবকাশ বা সুযোগ তাঁর নেই। আমার ‘কৈফিয়ৎ’ শীর্ষকে তিনি তা ব্যক্তও করেছেন। তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বলব, এম. ফিল,-এর ডিসারটেশন বা উপাধির জন্য লিখিত আলোচনা হিসাবে কাজ শুরু করলেও, শ্রীমতী শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের মূল্যায়ন-সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সিদ্ধার্থ সাহা

নজরুল : একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকাশক : নবপত্র প্রকাশন। দাম : ৩৫ টাকা।

অজানা ইতিহাসের সন্ধানে

সাংবাদিকতার ইতিহাসের উপর গ্রন্থের অভাব না থাকলেও সংবাদপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রাম-গ্রন্থের অভাব বিদ্যমান। অধুনা সাংবাদিকতায় এ সম্পর্কে গবেষনার কাজ হচ্ছে। সেদিক থেকে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক অরবিন্দ মজুমদার এবিষয়ে বিশেষতঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে পরিস্ফুটিত করে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ইণ্ডিয়ান প্রেস এ্যাণ্ড ফিড্রাম স্ট্র্যাগেল (১৯৩৭-১৯৪২) গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯৩৭ ও ১৯৪২ সাল দুটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ ও ১৯৪২ সালে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। উক্ত গ্রন্থটিতে নথিভুক্ত ঐতিহাসিক গবেষণার নিরীখে আলোচনার সুরটি বিন্যস্ত—

প্রথম ভাগ—ভারতীয় সংবাদপত্রের পথিকৃৎ, প্রাক কংগ্রেস আন্দোলন ও সংবাদপত্র, সংবাদপত্রে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ, প্রাদেশিক স্থায়িত্ব-শাসনাধীন সংবাদপত্র কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী সরকার, দেশীয় রাজ্যগুলি, সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রারাম্ভ, সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক বন্দী—কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী সরকার, কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের উন্নতি, ভারতীয় সংবাদপত্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এ আই এন ই সি এর প্রারাম্ভ ও ভূমিকা, দ্বিতীয় ভাগ—সংবাদপত্র ও বিচারাধীন সংবাদপত্র মামলা, কংগ্রেস ও অকংগ্রেসী সরকারী সংবাদপত্র ও যুদ্ধ, উপসংহার পরিশিষ্ট রয়েছে যে বেঙ্গলী পত্রিকার বিরুদ্ধে বিখ্যাত আবমাননা মামলা, তেজবাহাদুর কমিটির প্রতিবেদন, সেনাবাহিনীয় বয়কট—শ্রীঅরবিন্দ।

বিষয়গুলি সংযোজনা করে প্রাথমিক সূত্র থেকে কাজ করার প্রবণতা লক্ষণীয়।

১৯৩৭তে প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রকাশনায় রয়েছে ইংরাজীতে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্টভার্ড বাংলায় 'যুগান্তর', বোম্বাইর 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' এটি প্রয়োজনে সর্বদলের নেতাদের সমালোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না,

এম. এন. রায়-এর 'সম্পাদনায় ইনডিপেনডেণ্ট ইণ্ডিয়া' মুসলীম লীগের 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া', অপরদিকে কংগ্রেস দলে রাজ্যে রাজ্যে সরকার গঠন।

১৯৩৭ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড, 'দি স্টেটসম্যান', ফজলুল হকের প্রতি সহনাভূতিশীল থাকলেও, আনন্দবাজার পত্রিকার আচরণ ছিল সংযত, অন্যদিকে কালীনাথ রায়-সম্পাদিত 'ট্রি বিউন' পত্রিকার সহানভূতির সুরটি সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি থাকলেও কিন্তু মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতি সদয় সুর ছিল না।' টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' মন্তব্য প্রকাশ ছিল সর্তকতায়।

১৯৩৭-৩৮ সালে দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল গণসংযোগ আন্দোলন। গণ মাধ্যমে গড়ে উঠে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এই আন্দোলনের পথিকৃৎরা ছিলেন মৃণালকান্তি বসু, কলকাতার মেয়র এ. কে এম. জাকারিয়া। ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু ইণ্ডিয়ান জারনালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতির ভাষণ দেন। ১১,৬, ১৯৩৯ সালে আসামে সাংবাদিক সমিতি গঠিত হয়—সাংবাদিকেরা তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য দাবী তুলে ধরেন। এপ্রিল, ১৯৩৮ সালে অন্ধ্র প্রাদেশিক জারনালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতির ভাসনে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ সাংবাদিকতার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রদেশগুলিতে ক্রমশঃ সাংবাদিকতার ইউনিয়ন সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৩৯ সালের মার্চে ত্রিপুরী কংগ্রেস এবং ১ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা শুরু হলে সংবাদপত্রের উপর সংবাদ পরিবেশনে নিষেদ্ধজ্ঞা জারী করা হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইস্টান নিউজ পেপার সোসাইটি। অধুনা ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপার সোসাইটি ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহরুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ন্যাশানাল হেরল্ড। প্রকাশিত হয় জমিদারী সমাজের মুখপত্র 'পাওনিয়ার' 'কৃষক' ও 'ভারত' 'মর্নিং স্টাণ্ডার' এবং উদারপন্থী দলের 'লীডার পত্রিকা'। ১৯৪০ সালে রামগর কংগ্রেসে মহম্মদ আলি জিন্না পৃথক পাকিস্থান রাষ্ট্রের

দাবী উত্থাপিত করেন। অনুষ্ঠিত হয় অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এডিটরস´ কনফারেন্স। বেঙ্গল প্রেস পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়।

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা রচনার দাবী তোলা হয়।

জুন, ১৯৪১ সালে জার্মানী ইউ. এস. এস. আর আক্রমণ করে। ভারতে ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজ (LANGUAGE) নিউজপেপার এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঘটনার সাথে সিঙ্গাপুর পতন, ২২ মার্চ ১২ এপ্রিল ভারতে ক্রীপস মিশনের আগমণও উল্লেখ্য। সরকার জারী করেন স্পেশাল কোর্ট অর্ডিন্যান্স এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সংবাদপত্র 'পিপলস ওয়ার' প্রকাশিত হয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এসম্পর্কে আলোচনা না থাকায় ঠিক হয়নি।

বইটির সামগ্রিক আলোচনায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্র কর্মী আন্দোলন এবং সংবাদপত্র আইনের ইতিহাসের স্পর্শতা থাকলেও ১৯৩৮-এর বিখ্যাত টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে উল্লেখ না থাকার কারণ কি ?

মুদ্রণে পরিচ্ছন্নতা, ও ভুল সম্পর্কেপ্রকাশক যত্নবান হলেও গ্রন্থের অত্যাধিক মুল্যের কারণে সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্লভ হবে। এই গ্রন্থটি সাংবাদিকতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস অনুসন্ধানী, গবেষক, ছাত্র, অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্টদের রেফারেন্স বুক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রবীরকুমার লাহা

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ত্রুটিগুলি দূর হবে প্রত্যাশিত। অরবিন্দ মজুমদার। ইণ্ডিয়ান প্রেস এ্যাণ্ড ফ্রিডম স্ট্যাগেল্স ওরিয়েন্ট লংম্যান। ১৯৯৩, ৩৫৩ পৃষ্ঠা। নির্ঘণ্ট। দাম ১৩০ টাকা।

রামায়ণ—খোলা চোখে

আগ্রাসী রামভক্তদের মোকাবিলা করার জন্য শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, সাংস্কৃতিক স্তরেও যে ব্যাপকভাবে লড়াই করা প্রয়োজন, তা কমবেশি দেশের বুদ্ধিজীবী-মহলে কম বেশি অনুভূত হচ্ছে। এ নিয়ে আত্মপ্রসাদের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, দীর্ঘ উদাসীনতার সুযোগে মৌলবাদ দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য—সর্বস্তরেই জাতীয়-চৈতন্যের শিকড় পর্যন্ত ইতিমধ্যে বিষাক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেহারা এখনো কাটা-ছেঁড়া দ্বৈপায়ন।

এমনই এক পর্বে আমাদের হাতে এসে পড়েছে হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘খোলা চোখে রামায়ণ’ নামে একটি গ্রন্থ। বইটি প্রধানত রামায়ণের রাজতিলক রামচন্দ্র এবং অযোধ্যার রাজ-পরিবারের সদস্যদের আন্তসম্পর্কের পুনর্বিবেচনা। প্রাচীন আর্য ইতিহাসের তিনটি প্রধান ঘটনা—মৃগয়াজীবী ও গোধন-নির্ভর আর্যদের কৃষি-কেন্দ্রিক সভ্যতার সূচনা ও রাজ্যবিস্তার, আর্য-অনার্য সংঘাত এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ—এই বিষয়গুলির ওপর রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি বর্তমান গ্রন্থের লেখক যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তা হল, তাঁরই ভাষায়' "..রামায়ণে আরও কিছু ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। আছে প্রাসাদ বিপ্লবের কাহিনী, আছে নীচতা শঠতা ও চক্রান্তের ইতিহাস, আছে দশরথের পরিবারের নিদারুণ ভ্রাতৃ-কলহ, সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ এবং সর্বোপরি একদা প্রগতির সমর্থক, হরধনু-ভঙ্গকারী রাবণ-বিনাশকারী রামচন্দ্রের পরবর্তী সময়ের রক্ষণশীল ভূমিকা ও সেই সঙ্গে রামচরিত্রের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলির উন্মোচন।"

অলৌকিক ও অলীক বাতাবরণ ছিঁড়ে এই গ্রন্থের লেখক যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এককথায় গোটা রামায়ণী কথাকেই পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেছেন যে আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে কখনো অবতার আখ্যা দেননি, বড়জোর তাঁকে ‘নরশ্রেষ্ঠ’ বা ‘নরচন্দ্রমা’-র মর্যাদা দিয়েছেন। বাল্মীকির দশরথ যে অযোধ্যার রাজা তা

মাত্র বারো যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তৃত। কৌশল্যা কোশলরাজের কন্যা নন, কোশল দেশের মেয়ে। দশরথের কনিষ্ঠা স্ত্রী সুমিত্রা-ও যে অভিজাত বংশীয়া এর কোনো প্রমাণ রামায়ণে নেই। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ছিলেন যথাক্রমে রাম ও ভরতের দেহরক্ষক।

গ্রন্থটির লেখক বাল্মীকির রচনাকেই অনুসরণ করে দেখাতে চেয়েছেন নবলব্ধ কৃষিবিদ্যাকে রক্ষা ও বিস্তার করার মানসে কেন রাজা জনক হরধনু-ভঙ্গকারী রামচন্দ্রকে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে যুক্ত করেছিলেন। এই কন্যাটি লৌকিক। আর, রামায়ণে যে অ-যোনিসম্ভবা সীতার কথা বলা হয়েছে, তা আর কিছুই নয়, 'হল' বা 'লাঙ্গলের' মুখে পৃথিবীর পেট চিরে আনা কৃষিজাত ফসল। 'সীতা' নামটিরও 'হলরেখা' ছাড়া অন্য কোনো অর্থ নেই। কৃষিসভ্যতার প্রাথমিক স্তরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিবৃত্তের রূপকথা হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অযৌক্তিক আলোচনায় তথ্যনিষ্ঠ চেহারায় দাঁড়িয়ে গেছে।

রামচন্দ্রের অসম্পন্ন রাজ্যাভিষেককে কেন্দ্র করে অযোধ্যায় প্রাসাদ-চক্রান্ত যে বহুমুখী মাত্রা নিয়েছিল, তার প্রতিটি স্তর হরপ্রসাদবাবু অত্যন্ত সতর্কতায় অথচ বিশ্বাস্যভাবে উন্মোচিত করেছেন। এ-ব্যাপারে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার মাধ্যমে যে-সব সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা অযোধ্যা রাজপরিবারের তথাকথিত আদর্শ পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে গদগদ ভক্তিবাদী চিন্তাধারার একটির পর একটি ইঁট খুলে নিয়েছে। লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন—

১। দশরথ চেয়েছিলেন, ভরত মাতুলালয়ে থাকতে থাকতে কেকয়রাজ ও ভরতের অজ্ঞাতে রামচন্দ্রের অভিষেক সম্পন্ন করতে।

২। রাম-অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন ক'রে এবং এই সংবাদ আগের রাত পর্যন্ত কৈকেয়ীর অজানা রয়েছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে দশরথ তাঁর মেজরাণীর প্রাসাদে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কৈকেয়ীর সশস্ত্র অনুচরদের হাতে কার্যত বন্দী হয়েছিলেন।

৩। এককথায় রাজা দশরথের প্রতি বলপ্রয়োগ করে রামের বনবাস ব্যাপারটি সিদ্ধ হয়েছিল।

৪। রামায়ণে কোথাও লেখা হয়নি যে দশরথ রামচন্দ্রকে বনবাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৈকেয়ীর প্রাসাদে খোদ কৈকেয়ীর মুখ থেকে রামের প্রতি এই ফতোয়া নির্বাক দশরথের নামে উচ্চারিত হয়েছিল।

৫। কৈকেয়ীর নির্দেশ না মানলে প্রবল কেকয় রাজ্যের আক্রমণে রাজসিংহাসন ও জীবন বিপন্ন হতে পারে, এই আশংকাতেই রামচন্দ্র বনবাসে যেতে সম্মত হন।

৬। কৌশল্যা তাঁর প্রতি অনুরাগহীন দশরথকে ঘৃণা এবং কর্কশভাষিণী, ক্রোধী কৈকেয়ী ও তাঁর পুত্র ভরতকে ভয় করতেন।

৭। লক্ষ্মণ তো সরাসরিই 'কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত, বালস্বভাবাপন্ন পিতা'-কে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন।

৮। দশরথকে হত্যা করে রামের রাজ্যলাভেও কৌশল্যার আপত্তি ছিল না।

৯। রামচন্দ্রও তীব্রভাষায় স্ত্রৈণ পিতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁকে 'ধর্মত্যাগী' ও 'কামের অনুসারী' আখ্যা দিয়েছেন।

দশরথের রাজান্তঃপুরের হিংসা, দ্বেষ, ক্ষমতালোলুপতা ও চক্রান্তের রূপকে এভাবেই উন্মোচিত করে তথাকথিত পিতৃভক্তি, পতিভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেমের ফাঁপা ফানুসগুলোকে ফাটিয়ে দিতে পেরেছেন লেখক।

ভরতকে হরপ্রসাদবাবু দেখেছেন 'মাস্টার ডিপ্লোম্যাট' হিসেবে। মাতুলালয় থেকে ফিরে এসে রামচন্দ্রের বনবাসে বিক্ষুব্ধ গোটা অযোধ্যানগরীকে সামলানোর জন্য তিনি অরণ্য থেকে রামকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসের একটা নাটক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তা না হলে চতুরঙ্গে সজ্জিত হয়ে হাতি-ঘোড়া-হয়-পদাতিকে পৃথিবী কাঁপিয়ে তিনি অগ্রজ-কে 'ফিরিয়ে আনতে' যাবেন কেন? এই সুবিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে বুদ্ধিমান রাম বুঝেছিলেন, ক্ষমতা প্রকাশের মূঢ়তা না দেখিয়ে ভরতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে প্রাণ বাঁচানো চেষ্টা করাটাই যুক্তিযুক্ত। ফলে রাম আত্মসমর্পণ করলেন। বলপ্রয়োগে নয়, বলপ্রদর্শনেই কার্যসিদ্ধি করে অযোধ্যার প্রজাদের সন্তুষ্টি বিধানে রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় নিয়ে পাকা অভিনেতা ভরত রাজ্যে ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে ভারী চমৎকারভাবে হরপ্রসাদবাবু মন্তব্য করেছেন, "...একথা তিনি জানেন, খড়ম কখনও রাজ্যশাসন করে না। সুতরাং রামের খড়ম সামনে রেখে প্রজারা যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাতে ভরতের লাভ বই ক্ষতি নেই।"

ঘরে-বাইরে এভাবে পরিপূর্ণ জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ভরত সর্বসমক্ষে নাটকীয় ভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যে, পঞ্চাশ বৎসরের প্রথম দিনে রামের দর্শন না পেলে তিনি অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেবেন। কিন্তু কার্যত যে ভরত

রামকে হিসেবের খাতা থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিলেন, হরপ্রসাদবাবু তা প্রমাণিত করার জন্য কয়েকটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। যেমন—রামের গোটা বনবাসকালে ভরত কোনোদিন সামান্য যোগাযোগ রাখেন নি। সীতার অপহরণের পর ভরতের কাছে রাম কোনো খবর পাঠাননি। ভরতও একটি সৈন্য দিয়েও বিপদের সময় অগ্রজকে সাহায্য করেনি। পঞ্চদশ বছরের প্রথম দিন নয়, তারও অন্তত ছয়-সাত মাস বাদে রাম অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। লেখক বলছেন, "অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেওয়া দূরে থাকুক, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রামচন্দ্রদের না ফিরবার কারণ সম্বন্ধে এতটুকুও অনুসন্ধান করেন নি ভরত।"

চোদ্দ বছর পরে ভরতেরই অস্ত্রে ভরতকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন রামচন্দ্র। বানর, ভল্লুক, মহাবল রাক্ষস সৈন্যবাহিনী, মিত্র বিভীষণ ও সুগ্রীবকে নিয়ে যখন তিনি অযোধ্যার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, প্রাণভয়ে ভীত ভরত কেবল তখনই অগ্রজকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। রাম অবশ্য ভরতকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারেন নি। চূড়ান্ত বিশদৃশভাবে তিনি ভরতের উপস্থিতিতেই লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চান। লক্ষ্মণ অবশ্য এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর বাধ্য হয়ে রাম ভরতকে যুবরাজ করেন। তবে বহির্যুদ্ধে তিনি লক্ষ্মণকে না পাঠিয়ে বা নিজে না গিয়ে সবসময়ই ভরত ও শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করতেন। সীতা এবং লক্ষ্মণও ভরত-সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন খুব কম নয়।

নানারকম অলৌকিক ঘটনা ও অতিকল্পনার যে হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলি কিছু কিছু খোদ বাল্মীকির কাব্যে ও পরবর্তী রামায়ন-প্রণেতাদের রচনায় ভূরি ভূরি আছে, অমোঘ যুক্তির শরসন্ধানে সেগুলিকে বারবার ছিন্নভিন্ন করেছেন বর্তমান গ্রন্থের লেখক।

ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে 'শতযোজনব্যপী' সমুদ্র কোনোদিনই ছিল না। বর্তমান কালে এই পকপ্রণালীর প্রস্থ প্রায় ছত্রিশ মাইল। পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে প্রায় চার হাজার বছর আগে রামায়ণের যুদ্ধ হয়েছিল। লেখক এখানে মেগাস্থিনিসের প্রামাণ্য বিবরণের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রায় দুহাজার তিনশো বছর আগে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এই গ্রীক রাষ্ট্রদূত অবস্থান করেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় আছে, ভারত ও লংকার মধ্যে 'সাগর' নামে এক অগভীর নদী ছিল।

হনুমান লাফিয়ে যে সেই সাগর পার হননি, তা বাল্মীকির বিবরণীতেই আছে। বাল্মীকি লিখছেন, হনুমান নৌযানের মত সাঁতার কাটছিলেন। তিনি সাগরের উর্মিজাল প্রতিহত করতে করতে মহাবেগে যাচ্ছিলেন। সেই সাঁতারের সময় 'সিংহিকা' নামে এক হাঙ্গর তাঁর বাধাসৃষ্টি করেছিল। আর, আকাশে হাঙ্গরের অবস্থান—এতো ভাবাই যায় না।

এভাবেই সীতার অগ্নিপ্রবেশ, পাতালপ্রবেশ ইত্যাদির ঘটনার অলীক-কল্পনাকে নানা প্রমাণসহ ছেদন করেছেন প্রাবন্ধিক। দেখিয়েছেন, কিভাবে কেবল বিপুল সৈন্যসহ রামচন্দ্রের লংকা অভিযানের পরই বিভীষণের ধর্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল। রামচন্দ্রও স্বয়ং রাজ্যলাভাষী বিভীষণের সঙ্গে কুটনৈতিক সদ্ভাব স্থাপনই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন।

রামচন্দ্রের প্রতি সীতার ও লক্ষ্মণের অচল বিশ্বাসের সৌধ কিভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে থাকে, তার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ করেছেন হরপ্রসাদবাবু। সঠিকভাবেই তিনি উক্তি করেছেন, "উচ্চস্থান থেকে পতনে ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটা সুগভীর বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার চেয়ে বড় পতন আর কিছু হতে পারে না। সীতার জীবনের ট্রাজেডি বোধহয় এই কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি রূপে গণ্য হতে পারে।" রামের প্রতি লক্ষ্মণের চূড়ান্ত বিশ্বাসভঙ্গের এহেন পটভূমিতেই রামায়ণের 'লক্ষ্মণবর্জন' অংশটির কারুণ্যকে তুলে ধরেছেন লেখক।

'খোলাচোখে রামায়ণ' এই আলোচকের মত অনেক পাঠককেই সম্পূর্ণ নতুনভাবে রামায়ণ পাঠ ও বিবেচনায় প্ররোচিত করবে, আশা করি। গ্রন্থটির অন্তিমপর্বে লেখকের একটি বক্তব্য উদ্ধার করে আলোচনার ইতি টানছি—

"প্রথম জীবনে রাম ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে খর্ব করার ভূমিকা নিয়েছিলেন। ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ সাধনে তৎপর ছিলেন। কিন্তু সারাজীবনই রামচন্দ্র সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজ-প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, একথা বলা যায় না। যে রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে মিত্র রূপে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি, পরবর্তী যুগে তিনিই শূদ্র তপস্বী শম্বুককে স্বহস্তে বধ করেছিলেন খড়্গাঘাতে। সমাজ বিপ্লবের যে অঙ্কুর রাম চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, সেখান থেকে ক্রমশই তিনি সরে এসে লোকাপবাদ ও লোকাচারের তুচ্ছ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের অনুগত হয়ে রাম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।"

অমিতাভ দাশগুপ্ত

খোলাচোখে রামায়ণ। হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিংশশতাব্দী,। ৭৫।সি পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬। দাম—ত্রিশ টাকা

বিভূতিভূষণের দিনলিপি

বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় দিনলিপি 'স্মৃতির লেখা'-য় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখের দিনলিপিতে লেখা আছে—

"আজ আমার সাহিত্য সাধনার একটা সার্থক দিন—এই জন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) বিচিত্রা-তে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বিচিত্রা পত্রিকায় 'পথের পাঁচালী' প্রায় ১ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে অবশেষে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর বুধবার মহালয়ার দিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বিভূতিভূষণ একজন সাহিত্যযশঃপ্রার্থী নবীন লেখক। কিন্তু উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের মুহূর্ত থেকে তিনি বিশেষ ভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি এসেছেন বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী পরোয়ানা নিয়ে। বলাবাহুল্য ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর (বিভূতিভূষণের মৃত্যুদিন) পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর পর্যন্ত তিনি নিবিড় নিষ্ঠায় সাহিত্য সেবা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তৎকালীন প্রায় সমস্ত কবিসাহিত্যিকদের কাছ থেকে বিভূতিভূষণ পেয়েছেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। অগণিত পাঠক সাধারণ তাঁকে বসিয়েছেন তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। 'পথের পাঁচালী' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ যে সমালোচনা লিখেছেন, সেটি পরিচয় পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সুস্পষ্ট।" সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাবেই যে লেখক যাবতীয় পাঠক কুলের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারেন তিনি যে কালে জয়ী হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পথের পাঁচালী প্রকাশের পর বিভূতিভূষণ একের পর এক উপন্যাস ও ছোট গল্প উপহার দিয়েছেন। তার ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার। বিভূতিভূষণের বিশাল সাহিত্যসম্ভার আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বিভূতি সাহিত্যের মূল্যায়ণে সমালোচকদের ক্লান্তিহীন প্রয়াস চোখে পড়ার মত। নানা পত্রপত্রিকা আজও বিপুল সমারোহে

বিভূতিভূষণের স্মৃতিতে মুখর। দুঃখের বিষয় নিরলস সাহিত্য সেবক বিভূতিভূষণের সাহিত্যের মূল্যায়ণে যতখানি আগ্রহ প্রকাশিত হয়, ততখানি আগ্রহ বর্ষিত হয় না বিভূতিভূষণের জীবনীচর্চায়। সাহিত্যে নতুন জিনিস দেবার জন্যে যে-লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর জীবনকে জানার যে প্রয়োজন আছে, এই কথাটা কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় এই দৃঢ়পণ নিয়ে বিভূতিভূষণের জীবনরঙ্গমঞ্চের পর্দা উত্তোলন করেছেন। আলোচ্য 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ' গ্রন্থখানি তারই ফলশ্রুতি। গ্রন্থটিকে লেখক প্রধান যে তিনটি বিষয়ের কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছেন তা হল—বিভূতিজীবনী, স্মৃতিচারণ ও সাহিত্যের উৎস। শুধু তাই নয় শ্রী চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৪ থেকে ১৯২৮—অর্থাৎ ৩৪ বছরের কালসীমার মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবন পর্যালোচনাকে সীমিত রেখেছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হল বিভূতিভূষণের জন্মসন আর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হল 'পথের পাঁচালী'র রচনা সমাপ্তি বর্ষ। বিভূতিভূষণ তাঁর জন্মের পর কেমন ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বর্ধিত ও পালিত হয়ে এক পরিপূর্ণ লেখকে পরিণত হলেন তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ' সাহিত্যিক হয়ে ওঠা বিভূতিভূষণের সারস্বত জীবনের প্রস্তুতির ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। সেইদিক থেকে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। সেইজন্য লেখক গ্রন্থটির ভূমিকায় সঙ্গত কারণেই জানিয়েছেন "বিভূতিভূষণের জীবনী রচনায় তাঁর জীবনের প্রথম ৩৪ বৎসর খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ।"

সৌভাগ্যবশত লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের নিকটতম আত্মীয়। আত্মীয়তার সুবাদেই তিনি বিভূতিভূষণকে অতি কাছ থেকেই দেখেছিলেন। শুধু আত্মীয় হলেই যে কাউকে খুঁটিয়ে দেখা সহজ, তা মানা কঠিন। বিশেষ করে যে লোক লেখক হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন তাঁকে খুঁটিয়ে দেখার মত কোন আত্মীয় হলেই যে সম্ভব, তা নয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের নিকট আত্মীয় বলেই নয় তিনি নিজে বিভূতি-অনুরাগী সংবেদনশীল এক জীবনসন্ধানী সত্যান্বেষী। তিনি যেদিন থেকে বিভূতিভূষণের লেখা পড়তে শুরু করেন, সেইদিন থেকেই বিভূতিভূষণের জীবনের নিভৃত কক্ষের কপাট উদ্‌ঘাটনের জন্যে প্রস্তুত হন। 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিপর্ব সেইদিন থেকে শুরু। সেই জন্যেই বিভূতিভূষণের বংশলতিকা, বিভূতিভূষণের

জন্মশিক্ষা, জীবিকা, বিবাহ রচনানুশীলনের খুঁটিনাটি তথ্য মনোযোগ সহকারে সংগ্রহ করেছেন। জানতে চেয়েছেন তিনি বিভূতিভূষণের মনের ভূগোল, মর্মের ইতিহাস। অপরাজিত বিভূতিভূষণ গ্রন্থখানি লেখকের সেই নিষ্ঠাবান অনুশীলনের প্রকাশ।

আলোচ্য গ্রন্থটির তিনটি ভাগ—'সূচনা', 'কথা আরম্ভ', ও 'পরিশিষ্ট'। 'সূচনা' অংশে লেখক জানিয়েছেন কেমনভাবে বিভূতিভূষণের নিকট সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি বিভূতিভূষণের প্রীতি আকর্ষণকে মূলধন করে 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ' গ্রন্থ রচনার দায় অনুভব করেন।

প্রকৃতপক্ষে কথাআরম্ভ অংশটি গ্রন্থটির মূল অংশ শুধু নয়, দীর্ঘতম অংশও বটে। এই অংশে বর্ণিত হয়েছে বিভূতি ভূষণের বংশ পরিচয়। জন্ম, শিক্ষা জীবিকাসংগ্রহের আগ্রহ, সাহিত্য রচনার অনুশীলনের আনুপূর্বক ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনায় লেখক যেমন সাহায্য নিয়েছেন বিভূতিভূষণের পরিচিতমণ্ডলীর, তেমনি তারই রচিত নানা স্মৃতিচারণা ও দিনলিপির। বিভূতিভূষণ তাঁর রচনার বিষয় খুঁজে পেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন থেকে। সেই জীবনের নানা মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানে লেখকের উদ্যম অপরিসীম।

পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যেমন বিভূতিভূষণের জন্ম পত্রিকা বিভূতিভূষণের জন্মকালীন কলকাতাও তৎসন্নিবিষ্ট অঞ্চলের একসপ্তাহের আবহাওয়ার বিবরণ, বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত শক্তিশেল নাটকের উল্লেখ। রবীন্দ্রনাথকে 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে সমালোচনা লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র পরিচয়, (বৈশাখ ৩৪০) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'পথের পাঁচালী সম্পর্কিত দুর্লভ রচনা উদ্ধৃতি। এবং সেই সংগে লেখককে লেখা বিভূতি ভূষণ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনকারী নানা ব্যক্তির মূল্যবান পত্র। এই ব্যক্তিদের তালিকায় আছেন, গোপাল হালদার, নলিনীকান্ত সরকার, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, সন্তোষকুমার দে। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে আরও একটি রচনা যার লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনাটি লেখকের বিভূতিভূষণের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তারাশংকরের উক্ত রচনাটির নাম অপরাজিত বিভূতিভূষণ'। লেখক শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর

গ্রন্থের নামকরণ ব্যাপারে তারাশংকরের উল্লিখিত রচনাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের তথ্য আহরণের ব্যাপারে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়েছেন, তেমনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতেও পত্রাঘাত করেছিলেন। এসবই তাঁর বিভূতিভূষণের প্রতি অসীম অনুরাগের চিহ্ন বহন করে। শুধু আক্ষেপ এবং অপেক্ষা, লেখক ১৯২৮ সালের পরবর্তীকালের বিভূতিভূষণের সারস্বত জীবন কাহিনী শোনাবেন। শিল্পী গণেশ বসুর প্রচ্ছদচিত্রণ এক অসাধারণ শিল্প মহিমায় পূর্ণ। প্রকাশক দেবকুমার বসু গ্রন্থটি র প্রকাশে কতখানি সতর্ক ও শিল্পরুচিসম্পন্ন তা গ্রন্থটির মুদ্রণ পরিপাট্যে ধরা পড়ে।

জগন্নাথ ঘোষ

অপরাজিত বিভূতিভূষণ। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ব জ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন কলকাতা-৭০০০০৯। মূল্য : ৩৫·০০ টাকা।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ঐরকমই ছিলেন মানুষটি, নিজের নাম বলার সময়ে পুরো সব নামটা উচ্চারণ করতেন। টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বা 'হেল্লো' বলতেন না, বলতেন 'বলুন'। আর নিজে ফোন করলে বলতেন 'আমার নাম শুভেন্দুশেখর মুপোপাধ্যায়'। আমরা যারা নামে মধ্যপদলোপী তাদের বিশ্বাস করতেন না বলতেন ও নামের তো কোনো মানেই হয় না। তিরস্কার উনি নানা বিষয়েই করতেন, বস্তুত উনি যে কোনো বিষয় নিয়েই আমাদের তিরস্কার করতে পারতেন। অতর্কিতে লাঠি চালানোর মতো কোন ব্যাপারে কোথায় সে কাকে কখন তিরস্কার করে বসবেন তা অনেক সময়েই আন্দাজ করা যেত না। আমরা এটাকে ওঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলতাম, হাসতেন। বলতেন, আপনাদের দোষ ধরবার জন্যে ছিদ্রান্বেষী হতে হয় না, এত দোষ আপনাদের চতুর্দিকে। এই 'আপনাদের' কথাটার মধ্যে ওঁর কিন্তু সত্যিকারের বলবার একটা কথা থাকত। এটার মধ্যে কোনো ফাজলামি ছিল না। বুঝতামও সেটা। তবুও ওঁকে তাতাবার জন্যে বলতাম, এই 'আপনাদের' মধ্যে কে কে আছে নাম করুন, আপনি নিজেও নেই তো, ইত্যাদি।

শেষের বেশ কয়েকটা বছর আমার সঙ্গে এমনি ধরনের একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার সুযোগ হয়েছিল। নানা বিষয়ে কথা হত, নানা বিষয়ে তর্ক হত, মতের মিল অনেক হত, গরমিল আরো অনেক বেশি হত। তবে তাতে খুব কিছু এসে যেত না, কারণ আমাদের সঙ্গে তো ওর মতের গরমিল হবেই, উনি তো আর নিজে ঐ 'আপনাদের' মধ্যে নন। আসলে ঐ 'আপনাদের' শব্দটাকে তো প্রায় গালি হিসেবেই ব্যবহার করতেন। বুঝতাম কী বলতে চাইছেন। যে মধ্যবিত্ত তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজি জানে,

চাকরিবাকরি করে, জীবনে উন্নতির চেষ্টা করে, উন্নতি হয়, নামডাক হয়, শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাদের বাইরে নিজেকে ভাবতে চাইতেন। এই আত্মমগ্ন ঘূর্ণীস্রোতে আটকে থাকা মধ্যবিত্তকে তিনি বকতেন, কেউ শুনুক বা না শুনুক তিনি বকে যেতেন, আমরা যারা কাছাকাছি থাকতাম তারা সবাই মিলে সেই বকুনিই ভাগ করে নিতাম। এমনি করে নিজেকেও তো বকতেন। এর ভেতরে যে-একটা লড়াই আছে সেই লড়াইটা তো করতেই চাইতেন। লড়াইটা আর শেষ করে যাবার সময় পেলেন না। অবশ্য এ লড়াইয়ের তো শেষ নেই। বাকি যারা রইলেন রিলে রেসের বেটন তাদের হাতে দিয়ে গেলেন।

মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতা করা আমাদের মানায় না। তবে মৃত্যু তো জীবনকে একটা কিছু দিয়েও যায়। নইলে সবাই মিলে আবার বাঁচি কীভাবে। মৃত্যু থেকে উৎসারিত এত যে মৃত্যু। এক মাসের মধ্যেই দুপাশ থেকে দুজনে মুখ ফিরিয়ে সরে গেলেন। খুব আলতো ভাবে উল্টো দিকে হেঁটে চলে গেলেন যেন। অক্টোবরের স্মরণসভায় ঘরের বাইরে বারান্দায় দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে আর জায়গা ছিল না, অনেকেই এসেছিলেন স্মৃতিতে মেলবার জন্য। ছবিটা এখনো একটুও ধূসর হয়নি। শুভেন্দুবাবুও দাঁড়িয়েছিলেন আমার পাশেই, ঐ দেয়ালেই ভর দিয়ে। চুপ করে। বাইরের মানুষ এক একজন আসছেন, আর উনি এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁকে ঐ বারান্দায় কোনো খালি চেয়ারে একটু জায়গা করে দেবার জন্য। এলেন মহাশ্বেতা দেবী, এলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, এরকম অনেকেই। উনি বারবার এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন ঐ এক জায়গায়। হাতে ধরা, কোল ঘেঁসে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সেই বালককে যে চা দিত 'স্যার'কে।

নভেম্বরের স্মরণসভা। পরিণত বয়সেই চলে গেলেন গোপাল হালদার। ওর খুবই কাছের মানুষ। মঞ্চ থেকে ঘোষণা হল : গোপাল হালদারের স্মরণে একটি লেখা পাঠিয়েছেন অরুণা হালদার। সেটি পড়ে দেবেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। আমাদেরই পাশে বসা ছিলেন তিনি। পেছনের দিককার এক সারিতে। সেখান থেকে উঠে গেলেন। পড়তে গিয়ে দু-এক জায়গায় গলা একটু ধরে গেল। মনে হল কান্না চাপলেন। নাকি তখনই কিছু বোধ করছিলেন? আর জানবার উপায় নেই। পড়া শেষ করে ফিরলেন

আমাদের পাশেই। পাশেই কেউ একজন লেখাটা পড়তে চাইলেন। বললেন: এই যে মঞ্চের ওখানে নিয়ে নিল কে যেন। একটু পরেই উঠলেন। ফিরে এলেন লেখাটি সংগ্রহ করে। আমরা ওখানেই পড়ে নিলাম দু-তিনজনে। লেখাটি নিজের কাঁধের ব্যাগে রাখলেন। দু-এক মিনিট পরে কিছু না বলে উঠে বাইরে গেলেন। প্রায় তখুনি ফিরে এলেন। আমাকে ডাকলেন বাইরে। বাইরে যেতেই বললেন, 'শরীর খারাপ লাগছে। সরবিট্রেট্ আছে?'

মৃত্যু থেকে উৎসারিত এত যে মৃত্যু।

একটা কথা প্রায়ই বলতেন: শহুরে বাঙালি মধ্যবিত্তের কোনো জবাব নেই। মার্কসবাদ, রবীন্দ্রসংগীত আর ক্রিকেট একসঙ্গে মেলাতে পারে, এরকম প্রাণী এই একটিই সৃষ্টি হয়েছে। আসলে নিজে এই তিনটিকেই মিলিয়ে ছিলেন। সঙ্গে আরো একটা চতুর্থ জিনিসও ছিল ওঁর ভুবনে। গান্ধী, গান্ধীবাদ। এই কথাটা আমার সঙ্গে প্রায়ই হত। একটু ভয়ে ভয়ে লিখেই ফেলি। আমার এই একটা কথা যা নিয়ে উনি আমার সঙ্গে কখনো ঝগড়া করেননি। আমাদের কমিউনিস্টরা যদি গান্ধীকে বাদ দিয়ে গান্ধীবাদ আর একটু গ্রহণ করতেন তবে বোধ হয় বেঁচে যেতেন। এ কথাটার অনেক মানেই হতে পারে, অনেক বিসম্বাদের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবুও আমার মনে হয় এ কথাটায় আমরা মিলতে পারতাম। এমনিতেও বাইরের দিক থেকেও ওর একটা 'গান্ধীপর্ব' ছিল। কিন্তু জীবনীর সেই বহিরঙ্গ অধ্যায় আমার মনে হয় খুব জরুরি নয়। কে কী কীভাবে পায় সে বলা খুব মুশকিল। এমন হতেই পারে যে উনি ওর গান্ধীকে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পথে। ঠিক এই বিন্দুতে আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা হয়নি। তবে গান্ধী নিয়ে যেটুকু আর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যতটা কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, তার থেকে এরকম একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা অনেক দিকে যেতে পারি, অনেক দিকেই, অনেক সময়ে অনেক অপ্রত্যাশিত দিকেই হয়ত চলে যেতে পারি একথাটা উনি কিন্তু খুব সহজেই সায় দিতেন। তাহলে অত দূরত্ব সত্ত্বেও কিছুটা গান্ধীই বা পাব না কেন?

এসব কোনো কথাই প্রায় কখনো গুছিয়ে বসে ঠাণ্ডা মাথায় ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে মীমাংসায় এসেছি তা নয়। ঐ 'ঠাণ্ডা মাথায়' কথাটা

শুনলেই উনি চটে উঠতেন। বলতেন: আপনার মুখে ঐ 'ঠাণ্ডা মাথায়' কথাটা শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমি যোগ করতাম, আমাকে খুন করতে ইচ্ছে করে। বেশির ভাগ কথাই হত হাঁটতে হাঁটতে, পথে, গাড়িতে, ট্যাক্সিতে, মিনি বাসে। একবার একটা কাণ্ড হয়েছিল। ট্যাক্সিতে বসে তর্ক হচ্ছিল। ওঁকে চটানো যেত, উনি চটেও যেতেন, তখন গলা চড়ত, বারণ করতে হত, রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবার ভয় দেখাতে হত, তাতেও কিছু হত না। ঐ রকমই একটা কিছু নিয়ে তর্ক হচ্ছিল, খুবই তুমুল তর্ক। আমাদের ট্যাক্সি মৌলালির মোড়ে ট্র্যাফিকের ভিড়ে আটকে আছে। পাশের ট্যাক্সির চালক মুখ বাড়িয়ে আমাদের চালককে জিজ্ঞেস করলেন: 'কুচ্ হুয়া'? আমাদের চালক মনে হয় দুজনকেই ঠিক বুঝে গিয়েছিলেন। খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন: 'কুচ্ নেই হুয়া'।

রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপারে ওঁকে খুব দুঃখ দিয়েছিলাম। বুঝি। সম্ভবত আঘাত পেয়েছিলেন। আমাকে অনেক বকুনিই শুনতে হয়েছিল। নাছোড়বান্দার মতো তর্ক করেছি আমিও। কী করব, ওঁর সেই ব্যাপারের অবস্থান মেনে নিতে পারি নি। আমার কথাও উনি আদৌ গ্রহণ করেন নি। গ্রন্থস্বত্ব-বিতর্কে নেপথ্যেও ওঁর পাশে থাকতে পারি নি। নতুন আইন পাশ হল, উনি মোটের উপর খুশি হলেন। তখনও বলেছিলাম, দেখি দশ বছর বাদে আপনি কী করেন। তর্কটা শেষ হতে দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ছেলেমানুষিও ছিল মজার। পেছনে লাগতাম। চুপচাপ হাসতেন। প্রায় প্রত্যেকবারই হত, বইমেলাতে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে বিশ্বভারতীর স্টলের বাইরে এসে দাঁড়াতেন। কাছাকাছি হয়ত আছেন সুবিমলবাবু বা অরুণ। আমাদের পেলেই বলতেন, দেখলেন, আপনাদের তো সব এত বড় বড় লেখক আছে, এখনো কার বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় দেখেছেন? পেছনে লাগার জন্যেই বলতাম, বিক্রি তো হয় বুঝলাম, দামও কম একটু, বইগুলো দেখতে শুনতেও বেশ, পড়ে কি কেউ? ছেলেমানুষির গল্প আরো আছে। বেশ কয়েক বছর আগে অমল ভট্টাচার্য সেন্টার ফর ইয়োরোপীয়ান স্টাডিজ-এর তরফে সত্যজিৎ রায়ের একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। অত খ্যাতিমান মানুষ, অমন ব্যক্তিত্ব, আর সভাসমিতি বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যে বেশি যেতেন না তো। সেবারের বক্তৃতায় দারুণ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর একতলা

দোতলা উপচে পড়েছিল। বিশেষত অল্পবয়সীরা ভীষণ আগ্রহে শুনতে গিয়েছিল সেদিনের বক্তৃতা। অনেকেই ভেতরে ঢুকতে পারেন নি। বাইরে বোধ হয় মাইকেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভিড় পৌঁছে গিয়েছিল বড় রাস্তা পর্যন্ত। বক্তৃতার শেষে ওঁকে দেখলাম খুব চিন্তিত। এদিক ওদিক একটু আধটু হেঁটে বেড়াচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, এত চিন্তার কী?' আস্তে আস্তে বললেন, ভিড়টা বুঝলেন, বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেল। আর একবার সেই তেইশে এপ্রিল। সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরদিন নন্দন-রবীন্দ্রসদনের সামনে মানুষের সেই ভেঙে-পড়া ভিড়। লাইন যে এঁকেবেঁকে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। লাইনের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে করতে শুভেন্দুবাবুকে দেখলাম ঐ রকমই চিন্তাক্লিষ্ট মুখে এদিক ওদিক হাঁটা-চলা করছেন। একবার একটু কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, আপনি বাইশে শ্রাবণের সঙ্গে মেলাচ্ছেন তো?' নিঃশব্দে একটু ম্লান হেসে ঘাড় নাড়লেন। জানি উনি তাই মেলাবেন।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী এঁদের ছুঁয়ে থেকেই বেশ নিয়ে সময় নিয়ে, এই সময়ের হালচাল নিয়ে কত কথাই হত ওঁর সঙ্গে। চারপাশের চলনবলনে যে বদল ঘটে যাচ্ছে তার অনেক কিছুই হয়তো ঠিক মানতে পারতেন না। তবে তা নিয়ে আপত্তির ধরণটা কিন্তু ঠিক একাল-সেকালের প্রচলিত ধরণ ছিল না। বলতামও, নিজেদের বয়স বাড়ছে, এসব কথা ভাববার সময় সে-বিপদের কথা মনে রাখবেন। বিপদ যে আছে সেটা বুঝতেন। যুব সমাজকে, তাদের চিন্তাভাবনায় ধরণকে বুঝতেই চাইতেন উনি। অনেকটাই মানতে পারতেন না বলেই আমার ধারণা। অনেক সময়ে বলতেন, আমরা কি এতই সেকেলে হয়ে গেছি, কী জানি। বলেই আবার হয়তো আমাদের একটু বকে দিলেন, কী যে সব ছাত্রছাত্রী তৈরি করেন আপনারা, বুঝি না। আসলে এক রকমের আদর্শের সংকট থেকে কষ্ট পেতেন। এর ধরনের নির্জলা আদর্শবোধের কথা ভাবতেন, বলতেন। এর জটিলতা নিয়ে অনেক সময়ে তর্ক করার চেষ্টা করেছি। বলতেন, এসব আমাদের বই পড়া কথা, এখানকার মাটির সঙ্গে কোনো যোগ নেই আপনাদের, তাই এসব বইয়ের তত্ত্বকথা আউড়ে যান শুধু শুধু। আপনাদের দিয়ে কিসসু হবে না কারো। বলতাম, এই কথাটা একদম ঠিক বলেছেন, কিন্তু তাতে কী হবে? মাঝেমাঝে থেমে গিয়ে ইতি

টানবার মতো করে বলতেন, কী জানি, আপনাদের আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের দুটো ব্যাপারে সত্যিই খুব বিচলিত ছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। আমাদের দেশের হালফিল সাম্প্রদায়িকতার রকম সকম আর সোভিয়েত সমেত পূর্ব ইউরোপের পালাবদল এই দুইই ওঁকে খুব ধাক্কা দিয়েছিল। ওঁর ধারণার ছকে এদুটোর কোনোটাকেই মেলাতে পারতেন না, আবার গা সওয়া গোছের মেনে নিতেও পারতেন না। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের পরে সবাই খুবই বিচলিত ছিলেন। কিন্তু ওঁকে দেখেছি একেবারে ছটফট করতেন! ঐ সময়ে এক নাগাড়ে অনর্গল কথা বলেছি ওঁর সঙ্গে কয়েকদিন। তাতে ঝাঁঝ উত্তাপ সবই ছিল। বুঝতে পারছি উনি অস্থিরচিত্তে শুধু হাতড়াচ্ছেন। এই রকম মনের অবস্থাতেই ঐ সময়ে একদিন আমার কর্মক্ষেত্রে বসার ঘরে দ্রুত পায়ে ঢুকলেন। উনি সব সময়েই খুব দ্রুত পায়েই ঢুকতেন। চেয়ারে বসবার আগেই ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, 'যা বলি চুপ করে শুনবেন, কোনো কথা না বলে।' চেয়ারে বসেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন! ৬ তারিখে যা ঘটে গেল তাই নিয়ে একটা রূপকধর্মী গল্প। কোনো কথা না বলেই শুনলাম। আমি ঠিক জানি না লেখাটা কোথাও ছাপা হয়েছে কিনা। পরে আমি খুঁজেছি। কিন্তু ঠিক হদিশ করতে পারি নি।

নিজেকে বেশ সাবেক আমলের লোক বলে জাহির করতে ভালোবাসতেন। এমনকি নিজের জন্মসাল নিয়েও মনে হয় একটা গোলমাল করতেন। পারিবারিক সূত্রে ওঁর জন্মসাল ধরা হয় সম্ভবত ১৯৩২। উনি বলতে চাইতেন ১৯৩১। আমরা ওঁকে ঠাট্টা করে বলতাম, ডিরোজিও-বিদ্যাসাগরের সমবয়সী। ঐ রকম ভাবে নিজেকে সাজাতে উনি পছন্দ করতেন। মনে হয় এটা ওঁর প্রতিবাদের একটি ভঙ্গি। যা কিছু হচ্ছে চলছে ঘটছে, এসবের যা কিছু ওঁর মনোমত নয়, তার সবকিছুকে অস্বীকার করবার ওটা একটা ধরণ। 'ঐ যে আপনাদের' বলে নিজেকে একটু আলাদা করে রাখতেন, তেমনি নিজেকে প্রবৃদ্ধ সাজিয়ে অমনি সময়ের দিক থেকে নিজেকে একটু দূরে রাখতেন। চারিপাশের চলমান সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েই রাখতেন, অনেক সময় হয়তো একটু বেশিই জড়িয়ে রাখতেন. কিন্তু ঐ ভঙ্গিতে ঐসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ওঁর কিছু সমালোচনাও নিহিত থাকত মনে হয়।

এমনি করে পুরনো সময়ে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক ধরনের আবেগের আত্মীয়তাও বোধ করতেন মনে হয়।

গত কয়েক বছরে যে-প্রতিষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করে ওঁর সঙ্গে খুব কাছাকাছি থেকে কাজ করতে হয়েছিল সে-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ওঁর এই ধরনেরই একটা আবেগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শুধু বয়সের হিসেবেই যে শতবর্ষে পৌঁছল তাই নয়। প্রতিষ্ঠানটির ঝোঁক, ধরনধারণ, তার শত্রুমিত্র, তার কর্মপ্রণালী সবই যেন অন্য এক শতাব্দী থেকে উঠে আসা। যেন কালাতিক্রান্ত দোষে দুষ্ট এই মূর্তিমান প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে তাঁর আবেগ ও মান-অভিমানের শেষ ছিল না। প্রায় ব্যক্তিগত উদ্যমে কিছু মানুষকে জড়ো করেছিলেন এর চারপাশে। সরকার ও অন্যান্য মানুষের টনক নড়ানোর জন্যে একেবারে আক্ষরিক অর্থে দুবেলা ছুটোছুটি করছিলেন। কিছুটা বোধ হয় পেরেওছিলেন। কিন্তু ওঁর তো আর সময় হল না।

জীবনে অসফল অসার্থক ভাঙ্গাচোরা স্খলিত কিছু লোককে একসঙ্গে নিয়ে অনিশ্চয়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন একজন মানুষ। এমনি এক মানুষের কথা পেয়েছি আমরা আমাদের এক চলচ্চিত্রকারের ছবিতে। ওই ছবিটা হয়তো তাঁর তেমন মনঃপূত ছিল না, ওই শিল্পীর প্রতিও হয়তো তাঁর তেমন কোনো টান ছিল না। কিন্তু তবুও ঐ এগিয়ে চলা মানুষটির কথা আমার মনে পড়ে। কিছু লোককে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে তিনিও এগোতেই চেয়েছিলেন। তাঁর শেষ বেলাকার ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে বুকের যন্ত্রণার মধ্যেও বলেছিলেন, 'ডাক্তার, I have the will to live'।

মৃত্যু থেকে উৎসারিত এত যে মৃত্যু।

সৌরীন ভট্টাচার্য

উৎপল দত্ত

উৎপল দত্তকে প্রথম দেখি ১৯৫০-এ, মাইকেল মধুসূদন ফিল্মের নাম ভূমিকায়: মধু বসু-পরিচালিত এ ছবি মুক্তি পেয়েছিল 'ইন্দিরা' সিনেমা হলে। তখন স্কুলের শেষ ধাপ, মধুসূদন সম্পর্কে প্রচণ্ড মোহ ও আগ্রহ। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা আমাদের প্রথম তারুণ্যকে তরঙ্গিত করে তুলেছে। মধুসূদনের কল্পমূর্তিতে আন্দোলিত আমরা। তারই প্রতিফলন কতটা সফল হয়েছে সেলুলয়েডে তা যাচাই করতে দল বেঁধে সিনেমা গমন।

তারপর কেটে গেছে তেতাল্লিশ বছর। পর্দার বুকে মধুসূদনকে দেখে শুরু হয়েছিল যে বিস্ময়, তার উপর আপাত যবনিকা পড়ল ১৯৯৩ এর ১৯শে আগস্ট। 'আপাত যবনিকা' বলা হল এ জন্যই। অতঃপর উৎপলকে আর দেখা যাবে না মঞ্চে, দেখা যাবে না মাঠে ও ময়দানে। চার-দশকেরও বেশি সময় ধরে অবিরল কর্মকুশলতা আমাদের আন্দোলিত করবে না আর। কিন্তু তাই কি? উৎপল আজ প্রয়াত, কিন্তু তাঁর সৃজনশীলতা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ আমাদের অর্জিত উত্তরাধিকার। তার প্রাণনা চলতেই থাকবে গভীরতর আগামীতে।

ফিল্ম দিয়ে পরিচয় শুরু হলেও উৎপল যে আসলে আদ্যন্ত থিয়েটারের মানুষ তা জানতে পারি আরো কয়েক বছর পর। অবশ্য ১৯৫০য়েও মাইকেল মধুসূদন ফিল্মের কালেও তিনি যে থিয়েটারে নিমজ্জ আছেন ওতপ্রোত সেকথা জানা ছিল না। কারণ তিনি তখন থিয়েটার করতেন ইংরেজিতে সেই সময়ে, যখন পাবলিক থিয়েটারের হাল ছিল অসহ্য এবং আমিও ছিলাম বয়স ও অভিজ্ঞতায় নগণ্য, তাই শুধু উৎপল কেন, সাধারণভাবে থিয়েটার নিয়ে প্রমত্ত হবার তেমন সুযোগও ছিল না। অবশ্য ততদিনে

বাংলা থিয়েটারে এসে গেছে 'বহুরূপী', কিন্তু পরিবেশ, অজ্ঞানতা ও নানাধরণের অক্ষমতায় তখন আক্রান্ত, তাই বহুরূপীর গোড়ার দিকের প্রযোজনার সঙ্গে পরিচিতি সম্ভব হয় নি তখনো। তারপর এল ১৯৫৪। দেখলাম 'রক্তকরবী'। থিয়েটারের সেই বিস্ময় চল্লিশ বছর ব্যবধানেও সমান তাজা। তখন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র, অন্তত প্রবল আলোচনা চালিয়ে যাবার বয়স তখন, কলকাতা ক্রমে উন্মোচন করে চলে চলেছে তার বিবিধ রহস্য। পরের বছরই এসে গেল 'পথের পাঁচালী'। স্থির থাকার আর অবসরই নেই।

ইতিমধ্যে কখন যে উৎপল ও তাঁর দল ইংরেজি নাট্য প্রযোজনা বর্জন করে প্রবলভাবে হাজির হয়েছেন বাংলা মঞ্চে, তেমন কিছু লক্ষই করি নি। আমাদের প্রবণতা ও পরিবেশ তখনো ফিল্ম কেন্দ্রিক বহুরূপী-র উপস্থিতি সত্বেও। অবশ্য এরই মাঝে দেখেছি উৎপল-অভিনীত বেশ কিছু ছবি। দেখেছি 'শেষের কবিতা'। দেখেছি গোগোলের 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' অবলম্বনে নির্মিত ছবি 'রাজধানী' থেকে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় উৎপল দত্ত। তথাকথিত উৎপল-কালীর যুগলবন্দীর আবেশ এখনো কাটে নি।' সিরিও-কমিক অভিনয়ে এটাই বোধহয় উৎপলের প্রথম আত্মপ্রকাশ। মনে আছে এখনো তাঁর সেই অনবদ্য সংলাপ-'গ্রেট ম্যান-বাবাজি!' তাই কখন যে মিনার্ভা থিয়েটারে শুরু হয়ে গেছে বাংলা থিয়েটারের পালাবদল তার খোঁজ রাখার তেমন অবকাশ ঘটে নি। অবশ্য সেটা বেশিদিনের জন্য নয়। কেননা বেশিদিন এ ব্যাপারে অসচেতন থাকা সম্ভব ছিল না। তাই পর পর দেখা হল 'নীচের মহল', 'ছায়ানট'। রাশিয়ার এক বস্তির মানুষগুলো আমাদের কলকাতায় এসেও অচেনা ত রইলই না, বরং যেন আরো বেশি বাস্তব হয়ে উঠল। যে সাটিনের ভূমিকায় স্তানিলাভস্কির অভিব্যক্তির বিবরণ ও আলোকচিত্র আমাদের আলোড়িত করেছিল তার সার্থক স্বীকরণ দেখলাম উৎপলের গগন্ চরিত্রের মধ্যে। মঞ্চের উপর বস্তির অনুপুঙ্খ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল। 'ছায়ানট' ভাবাল, রুপোলি পর্দার আড়ালে মুনাফাবাজি শিল্পকে অধিকার করে রাখে কোন্ কৌশলে। মনোজকুমারের নায়ক হিসেবে উত্থান ও পতনের নেপথ্যে কাজ করে কোন কারসাজি! শুধু সমাজমনস্কতা নয়, সমাজবিজ্ঞান মনস্কতা না থাকলে একালে শিল্প নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন. উৎপল একথা আমাদের শেখালেন দ্ব্যর্থহীনতা নিয়ে। শুধু তাই নয় পরিকল্পনা. পরিচালনা,

অভিনয় সবকিছু মিলিয়ে থিয়েটারে পেলাম অন্য ধরণের অভিজ্ঞতা। বাংলা থিয়েটার প্রাজ্ঞ হল পঞ্চাশের দশকে।

তারপর মিনার্ভা থিয়েটারে একে একে মঞ্চস্থ হল 'অঙ্গার' 'ফেরারী ফৌজ,' 'ভি. আই. পি'. 'তিতাশ একটি নদীর নাম' প্রভৃতি নাটক। সবগুলিই সার্থক হল তেমন হয়ত নয়। তবু বিষয়ের বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের অভিনবত্ব, প্রকরণের নতুনত্ব সব যেন পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়াল একেকটি প্রযোজনায়। আমাদের পাবলিক থিয়েটারের পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'অঙ্গার' 'তিতাস' প্রযোজনা কত দুরূহ এখনকার প্রেক্ষিতেও, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শৈল্পিক উৎকর্ষের কথা ছেড়ে দিলেও, শুধু পরিমানগত দিক থেকে ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। মঞ্চের উপর একখানি আস্ত কয়লাখনি অথবা তিতাস-তীরবর্তী জনপদ দর্শকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল তার ভাল মন্দ নিয়ে। থিয়েটারের ভাষা কাকে বলে, উৎপলের একেকটি প্রযোজনা হয়ে উঠল যেন তারই ভাষা।

তারপর ১৯৬৫-তে 'কল্লোল'। ছেচল্লিশের নৌবিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা নাটক। ইতিমধ্যে মতাদর্শগত কারণে ভাগ হয়ে গেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সৃষ্টি হয়েছে 'ভারতের কমুনিস্ট পার্টি' (মার্কসবাদী)। 'কল্লোল'-প্রযোজনা নিয়ে শুধু যে কংগ্রেস ও স্টেটসম্যান আনন্দবাজার পত্রিকাগুলো ক্রুদ্ধ হল তাই নয়, শুরু হল কমিউনিস্ট মহলেও, বিতর্ক। কিন্তু একথা ত অস্বীকার করা যায় না ১৯৬২-তে ভারত চীন সংঘর্ষ ও কমুনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়া নিয়ে সারা দেশে তৈরি হয়েছিল যে শ্বাসরোধকারী পরিবেশ, 'কল্লোল' তার উপর আছড়ে পড়েছিল। মঞ্চের উপর লাল পতাকা উত্তোলন এবং 'জাগা হায় ইনসান জমানা বদল রহা' গান জাগিয়ে তুলেছিল সারা পশ্চিমবাংলাকে। তাই তথ্য নিয়ে নানা মতভেদ, বিবিধ মহলের বিরূপতা ছাপিয়ে 'কল্লোল'-এর অভিঘাত আমাদের চেতনায় অস্তি নিয়ে এল। ১৯৬৭-তে প্রথম যুক্তফ্রণ্টের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল 'কল্লোল' দিয়ে, এমন অভিমত হয়ত অতিশয়োক্তি বলে পরিগণিত হবে না।

এমনি হয়ত বলা চলে ১৯৭২-এর 'ব্যারিকেড', ১৯৭৪-এর 'দুঃস্বপ্নের নগরী' এবং আরো সব উৎপল-প্রযোজনার কথা। আনা যায় 'টিনের তলোয়ার,' 'মানুষের অধিকার' এবং অন্যান্য নাটক। জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রযোজিত এবার 'রাজার পালা।' বলা যায় 'ক্রুশবিদ্ধ ক্যুবা,' 'লেনিনের ডাক',

'লেনিন কোথায়', 'স্তালিন ১৯৩৪' অথবা 'অজেয় ভিয়েতনাম' প্রভৃতি প্রযোজনা নিয়ে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের নানা আলোড়ন, এমনকি নিকট অতীতের 'লাল দুর্গ'-ও এসে যায় আলোচনার পরিধিতে। সবগুলো প্রযোজনা যে সমান মাপের অথবা নাটকগুলো বিতর্কহীন তা নয় অবশ্যই। কিন্তু একটা কথা ত স্বীকার করতেই হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা উচ্চবচতা উৎপলকে ভাবিয়েছে সব সময়েই, নিজস্ব অভিমত ছুঁড়ে দিয়েছেন বিরোধীদের টেবিলে, চেয়েছেন আলোচনা হোক যা চেতনার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ। পি-এল-টি, এল-টি-জি, পি-এল-টি-তে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৩-য়ের মধ্যে ইংরেজি বাংলা ছোট বড় মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশি নাটক তোলা সহজ ছিল না নিশ্চয়ই।

শুধু যে মঞ্চনাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন উৎপল তাও ত নয়। লিখেছেন যাত্রাপালা, নিজেই ছিলেন তাদের অনেকগুলির পরিচালক। বিশ বছরে আঠারটি যাত্রাপালা লেখা ও পরিচালনা করা কম ছিল না আমাদের যাত্রাশিল্পের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর আওতায়। কেননা তার যাত্রাপালাগুলো ত আর 'স্বামীর কোলে মৃত্যু' 'সিঁদুর দিয়ো না মুছে' জাতীয় নয়, যেগুলো অর্থহীন তরল আবেগে ভাসিয়ে দেয় দর্শকদের। লিখেছেন 'রাইফেল' স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী কংগ্রেসী রাজনীতির ভণ্ডামি নিয়ে লিখেছেন 'সন্ন্যাসীর তরবারি' 'মাও-ৎসে-তুং' 'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে' প্রভৃতি পালা সি-আই এর সর্বগ্রাসী চক্রান্ত নিয়ে' তুরুপের তাস', লিখেছেন 'কুঠার ও স্বাধীনতার ফাঁকি'। ইতিহাসকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্বরূপে বিশ্লেষন তিনি করেছিলেন এসব পালায়।

প্রসঙ্গত ভোলা যায় না তার পথনাটকের কথাও। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে লিখেছেন অন্তত ১৪টি পথনাটক, নিজে পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন, ফিল্মের গ্ল্যামার সত্ত্বেও, বরং বলা যায়, ফিল্মের গ্ল্যামরকে কাজে লাগিয়ে রাতের পর রাত পথ নাটক করা সহজ ছিল না। উৎপলের উচ্চতায় উঠে কোন শিল্পী এমন সচেতনতা ও সাহস দেখাতে পেরেছেন কি?

কিন্তু উৎপল শুধু নাট্য রচনা ও প্রযোজনায় নিবদ্ধ ছিলেন তা নয়। বাংলা ও হিন্দী ফিল্মের ডাক সাইটে অভিনেতা একদিকে 'গোলমাল' বা 'অমানুষ', অন্যদিকে 'ভুবন সোম' ও 'আগন্তুক', 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ 'মদনলাল মেঘরাজ' অথবা জন অরণ্যতে 'বিশুদা', 'হীরক রাজা' থেকে 'সৌকীন'–

এর প্রৌঢ়—মননশীল গভীরতা থেকে স্টাইলাইজেমনের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে উৎপলের অভিনয়ে। থিয়েটারের মানুষ নাকি সেলুলয়েডে সার্থক হন না তেমন, এমন কথা চালু আছে বাংলায়, উৎপল ছিলেন যেন তার প্রবল প্রতিবাদ। অবশ্য সিনেমার নায়কদের মঞ্চে দেখা যেত এক সময়ে, যেমন এখন দেখা যায় যাত্রায় কিন্তু তার প্রেক্ষিত ত ভিন্ন। 'ভুবন সোম'-এ তাই উৎপল অর্জন করেন 'ভরত'। বেশ কয়েকটি ফিল্ম পরিচালনাও করেছিলেন তিনি যাদের মধ্যে 'মেঘ' অবশ্যই নিয়ে এসেছিল স্বতন্ত্রতা।

এতসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে কখন যে লেখাপড়া করতেন উৎপল সেটাও ত বিস্ময়ের। প্রতিভার অন্ততম শর্ত পরিশ্রম, যেমন অভিব্যক্ত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের জীবনে উৎপল যেন তারই সম্প্রসার। ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে প্রায় দশখানি প্রবন্ধের বই লিখেছেন তিনি যাদের মধ্যে রয়েছে 'শেক্সপীয়রের সমাজ চেতনা', 'টুওর্ডস এ রেভ্যুলেশনারি থিয়েটার' অথবা 'প্রতিবিপ্লব'-এর মত বই। এ সকল বইতে প্রতিফলিত তার অভিমত সমূহের সর্বদা সমর্থক হবেন সকলেই তা অবশ্যই নয়, কিন্তু এখানেও অলক্ষ্য থাকে নি তাঁর সেই নিরলস সাধনা যাতে আমাদের চেতনা না ঝিমিয়ে পড়ে। একজন লেখক ত সার্থক তখনই যখন তাঁর অভিমতের অভিজ্ঞতা পাঠকের চিন্তাকে উসকে দিতে পারে। টেনে আনতে পারে বিতর্কের কেন্দ্রে। উৎপল তা পারেন।

তাই তার নানা সংশয় প্রশ্ন প্রত্যয়সহ উৎপল এমনই এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যে তাঁকে নিয়ে আমাদের বিস্ময় কিছুতেই ঘুচতে চায় না। এক জীবনেই বহু জীবনের প্রতিফলনে কোন একটি বিশেষ চেহারায় আটকে রাখা যায় না তাঁকে। আমাদের মিশ্র অর্থনীতির দ্বান্দ্বিকতা তার দোষগুণ সহ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মননে ও কর্মে। অভিনেতা পরিচালক. নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক—এসব পরিচিতি ছাপিয়ে তাই বড় হয়ে ওঠেন 'অ্যাজিটেটর' উৎপল। বস্তুত পুরো চার দশক ধরে পশ্চিমবাংলার অর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে দেখা গিয়েছে যত ধরণের তরঙ্গ তার সবগুলোই যেন গভীর হল কর্ষনের দাগ রেখে গেছে তার জীবনে ও শিল্পে। ১৯৯৩-য়ের ১৯শে আগস্ট তার জীবনে টেনে দিল পূর্ণছেদ কিন্তু রইল তাঁর শিল্প। এবার শুরু করতে হবে তাঁর কাছ থেকে অর্জিত উত্তরাধিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ। সে কাজ কঠিন ও বিপুল, তবু করতেই হবে। কেননা শুধু উচ্ছ্বাস আর আবেগ প্রকাশে উৎপলের পরিমাপ সম্ভব নয় কখনোই।

বিষ্ণু বসু

কমরেড সুনীল সেন স্মরণে

অশোচিত, অগীত চলে গেলেন কৃষকনেতা, ইতিহাসবেত্তা কমরেড সুনীল সেন। প্রয়াতজনের স্মরণে আজ যেন এক 'কালচার' এ দাঁড়িয়েছে মানুষের যোগ্যতা ও কীর্তি নয়, তাঁর গোষ্ঠি সম্পর্কের ভিত্তি দিয়ে গুরুত্ব দেওয়া। করুণ নয়, এ বড় নির্মম প্রচলন, জানিনা এ সযত্নে গড়ে তোলা এক মানসিকতা কিনা যা দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয় গৌরবোজ্জ্বল শ্রেণী সংগ্রামের দিনগুলির কথা, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন প্রজন্মের কাছে অবশ্য জ্ঞাতব্য শিক্ষা।

সুনীল সেনকে পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ব্যক্তি মানুষ হিসেবে দেখি না, দেখি উত্তাল চল্লিশের গণ অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিরূপে, যাঁদের বেশীর ভাগই হারিয়ে গেছেন বর্তমান স্মরণ-কালচারের প্রকোপে, আর অস্বীকার করে লাভ নেই যে প্রয়াত প্রবীণদের মধ্যে সংস্কৃতিবিদ্ সাহিত্যিক বা ইতিহাসবিদরা স্মরণিকায় যেটুকু স্থান পান, শ্রেণী সংগ্রামের নেতা-কর্মীদের ভাগ্যে সেটুকুও জোটে না। সংসদীয় রাজনীতিকে নির্ধারক করতে গিয়ে 'শ্রেণীসংগ্রামকে ভুলোনা' আর 'শ্রেণীসংগ্রামকে মনে রাখার দরকার নেই' এর দ্বন্দ্ব মার্কসীয়-রাজনীতির মধ্যে এক মৌলিক দ্বন্দ্বে যেন রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে।

উত্তাল চল্লিশ—১৯৪৫ থেকে '৪৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অংশীদার হয়ে গেল ভারতীয় জনগণ—শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত। '৪৫ সালের শেষ ভাগ থেকে '৪৬ এর মার্চ পর্য্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভারতেরই বড় শহরে লক্ষ শ্রমিক লাগাতার হরতাল, বন্ধ পালন করতে লাগলেন, এস, আই রেলে পরপর ধর্মঘট, রেলে ষ্ট্রাইক ব্যালট, ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় ১৬ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে মিছিলে পথে নেমে এলেন—সারা ভারত শ্রমিক-কর্মচারীর আওয়াজে—'আজাদী লড়কর লেনা হ্যয়', 'খুন বহাকর লেনা হ্যয়',—'সড়িগলি সরকারকো এক ধাক্কা আউর দো'-তে মুখরিত হয়ে উঠলো। অকুতোভয়ে কমিউনিস্টরা, শ্রমিকরা নারীপুরুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে (হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তখন শুরু হয়েছে) প্রবল অত্যাচার না মেনে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের (অবশ্যই দেশী) গুলির

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। কলকাতার পথে ছাত্ররা ব্যারিকেড করে অপরূপ সংহতি জানিয়ে চলেছেন শ্রমিক-কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভ্যুত্থানের সাথে—আর গুলি খেয়ে মরার প্রতিযোগিতায়। নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, দেরাদুন-লক্ষ্ণৌ পাটনায় সশস্ত্র পুলিশ বিদ্রোহ 'সব ছত্রখান করে দিচ্ছে দাঙ্গার কুচক্র, নেহেরু-প্যাটেলের আপোষ পন্থার গোপন চক্রান্ত। কমিউনিস্টরা এই উত্তাল সংগ্রাম জল তরঙ্গের চূড়ায়, লালঝাণ্ডা সবারই জনপ্রিয় সংগ্রামী প্রতীক।

এই উত্তাল শ্রেণী সংগ্রামের তরঙ্গের মধ্যে ইতিহাস বোধের হাতে খড়ি কমরেড সুনীল সেনের। অবিভক্ত বাঙলার দিনাজপুর জেলায় কৃষক আন্দোলনে ব্রতী তখন অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী কমরেড সুনীল সেন। যুদ্ধোত্তর ভারত জুড়ে গণ অভ্যুত্থানের ধারা বেয়েই এসেছিল ৬০ লক্ষ কৃষকের তে-ভাগা সংগ্রাম। তে-ভাগা সংগ্রামই কৃষক আন্দোলনের কর্মী সেনকে দিনাজপুর জেলার তে-ভাগা সংগ্রামে কৃষক সংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিল। গ্রামের চাষী আর শহরের ছাত্র-মধ্যবিত্তের ঐক্য সম্বলিত মহামানবের সাগরের অপরূপ রূপ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি দিনাজপুর শহরে গিয়ে। কমিউনিস্টরা আত্মগোপন করে অবাধে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করছেন, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথের বিদেশী প্রতিনিধিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংগ্রামের মর্মস্থলে। সাধারণ পার্টি কর্মী যাঁরা সহরের পার্টি অফিস আগলে রেখেছেন (গ্রাম-শহরের যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল কোন দোকান বা কারও বাড়ী) তাঁদের কাছে শুনেছি গ্রামগুলি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, থানার পুলিশ পলাতক—কৃষক মেয়েদের শাঁখ বাজিয়ে পুলিশ-আগমনের সতর্কীকরণ। রেলের গ্যাং ম্যানের কোয়ার্টারে আহত কমরেডের গোপনে চিকিৎসা। এই সর্বাত্মক সংগ্রামের গভীরেই ছিল কমরেড সুনীল সেনের গতিবিধি, স্বভাবতই আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন বেরুল যে কিছুদিন আগে এক বিদেশিনী তে-ভাগা আন্দোলনের গবেষণা কাজে বাংলাদেশের দিনাজপুর গেলে বৃদ্ধ কৃষকদের মুখে সুনীল সেনের নাম গভীর শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হতে দেখলেন তখন আশ্চর্য হইনি—ঐটিই তো সুনীল সেনের ন্যায্য প্রাপ্য।

বাঙলার কৃষক আন্দোলন কমিউনিস্টদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল বলেই ১৯৩৬ সালে যখন কৃষক সভার পত্তন হয় তখন থেকেই হিন্দী বলয়ে গান্ধীবাদী

কৃষক আন্দোলনের ঠিক বিপরীতে কৃষকের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণী দাবী এবং জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে গোড়াথেকেই বাঙলার সর্বত্র কৃষকদের সংগঠিত করেছে কমিউনিস্টরা। সে যেন অন্য এক ধরণের কমিউনিস্টরা—রবীন্দ্র কবিতার একটু সূত্র ধরে বলা যায় ঘর ছাড়া সবে মরিতে ছুটিছে শত শত প্রভাত আলোর পানে কি আশ্বাস রবে ?' —সে আশ্বাস ছিল শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে ভারতের মুক্তি অর্জনের স্বপ্নে সর্বস্বত্যাগ করে আন্দোলন সংগঠন করা। কয়েকটি বড় শহর বাদে আর সবই তো কৃষক অঞ্চল—তৎকালীন উত্তর বাঙলায় তো বটেই। তাই কৃষকের আস্থা ভাজন হওয়া, কৃষককে সংগঠিত করা, কৃষকের নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করা—১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত একাজ করে আঞ্চলিক কৃষক সংগ্রাম গড়ে জমিদারের দ্বারা শারীরিক নির্যাতন, হাটতোলা, গণ্ডি চড়াসুদ প্রভৃতি কে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে কৃষকের শ্রেণী ও সংগঠন চেতনা এসেছে, কৃষকদের ভিতর থেকে কমিউনিস্ট তৈরী হয়েছে। ঐ 'ঘর ছাড়া সবে' রাই কমিউনিস্ট হিসেবে করেছে—পরিবার, পরিজন, নিরাপদ আশ্রয় সব ত্যাগ করে, কিছু প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আর পিছনে ফেরার সেতু পুড়িয়ে দিয়ে গ্রামে চলে গেছে সেদিনের কমিউনিস্ট ছেলে মেয়ে। শ্রেণীসংগ্রামের বর্শামুখ সেদিন খান খান করে ভেঙে দিয়েছে জাত, পাত ধর্ম, বর্ণের সীমারেখা এই কমিউনিস্টদের—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমানের ঘরের ছেলেমেয়ে একাকার হয়ে গেছে একটি মাত্র সম্বোধনে—তা হচ্ছে 'কমরেড'। সুনীল সেন ছিলেন এই প্রজাতির কমিউনিস্টদের একজন।

১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাঙলার বুকে বুকে নামিয়ে দিল এক সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশ-লাখ মানুষ মরে গেল—অধিকাংশই তার কৃষক আর বেশীর ভাগই উত্তর বাঙলায়। কমিউনিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ত্রাণ কার্যে সেদিন। তখন তো 'স্বেচ্ছাসেবী' সংগঠনের এমন রমরমাও নেই আর ভক্ষক সরকার কেন দেবে ? কমিউনিস্টরাই সার্বিক ত্রাণ চালিয়ে গেছে।

তিন বছর লেগে গেছে দুর্ভিক্ষ জর্জরিত কৃষকের মাথা তুলে দাঁড়াতে—তবে 'মাগো, একটু ফ্যান দাও,' বলতে বলতে কৃষক বুঝেছে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ না হলে, সাম্রাজ্যবাদকে খেদিয়ে তাড়াতে না পারলে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ১৯৪৬ সালের গোড়া থেকেই কৃষকের চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলতে লেগেছে—যদিও কমিউনিস্ট পার্টি বুঝতে পারেনি।

প্রবীণ কৃষক নেতা আবদুল্লা রসুল তাঁর 'কৃষক সভার ইতিহাস' বইয়ে বলেছেন —"কিন্তু পরিস্থিতির এই বিস্ফোরণের অবস্থা তখন প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন। তাঁরা সঠিক ধরতে পারেননি এর সংগ্রামী গুরুত্ব কতখানি। এই ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছিল ২১ থেকে ২৪শে মে ১৯৪৬ তারিখের খুলনা জেলার মৌভোগে তার নবম সম্মেলনের অধিবেশনে। ...পরবর্তী দুমাসের মধ্যে বাঙলার বহু জেলায় যে ব্যাপক ও প্রবল তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যায় তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মৌভোগ সম্মেলন চিন্তাও করতে পারে নি।

কিন্তু উত্তর বাঙলার জেলা কৃষক নেতারা বুঝেছিলেন। বিভিন্ন জেলার কৃষক নেতারা এক জায়গায় বসে দুর্ভিক্ষ পরবর্তী পরিস্থিতিতে কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার পরিকল্পনা করতে গিয়ে দেখলেন তে-ভাগার দাবী জীবন্ত হয়ে উঠছে—জেলায় জেলায় প্রচার চলতে থেকেছে মৌভোগ সম্মেলনের আগে থেকেই। সরকার কৃষকের মেজাজ বুঝতে পারছিল তাই '৪৬-এর জুলাই থেকেই থানায় থানায় পুলিশ বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কিছু গ্রেপ্তার শুরু করে দিয়েছিল। আর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করেই ফেটে পড়লো কৃষকের বিক্ষোভ—শুরু হল তেভাগার অভ্যুত্থান। '৪৬ এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে আন্দোলন তুঙ্গে—জমি দখল, জমিদার বিতাড়নে পর্যবসিত হয়েছে তেভাগার সীমিত দাবী—পুলিশী অত্যাচারও চরমে। ক্রমাগত গুলি করে হত্যা, গ্রেপ্তার করে বীভৎস অত্যাচার, নারী ধর্ষণ চলেছে। আন্দোলনের মেজাজ আরও তীব্র হয়, পুলিশ প্রতিরোধে কৃষকরা অস্ত্র চাইতে লাগল। সুনীল সেনের লেখাতেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। রসুল সাহেব লিখেছেন—"এই আন্দোলন যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ নেতৃত্বের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণা এবং তার ফলে আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার অভাব।" '৪৭ এর ফেব্রুয়ারীতে তেভাগা আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছিল তেভাগার দাবী স্বীকৃত হয়েছে বলে।

কমরেড সুনীল সেনের কৃষক আন্দোলনে সশরীর উপস্থিতি প্রকৃত পক্ষে এখানেই শেষ। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান হয়েছিলেন তিনি—পাদ প্রদীপের সামনে আসার ঝোঁক তাঁর কোনদিনই ছিল না—তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে লেখাপড়া করে গেছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নানা মোড় ফেরার মধ্যে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল কিনা বলতে পারব না।

বেশ কিছু জ্ঞানগর্ভ রচনা তিনি লিখে গেছেন। তার মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান এ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্‌ ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬-৪৭' তেভাগার আন্দোলনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথা আন্দোলনেরও বিস্তারিত বিবরণ। এছাড়া 'দি হাউজ অব টাটা', 'দি ওয়ার্কিং উইমেন অ্যাণ্ড পপুলার মুভমেণ্টস ইন বেঙ্গল' এবং সর্বশেষ 'ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ১৮৮৫—১৯৭৫' উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

কমরেড সুনীল সেন এর এই নিঃশব্দ প্রয়াণে বার বার একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে যে ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দিনেশ, মাষ্টারদা, নেতাজী দিবস আমরা বছরান্তরেই পালন করি, কিন্তু তার পরবর্তী সময়ের নৌ বিদ্রোহ, ২৯শে জুলাই, তেভাগা, তেলেঙ্গানাদের কথা মনে রাখিনা কেন? এগুলি কি প্রতি বৎসর স্মরণযোগ্য ঘটনাবলি নয়—এগুলো স্মরণ করলেই কিন্তু বঙ্কিম মুখার্জী প্রভৃতি শ্রেণী নেতাদের, সুনীল সেনরা ও শ্রমিক-কৃষক নেতাদের কথা ও কাজ মনে পড়ে যাওয়ার পথে আর বাধা রইবে না।

সৌরেন বসু

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার শেষ সৈনিক

গোপেন চক্রবর্তী

বিশিষ্ট সমাজসেবী. চিকিৎসক,
স্টুডেন্ট্‌স হেল্‌থ হোম-এর প্রতিষ্ঠাতা

অরুণ সেন

C.L.
Gift

পরিচয়

৮৩
৩৩

গোপাল হালদার স্মরণ সংখ্যা

…"ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ কয়ানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১৪২৮/৯৪

"হাওড়া শহরে খেলাধূলার প্রসারে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টেডিয়াম হাওড়াবাসীর বর্তমান গর্ব।—হাওড়াবাসীর ভবিষ্যৎ গর্ব ইনডোর গেমসের প্রসারে ডুমুর জলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং সংস্কৃতি বিকাশে শরৎ সদনের নির্মাণ কাজও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। পুরসভার টেলারিং স্কুলগুলি দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে। শুধু নাগরিক সুখ সুবিধা নয়—হাওড়া ব্যসীর সার্বিক বিকাশই আমাদের লক্ষ্য।

স্বদেশ চক্রবর্ত্তী

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

57/93-94

বর্তমান প্রজন্মের কাছে গোপাল হালদার পিতামহ-প্রতিম শ্রদ্ধেয় একটি নাম। বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বস্তুবাদী বিশ্লেষক পণ্ডিত হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি; তবে 'একদা', 'আড্ডা', 'বাজেলেখা' ও 'রূপনারানের কূলে'-র স্রষ্টা হিসাবেও তিনি কীর্তিমান।

স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সহৃদয় সহযাত্রী এই মনীষীর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি—

সাহিত্যভারতী পাবলিকেশনস্ (প্রাঃ) লিমিটেড
২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬
২৬৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৭

With best compliments from :

The Peerless General Finance
&
Investment Company Limited

Regd. Office :
'PEERLESS BHAVAN'
3, Esplanade East, Calcutta-700069

India's Largest Non-Banking Savings Company

BISHNU DEY

History's Tragic Exultation
tr. Bishnu Dey and others
Cover Design : Hemanta Mishra
Rs. 50.00

ARUN MITRA

The Quest Goes on and other Poems
tr. Surabhi Banerjee
Cover Design : Subrata Chowdhury
Rs. 40.00

SUBHAS MUKHOPADHYAY

Wherever I Go and Other Poems
tr. Sunil Kanti Sen
Cover Design : Krishnendu Chaki
Rs. 45.00

NIRENDRANATH CHAKRAVARTI

The King without Clothes
tr. Sukanta Chaudhuri
Cover Design : Purnendu Pattrea
Rs. 20.00

SANKHA GHOSH

Emperor Babur's Prayer and other Poems
tr. Kalyan Ray
Cover Design : Purnendu Pattrea
Rs. 50.00

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road,
New Delhi-1
Jeevantara Bhavan,
23A/44X. Diamond Harbour Road, Calcutta-53
(Phone : 478-1806)

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার আমাদের কালের একজন উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিবান পুরুষ। তাঁর সুভদ্ররুচি, প্রজ্ঞা ও মার্কসীয় জীবনদৃষ্টির আলোকে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিজীবন দ্যুতিময়। এই মণীষী লেখকের উদ্দেশে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি—

নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা—৭০০০০৭

মনীষা প্রকাশিত
গোপাল হালদারের
দুটি বিশেষ বই
'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ',
'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'—এক খণ্ডে
সংস্কৃতির বিশ্বরূপ
দাম: ৭৫'০০
ভারতের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ
ভারতের ভাষা
দাম: ৩৬'০০
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বাঙালি পাঠকের অহংকার সংসদের অভিধান

English Bengali Dictionary	105.00
Student's Eng. Beng. Dictionary.	45.00
Common Words Dictionary.	27.50
Beng. Eng. Dictionary	90.00
Student's Beng. Eng. Dictionary.	42·50

বাঙ্গালা অভিধান	৭৫·০০
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ১-২ (প্রতি খণ্ড)	১৫০·০০
সমার্থ শব্দ কোষ	৭০·০০
বাগ্‌ধারা অভিধান	৬৫·০০
ব্যাকরণ অভিধান	২৫·০০
বাংলা উচ্চারণ অভিধান	১০০·০০
বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ	৮০·০০
বাঙালী চরিতাভিধান	৭৫·০০

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

With Best Compliments From :

Reme Private Limited

REME FEELS PROUD IN COMING UP WITH ITS LEAD PLANT AT BISHNUPUR (BANKURA) WITH SUPPORT FROM WBIDC AND IRBI

Registered Office :
72, Okhla Industrial Estate
NEW DELHI-110 020
Telephone No. 68-30214
Telex No : 031 75407 REME IN
Fax No. 011 64 31821

Corporate Office :
'VASUNDHARA'
Suite No. 5. 7th floor
2/7, Sarat Bose Road
Clacutta 700 020
Telephone No. 748290/91
Telex No. 021-7056 HAMC IN
GRAM : HINDALLOY

WORKS
Industrial Growth Centre, Bishnupur
Plot No. L-35 & L-36.
Bishanupur, Dist : BANKURA (W. B)

ইংরেজ আমলে যখন মানুষ চা-পান করত না
তখন এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল ঃ

চা-পানের উপকারিতা

ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু।
ইহাতে কোন অপকার হয় না।
ইহা জীবনশক্তির উদ্দীপক।
ইহাতে মাদকতা শক্তি নাই।

ইহা নিম্নলিখিত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে—
ম্যালেরিয়া * টাইফয়েড * কলেরা * আমাশয় *
প্লেগ * অবসাদ

চা প্রস্তুতকার্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অন্ন করিয়া খাইতেছে। জল ব্যতীত যাবতীয় পানীয়ের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সুলভ। চা শীত ও বর্ষায় ব্যাধি দূর করে।
ইহা একমাত্র গ্রীষ্মের শীতল পানীয়।
চা-ই জীবনের একমাত্র সম্পদ, স্বাস্থ্য ও সুখ।

এখন আর এভাবে মানুষকে চা-পানের জন্য আবেদন করতে হয় না।

এখন দরকার সঠিক দামে সঠিক চা চিনে নেওয়া !

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পাশে, মেট্রো রেল স্টেশনের বিপরীত দিকে চায়ের দোকান

মরনাই টি এস্টেট, অসম
২৫৭, দেশপ্রাণ শাসমল রোড
টালিগঞ্জ

মরনাই টি এস্টেট, অসম
এজেন্ট : ভুটান ডুয়ার্স টি
এসোসিয়েশন লিঃ
নিলহাট হাউস (ষষ্ঠ তলা)
১১, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা—১
ফোন—২৪৮-৯৬৩১

প্রাণ ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য অগ্নিপ্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন হোন

যা করবেন

- আপনি যদি বহুতল বাড়ির বাসিন্দা হন তবে সে বাড়িতে আগুন লাগলে নিষ্কৃতি পাবার সব পথ চিনে রাখুন ও আগুন লাগলে জল সররবাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
- ঘনবসতি এলাকায় বে-আইনীভাবে তেজস্ক্রিয় বা বিস্ফোরক দাহ্য পদার্থ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ হোন।
- আগুন লাগলেই দমকল বাহিনীকে কলকাতার ১০১ বা ২৯-০১০১ নম্বরে ডায়াল করুন।
- সঠিক সংবাদ দিয়ে কর্তব্যরত দমকল বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। জলের সন্ধান দিন। অযথা আতঙ্কের সৃষ্টি না করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন। দমকলের কাজে বাধা সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন বা অযথা ওদের উপর যাতে আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

যা করবেন না

- বৈদ্যুতিক লাইন গ্যাস সহ বিভিন্ন সরঞ্জামে যে কোনরকমের ত্রুটি দেখলেই নিজে ঝুঁকি না নিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের পরামর্শ নিন। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই দমকলকে খবর দিন।
- কোন নির্দিষ্ট ইলেকট্রিক তার বা মিটারের পরিবাহী ক্ষমতার চেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রে ঐ তার বা মিটার ব্যবহার করবেন না বা অস্থায়ী ইলেকট্রিক তার টানবেন না।
- উৎসব বা পূজার সময় অস্থায়ী মণ্ডপের জন্য সরকারী নিয়ম মেনে চলুন—দমকলের পরামর্শ নিন।
- নিজের বাড়ি, কলকারখানা দোকান বা দপ্তর যেকোন স্থানেই দাহ্য বস্তু অসতর্কভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে রাখবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১০৯৪/৯৪

ঐক্যই শক্তি

“বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন

ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ: ১৪২৮/৯৪

সম্প্রতি প্রকাশিত। পরিবর্ধিত সংস্করণ

হে চিরনূতন

রবীন্দ্ররচনা-সংকলন

১৪০০ সালের আবির্ভাব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘১৪০০ সাল’ কবিতা এবং পুরাতন বৎসরের বিদায় ও নূতন বৎসরের আবাহন উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা. গান, প্রবন্ধের সংকলন। মূল্য ১৫·০০

আত্মপরিচয়

কবি তাঁর যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন তার ইতিবৃত্ত। বর্তমান সংস্করণে বৈশাখ ১০০৪ নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত “সন্ধান” প্রবন্ধটি সংযোজিত। মূল্য ২০·০০

ছিন্নপত্রাবলী

ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ। মূল্য ৭৮·০০

নৃত্য ॥ প্রতিমা দেবী

নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা সম্বন্ধে সুখপাঠ্য আলোচনা। মূল্য ২৬·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

With Best Compliments From :

TATA STEEL

Space donated by

A Well Wisher

শতাব্দীর এক অসাধারণ লেখক—
জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা

তাঁর লেখা আমাদের প্রকাশনার দুখানি অমূল্য রচনা :—

গোপাল হালদার রচনা সমগ্র—১ / দাম ৭০ টাকা
গোপাল হালদার রচনা সমগ্র—২ / দাম ১০০ টাকা

আমরা বই ছাপি না   বিষয় ছাপি

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ৩১-১৪০৬ / ৩১-১১৯৯

Gluconet specialities at a Glance :—

Stibanate Injection
(Sodium Stibo-Gluconate)
for Kala—Azar

- * Alkacitron Liquid
- * Sodium based Systemic Alknliser
- * Pocitron Liqued Potassium btsed systemic Alkaliser
- * Glcov t Capsule 8 Water Soluble Vitamins
- * Kefaxin Capsule Cephalexin-250 mg.
- * Calcisprin Tablet Solube Aspirn
- * Theodyl Tablet For Bronchil & Cardiac Asthma
- * Lacto-Fetment Tablet Contains Sufficlent bacilli of L-Acidophillus
- * Wondazola Teblet Tinidzole-500 mg.

GLUCONATE INDIA LIMITED

(A Govt. of West Bengal Undertaking)

Sole Manufacturer Of Basic Drug Pethidine Hydrochloride In India

Regd. Office :
2, Durga Charan Doctor Lane, Cal-14
Gram : Alkacitron Phone : 244-1277/78/99 (3 lines)

পড়ার মতো ও রাখার মতো কয়েকটি বই

মুজফ্ফর আহ্মদ
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন ২৫'০০

সরোজ মুখোপাধ্যায়
নির্বাচিত রচনা ১ম খণ্ড ৩৫'০০
২য় খণ্ড ৫০'০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ভারতীয় দর্শন ৬০'০০

সুকোমল সেন
ভারতের সভ্যতা ও সমাজ-বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ ৭০'০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
জানবার কথা (১০ খণ্ডে)

১নং বিজ্ঞান। ২নং ইতিহাস। ৩নং ইতিহাস। ৪নং যন্ত্র কৌশলের কথা। ৫নং যন্ত্র কৌশলের কথা। ৬নং পৃথিবীর খবর। ৭নং অর্থনীতি রাজনীতি ৮নং সাহিত্য। ৯নং চারুশিল্প। ১০নং দর্শন। প্রতি খণ্ড ২৫'০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ / ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ১২ /
ডি, ডি ৪২, সেক্টর ১ বিধান নগর, কলকাতা ৬৪
শাখা ঃ দুর্গাপুর। শিলিগুড়ি। মেদিনীপুর শহর। বর্ধমান শহর

Hindustan Cables Limited

(A Govt. of India Undertaking)
Rupnarainpur Unit
P. O: Hindustan Cables
Dist. Burdwan
Pin code No. 713 335

EVER AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY
PROVES IT AGAIN BY
PRODUCIONG OPTICAL FIBRE CABLES FOR
THE FIRST TIME IN INDIA

The Glass fibre thinner than human hair with enormous transmission Capacity revolutionising the WORLD OF TELECOMMUNICATIONS.

H C L—Pioneers in the manufacturing of all types of Telecommunication Cables, accesories and micro-Processor based testing equipment and supplying to DOT, Defence, Railways and other Public Sector Undertakings.

Intensive R & D activity—an over-riding priority at HCL contributing to continuous technological upgradation in products and quality.

At HCL Growth through excellence is a commitment & way of life.

Regd & Corporate Office : 9 Elgin Road, Calcutta-700020
Other Units : Hyderabad & Allahabad
Regional Offices : Calcutta, New Delhi & Madras.

জাতীয় সংহতি

ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ সেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায়না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি. এ ১০৯৪[৯৪

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য
একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ
(একটি সরকারী সংস্থা)
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়ঃ—

ক) এইচ, এম, টি, / মহিন্দর / এসকটস / মিৎসুবিশি ট্রাকটরস।
খ) কুবোটা / মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।
গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।
ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের, তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড় অফিসে (ফোন নং ২২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস

২৪-পরগণা (দক্ষিণ) ঃ ১৪, নিউ তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
" (উত্তর) ঃ ২৭নং যশোর রোড, বারাসাত
হুগলী ঃ সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, চুঁচুড়া/পুরশুরা
বর্ধমান ঃ ৫নং রামলাল বোস লেন, রাধা নগর পাড়া, ষ্টেশন রোড মেমারি, বর্ধমান
বাঁকুড়া ঃ লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট) ঃ সুভাষ নগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট) ঃ পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া
বীরভূম ঃ সিউড়ি, বড়বাগান
মালদা ঃ মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ ঃ ১৬, শহীদ সূর্য্য সেন স্টীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি ঃ 'সবরি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং ঃ বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি
কোচবিহার ঃ এন, এন, রোড, কোচবিহার
পুরুলিয়া ঃ নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া
নদীয়া ঃ ১/১ এম, এম, ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১৪নং আর এন টেগর রোড, নদীয়া
উত্তর দিনাজপুর ঃ সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স
পশ্চিম দিনাজপুর ঃ বালুর ঘাট

ভস্তকের নতুন-গ্রন্থ সম্ভার

গল্প গ্রন্থ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ।। রুশ গল্প সঞ্চয়ন

দস্তয়ভস্কি, চেখভ, তলস্তয় প্রমুখের ১৭টি গল্প

অনিতা অগ্নিহোত্রী ।। চক্রব্যূহ

তরুণতম গল্পকারের হীরকদ্যুতি সম্পন্ন প্রথম গল্পগ্রন্থ

বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধল ।। অসমাপ্ত শতক

ওড়িয়া লেখকের খেলাকেন্দ্রিক অনুবাদ গল্প সংকলন

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল রায় সম্পাদিত

কলকাতা কলকাতা

আবার কলকাতা

কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে আধুনিক দুটি গল্পগ্রন্থ

কবিতা গ্রন্থ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ।। ভোম্বলের আশ্চর্য কাহিনী ও অন্যান্য কবিতা

কবিতা-চলচ্চিত্র ভাবনায় আশ্চর্য কাব্যকাহিনী

রণজিত দাশ ।। নির্বাচিত কবিতা

বাংলা কবিতার এক গোপন পাওয়ার স্টেশন

সুবোধ সরকার ।। দেশটা আমেরিকা

কবির লেখা ভ্রমণ কাহিনীই শুধু নয়, সেদেশের মানুষ ও তাদের জীবনের বিশ্লেষণ

ভস্তক

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, ফোন ঃ ২৪১-৩৪০১

গোপাল হালদারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ

১।	রূপনারানের কূলে (১ম)	৩০·০০
২।	রূপনারানের কূলে (২য় খণ্ড)	৪৫·০০
৩।	A Comparative Grammar of East Bengali Dialects	90/

পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিঃ
৯, অ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৩০।৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২ প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—রঞ্জন ধর, ভারতীয়, ৩০।৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪ প্রকাশক— ঐ ঐ

৫ সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা—

১। গোপাল হালদার (মৃত) ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি, আই, টি, বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু (মৃত), ৭৩ এল মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, (মৃত) ১।১।১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-৩২। সত্যজিৎ রায় (মৃত) ফ্ল্যাট ৮. ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত) ৪৮৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। হরিদাস নন্দী, ২৯।এ, কবির, রোড, কলকাতা-২৬। ১৫। ধ্রুব মিত্র, (মৃত), ২২ বি, সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা' ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত) পূর্বপল্লী. শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৮ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত) ৯।১ কর্নফিল্ড রোভ, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত), ৫৯বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত) ৩সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মৃত), ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা ২০। ২২। শান্তা বসু, ১৩ এ বলরাম ঘোষ

স্ট্রিট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন্দ্র রায়, ১০।৭ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রিট কলকাতা-১৩। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্, রোড নয়াদিল্লি। ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, (মৃত) ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বসু (মৃত) ২০০এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড কলকাতা-১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকার ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা ৪০। ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি বি সি রোড জলপাইগুড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত) ১৯। ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯। ৩৭। রণজিৎ মুখার্জি, পি, ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা ৪০। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভবন, নয়াদিল্লি। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, (মৃত) ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, (মৃত), ১।এ, মহীশুর রোড, কলকাতা ২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১।১, ব্লক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্লাট-বি সি-৩, পিক নিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকি বাগান লেন কলকাতা-৬। ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১৬, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত (মৃত), ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৯। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ১২।

আমি রঞ্জন ধর এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

স্বাঃ রঞ্জন ধর

৩০।৩।৯৪

পরিচয়

মার্চ-জুন ১৯৯৪; চৈত্র-আষাঢ় ১৪০১   ৬৩ বর্ষ ৮-১১ সংখ্যা

সঙ্গ-অনুষঙ্গ

প্রসঙ্গ : গোপাল হালদার   অরুণা হালদার   ১
তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক   সোমনাথ লাহিড়ী   ৫
গোপাল হালদার : ৫৬ বছরের স্মৃতি   হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়   ৮
গোপাল হারদার স্মরণে   কবীর চৌধুরী   ১৩

প্রবন্ধ

কয়েদির আকাশ   শঙ্খ ঘোষ   ১৬
সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাসের তত্ত্ব এবং গোপাল হালদার   ক্ষেত্র গুপ্ত   ২৬
লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে গোপাল হালদার   সুধীরকুমার করণ   ৩৬
সাহিত্য-সমালোচক গোপাল হালদার   বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য   ৫০
দেশপ্রেমিক, বিপ্লববাদী, কমিউনিস্ট গোপাল হালদার : ১৯২০-৪৫   গৌতম চট্টোপাধ্যায়   ৬৫
'ত্রিদিবা'-র গোপাল হালদার   রবীন্দ্র গুপ্ত   ৭৩
গোপাল হালদার : সমাজবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিচেতনার ভাষ্যকার   সুরেশ মৈত্র   ৯৩
পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাচর্চায় গোপাল হালদার   প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত   ১০৪
গোপাল হালদারের 'মন্বন্তর' : তেরশ পঞ্চাশ   সুব্রত রায়চৌধুরী   ১১৫
বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার   জ্যোতির্ময় ঘোষ   ১২৭
প্রগতি সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার   ধনঞ্জয় দাশ   ১৪৬
গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত   বাসব সরকার   ১৮০

স্মৃতিচারণ

বিনয় চৌধুরী সুধী প্রধান মনসুর হবিবুল্লাহ্ ২০১—২১৩

পরিশিষ্ট ১

বিশ শতকের ঘটনাক্রম ও গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী
সংকলন ও সম্পাদনা অমিয় ধর ১—৬৮

পরিশিষ্ট ২

গোপাল হালদারের রচনার পুনর্মুদ্রণ

নটরাজের নৈবেদ্য ৭০, সোফা ও খোঁপা, ৮১ কবিতার রাত ৮৫
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা ৯৫, ডাক আসিয়াছে ১০০
প্রমথ চৌধুরী ১০২ চিঠি ১০৬
Follow Nagpur ১০৯ The poet is no more ১১৩
আমার প্রসঙ্গে আমি ১১৫

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার সম্পাদকের নিবেদন

প্রচ্ছদ দীপ্ত দাশগুপ্ত

অতিথি-সম্পাদক অমিয় ধর

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত
প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
রঞ্জন ধর
সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু
উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর: ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা–৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

প্রাসঙ্গিক দু-একটি কথা

বাঙালী মনীষার এক চিরায়ত অহংকার—গোপাল হালদার। আমরাও গর্বিত, তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের অন্যতম সতেজ প্রবাহ ছিল 'পরিচয়' সম্পাদনা। জন্মলগ্ন থেকে কখনো সাবলীল কখনো উপলব্যথিত গতিতে চলতে চলতে এই পত্রিকা যখন চৌষট্টি বছরে পা দিল, তখনই তার প্রাণপুরুষ, আমাদের সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় গোপালদা চলে গেলেন।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মত অর্বাচীন পরিচয়-পন্থীদের ওপর মহা দায় বর্তেছিল, আমাদের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে তাঁর মহান অবদানের প্রসঙ্গগুলি উল্লেখ করে একটি উপযুক্ত সংখ্যা প্রকাশ করা। এক যুগ আগে, গোপালদা যখন বিপুলভাবে জীবিত, তখন তাঁকে নিয়ে পরিচয়-এর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে, বর্তমান সংখ্যাটিতে যতদূর সম্ভব তাঁর কাজের সার্বিক পরিচিতি তুলে-ধরার দায়িত্ব আমরা গভীরভাবে অনুভব করছিলাম। ব্যর্থ হওয়ার শঙ্কাও আমাদের কম পীড়িত করছিল না।

এমনই উদ্বেগ-পর্বে আমাদের পরিকল্পনাকে বাস্তব করে তোলার কাজে এগিয়ে এলেন আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধু এবং গোপালদা-র জীবন ও কর্মের একান্ত নিষ্ঠাবান অনুসারক শ্রী অমিয় ধর। তিনিই এই বিশেষ সংখ্যার অতিথি-সম্পাদক। যে সততা, শ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে তিনি সংখ্যাটির পরিকল্পনা, বিভিন্ন রচনা এমনকি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন, তার জন্য পরিচয়-এর সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করছি।

এই সংখ্যাটি প্রকাশ করার জন্য পরিচয়-এর সকল কর্মীই কমবেশি পরিশ্রম করেছেন। তবুও, সম্পাদক হিশেবে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী বাসব সরকারের কথা। সংখ্যাটির রূপায়ণের কাজে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় দিয়ে, কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক ভাবেও তিনি যে ব্রতপালন করেছেন, তা আমাদের কাছে এক অনন্য নজীর হয়ে রইল।

বলা বাহুল্য, সংখ্যাটির মূল পরিকল্পনার সবটুকু আমরা বাস্তব করে তুলতে পারি নি। গোপালদা-র আয়তনবান ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু দিক এখানে অনালোকিত রয়ে গেল। আমাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ফাঁক-ও রইল কিছুটা। নানা কারণে সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে বেশ দেরি হয়ে গেল। এই অসম্পূর্ণতা ও

বিলম্বের সবটুকু আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তবুও, পরিচয়-এর পাঠক ও শুভার্থীদের প্রতি বিনীত ভাবে নিবেদন করতে চাই—আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

খোলা বাজারি অর্থনীতির হাওয়ায় বেগবান বাণিজ্যিক সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্তের এই কালপর্বে পরিচয়-এর মত একটি সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক ও আপোসহীন পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখা যে কতখানি দুরূহ, তা আমাদের সহধর্মীমাত্রই জানেন। এই সংখ্যার সমস্ত লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এর পরই পরিচয়-এর শারদীয় সংখ্যা। আশা করি, সৎ সংস্কৃতি প্রেমীদের সক্রিয় সহযোগিতা থেকে এবারও আমরা বঞ্চিত হব না। পরিচয় কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক পত্রিকা নয়; প্রায় সাড়ে ছয় দশকব্যাপী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিমান। নতুন বাংলা শতকে তা আরও স্ফুরিত, আরও মর্যাদাদীপ্ত হয়ে উঠুক।

অমিতাভ দাশগুপ্ত
১৫ ৭. ৯৪

চট্টোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আহমদ স্মৃতি পাঠাগারের শ্রী ধীরেন্দ্র সিংহরায়, শ্রী সুধীর খাস্তগীর, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ); 'নতুন সাহিত্যে'র সম্পাদক শ্রী অনিল সিংহ; বিশিষ্ট লেখক শ্রী হিমানীশ গোস্বামী; অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন নাথ, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুব্রত রায়চৌধুরী, ডঃ কৃষ্ণা রায়, শ্রী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য, শ্রী তারাপদ আচার্য, অধ্যাপক অরূপ সেন, গাড়ুলিয়া সাধারণ পাঠাগারের কর্মিবৃন্দ, রামমোহন লাইব্রেরির সভাপতি ডঃ সরোজমোহন মিত্র এবং আরও অনেকে নানাবিধ সাহায্য করেছেন। আমারও 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে সকলকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ওপার বাঙলার বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটি লেখা আমরা 'শিক্ষাবার্তা' থেকে পুনর্ম্মুদ্রণ করেছি; তাঁর কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহে যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটেছে, সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। গোপাল হালদার অনুরাগী ধীমান অধ্যাপক, জানি ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। 'পরিচয়'-এর কর্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য, 'বাণীরূপা প্রেসের কর্মীবন্ধুরা অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ অধ্যাপক বাসব সরকার ও ডঃ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের সক্রিয় সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

সকলের সর্ববিধ সহযোগিতা সত্ত্বেও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল, তার জন্য আমার অনভিজ্ঞতাই মূলত দায়ী; আর এ প্রয়াস যদি কিছুমাত্র সার্থক হয়ে থাকে তার কৃতিত্ব প্রধানত সহৃদয় লেখক ও 'পরিচয়'-এর সম্পাদক বন্ধুদের।

পরিশেষে, সংস্কৃতি মনস্ক পাঠকদের সহৃদয়তা কামনা করে 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে তাঁদের হাতেই 'গোপাল হালদার স্মরণ সংখ্যা' তুলে দিলাম।

বিনীত
অমিয় ধর
২২. ৭. ৯৪

নিবেদন

বিচিত্রপ্রভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আচার্য গোপাল হালদার আমাদের কালের একজন উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতিবান পুরুষ। তাঁর সুভদ্ররুচি, প্রজ্ঞা ও মার্কসীয় জীবনদৃষ্টির আলোকে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ দ্যুতিময়। ১৯৯৩ সালের ৪ অক্টোবর, প্রায় শতাব্দী ব্যাপ্ত জীবন-পরিক্রমা শেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সহৃদয় সহযাত্রী, বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র অনুরাগী, মুক্তপ্রাণ, কৃতবিদ্য, কৃতকর্মা গোপাল হালদার প্রয়াত হয়েছেন।

এই শতাব্দীর চারের দশকে 'পরিচয়' পত্রিকার নবপর্যায়ে গোপাল হালদার ছিলেন তার অন্যতম সম্পাদক। "সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা"—এই বিশ্বাসে সুস্থির থেকে দীর্ঘ একুশ বছর 'পয়িচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব সযত্নে পালন করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন, এই পত্রিকার পিতামহপ্রতিম উপদেষ্টা।

প্রয়াত মনীষীর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী 'গোপাল হালদার স্মরণ সংখ্যা' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের এই উদ্যোগের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে, তাঁরা আমার প্রতি যে স্নেহ ও আস্থা প্রকাশ করেছেন, তাতে আমি আভিভূত।

আচার্য গোপাল হালদারের সুযোগ্যা সহধর্মিণী ড. অরুণা হালদার; সুবিজ্ঞ ইতিহাসবিদ্‌ ও কমিউনিস্ট সাংসদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; বিশিষ্ট কৃষক নেতা, প্রাক্তনমন্ত্রী ও স্পীকার মনসুর হবিবুল্লাহ; প্রবীণ কৃষক নেতা ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী; গণনাট্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রবীণ সারথি শ্রীসুধী প্রধান লেখা দিয়ে, সাক্ষাৎকার দিয়ে অতুলনীয় সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

গোপাল হালদার অনুরাগী ডঃ সুরেশ মৈত্র, ডঃ সুধীর করণ, কবি শঙ্খ ঘোষ, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, ডঃ প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জন গোপাল হালদারের মনীষা ও সাহিত্যকৃতির আলোচনায় নতুনমাত্রা সংযোজন করেছেন। তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতাও স্মরণীয়।

এই স্মরণসংখ্যা সম্পাদনায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ করে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের পঃ বঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ডঃ প্রভাত পালিত, শ্রী নন্দ ঘোষ; অধ্যাপক গৌতম

গোপাল হালদার, ১৯৪৩

ফোটো ঃ পরিমল গোস্বামী

প্রসঙ্গ ঃ গোপাল হালদার

অরুণা হালদার

গোপাল হালদার, জন্ম ১৯০২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যু ৩ অক্টোবর রাত্রি ১২-৩৫, ১৯৯৩। এই দীর্ঘ প্রায় ৯১ বৎসরের মানুষটির জীবনের শেষ পর্বে যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের উপস্থিতির মধ্যে সে মানুষটি আজ একটি স্মৃতি একটি খবর অথবা এ কটি চিত্র মাত্র। নিকট জনার কাছে কিছু সান্ত্বনা নাই। তবুও একত্র হয়ে স্মৃতিচারণার কিছু উপযোগিতা আছে। প্রার্থনা করি, আজ যেন তা সার্থক স্মৃতিচারণা হয়। কৃতজ্ঞ নমস্কার নিবেদন করি উপস্থিত সকলকে এবং সভাদেবতাকে তথা উদ্যোক্তাগণকে। "অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু নঃ।"

গোপাল হালদার বিক্রমপুর, নোয়াখালির অশান্ত বিপ্লবী-স্বাধীনতার স্বপ্ন সাধক হয়ে জীবনারম্ভ করেন। কিশোর ও তরুণ গোপাল হালদার কলিকাতার জীবন স্রোতে আপন প্রয়াসে কৃতিত্বে অধ্যবসায়ে এক সুশিক্ষিত সুদীক্ষিত আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনবীক্ষায় প্রতিটি দিনই এক সামগ্রিক সংযোজন। যাঁরা তাঁর কাছাকাছি থেকে তাঁকে দেখেছেন—তাঁরাও অনুভব করেছেন তাঁর অতি-সন্নিকট স্নেহ সাহচর্য সত্ত্বেও কোথাও একটি অনমনীয় দূরত্ব। দীর্ঘ ৫০ বৎসরের পরিচয় ও গত ৪৫ বৎসরের একত্রিত জীবনে এই বিচিত্র মানুষটিকে নানাভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। গোপাল হালদারের ক্ষীণস্বাস্থ্য, ক্ষীণদৃষ্টি,

প্রসন্ন হাস্য এবং নিজেকে নিয়ে কৌতুক, এতো সতত সহজবোধ্য হতে পারত না। ইংরাজী সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গমে তিনি যুক্ত করেছিলেন তাঁর বিশ্বসাহিত্যের অন্তত কয়েকটির ক্ষেত্রে অবাধ পরিক্রমা, যেমন, ফরাসী, জর্মন ও রুশ সাহিত্য। তাঁর গৃহে অজস্র গ্রন্থসম্ভার—প্রায় প্রতিটি গ্রন্থ সযত্নে আহরিত, সযত্নে পঠিত। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে সুলিখিত মন্তব্য—তাঁর শরীর-উপস্থিতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিদ্যাব্যসনী গোপাল হালদার-এর কাছে তাঁর Vision-ই Mission ছিল। তিনি নিজে যা ভাবতেন তার প্রয়োগ দ্বারাই সে ভাবনাকে গ্রহণ করতেন। তাঁর এই নিরীক্ষা-পরীক্ষা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানসম্মত আচরণ। কিন্তু, প্রকৃত democratic মানুষ হিসাবে তিনি এই ভাবনা বা আচরণ কখনও অন্যের উপর আরোপ করেননি। তাঁর কাছে আত্মীয় বন্ধু পরিজনের অবাধ গতি ছিল, তিনিও স্বীয় সৌহার্দ্যে সকলের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আঘাত পেলেও প্রত্যাঘাত করেননি। ক্ষমা যে শুধু সবলেরই ধর্ম্ম, এটা তাঁর বহু আচরণে নিকট থেকে দেখার দুরূহ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। একটি আশ্চর্য চারিত্র্য-ধর্ম্মও নিরলংকৃত আভিজাত্য তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত ঘিরে থাকত। সেই পরম বিনয়ী মানুষকে; চরিত্রগর্ব্বী মানুষকে উপেক্ষা করা সম্ভব হতনা বলে অনেক ক্ষেত্রেই বহু মানুষ তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। এই মৃদুভাষী মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে অবিচল থাকতেন এমন বহু নিদর্শন তাঁর জীবনের কাজে মিলবে।

তাঁর জীবনচর্য্যাতে আরও একাট ত্রিবেণীসঙ্গমে পাওয়া যেত বিবেকানন্দ-সুভাষ বসু মার্কস-লেনিন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যেও শেষাবধি তাঁর চৈতন্য-ধর্ম্মে বিধৃত ছিলে। সুভাষ বসু ও রবীন্দ্রনাথ। মানব-ধর্ম্মে দীক্ষিত মানুষ হিসাবেই তিনি বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের পথে অভিযাত্রী-হিসাবে মার্কস-লেনিনের পথকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হিসাবেই গ্রহণ করেন, স্থির মস্তিষ্ক, গ্রহীষ্ণু ছাত্রেরই মত। তিনি জানতেন রাষ্ট্রযন্ত্র যত সহজে পরিবর্ত্তিত হয় তত সহজে পরিবর্ত্তিত হয়না মানব ব্যক্তিজীবন অথবা সামাজিক পরিবেশ। তাঁর ভাষায়, মানব-মঙ্গলনীতি বা ethosও চলিষ্ণু, তবে তা চলে বড় ধীর গতিতে হয়ত বা হাজার বৎসরে এক মিলিমিটর মাত্র।

বিজ্ঞানমনস্ক সুধী গোপাল হালদার বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারেননি বলে নিজে দুঃখবোধ করতেন। গণিত ছিল প্রিয় বিষয়। কিন্তু বোঝা শক্ত ছিল সাহিত্য

বা বিজ্ঞানের কোনটি তাঁর সমধিক প্রিয়। তবে সাহিত্যচর্চ্চাই জীবনবোধের দ্যোতক, এই হিসাবে তিনি আজীবন করে গেছেন এই সাহিত্যই। সাহিত্য ছিল তাঁর হাত ও হাতিয়ার দুইই। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বিশ্বাসী ছিলেন creative সাহিত্য দ্বারা creative politics—এর প্রসাদনে।

গোপাল হালদারের জীবন, তাঁর গৃহ, সতত সবার জন্য থাকত অবারিত। সেই গৃহে সেই শান্ত পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রায় কোনও মালিন্য দেখিনি। তবে সেই প্রাণের প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্য শুধুমাত্র মর্ম্মজ্ঞ মানুষেরই মর্ম্মস্পর্শ করত। ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত অন্যমত স্বমতের সকল মানুষই, আত্মীয় অনাত্মীয় সকল ব্যক্তিই কেউ সে গৃহে নিজেকে অবাঞ্ছিত বোধ করত না—"চাঁদামামা সকলেরই মামা।" অথচ গোপাল হালদার নিজেকে সহজে প্রকাশ করতেন না। মানবিক সুখদুঃখ জৈবনিক ক্ষুধাতৃষ্ণা, অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ কোনও এক অজ্ঞাত উপায়ে সহ্য করতেন—তিক্ত হতেন না। যে কোনও দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আদর্শ পালনীয় কিছু গুণ এই মানুষের অনায়াসলভ্য ছিল। তথাপি তিনি জানতেন যে তিনিও অজাতশত্রু নন। তিনিও যে সূক্ষ্ম ঈর্ষার পাত্র একথা জেনে তীনি একপ্রকার বিষণ্ণ কৌতুক অনুভব করতেন। অপরপক্ষে বোধ করি গোপাল হালদার একটি মাত্রই লোক,, যাঁকে আমি দেখেছি, তথাকথিত ভক্ত সমাগমে তাঁদের সপ্রশংস উক্তিতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত উদাসীন রাখতে। এখানেও তাঁর বিনীত প্রসন্নতা ও কৌতুকহাস্যই তাঁর অস্ত্র ছিল—তাই তাঁর স্বদেশে-বিদেশে অজস্র বন্ধু ও সুহৃদ ছিলেন কিন্তু তাঁকে ঘিরে তাঁর কোনও দল সংগঠিত হয়নি—তিনি তার ঊর্দ্ধে ছিলেন। তাঁর তটস্থ রীতিতে সুবিধাবাদ বর্জ্জিত ছিল ; সেও তাঁর বহুজনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ।

আজ এই লেখাটা লিখতে গিয়ে বারবার অভ্যস্ত কিছু কথা কানে স্মৃতিরূঢ় হয়ে উঠছে—একটা কৌতুক হাস্য,কিছুটা স্বীকৃতি সহ তাঁর উক্তি এবং হেসে ওঠা—আরে 'আরে কি যে কর—মাথা খারাপ নাকি।' এই কৌতুক হাস্যটিই বড় আনন্দ ও শান্তির ছিল। সেটি আর নাই। "The tender glory of a day is dead and it will never come back to me".

প্রদীপশিখা অবশেষে নিভে যায়—নিদারুণ যন্ত্রণার কাছে অবশেষে অদম্য প্রাণশক্তিও হার মেনে নিল। গোপাল হালদারও বলতেন তাঁর গুরু সুনীতি কুমারের মত—আমি মানুষ 'যা কিছু মানবিক তাতেই আমার আগ্রহ।' তিনি

মানুষের সহযাত্রী বোধেই মানুষকে ভালবাসতেন—তীব্র তাঁর জীবনরস পিপাসার মধ্যে তাই প্রাণমন্ত্র ছিল—

"জয় হক মানুষের,—জয় হক জীবনের, প্রণাম মানুষকে"—আমিও বলি—সকৃতজ্ঞ প্রণাম মানুষকে। আজও শুনতে পাই, এই 'মানুষ'—বিজ্ঞাননিষ্ঠ হ'ক—এই 'মানুষ' সততা অনুশীলন—পরিশীলনে নিজেকে পূর্ণতর করুক। মানুষ মানুষকে ভালোবেসে পারস্পরিক সহায়তায় সহযোগী হক। সে শিক্ষায় দীক্ষায় প্রাগ্রসর হ'ক—তার কথায় ও কাজে পার্থক্যের অবসান হ'ক। মানুষ তন্নিষ্ঠ হক, হ'ক সে জীবনচর্য্যার ক্ষেত্রে আপোষহীন ব্রতধারী—তার জ্ঞাননিষ্ঠা তাকে অতন্দ্র করুক. অথচ-অজানাকে জানার আগ্রহ তাকে বিনীত করুক সে মানুষ যেন স্বকর্মে বিজ্ঞান নিষ্ঠায় দীর্ঘজীবন লাভ করে—তার রোগচিকিৎসা যেন সহজলভ্য হয়। সেই অজস্র মানুষ যেন অসংখ্য অগণিত প্রদীপশিখার মত কাল থেকে কালান্তরে স্রোতের দীপের মত জ্বলতে জ্বলতে জানা থেকে অজানা পথে এগিয়ে চলে—গোপাল হালদারের এই Common man-এর স্বপ্ন সত্য হ'ক—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই অনন্য-সাধারণকে অনন্যকে প্রণাম করি।

"সমাপ্তিরিয়ং শুভায় ভবতু সুখায় ভবতু শিবায় ভবতু" ওম্ শান্তিঃ।"

১০,১১ ৯৩-এ শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত গোপাল হালদারের স্মরণসভায় অরুণা হালদারের অনুপস্থিতিতে শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এই রচনাটি পাঠ করেন।

তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক

সোমনাথ লাহিড়ী

গোপাল-দা এবং উপস্থিত বন্ধুগণ, আজকে আমার বলবার ছিল, আজ বলতে পারছি না, খুবই দুঃখিত। ফলে একটা আমার যে কণ্ট গোপালদারও সে কণ্ট আছে, অর্থাৎ হাঁপ কণ্ট···

গোপাল-দা সম্বন্ধে আমার বলার অধিকারও নেই ক্ষমতাও নেই। আমি সাহিত্যের লোক নই, যোগ্যতাও নেই। ফলে ঐ সব মুস্কিল বিষয়ে আমি যাচ্ছি না। সে দেবেশবাবু বললেন, আরও অনেকে বললেন. অনেকে বলবেন ভবিষ্যতে। গোপালদা নিজেও কাজ করেছেন, করছেন, করবেন আশা করি আরো বহুদিন। আমি শুধু একটা জিনিস গোপালদার থেকে দেখেছি যা হয় তো আদৌ আমার বোধে ছিলো—সেটা হচ্ছে গোপালদা সম্বন্ধে আমার ধারণা হলো যে তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক। তাঁর সাহিত্যকীর্তি এতদিন পরে এসে 'রূপনারাণের কূলে' সরকারী স্বীকৃতি পেল সেটা কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু তিনি যে একটা প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিতে আসলেন তাতে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি আমার মতে, একটা দুর্মূল্য জিনিস লাভ করলো। কারণ একথা বলতে আমার কোনো সংকোচ নেই যে কমিউনিস্ট পার্টিতে আর যাই থাক, শিক্ষিত, মানে সত্যিকারের শিক্ষিত লোকের খুব অভাব। অনেক কমিউনিস্ট এ কথা বললে চটে যান তা আমি জানি। কিন্তু

সত্যি কথা বলা উচিত। আমাদের দৈন্য যদি আমরা অনুভব করি, তবেই সে দৈন্য কাটিয়ে উঠতে পারবো। আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেক সুশিক্ষিত লোক আছেন। সকল ব্যাপারে খবর রাখেন, জানেন। অনেক ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছেন, করেন।

গোপালদা একদিন রাগের মাথায় শনিবারের চিঠির সম্পাদক সম্বন্ধে বলে ফেললেন (প্রাইভেটলি অবশ্যি) আরে তুই দেশের Flora জানিস না Fauna জানিস না, তুই তাহলে লিখবি কি-রে দেশ সম্বন্ধে! কথাটা খাঁটি। দেশকে যদি সমস্ত দিক দিয়ে, সমস্ত এ্যাঙ্গেল দিয়ে (মাপ করবেন ইংরেজী শব্দের জন্য) জানা না যায়, চেনা না যায়, তাহলে সে মানুষ শিক্ষিতও হয় না এবং হতেও পারে না।

গোপালদার মধ্যে আমি সেই সব জানবার আগ্রহ শুধু নয়, অপরিসীম ক্ষমতা দেখেছি। এমন কি অত্যন্ত অবান্তর বিষয়, যেমন ধরুন একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। এইটা বলে আমি শেষ করব। আর বেশি বলব না। আমি এক-সময় একটা গল্প. গল্পের নায়কের জন্যে—একটা ঐতিহাসিক নায়কের নামটা খুঁজছিলাম, ঘটনাটা এই—খুব ছেলেবেলা স্কুলের বইতে পড়েছিলাম একটি গল্প। তাতে লেখা ছিলো,—একজন বিখ্যাত সুধী, তিনি ছেলেবেলায় ক্রীতদাস ছিলেন। একদিন তাঁর প্রভু তাঁর জানু ধরে উপরে ওঠানো আর নীচে নামানো এই করতে আরম্ভ করলেন। তাতে সেই বালক সুধী তাঁকে বললেন—ও-রকম করবেন না। তাহলে আমার জানু ভেঙে যাবে। অনেকক্ষণ পরে তাঁর জানু ভেঙে গেল। তখন তিনি বললেন—আমি তো বলিয়াই ছিলাম আমার জানু ভাঙিয়া যাইবে! এই যে দাস্যতাপরায়ণ দার্শনিকতা—যা সেই বিখ্যাত সুধী দেখিয়ে গিয়েছিলেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা গল্প লিখতে চাচ্ছিলাম আমার নায়ককে নিয়ে। কিন্তু খুব ছেলেবেলায় পড়েছিতো, কিছুতেই সে সুধীর নাম আর আমার মনে আসছে না! তো পরিচয়ের আড্ডায় একদিন বসেছিলাম—তখনকার দিনে—আগে—অনেক সুধী তখন পরিচয়ে আসতেন। আজকালকার কথা জানি না। বেশ শিক্ষিত শিক্ষিত লোকও আসতেন। তাঁদের একদিন আমি বলেছিলাম যে দেখুন, কিছুদিনের জন্যে পার্টি থেকে সাসপেন্ড হয়ে পরিচয়ে আড্ডা দিতে আসি। তো আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই সব সুধীবৃন্দকে যে আচ্ছা এই লোকটির নাম বলতে পারেন? কেউ জবাব দিতে পারলেন না। এমন সময় গোপালদা এলেন।

গোপালদাকে আমি আমার সমস্যার কথাগুলো বললাম—গোপালদা এই হ'ল কথা, আমি খুব সংকটে পড়েছি, আমি গল্পটা লিখতেই পারছি না। এই লোকটির নাম বলতে পারেন? গোপালদা বললেন—এরিকডেটাস। একেবারে ভাবতে হলো না, চিন্তা করতে হলো না বলে দিলেন। আমি বললাম—বিশ্ববিখ্যাত সুধী না হলেও গোপালদা কিছু কম যান না। যেমন সজনীকান্তকে Flora, Fauna শেখাতে পারেন, তেমনি অনেক গ্রীক ইতিহাসের ভক্তকে এরিকডেটাস শেখাতে পারেন। আবার কৃষক আন্দোলনের খুঁটিনাটি, ফ্লাড কমিশনের রিপোর্ট কি করে তৈরী করা যায়, তারজন্যে সমস্ত খুঁজে পেতে সেই মশলা তৈরী করা খুব কম কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলো না, যা গোপালদা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে সম্পাদন করেছিলেন। তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোথায় এরিকডেটাস, কোথায় Flora, Fauna আর কোথায় কৃষক আন্দোলন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কাজ করতে পারেন। সেই রকম জ্ঞান তাঁর আছে, আর সেই রকম জ্ঞানী একজনকে আমরা পেয়েছি বলে আমরা গর্বিত। এবং আমরা আজকে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন, তাতে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করবো যে গোপালদার—তাঁর সেই শিক্ষার ছিঁটে-ফোঁটা পেয়ে আমাদের মতো অশিক্ষিত লোকের বা অল্পশিক্ষিত লোকের উপকার হয়। গোপালদাকে এবং আর সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি শেষ করছি।

'সীমান্ত' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত

গোপাল হালদার ঃ ৫৬ বছরের স্মৃতি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয় কম্যুনিস্টদের দেশপ্রেম বিষয়ে লিখেছিলাম যে, আজ যদি কলকাতায় কেউ বাস্তবিকই 'স্বদেশী'-র 'পাঠ' নিতে চায় তো তাকে যেতে হবে এস্-এস্-কে-এম্ হাসপাতালে। যেখানে রয়েছেন তিন নবতি-অতিক্রান্ত দেশব্রতী—গণেশ ঘোষ, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল হালদার। বলা বাহুল্য তিনজনই কম্যুনিস্ট, প্রায় আজীবন কায়মনোবাক্যে কম্যুনিস্ট কর্ম-প্রয়াসে লিপ্ত। তর্কশাস্ত্রের নিরিখে আমার কথাটা টিকতে পারে কি না জানি না। কিন্তু আমার মনে অন্তত অহংকারের অবধি নেই যে আমাদের সেরা দেশভক্তদের মধ্যে কম্যুনিস্টের সংখ্যা আর তাদের অবদানের মর্যাদা মিথ্যাচার বিনা অস্বীকার করা চলে না। তাই ভালো লেগেছিল যখন আমাদের মধ্যে সর্ব অর্থে সর্বজনপ্রিয় গোপাল হালদার মহাশয়ের জীবনান্তের পর রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য পবিত্র সরকার লেখেন ঃ "তোমার বিশ্বাস আর নিষ্ঠার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যেন সবাই পেতে পারি"।

সুপরিণত বয়সে গোপালবাবুর মৃত্যু হয়েছে। জন্ম হলে মৃত্যু যখন অবধারিত, পঞ্চভূতে গড়া মানুষের পঞ্চভূতেই ফিরে যাওয়া যখন অবাধ্য নিয়তিরই নির্দেশ, তখন নবতিবর্ষপূর্তির পরও বেঁচে থাকা তো নিতান্ত সাধারণ ঘটনা নয়। আর গোপালবাবু তো জীবনান্তের অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত শারীরিক দিক থেকে পরিপূর্ণ

সচল না থাকলেও সমকালীন নানা ব্যাপারে তাঁর চিন্তাকে সুস্পস্ট আর সঙ্গে সঙ্গে সৌষ্ঠবমন্ডিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। এমন বহু গুণান্বিত অথচ সহজ সরল সৌম্য সজ্জনকে হারাবার দুঃখ তাই কম নয়। তাছাড়া যাঁরা সাহিত্য-শিল্পজ্ঞানচর্চাক্ষেত্রে প্রগতির ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছেন তাঁদের অন্তত দুই প্রজন্মের কাছে গোপালবাবুর উপস্থিতিই ছিল যেন একটা সক্রিয় প্রভাব। হয়তো একটু বাহুল্যদোষ ঘটে গেল, কিন্তু বলতে পারি যে তিনি আছেন আর সবাই যেন পর্বতের আশ্রয়ে, এই আমাদের স্বস্তি। এমন একটা অনুভূতি তাঁর জীবদ্দশায় সহজ ছিল। এই সান্ত্বনা থেকে তাঁর অন্তর্ধান আমাদের বঞ্চিত করেছে।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সেদিনের বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যখন যোগদান করি, তখন গোপালবাবু কারাগারে। বোধ হয় ১৯৩৮ সালে দীর্ঘ কারাভোগের পর তিনি বাইরে এলেন আর স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনে বিলম্ব হল না। তখনকার আনন্দবাজার পত্রিকার, বর্মন স্ট্রীটের নড়বড়ে অথচ বিস্তীর্ণ আস্তানায় তখন আমাদের যাতায়াত। মনে পড়ছে, দেখা হল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদকীয় কক্ষে গোপালবাবুর সঙ্গে। এককোণে সম্পাদক হেমচন্দ্র নাগ। হয়তো আর এককোণে ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন-এর মতো মনস্বী। সেখানেই গোপালবাবু জায়গা পেয়েছেন (আর ১৯৪১ সালের বাইশে শ্রাবণ লিখেছিলেন সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অবিস্মরণীয় শোকবার্তা)। তখনই জানতাম গোপালবাবু কম্যুনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছেন আর প্রচুর উদ্দীপনা নিয়ে কৃষক সভার কাজ কর্মে যোগ দিয়েছেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস মন্ডপেই মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, স্বামী সহজানন্দ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, এমনকি কংগ্রেসভুক্ত (এবং আজও জীবিত, আমার বন্ধু) অধ্যাপক রঙ্গ প্রভৃতির মিলিত উদ্যোগে সারা ভারত কিসান সভার পত্তন হয়। গোপালবাবুর মতো ব্যক্তি স্বভাবতই হলেন সেই তৃণমূল আন্দোলনের সম্পদ। তাঁর চিন্তা আর আবেগ, কর্মক্ষমতা ও নিয়মনিষ্ঠা, আর সর্বোপরি তাঁর স্বভাবমাধুর্য ও সৌজন্য সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতির পত্তনকালে (এবং তারপর বহুদিন ধরে) তাঁর সামীপ্য ও সাহচর্য আমার জীবনের এক মহার্ঘ স্মৃতি হয়ে থাকবে।

গোপালবাবু সম্বন্ধে সব কথা যথাসম্ভব বলতে গেলেও গোটা বই ফাঁদতে হয়। ভবিষ্যতে কেউ একাজের ভার নেবেন ভরসা করতে চাই। আমার পক্ষে কেবল বাছাই করা কয়েকটা কথা লিখে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

বিদ্যা আর বিনয়ের সম্মিলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন আমাদের গোপালবাবু। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে গবেষণা ছেড়ে হয়তো আসতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তখন, সেই প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে, (এবং বিশেষ করে সমাজবাদ–সাম্যবাদী আন্দোলনের অভ্যুত্থানকালে) সত্যই যে "জননীর দ্বারে ওগো অই / শুনো গো শঙ্খ বাজে"—ধরণের পরিস্থিতি। গোপালবাবুর মতো কৈশোর থেকে 'স্বদেশী' করা মানুষের পক্ষে বিদ্যায়তনের মায়া অনেকটা কাটিয়ে সেদিনের উদ্দীপনাময় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু নিজের স্বাভাবিক প্রতিভাকেও রুদ্ধ করার প্রবৃত্তি তাঁর হয়নি, এবং সেজন্যই বোধ হয় ১৯৩৮ সাল নাগাদ সময়ে আমরা বিস্ময় আর আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ হতে দেখলাম তাঁর লেখা "একদা"। পরবর্তী দুই খন্ডের কথাও বাংলা সাহিত্যের কাহিনীতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, কিন্তু "একদা" ছিল (এবং থাকবে) এক অনন্য সৃষ্টি। বেশি কথা গুছিয়ে বলার সম্ভাবনা এখন আমার নেই, তাই শুধু বল্‌ব যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই সুবিদিত আর সঙ্গে সঙ্গে কালোচিত বিপ্লবী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ এই মানুষটিকে আমাদের আন্দোলন (এবং আমরা অনেকে) পরম সমাদরে গ্রহণ করল। প্রগতি লেখক সংঘের জন্মকালে তিনি (১৯৩৬) ছিলেন কারাবাসী। তাই যখন ৪৩–৪৪ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পিসংঘের উদ্ভব তখন গোপালবাবু তার প্রধান নেতা। বহুগুণান্বিত এবং সর্বতোভদ্র এই মানুষটি যে আন্দোলনের কত বড় সম্পদ তা সবাই সমানভাবে না বুঝলেও আমরা অনেকেই জানি ও উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত নই। আমার কষ্ট হয়েছিল যখন কম্যুনিস্ট পার্টি দফ্‌তরে তাঁর প্রাণহীন দেহে মাল্যদান করতে যাই তখন (জিজ্ঞাসার জবাবে) জানতে পারি যে পার্টির প্রধান অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেন নি। বর্তমান যুগে যখন নিমেষের মধ্যে টালা থেকে টিম্বকটু চলে যাওয়া পার্টি নেতাদের পক্ষে খুব দুরূহ নয়, তখন দিল্লি থেকে কলকাতা আসাটা কঠিন হল কেমন করে?

১৯৪৮–৪৯ সালে বেশ কয়েকমাস গোপালবাবুর সঙ্গে কারাবাস করেছি। বেশ মনে আছে, জেলে ঢুকে বলেছিলেন যে বুঝি এ–যাত্রা আর বেরোনো হয়ে উঠবে না। আশ্চর্য নয়, কারণ তখন আমাদের 'নারা'—"য়ে আজাদী ঝুটা হায় ভুলো মৎ ভুলো মৎ" আর "য়ে সরিগলি সরকারকো এক ধক্কা অওর দো"—ছিল এমন যে শত্রুপক্ষের প্রসন্নতার ওপর বিশেষ ভরসা ছিল না। শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা গোপালবাবুর সর্বদাই ছিল, কিন্তু তার দরুণ হাসিখুশি ভাব কখনও হারিয়ে

ফেলেননি। একবার জেলের ডাক্তার অনিচ্ছুক আমাকে পরীক্ষা করে যখন রায় দিলেন যে রক্তের চাপ একটু বেশির দিকে, তখন গোপালবাবুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল ঃ "আরে, হীরেন মুখুজ্জের ব্লাড প্রেসার কি 'হাই' না হয়ে 'লো' হতে পারে।" শরীরটা তাঁকে আজীবন বেশ ভুগিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু পরিণত বয়সে সে-যন্ত্রণাকে ততটা আমল দেন নি বলে মনে হয় (এজন্য সম্ভবত শ্রীমতী অরুণা হালদারকেই ধন্যবাদ দিতে হয়)। কতবার কত উপলক্ষে নিজেকে নিয়ে উপহাস করেছেন গোপালবাবু। বলেছেন আজীবন "অনেক হেসেছি আর আর অনেক হেঁচেছি!" যে বাক্‌পটুতা নিয়ে তরুণ বয়সে "শনিবারের চিঠি"-র শনিচক্রে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন, তা জীবনান্ত পর্যন্ত এই মানুষটির সম্পদ ছিল। শনিচক্রের উল্লেখে মনে পড়ল যে স্বনামধন্য নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর কোনো একটি প্রবন্ধে তদ্বিষয় উত্থাপন করে গোপালবাবুকে "প্রয়াত" বলে অভিহিত করেছিলেন। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমাদের গোপালবাবু বুঝি বলেন ঃ "নীরদবাবু দুনিয়ার এত বিষয়ে এত কিছু জানেন যে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব-এর খবর নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই!"

লেখকশিল্পীদের সঙ্গে পার্টিকর্ম ব্যাপদেশেই আমাকে যোগাযোগ রাখতে হত বহু বৎসর ধরে। আর স্বাভাবিকভাবে গোপালবাবুর সঙ্গে তো বটেই। জাত লিখিয়ে হলে এ বিষয়ে হয়তো সরস আর সরেস কিছু রচনা লিখতে পারতাম, কিন্তু তা সাধ্যাতীত (হয়তো কিছু পরিমাণে বিপজ্জনকও বটে!) যাই হোক্, সংহতি আর সংস্থার বাইরে থেকে কাজ করা অসার্থক জানলেও আমার মধ্যে একাকিত্বের একটা উপাদান সর্বদা থেকে গিয়েছে। এ জন্যই মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে, সাহিত্যশিল্প ব্যাপারে আমার রুচি একটু-আধটু গন্ডগোল ঘটাবার আশঙ্কা রেখেছে। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ নিয়ে বিবিধ বিতর্ক (এমনকি বিষ্ণু দে-র মতো গরীয়ান্ কবি বিষয়ে দ্বিধা) থেকে থেকে সামান্য অপ্রসন্নতা ঘটিয়েছে আর স্বভাবত সংবেদনশীল লেখকমহলে তার ঢেউ উঠেছে। গোপালবাবুকে কিন্তু কখনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য ও চিত্তপ্রসাদ হারিয়ে ফেলতে দেখিনি। আপাদমস্তক সাহিত্যিক ছিলেন গোপালবাবু—এটা তাঁর বিপ্লবী সত্তারই প্রকাশ ছিল—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় কখনও তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে বা ইঙ্গিতে অসূয়ার চিহ্নমাত্র লক্ষ্য করিনি। পরশ্রীকাতরতা তো তাঁর ক্ষেত্রে চিন্তনীয় নয়। নিজের জীবনদর্শন অনুসরণে সাহিত্য শিল্পকীর্তির সম্ভাবনা কিয়ৎপরিমানেও ক্ষুন্ন হয়েছে বা হতে পারে বলে

তাঁর মনে কাঁটা লাগেনি। কী বিচিত্র ও মাঝে মাঝেই গভীরতাস্পর্শী তাঁর সাহিত্য কৃতি। অস্বীকার করব না যে তাতে সর্বদা আমার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল না। কিন্তু এ তো নিঃসংশয় বিবিধ বিষয়ে তাঁর রচনা একটা যুগের প্রতিভূ হয়ে থাকবে আর বাংলা ভাষা ও ভাষাভাষীদের পক্ষে গোপালবাবুর কীর্তিকে বিস্মৃত হতে বহুকাল লেগে যাবে।

এবিষয়ে নিজে লিখতে পারছি না, সময় আর সাধ্য আর মেজাজ খুঁজে পাচ্ছি না বলে। কষ্ট হয় ভেবে যে চিন্মোহন স্নেহানবিশ অকালে না চলে গেলে এবিষয়ে (এবং গোটা 'মানুষ' গোপালবাবু সম্বন্ধে) লিখতে পারতেন অনবদ্য তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। আমি জানিনা শ্রীমতী উমা স্নেহানবিশ এ কাজটি এখন পারবেন কিনা। বলছি এজন্য যে প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের সকলের বুকে হঠাৎ দাগা দিয়ে দিলীপ বসু যখন চলে যান তখন উমা দিলীপকে নিয়ে ভারি সুন্দর একটি লেখা প্রকাশ করেছিল। যাইহোক্, গোপালবাবুকে ভালো বেসেছেন অনেকেই। তাদের মধ্য থেকে যথাযোগ্য রচনা নিশ্চয়ই ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

আমার প্রয়াত বন্ধু ও ভারতবিখ্যাত তবলচি হীরেন্দ্রকুমার ('হীরু') গাঙ্গুলির কাছে শুনেছিলাম তাঁর সঙ্গীতবিশারদ পিতার উপদেশঃ "গুণীরা গুণগ্রাহী হবে, দোষগ্রাহী হবে না।" শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম কী মনোহর এই কথাটি! ছিদ্রান্বেষণ মহৎ ব্যক্তি–সমেত সকলের ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষকে জানতে হলে তার ভালোর দিকটায় নজর রাখা সবচেয়ে দরকার। একেবারে অপাপবিদ্ধ মানুষ আমাদের এই হাসিকান্নায় ভরা মর্ত্যজগতে কল্পনীয় নন। বাস্তবে তো কথাই নেই। কালেভদ্রে যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের মধ্যে গোপালবাবুর মতো মানুষ অবশ্য দেখা যায় যাঁর নিন্দুক খুঁজতে দিনের আলোয় লণ্ঠন হাতে নিয়ে খুঁজেও ব্যর্থ হতে হবে। হয়তো আমি অনেক কিছু জানি না। হয়তো গোপালবাবুকে 'অজাতশত্রু' বলে আমার বর্ণনায় কিছু ভ্রান্তি আছে। কিন্তু আমি অন্তত ভাবতে পারি না গোপালবাবু সম্বন্ধে কেউ 'ভালো মানুষ' ছাড়া অন্য কোনো একটা বর্ণনা দিতে পারে। 'ভালো' হওয়ার চেয়ে বড়ো আর কি আছে আমাদের এই জগতে! গোপাল হালদার চলে গিয়ে আমাদের অনেককেই বেশ খানিকটা নিঃস্ব করে গেছেন।

গোপাল হালদার স্মরণে

কবীর চৌধুরী

একজন অসাধারণ মানুষ চলে গেলেন। গোপাল হালদান ছিলেন নানা দিক থেকে অসাধারণ।৪ ছেলেবেলায় পড়াশোনা করেছেন নোয়াখালীর স্কুলে। বাবা সীতাকান্ত হালদার সেখানে ওকালতি করতেন। গোপাল হালদারের কলেজের পড়াশোনা কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। ১৯২২ সালে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ বি. এ পাস করেন, '২৪শে এম. এ. এবং ২৫শে বি. এল। বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উপর গবেষণা করতে শুরু করলেন। ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত সে কাজেই ব্রতী ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তবে গোপাল হালদার শুধু বিদ্যানুরাগী এবং ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিবেদিতচিত্ত দেশপ্রেমিক এবং বৈপ্লবিক চিন্তা ও মতাদর্শের ধারকও। কিশোর বয়সেই তিমি যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তারপর ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস কমিটি, কৃষক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ তারপরও অবশ্য অব্যাহত থাকে।

গোপাল হালদার যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের উপর গবেষণা

কাজে নিয়োজিত তখন বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। প্রায় ছ'বছর তিনি কারাজীবন যাপন করেন। জেলে বসেই তিনি তাঁর গবেষণা কাজ শেষ করেন।

সাহিত্যচর্চা, সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ যেখানেই গোপাল হালদার নিজেকে যুক্ত করেছেন সেখানেই তিনি তাঁর প্রগতিশীল মানবতাবাদী ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি সে যুগের বিখ্যাত পত্রিকা প্রবাসী-র সহকারী সম্পাদক হন, ২৯–৩০ সালে তিনি ফেনী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত থাকেন '৩৭ সালে জেল থেকে বেরিয়ে ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজি সংবাদপত্র হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডর্ড-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন এবং ১৯৪৪ সালে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী প্রগতিশীল সাহিত্য-পত্রিকা পরিচয়-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এই সারাটা সময় সাম্যবাদের প্রতি তাঁর কমিটমেণ্ট বাড়ছিল, লেখালেখির কাজেও তিনি ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা জানি যে ১৯২৭–২৮ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন শক্তি অর্জন করতে শুরু করে। শ্রমজীবী মানুষের শোষণ-নিপীড়ন সম্পর্কে স্পর্শকাতর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠে, অনিবার্যভাবে গোপাল হালদারের উপর এর প্রভাব পড়ে। আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাইতেও তাঁর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে উপরোল্লিখিত প্রভাব পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তোলে। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ আমরা গোপাল হালদারকে একজন চিন্তাশীল গবেষক, প্রবন্ধকার, উন্নতমানের সাহিত্য সমালোচক ও ব্যতিক্রমী ধারার সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখি।

দুই খণ্ডে রচিত বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃতির রূপান্তর এবং বৈদগ্ধ-মণ্ডিত আলোকসঞ্চারী বহু প্রবন্ধ গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর পারঙ্গমতার পরিচয় দেয়। সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস একদা, আর একদিন ও অন্যদিন এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে প্রায় একশো বছরের কাল পরিধিকে ধারণ করে রচিত সাগাধর্মী উপন্যাসমালা ভাঙন, (ভাঙনী কূল), স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা, ভূমিকা, নবগঙ্গা, জোয়ারের বেলা,

উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথ ও ১৩৫০ তাঁকে এমন একটা আসনে বসিয়েছে, যার সঙ্গে তুলনীয় আর কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত ভূমিকা, নবগঙ্গা ও জোয়ারের বেলার ঘটনাকাল ১৮৫৭ সাল থেকে উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধে। '৪৭ থেকে '৫০ সালের মধ্যে প্রকাশিত ভাঙন ভাঙনী কূল, স্রোতের দীপ ও উজান গঙ্গার ঘটনাকাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নানা সামাজিক অবক্ষয়-বিপর্যয় ও মন্বন্তরপীড়িত বাংলার ছবি তিনি এঁকেছেন উনপঞ্চাশী পঞ্চাশের পথ ও ১৩৫০ নামক তাঁর তিনটি উপন্যাসে। তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে হয়ত অনেক সময় একজন নিবেদিতচিত্ত সাহিত্য-শিল্পীর চাইতে একজন রাজনীতিমনস্ক বিশ্লেষণপ্রবণ সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পেয়েছে। একথা বহুলাংশে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েও কিন্তু বলতে হবে যে গোপাল হালদার এই সব উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের সীমানাকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁর মধ্যে এক স্বল্পলভ্য বৈদগ্ধের আবহ নিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায়ের দু' খণ্ডে বিভক্ত বিশাল এপিকধর্মী উপন্যাসমালা সত্যাসত্য ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস অন্তঃশীলা, আবর্ত ও মোহনার নামও অবশ্য স্মর্তব্য।

সৃজনশীল সাহিত্যিক গোপাল হালদার ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বিশেষ প্রিয় তাঁর একদা, আর একদিন ও অন্যদিন-এর জন্য। এর মধ্যেও একদা আমাদের অসম্ভব আলোড়িত করেছিল যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে আমি ওই উপন্যাসটি এক বৈঠকে মুগ্ধ হয়ে পড়ে ফেলি। আজও একদা-র আবেদন আমার কাছে অম্লান। বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, চরিত্র চিত্রণ সব দিক থেকেই একদা নিঃসন্দেহে একটি উচ্চমানের সৃষ্টি। জেমস জয়েস-ভার্জিনিয়া উলফের চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহরীতি অনুসরণ করে একদা রচিত। নায়ক অমিতের একটি দিনের ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে। তাঁর আত্মকথন, আত্মবিশ্লেষণ ও অন্তর্মুখী ভাবনার মধ্য দিয়ে আমরা আরো অনেকের সঙ্গে পরিচিত হই, সমকালীন দেশ-সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত হই এবং একই সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রগাঢ় হৃদয়াবেগের। একদা-তে অমিতের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে আমরা গ্রন্থের একাধিক চরিত্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসি, বিশেষ করে ইন্দ্রানীর। তবে একজন জীবনবাদী মানবদরদী অন্তর্মুখী চিত্তের অধিকারী তরুণ বুদ্ধিজীবী অমিতের চরিত্রাঙ্কনেই গোপাল হালদার তাঁর শিল্পদক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

গোপাল হালদারের প্রয়াণ বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনকে দরিদ্র করল। সাহিত্যিক গোপাল হালদার ও মানুষ গোপাল হালদার উভয় পরিচয়েই আমরা তাঁকে চিরকাল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করব।

---

* ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শিক্ষাবার্তা'-র (নভেম্বর ১৯৯৩) সৌজন্যে।

কয়েদির আকাশ

শঙ্খ ঘোষ

লেখার জগতে বাঁধাধরা কিছু ছাঁচ আছে। অল্পবয়স থেকে আমাদের মাথায় ঢুকে যায় সেটা। কেউ যদি তার বাইরে চলে যান কখনো, সঙ্গে সঙ্গে অনেকরকমের কৈফিয়ত বুনে দিতে হয় তাকে। এটা কি প্রবন্ধ? এটা কি উপন্যাস? এটা কি নাটক? প্রচ্ছন্ন এই প্রশ্নটা মনে রেখে একজন পড়তে বসেন কোনো লেখা, প্রতিটি ছাঁচের বিষয়েই একটা সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে মনে তৈরি থাকে, পড়তে পড়তে সেই ছাঁচের সঙ্গে তিনি মেলাতে থাকেন লেখাটাকে। না-যদি মেলে একেবারে? পাঠক তা'হলে একটু বিব্রতই হন, তাঁকে বিড়ম্বিত করা হয়েছে বলে লেখকের উপর হয়তো-বা একটু বিরক্তও হন, কিন্তু তবু প্রায়ই লেখকেরা ভেঙে দিতে চান সেই ছাঁচ, নিজের খুশিমতো যে-কোনো পদ্ধতিতে সাজাতে থাকেন তাঁদের কথাগুলি।

তবে অনেকেই, নিজের সেই খুশিমতো পথে চল্‌বার সময়েও, কৈফিয়তের কথাটাও একবার বলে নেন সঙ্গে! যেমন আছে গোপাল হালদারের 'স্বপ্ন ও সত্য' বইটিতে। কখনো কখনো এই লেখক তাঁর মনকে ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে বল্গাহীন 'আড্ডা'য়, 'বাজে লেখা'য়, আর তখন, তাঁর নিজেরই ভাষায়, 'বইয়ের আলো না খুঁজে মন বয়ে চলেছে আপনার নিয়মে, আপনার রীতিতে, আপনার গতিতে', যুক্তিক্রমে না এগিয়ে কথাগুলি ছুটেছে 'মনের ধারা'য়, গোটা লেখাটা হয়ে উঠেছে কোনো স্বগতোক্তির মতো। সেজন্য তাঁকে কৈফিয়ত তৈরি করতে হয়

বইয়ের নামের মধ্যেই, নাম বলতে হয় 'বাজে লেখা' (পরে যার রূপান্তর হবে 'স্বপ্ন ও সত্য'), তার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় 'বাজে কথা', যেমন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটিতে। মনের পথচলার একটা ছবি পাওয়া যায় এসব লেখায়, নানারকমের ভাবনা আর অনুভবের স্রোত চলতে থাকে, আর পাঠকও যদি নিজেকে সেখানে ছেড়ে দেন সহজে, একটা সজীব মনের সজীব হৃদয়ের সান্নিধ্যে তিনি থাকতে পারেন কিছুক্ষণ। এসব লেখার বেশ কয়েকটি গোপাল হালদার তো লিখেছিলেন প্রায় ষাট বছর আগে, তাঁর প্রথম কারাজীবনের দিনগুলিতে। বাংলায় এমন লেখার যে একেবারেই কোনো চলন ছিল না তখন, তাও নয় ; তবুও দেখি পাঠকের কাছে লেখককে অনেকখানি ভূমিকা করে নিতে হয় "সূচীপত্র" নামের একটি গদ্যলেখায়, এমনকী তারও আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত 'নিবেদন'-এর এই কথায় যে 'এ জাতীয় লেখারই বিদেশী নাম "বেল লেত্‌র্‌স" আর স্বদেশী ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত"।'

কিন্তু ওসব বইয়ের নাম বা রীতির নাম বললে যে খুব-একটা নিস্তার পাওয়া যায় তাও নয়। তখন বরং দেখা দেয় আরেকরকমের সংকট। অনেকে তখন পুঁথিপত্র মিলিয়ে দেখতে শুরু করেন কাকে বলে 'বেল লেত্‌র্‌স', কী কী তার কাছে আশা করা যায়, ইওরোপ-আমেরিকায় যাঁরা ও-রীতিতে লিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে ঠিক ঠিক সাযুজ্য হলো কি না এর, এমন হাজার হিসেব উঠে পড়ে তখন। প্রতিটি লেখাকেই যে তার নিজস্ব দাবিতে আর নিজস্ব প্রকৃতিতে দেখা সম্ভব আর সংগত, সেই বোধটা আজও পর্যন্ত আমাদের গড়ে উঠল না জেনেই হয়তো এত ইতস্তত করেন লেখকেরা, আর কোনো-না-কোনো পুরোনো কাজের সঙ্গে গোত্রবন্ধ করতে চান তাঁদের লেখাকে। 'স্বপ্ন ও সত্য' বইতে "সূচীপত্র" প্রবন্ধে গোপাল হালদার যখন লিখছিলেন যে '···এতে ধারাবাহিক আলোচনা নেই, একটা সুসম্বন্ধ কাব্য-জিজ্ঞাসা নেই, এমন কি কোনো উত্তরই নেই সেই পুরোনো প্রশ্নের—লেখা কি, স্বপ্ন না সত্য, কি দিয়ে তার পরিচয়, কেন লেখা হয় বাজে লেখা'—তখন সেই 'নেই'-পরিচয়টাকেই বলা যেত পাঠকের পক্ষে যথার্থ চলবার পথ, স্বস্তির পথ। কিন্তু সেইখানে না থেমে "নিবেদন"-অংশে 'বেল লেত্‌র্‌স' আর 'পঞ্চভূত'-এর প্রসঙ্গটা তুলে এনে আবার একটা রুদ্ধতাই যেন তৈরি করে দেন এর লেখক।

পাঠকের অবশ্য এই স্বাধীনতা আছে যে সে-রুদ্ধতাকে তিনি ভেঙে দেবেন। 'স্বপ্ন ও সত্য' বইতে যেমন নিজের খুশিতে হালকা চালে মন চলেছে বা কলম চলেছে লেখকের, 'পঞ্চভূত'-এর কথা কিছুমাত্র না ভেবে পাঠকও তেমনিভাবেই

দেখতে পারেন এর লেখাগুলিকে, সেটা কী ধরণের লেখা তার হিসেব নেবার যেন কোনো দরকারই নেই তাঁর, অভ্যাসের কয়েদ থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে করলেই তিনি দেখতে পারেন খানিকটা 'কয়েদির আকাশ'।

২

'রূপনারানের কূলে'র দ্বিতীয় পর্বটি শেষ হয়েছিল এইভাবে ঃ '...এমন সময়ে সেই এপ্রিলের প্রত্যূষে (২৪ এপ্রিল ১৯৩২) পরোয়ানা নিয়ে এসে গেল পুলিশ—আমার যৌবন পেল রাজটীকা।' গোপাল হালদারের পাঠক মাত্রেরই নিশ্চয় মনে পড়বে যে ঠিক একইভাবে শেষ হয়েছিল 'একদা' উপন্যাসটিও, তারও পরিণামে '...ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নূতন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে। ততক্ষণে সবুট পদধ্বনি দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গেল।' ১৯৩০ সালের একটা দিন হিসেবে, ডিসেম্বরের একটা দিন।

পুলিশ তো ধরল এদের। কিন্তু তারপর কী হলো, গোপাল হালদারের বা অমিতের?

ঠিক এইখানেই, এই 'বা' শব্দটার প্রয়োগ থেকেই অন্য এক সমস্যার শুরু হয়ে যায়। এক হিসেবে এই দুজনকে কি একেবারে একাকার করে নিচ্ছি আমাদের মনে? অমিতকে কি গোপাল হালদারই ভাবছি? গোপাল হালদারকে অমিত? আত্মজীবনের খানিকটা চিহ্ন থেকে যায় যেসব লেখায়, সে-লেখা নিয়ে এ-সংকটটা সবসময়েই ঘটতে থাকে, লেখকের সঙ্গে চরিত্রের একটা সহজ সমীকরণের প্রবণতা এসে যায় পাঠকের মনে। লেখকেরাই হয়তো তার দু-একটা সুযোগ করে দেন, 'ত্রিদিবা'র লেখকও যে তেমন সুযোগ আমাদের অল্পস্বল্প দেন না এমন নয়। এখানে কারাবরণ করবার অভিজ্ঞতাগুলি শুধু নয়, কারাবাসের সময় নিয়েও চরিত্রের উপর লেখকের প্রক্ষেপ ঘটতে দেখি অনেকসময়ে। 'অন্যদিন' পর্বে যখন মুক্তির পথে এসে পৌঁছচ্ছে অমিত, দীর্ঘ দিনরাত্রির নিশ্চল প্রতীক্ষার পর তার মনে হচ্ছে তখন '...এক-একটা দিনই এখন এক-একটা পরীক্ষা। ছয় বৎসর যেন ইহারই প্রস্তুতি। ছয় বৎসরের চাপা-পড়া আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা অবশেষে দিন ও প্রহরের হিসাবে আসিয়া পৌঁছিতেছে।' উপন্যাসটির নিবেদনে বলা হয়েছিল যে এর ঘটনাকাল ১৯৩৭-৩৮। একদিনের ঘটনাকালকে দুবছর ব্যাপ্ত করে বলবার কারণ নিশ্চয় এই যে স্মৃতির প্রক্ষেপে পুরোনো অনেকটা সময় উঠে আসছে রচনায়, মুক্তিদিনটাকে আমরা তাই ১৯৩৮ সালের কোনো দিন বলেই গণ্য করতে পারি।

আর গ্রেপ্তার তো হয়েছিল অমিত ১৯৩০ সালে। 'আটাশে অগ্রহায়ণ, তেরোশো সাঁইত্রিশ সাল'-এর ভোরবেলা থেকে শুরু হয়েছিল 'একদা'র দিনটি। তাহলে সাত-আট বছরে ব্যাপ্ত না হয়ে অমিতের দিনরাত্রির নিশ্চল প্রতীক্ষা কেন হলো ছ-বছরের? তার একটা অবচেতনগত কারণ কি এই নয় যে প্রথম পর্বে ঠিক ছ-বছরেরই ছিল গোপাল হালদারের নিজস্ব কারাজীবন? ১৯৩২ সালে জেলে পৌঁছে তার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি উনিশশো আটত্রিশে, সে-কথাটা এখানে আমাদের মনে পড়তে পারে। আবার, অবচেতনের উল্টোরকম এক কৌতুক দেখতে পাব 'একদা'র প্রথম দুই সংস্করণের এক মুদ্রণগত ত্রুটিতে। জেলে যাবার পর অসুস্থ অবস্থায় লেখাটি শুরু করেছিলেন গোপাল হালদার, ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে। কিন্তু ছ-বছর পর এর মুদ্রণকালে তিনি লিখে বসেন ঃ 'গ্রন্থখানা লেখা হইয়াছিল রোগশয্যায় প্রেসিডেন্সী জেলে, ১৯৩০ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।' দুটি সংস্করণ জুড়ে ভুলটি চলবার পর এর সংশোধন এল তৃতীয় সংস্করণে ঃ '...এই গ্রন্থের রচনাকাল "১৯৩০" লেখা হয়। আসলে "১৯৩৩" হইবে।' 'লেখা হয়' শব্দদুটি এখানে স্মরণযোগ্য। এই বিভ্রমটাকে লক্ষ্য করবার সময়ে আমাদের শুধু আরেকবার মনে পড়বে যে অমিতের প্রথম কারাবরণের সময়টাকে ভাবা হয়েছিল ১৯৩০ ('তেরোশো সাঁইত্রিশ') সাল।

কেবল এইটুকুই নয়। বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখবার ইচ্ছে বা এর সংস্কৃতির বিষয়ে অমিতের আগ্রহ আর আবেগ, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তাঁর ভালোবাসা, বাস্তব জীবনের সামনে দাঁড়িয়েও ভিতরে ভিতরে তার আদ্যন্ত রোম্যান্টিকতা, 'চার অধ্যায়' নিয়ে বিতর্কে তার রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে অপ্রতিবাদী মন ঃ এইসব নানা সূত্র থেকেও কখনো লেখক আর তার চরিত্রকে অনেকটা ঘনিষ্ঠ বলে মনে হতে থাকে। কিন্তু তার ফলে যদি বইয়ের উক্তিবিশেষ লেখকেরও বিশেষ বক্তব্য বলে পাঠক ধরে নিতে চান, তাহলে খানিকটা সতর্ক করবার ধরণেই আমাদের লেখক কিন্তু জানিয়ে দেবেন ঃ 'কাজটা কতটা যথার্থ হয়, "একদা"-র পূর্বভূমিকায় তৃতীয় বক্তব্যে তাহা বলিয়াছিলাম'। কী বলেছিলেন সেই পূর্বভূমিকার তৃতীয় বক্তব্যে? বলেছিলেন যে 'গ্রন্থখানির ঘটনাবলী সত্য—উপন্যাসের ঘটনামাত্রই যে অর্থে সত্য।'

তাহলে, একে বিশেষ কোনো আত্মজৈবনিক চিহ্নে বাঁধতে চাননি গোপাল হালদার, উপন্যাসোচিত সত্যের চেয়ে ভিন্ন কোনো সত্যের খোঁজ নিতে বারণই করেছেন তিনি। এ-কথাটা বলে দেবার পর, লেখক আর তাঁর চরিত্রের কোনো

কোনো সর্বাঙ্গীণ সমীকরণ আমরা আর খুঁজব না নিশ্চয় এসব লেখায়। কিন্তু তবু, প্রায় একইভাবে এই দুজনের কাছে পুলিশের পরোয়ানা হাজির হবার পরে দুজনের প্রতিক্রিয়া একবার তুলনা করে দেখলে হয়তো দোষ হবে না। জেলে পৌঁছবার পর অমিতের যে কী হলো তার খানিকটা ছবি আছে 'অন্যদিন'-এর প্রথম অংশে, ছ-বছর পর (?) মুক্তি পাবার দিনটাতে তার কেবলই মনে পড়ছে বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতাগুলির স্মৃতি। বিছানা ছেড়ে গরাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অমিত, দৃষ্টি মেলে দেয় একবার 'প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া প্রাচীর ছাড়াইয়া বাহিরের ঝাউ-অশ্বত্থের দিকে, নবালোকিত নীল আকাশের বুকে।' আর এই আকাশ, এই সকাল, তার কাছে হয়ে ওঠে 'যেন বাঙালী মা', যেন কোনো স্নেহাশ্রয়, জাল বুনতে থাকে তার মন। সে-জালে গৃহজীবনের জেলজীবনের অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার ছবি, এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। কিন্তু, যে-মনের সামনে সেই ছবি, বন্দীদশায় সে-মন কীভাবে খুঁজে পেত তার মুক্তির আকাশ-টুকু, তার মনের আকাশ, সে-কথাটা সন্তর্পণে এড়িয়ে যায় অমিত। তার মনের সেই ভিতরকার অংশটা কীরকম হতে পারত সেটা জানবার জন্য আমরা পৌঁছতে পারি অন্যরকমের আরেকটা লেখায়, সে-লেখা হলো 'স্বপ্ন ও সত্য' বইয়ের "কয়েদির আকাশ"।

৩

'একদা'র সূচনায় অমিত যখন দেখছিল '…সম্মুখের নীচু বাড়ীখানার ওপারে তেতলার বাড়ীটির পূর্ব আকাশ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে', তখনো সে জানত না যে একদিনের ব্যবধানেই ফাঁকেফোকরে ওইরকম আকাশ-দেখাই হয়ে উঠবে তার অস্তিত্বের অনুভূতি, কেবল ওই দেখাতেই তার মনে হবে 'আমি আছি, পৃথিবী এখনো রয়েছে'। ছ-বছর (?) পর জেল থেকে ফিরে এসে 'অন্যদিন'-এর রাত্রিবেলায় সে দেখবে 'সেই তারা, সেই আকাশ' যার মধ্যে আছে একটা 'অসীম আহ্বান'—কেননা সে 'মানুষের আত্মীয়'। হয়তো চল্লিশ টাকা ভাড়ার আরেকটা ফ্ল্যাটের ছাদে ইন্দ্রাণীও এসে দাঁড়িয়েছে তখন ওইরকমই কোনো আকাশের নিচে, একই তারার সঙ্গে হয়তো দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে তাদের দুজনের, তারই ফলে যেন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে দুজনের দৃষ্টি। জেলজীবনেও, মরুভূমির বুকের উপরে এমনি করে তার দিকে তাকিয়ে থাকত রাত্রিশেষের তারা, মনে পড়ে অমিতের, 'অন্যদিন'-এর শেষে।

অমিতের কথা ওইটুকুই। কিন্তু এই আকাশটা অনেকখানি জায়গা পেয়ে যায় যখন গোপাল হালদারের স্বগতোক্তিতে সেটা ছড়িয়ে পড়ে তাঁর লেখায়, মন যেখানে 'ইচ্ছামত বয়ে চলেছে, উপল কুড়োতে চায় নি'। সে-লেখায় একফালি আকাশ দেখতে দেখতে তাঁর মন ছড়িয়ে পড়তে থাকে মানুষের জীবনে, প্রকৃতির জীবনে, সাহিত্যের জীবনে! কয়েদের মধ্যে আছেন বলেই কোনো নিরাশার চাপে একথা তখন ভাবতে হয়নি তাঁকে যে 'পৃথিবীর সমস্তটাই দেয়াল, সব হাজতখানা'। 'সেলের ভিতরে বসেও এমন ভুল আমার হত না। আর আকাশও জানি কেউ কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে পারবে না।' এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে এ আকাশ যেন আর কয়েদির আকাশ হয়ে ঘিরে ধরে না শ্বাস, আকাশের ওপারে আকাশ তখন টান দেয় মনকে, তখন বলা যায় 'থানার ফাঁকে দেখা ছোট্ট আকাশ চোখ ভরে পান করতাম'। প্রাচীর আর অন্ধকারকে বাইরের দিক থেকে সত্য বলে মেনেও গভীরতর সত্যে পৃথিবীকে আশ্চর্য বলে মনে হতে থাকে তাঁর, প্রত্যেক রোমকূপের মধ্যে পাওয়া যায় তার স্বাদ, বিস্ময়ে আর বিশালতায় মুগ্ধ চোখ নিয়ে তাকাতে ইচ্ছে করে অতীত-থেকে-ভবিষ্যতে-প্রবহমান জীবনের দিকে, মনে পড়তে থাকে নানাদেশের কবিদের প্রগাঢ় একাত্মবোধের কথা। যে-একাত্মবোধে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে লীন করে দেবার ইচ্ছে জাগে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হয় বাইরের জগৎকে, তার টানে তাঁর মনে পড়ে যায় ওয়ার্ডসওয়ার্থকে হাডসনকে, হাডসনের ভাষায় তাঁর বলতে ইচ্ছে করে: ওপরে নীল আকাশ, নিচে ধূসর মাটি ঘাস তরুলতা পশুপাখি বাতাস বৃষ্টি গ্রহতারা কিছুই আমার অচেনা নয়; তাদেরই থেকে আমি, তাদেরই মধ্যে আমি, তাদেরই সঙ্গে আমি এক হয়ে আছি; সভ্যতার বহির্বিকাশ এই একাত্মবোধকে ছিঁড়ে দিতে চায়, সভ্যতার ইতিহাসই যেন 'আকাশকে আড়াল করার ও দিগন্তকে আবৃত করার চেষ্টা'। কয়েদখানার তখন ভিন্ন একটা অর্থ দাঁড়িয়ে যায় আমাদের সভ্যতার ইতিহাস হিসেবে। আর তখন, আগের চেয়ে একটু ভিন্ন অর্থে যেন সমস্তটাকেই হাজত বলে ভাবা যায় এবার, কেননা 'ইমারতের আশ্চর্য বোলতার চাক'ও তো শেষ পর্যন্ত আকাশকে ঢেকে ফেলবারই চক্রান্ত। সেইজন্যে এখনই যে আমাদের আরো বেশি দরকার 'পৃথিবীর নিরাবরণ উদাস-করা ব্যাপ্তি', এইকথা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা সমসাময়িকের গণ্ডি থেকে নিজেকে বার করে আনেন এর লেখক, চলে যান একেবারে মানবপ্রকৃতির মূলগত ভাবনায়। সভ্যতার বিকাশ যতই বেশি প্রকৃতিকে আড়াল করতে চাইছে, প্রকৃতির জন্য ততই

বেশি গোপন টানের একটা অনুভব তৈরি হচ্ছে মানুষের, ততই বেশি সে জানতে চাইছে পেতে চাইছে প্রকৃতির শুশ্রূষা, উলটোপথে ততই বেশি সে পৌঁছচ্ছে প্রকৃতির গূঢ়তায়, আর এরই মধ্যে কাজ করে তার স্বাধীনতার ইচ্ছে আর আয়োজন। রুশোর কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে ভাবেন গোপাল হালদার : Man **was born in chains ; he is trying to be free**। এই মুক্তি আসবে তখন, যখন আমরা সহজ হব, অনায়াস একটা সাযুজ্য হবে প্রকৃতির সঙ্গে, যখন আমরা বুঝব 'আকাশ আমাদের কত আত্মীয়'। তখনই লেখক বলতে পারেন 'প্রকৃতিকে আর প্রতীক করে তুলছি না—তুলছি আমার সক্রিয় সঙ্গী করে।'

'একদা'র চেতনাপ্রবাহেই হোক বা 'অন্যদিন'-এর অন্তর্মুখী বাচনেই হোক, ঘটনার পরম্পরায় মন রাখতে গিয়ে ওই 'সঙ্গী'কে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছিল অমিত, লেখকে আর তার চরিত্রে এইখানে এক বিযুক্তি তৈরি হয়ে আছে মনে হয়। ওই সঙ্গীর সাহচর্য ছিল বলে গোপাল হালদারের ব্যক্তিগত লেখায় আকাশটা আর আকাশমাত্র থাকে না, সে হয়ে ওঠে সত্যিকারের প্রবাহের পথ, চেতনারই প্রবাহের। প্রতীক অর্থে নয়, স্বাভাবিক অর্থেই। আর ওই সঙ্গীর আপেক্ষিক অভাবে, অমিতের কাছে যতটুকু আকাশ এসে পৌঁছয়, সেটুকু হয়ে থাকে 'কয়েদির আকাশ'।

৪

কয়েদির কাছে আকাশ তার মুক্তির জন্য একটা ব্যাকুলতা মাত্র। তার অনুভূমিক দৃষ্টি যখন থমকে আছে পাঁচিলে-পাঁচিলে, গরাদে-দেয়ালে, উঁচু থেকে একফালি আকাশের চকিত টান তাকে অনেকখানি ভরসা দিয়ে যায় তখন। কিন্তু কয়েদিমাত্রেরই স্মৃতিলেখায় সেই আকাশ যে অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে তা নয়, শাসকের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের লড়াইটাই—তার নীচতা-বর্বরতার উদ্‌ঘাটনটাই—ঘটনায় ঘটনায় ভরপুর থাকে অনেকের কাছে। গোপাল হালদারের "কয়েদির আকাশ" পড়তে পড়তে তবু ভেসে আসে অন্য কোনো কোনো আকাশের ছবি, তাঁরই সমতুল্য আরো অনেক অনুভবের ইতিহাস। মনে পড়ে যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'তে বিলুরও কথা শুরু হয়েছিল 'অশথ গাছের উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো' দিয়ে (সেই একই অশ্বত্থ), 'সিঁদুরে আকাশের আভা' লেগেছে সেখানে, আর 'এছাড়া দেখা যায় এক ফালি নীল আকাশ—লোহার গরাদের মধ্য' দিয়ে। বিলুর মনে হয় 'আকাশের ঐ ফালিটুকু আমার

একান্ত আপন, ও যে আমার নিজস্ব জিনিস। এমন করিয়া, আমার মতো করিয়া আকাশের ঠিক ঐ অংশটুকু কি আর কেহ পাইয়াছে?' এ কথাগুলি যখন লিখছিলেন সতীনাথ, তার প্রায় দশ বছর আগে যেন ওই ভাষাতেই লেখা হচ্ছিল "কয়েদির আকাশ". গোপাল হালদারও ভাবছিলেন 'উপরের আকাশের অনেকটা দেখা যায়, ওখান থেকে সেই একফালি আকাশকে মনে হত পরম আত্মীয়।' এখানেও 'একটু একটু করে···সূর্যের অস্ত আভা সরে-সরে মাথার ওপরে আসে, সামনে এগিয়ে যায়. একে একে নানা রঙ্ দেখা দেয়, একটু একটু করে রঙ্ হয়ে আসে ম্লান', বিলুও যেমন দেখে 'সন্ধ্যার লালিমা ধূসর হইয়া আসিতেছে।··· আমার নীল আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে।'

এক লেখা থেকে আরেক লেখায় এইভাবে গড়িয়ে যায় মন। 'আমাদের ছোট আঙিনার দুয়ার বিকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খোলা থাকে। আমরা সামনেকার বড় আঙিনায় হাওয়া খেতে বেরোই—যে হাওয়া আসে গোটা তিন-চার পাঁচিল টপ্‌কে', পড়তে পড়তে সরে যাই এক ভিয়েৎনামি নেতার কবিতায়, যেখানে 'সূর্যের আলো পাঁচিল টপ্‌কে আসে'। যেখানে 'দুটো গেছে বেজে ঃ কুঠুরিদুয়ার খুলে দিল, এল হাওয়া / চোখ তুলে এক ঝলক সকলে দেখে আকাশের দিকে।' সন্ধ্যা এসে যায়, নিয়মমতো সান্ত্রী এসে বলে "টাইম্‌স্ আপ্", ব্যারাকে বন্ধ হয়ে যান আবার সবাই। রাত বাড়ে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কখন জানলার দিকে চোখ গিয়েছিল',চোখে পড়ে যায় 'লাল আর গোল, সোনার থালার মতো' চাঁদ, গরাদের ফাঁকে 'এক একবার তাকাই ওই চাঁদের দিকে!' আর তারপর সেই ভিয়েৎনামি কবিতায় পড়ি; 'জানলায় ফিরে যাই আর দেখি গর্বিণী চাঁদিনীকে / গরাদের ফাঁকে চেয়ে আছে চাঁদ কবির মুখের দিকে' অথবা 'মধ্যশরতে ঝলমলে চাঁদ গোল আয়নার মতো'।

কবির মুখের দিকে চাঁদের চেয়ে থাকবার কথায় হয়তো একবার মনে পড়ে বক্সায় 'নিদ্রাহীন রাত্রে যখন মনে হত হিমালয় আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আছে', কিন্তু উপরে-বলা ওইসব কবিতার সঙ্গে বেশ-একটা দূরত্বও আছে গোপাল হালদারের অনুভবের। ওসব কবিতায় সূর্যচাঁদের আলোয় ভরা বাইরের আকাশের জন্য যে ব্যাকুলতার কথা, তার একটা চাপা চেহারা আছে, যেমন আছে বিলুর দেখাতেও। কবির মুখের দিকে চাঁদ চেয়ে থাকে বটে, 'কিন্তু এখানে চাঁদ বা হাওয়াও আসে বিষাদের ভারে'। পাঁচিল টপ্‌কে আলো আসে বটে, কিন্তু 'দরজায় এসে ঝলকায় তবু দরজা খোলে না তার / জেলের ভিতরে থম্‌কিয়ে

আছে এখনো অন্ধকার'। বাইরে যে আকাশভরা সূর্য' আছে তা জানা সত্ত্বেও এসব লেখায় একটা থমথমে ভাবই হয়ে ওঠে বড়ো। 'খোলা আনন্দে শারদ চন্দ্র বইতে পারি না ব'লে' এখানে একজন মন-খারাপ করা মানুষের মুখচ্ছবি ছেয়ে থাকে পাতার পর পাতায়, গরাদঘেরা কয়েদখানায় সেটা কিছু অপ্রত্যাশিত কথাও নয়।

কিন্তু গোপাল হালদারের "কয়েদির আকাশ" নিয়ে আসে সেই অপ্রত্যাশিত 'আনন্দে'রই স্বাদ। 'তবু তারও ফাঁকে ফাঁকে পাই আভাস—জীবনের মুক্ত আনন্দ-রূপের': বলতে পারেন তিনি। সামান্য একটু ফাঁকা আঙিনাতে তাঁর 'মনে একটা নতুন হাওয়া লাগত। তাতে এই কথাই যেন জেগে উঠত—কোন চেতনাপারের সুপ্ত স্মৃতির মতো—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে।' কয়েদখানাতে বসেও এই-যে ধন্যতার বোধ, এ যে শুধু তাঁর এই একটি লেখার মধ্যেই আলো ফেলে যায় তা নয়, এই প্রসন্নতার আভা তাঁর সমস্ত লেখারই একটা মৌলিক ভিত্তি হয়ে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাই। জীবনকে তিনি যতরকম কয়েদখানার ভিতর থেকেই দেখুন না কেন, সবসময়েই তাঁকে সহজে তার থেকে বাইরে টেনে নিতে পারে এই 'কয়েদির আকাশ'।

৫

'জাগরী'তে আছে চারজন মানুষের আত্মকথন, সময়ের একই বিন্দুতে বসে একইরকম ঘটনার দিকে ফিরে-ফিরে আসছে চারজনের মন। মনের ধরণ অনুযায়ী বাচনভঙ্গিতেও ঈষৎ স্বাতন্ত্র্য আছে চারজনের ভাবনাস্রোতে! কিন্তু 'ঈষৎ'কে ছাপিয়ে গিয়ে খুব বড়োমাপেরই একটা ভাষাবদল দেখি মায়ের কথায়, আওরৎ-কিতায়। বিলু নীলু আর তাদের বাবার কথা যখন লেখেন সতীনাথ, সেসবই আসে সাধুভাষায়। কিন্তু, বলেন যখন মা, তখন সে-ভাষা কথ্য, চল্‌তি। সবটাই কেন নয় চলিতভাষা, বা সবটাই কেন নয় সাধু? বিলু নীলু ডায়েরি লিখছে না, অন্য কারো সঙ্গে সংলাপেও যাচ্ছে না, সব ভাবনাটাই তো তাদের নিজেদের মনের ভাবনা। যেমন তাদের মায়েরও। তাহলে এই ভিন্নতা কেন ভাষায়?

একেবারে একইরকমের না হলেও, প্রায় এর অনুরূপ একটা প্রশ্ন তোলা যায় 'স্বপ্ন ও সত্য' আর 'একদা'কে পাশাপাশি সাজিয়ে নিলে। প্রেসিডেন্সি জেলে বসে 'একদা' লেখা হয়েছিল ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে আর তারই অল্প কয়েকমাস

আগে পরে ১৯৩৩-৩৪ সালে লেখা গদ্যগুলি নিয়ে 'স্বপ্ন ও সত্য'। দুটোই প্রকাশার্থে লেখা, দুয়েরই মধ্যে আছে আত্মকথনের ভঙ্গি। কিন্তু এখানেও, পাশাপাশি-লেখা এ-দুয়ের ভাষা কেন আলাদা? একটায় যদি চল্‌তি, অন্যটায় কেন সাধু? 'একদা'র অনেকদিন পরে 'অন্যদিন' 'আর একদিন'ও সেই একই সাধুভাষায় চলে, কিন্তু "কয়েদির আকাশ" বা "কবিতার রাত" এগোয় চল্‌তি চালে।

এই দুই-প্রভেদেরই কারণের মধ্যে কোথাও একটা সমীপতা আছে মনে হয়। 'জাগরী'তে সকলেই নিভৃত ভাবনায় মগ্ন, কিন্তু তারও মধ্যে বাইরের জগতের মানুষে আর ভিতরের জগতের মানুষে—এমনকী পুরুষে আর নারীতে—একটা ভেদ করে দেন সতীনাথ। রাজনীতির একজন কর্মী হওয়া সত্ত্বেও মা যে অন্তঃপুরিকা, তার সেই মূলরূপটাকে ভুলতে দেন না তিনি। অন্তঃপুরিকা না বলে এক হিসেবে ধাত্রী বা লালয়িত্রীও বলা যায় সেই মাকে। বাইরের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আওরৎ-কিতার পুরোটা জুড়ে আছে প্রচ্ছন্ন সেই লালনের একটা স্তর, আর সেইজন্যে তার ভাষাকেও হতে হয় আলাদা।

আর অন্যদিকে, অমিতের মনের কথা আছে 'ত্রিদিবা'য়, তার লেখকের মনের ছবি 'স্বপ্ন ও সত্য'তে। কিন্তু 'স্বপ্ন ও সত্য'তে আছে সেই লালনের বা সেই ধারণেরই একটা পলি, ভিতরের একটা তল, যার উপরে ফলে ওঠে অমিত অভিজ্ঞতার ফসল। তাই স্বচ্ছন্দেই এর ভাষা হয়ে যায় আলাদা। কিন্তু এর ভাষায় এর কথায় যে মুক্তির আনন্দ ছড়ানো থাকে, ব্যক্তিমানুষ আর শিল্পীমানুষ হিসেবে যে প্রসন্ন আনন্দ ছিল গোপাল হালদারের অন্তর্গত স্বভাবও, সেটাই জড়িয়ে থাকে তাঁর সমস্ত সাংস্কৃতিক কাজে আর সমস্ত সাহিত্যিক রচনায়, সামাজিক সমস্ত অবরুদ্ধতার মধ্যে বেঁচে থেকেও কেবলই তাঁর চোখে পড়তে থাকে একটুকরো আকাশ, প্রায় যেন 'ছিন্নপত্র'রই ভাষা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি তখন বলতে পারেন 'তখন সমস্ত দেহকোষের মধ্যদিয়ে আমি গ্রহণ করতাম আলো আর উত্তাপ', আর সেই আলো-উত্তাপে, টুকরোর মধ্য থেকেই তখন অনেকখানি হয়ে দেখা দেয় তাঁর সামনে ছড়িয়ে থাকা একটুকরো ওই 'কয়েদির আকাশ'।

সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিহাসের তত্ত্ব এবং গোপাল হালদার

ক্ষেত্র গুপ্ত

এক

গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা / প্রথম খণ্ড—প্রাচীন ও মধ্যযুগ, বইটি বের হয় ১৯৫৪ সালের মে মাসে। পরে তিনি বইটির দ্বিতীয় খণ্ড—নবযুগ, প্রকাশ করেন ১৯৫৮ সালে। আমরা তখন ছাত্রাবস্থার গুটি কেটে নব্য অধ্যাপক হিসেবে পেশাদার সাহিত্য-সাধক হয়ে উঠেছি। এ বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অজস্র তথ্যের মধ্য থেকে সাহিত্যের ইতিহাসকে বুঝে নেবার একটা পথ এতদিনে পাওয়া গেল! কলেজী পড়াশুনার বাইরে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা এবং সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির সম্পর্ক-আবিষ্কারে আগ্রহীরা এতকালে সামনে একটা কিছু পেলেন। যতদূর মনে পড়ছে অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানস' বইটি তখন প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনার সেই মার্কসবাদী বিশ্লেষণে শিল্পচেতনার অভাব তথা যান্ত্রিকতা দেখে যাঁরা পীড়িত বোধ করছিলেন, তাঁদের স্বস্তি পাবার মতো কিছু ছিল গোপাল হালদারে।

গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' এবং 'ইংরেজী সাহিত্যের

রূপরেখা'র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল অনার্স এবং এম এ-র ছাত্ররা। আমার ধারণা, পাঠ্যপুস্তক লেখার ভাবনা থাকার ফলে একটা বড় বইয়ের গণ্ডী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি, বরং সুনির্দিষ্ট হয়েছে। তাতে কলেজের পড়ুয়া যারা নন, তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নি, পথটি সুচিহ্নিত ও লক্ষ্যাভিমুখী হয়েছে। ছাত্ররা নতুনভাবে এবং অনেকটা ঠিক পথে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পড়তে শিখেছে। বাইরের পাঠকেরা বুঝতে পেরেছে, সাহিত্যের ইতিহাস শুধু ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা পেরুবার জন্য নয়, বাঙালি মাত্রের আত্মানুসন্ধানের দিগদর্শন।

দুই

সুকুমার সেনের বিপুলায়তন 'সাহিত্যের ইতিহাস' কালানুক্রমে সুবিন্যস্ত একটি অতি বিস্তৃত ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ। এমন কি বাংলা সাহিত্যের মহাফেজখানা বললেও অত্যুক্তি হয় না। আহমেদ শরীফ রচিত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের পরে সেকালের বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশের পরিচয় পেয়েছি, যা এতকাল আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল। শরীফের গ্রন্থে প্রাপ্ত নতুন তথ্যাদি সহ সুকুমার সেনের লেখায় পুরনো দিনের কাব্যাদির যে পরিচয় পাই, মূলত তার উপরে ভিত্তি করেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠবে। 'আর্কাইভ্‌স' বা মহাফেজখানা, 'ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগ', পুঁথির বিবরণ এবং সাহিত্যের ইতিহাস এক বস্তু নয়। উৎস থেকে যেমন প্রয়োজন নির্বাচন করে, গুরুত্ব-অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জনে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হয়, তেমনি সময়ের সঙ্গে তাকে অন্বিত করতে হয়, কালানুক্রমকে যুগ থেকে যুগে বিকাশের সূত্রে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়।

একথা অবশ্য ঠিক, রামগতি ন্যায়রত্ন থেকে শুরু করে যাঁরাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তাঁরাই প্রাথমিক রকমের হলেও কোন একটা যুগবিভাগের চেষ্টা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা এ সাহিত্য' বইয়ে যুগের বিভাগ অনেক সুনির্দিষ্ট। সময়ের সঙ্গে সমকালের সাহিত্যকে—সাহিত্যের মূল প্রবণতাকে যুক্ত করার একটা ঘনিষ্ঠ তৎপরতাও সেখানে দেখা গিয়েছে। তিনি যে সব তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন, যে সব তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাতে অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের সায় না থাকলেও, পদ্ধতির দিক থেকে দীনেশচন্দ্রের বাংলা বইটির মূল্য মানতেই হয়।

একথা ঠিক যে লেখক আদ্যন্ত যুগের বিন্যাসে সুসঙ্গত কোন রীতি অবলম্বন

করেন নি। যেমন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র চতুর্থ অধ্যায় তাঁর মতে 'হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ', পঞ্চম অধ্যায় কোন যুগ নয়। অনুমান করা যায়, লেখক হিন্দু রাজত্বের অবসানে তুর্কিবিজয়-পরবর্তী সময়ে লিখিত সাহিত্যের কোন তথ্য না পেয়ে এই কালকে যুগচিহ্নহীন করেছেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে। অবশ্য এখানে পঞ্চদশ শতকের সাহিত্যের ভূমিকা হিসেবে তিনি কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে পরবর্তী স্তর হল 'গৌড়ীয় যুগ'। ব্যাখ্যায় বলেছেন—'চৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্য'। কিন্তু পরের স্তরে একই কালসীমার সাহিত্যকে তিনি দুটি যুগে ভাগ করে বিন্যস্ত করেছেন। সপ্তম অধ্যায়—'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ'। এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্নধরনের বৈষ্ণব সাহিত্য। অষ্টম অধ্যায়-'সংস্কার যুগ'—যার অন্তর্গত চৈতন্য-প্রভাব-কালীন মঙ্গলকাব্য, উনি যাঁকে বলেছেন লৌকিক শাখা এবং রামায়ণাদির—'অনুবাদ শাখা'। একই কালসীমায়, এভাবে দুটি যুগের ধারণা অবশ্যই যুক্তিসহ নয়। দীনেশচন্দ্র যাদের যুগ বলেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে যুগ নয়। কারণ এদের একটির সঙ্গে পরবর্তীর পার্থক্য মৌলিক ও গুণগত নয়—রূপগত। এজন্য আচার্যকে অভিযুক্ত করা যায় না—কারণ তখনও 'যুগ' শব্দটির দ্বারা ঐতিহাসিক পর্যায়ের যে মূল রূপান্তর দ্যোতিত হয়, সে ভাবনা আসে নি। তিনি যুগ বলতে পর্বই বুঝিয়েছেন। তবে গৌড়ীয় যুগের সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের পার্থক্য যে যথার্থ যুগগত, শুধুই স্তর বা পর্বগত নয়, এই সত্য অনুধাবন করেন নি। তাছাড়া স্তরগুলির নামকরণ ও লক্ষণ-নির্ণয়ে তাঁর অনেক কথা হয়তো মানা যায় না। তবুও সব অসঙ্গতি সত্ত্বেও এ কথা বলব যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম বড় লেখক কালবিভাজনের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, ঐ কাজটি ছাড়া যে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা যায় না এসত্য তাঁর জানা ছিল। কিন্তু এই কাল-বিভাজনের ভিত্তি কি তিনি আমাদের জানান নি, নিজে স্পষ্ট করে জানতেন কি? যুগের সঙ্গে যুগের পার্থক্য এবং যুগের অন্তর্ভুক্ত পর্বের বা স্তরের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের পার্থক্য সম্বন্ধেও সাহিত্যের ইতিহাসের এই যথার্থ পথিকৃৎ আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন না।

তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বইটির বিন্যাস কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি বিভিন্ন শাখা ধরে বিবরণ ও বিকাশ দেখিয়েছেন। কোন্ পথটি সঠিক বলে আচার্য মনে করতেন? বাংলা বইটির পদ্ধতি—যুগানুযায়ী সাহিত্যের বিকাশ দেখা, যুগের মধ্যে শাখাগুলিকে নিয়ে অধ্যয়ন? অথবা,

ইংরেজি বইয়ের রীতি—শাখা ধরে পরিচয় এবং প্রসঙ্গক্রমে যুগের প্রশ্ন আনা ? অবশ্য দীনেশচন্দ্রের কাছে যুগ (আমাদের ভাষায় হওয়া উচিত পর্ব) এবং শাখাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যে কখনও কখনও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার নিদর্শনও আছে। আমি বিশেষভাবে ইংরেজি 'বেঙ্গলি রামায়নস্'-এর কথা বলছি। চৈতন্য-পূর্ব অর্থাৎ দীনেশবাবু-কথিত গৌড়ীয় যুগে, চৈতন্য-প্রভাব কালে এবং তথাকথিত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে (দীনেশবাবু অষ্টাদশ শতককে এই নাম দিয়েছিলেন) বাংলায় অনূদিত রামায়ণে যে সব যুগোচিত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তার চমৎকার বিশ্লেষণ ঐ বইয়ে আছে। অবশ্য তার সঙ্গে সবাই একমত নাও হতে পারেন ! তবুও লেখকের চেতনায় যে ইতিহাসের ছন্দ আন্দোলিত হত তাতে সন্দেহ নেই।

তিন

সুকুমার সেন তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক বেশি তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তথ্য সংকলন এবং কালনির্ণয় ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, যদিও পুঁথির প্রাচীনত্ব-বিচারে সর্বদা নিরপেক্ষ নন। তবুও তাঁর গ্রন্থ তথ্যের আকর রূপে সকলের মান্য ! সম্ভবত বস্তুনিষ্ঠার জন্যই তিনি যুগবিভাগকে আরোপিত ব্যাপার বলে মনে করেছেন। বইয়ের প্রথম সংস্করনে তিনি লিখেছিলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং অবজেকটিভ্ বা বস্তুগত ভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।··· সত্যকথা বলিতে কি, বাঙ্গালা দেশে তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বৌদ্ধ' 'শৈব' 'ব্রাহ্মণ্য' 'ঐস্লামিক' ইত্যাদি যুগবিভাগ একেবারে কাল্পনিক।" ইঙ্গিতটা দীনেশচন্দ্রের প্রতি, বোঝা যায়। মনে হয় কোনরূপ যুগবিভাগ ব্যাপারটাকেই তিনি ইতিহাসের পক্ষে অবান্তর, এমন কি ক্ষতিকর মনে করেছেন। করেছেন কি ?

তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণেই গ্রন্থটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ আকার নেয়। পরবর্তী সংস্করণগুলি এরই উপরে কিছু সংযোজন, সংশোধন। দেখা যায় বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক কতগুলি পর্বের কল্পনা করেছেন—যুগের নয় ! তাঁর নিজের ভাষায় সেগুলির পরিচয় দিচ্ছি—

প্রথম পর্ব—চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত
দ্বিতীয় পর্ব—পঞ্চদশ শতাব্দী

তৃতীয় পর্ব—পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ঃ পাঠান ও আফগান আমল (১৪৯৪-১৫৭৫)

চতুর্থ পর্ব—মোগল শাসনের সূত্রপাত (১৫৭৫-১৬০৭)

পঞ্চম পর্ব—সপ্তদশ শতাব্দী ঃ মোগল আমল (১৬০৭-১৭০৭)

ষষ্ঠ পর্ব—অষ্টাদশ শতাব্দী ঃ নবাবী আমল (১৭০৭-১৭৬৫)

সপ্তম পর্ব—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী ঃ কোম্পানী আমল (১৭৬৫-১৮৫৭)।

লেখক এইভাবেই পর্ববিভাগ করেছেন, নামকরণ করেছেন, কাল-নির্ধারণ করেছেন। কেন যুগ না বলে এদের পর্ব বলছেন তা বোঝার উপায় রাখেন নি। নামগুলি দেখে মনে হয় রাজনৈতিক রদবদলের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এই ভাগগুলি করেছেন। অথচ তুর্কিবিজয় ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়কে একটা পর্বের মধ্যে রেখেছেন, যদিও বাঙালী জাতিগঠনে তুর্ক-অধিকারের তাৎপর্য নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। আবার বাংলার ইতিহাসকে পাঠান-আফগান আমল, মোগল শাসনের সূত্রপাত, মোগল আমল, নবাবী আমল এইভাবে সাল মেপে বিভক্ত করেছেন। এর সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের পর্বান্তরের যেমন কোন যোগ নেই, তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও কোন লক্ষণীয় রূপান্তরের চিহ্ন নেই। লেখক প্রায়ই সুনির্দিষ্ট সালেরও উল্লেখ করেছেন পর্ববিভাগ প্রসঙ্গে, যেমন, ১৪৯৪, ১৫৭৫, ১৬০৭, ১৭০৭, ১৭৬৫। কিন্তু এই সালগুলি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যঘটিত কোন্ তাৎপর্যের জন্য ওঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

কোন পর্বের আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি বিষয়ে ক্বচিৎ যে দু-একটি মন্তব্য করেছেন তা আকস্মিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। কোন পর্বকে তার কালগত বৈশিষ্ট্যে যেমন লেখক চিহ্নিত করতে পারেন নি, তেমনি ঐ সময়ের রচনার সঙ্গে তার কোনরূপ সম্পর্কের সন্ধান করেন নি। মনে হয় এসব তিনি জেনেশুনে করেছেন বস্তুনিষ্ঠার জন্য। ফলে তাঁর মহাগ্রন্থ লিটারারি আর্কাইভস্ হয়ে উঠলেও সাহিত্যের ইতিহাস হল না।

চার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এই দুই লেখকের কথা মনে রেখেই গোপাল হালদারের ছোট বইটির কথা ভাবব।

দীনেশচন্দ্র এবং সুকুমার সেন, দুজনই দুভাবে সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ—মনীষী। নিজ নিজ কালে তাঁরা ছিলেন তথ্যের প্রভু। গোপালবাবুর উপরে এই দুই কৃতিত্বের কোনটি আরোপ করাই সম্ভব নয়। আর দীনেশ সেন সুকুমার সেনকে টক্কর দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের কোন আদর্শ কেতাব লিখবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। বাংলাসাহিত্যে তাঁর স্থান স্বতন্ত্র ধরনের উপন্যাস লেখার সুবাদে, এবং বাংলা সংস্কৃতির মার্কসবাদী ভাষ্যকার রূপে। আমার মনে হয় প্রকাশক ছাত্র-পাঠ্য একটি বই বের করতে চেয়েছিলেন, গোপাল হালদার সেই উদ্দেশ্যে লিখতে গিয়েও প্রয়োজন ছাপিয়ে যান। পূর্বসূরীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে গুরুত্ব বিবেচনায় কিছু গ্রহণ করে তিনি একটি খাঁটি সাহিত্যের ইতিহাসই লিখলেন। আকারটা সংক্ষিপ্ত এবং অপূর্ণ বলেই নাম দিলেন 'রূপরেখা'। কিন্তু তা যথার্থ রূপরেখা। তাঁর ভেতরে খাঁটি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে সংস্কৃতিকে বুঝে নেবার যে বৌদ্ধিক তাগিদ ছিল এই সুযোগে তার মুক্তি ঘটল। বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যানে এই বস্তুটি অপেক্ষিত ছিল, তা তিনি জানতেন। আর প্রকৃত অবজেক্টিভিটি যে শুধু নিষ্প্রাণ তথ্যনিষ্ঠায় নয়, বস্তুবাদী প্রত্যয়ে,—সুকুমার-ঘরাণার সামনে সেই বক্তব্যটি তুলে ধরার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। তবে এসব করতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের সীমানা ডিঙ্গোন নি। সেকারণে এই বইয়ের প্রকৃত গুরুত্ব ততটা প্রচারিত নয়।

পাঁচ

সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কুঞ্চিকা—

১. যুগ-বিভাজন

২. বর্গীকরণ

জাতির ইতিহাস যুগ থেকে যুগান্তরে এগিয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সহজ ও জটিল নানা সম্পর্কে বিবর্তিত হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস। কিন্তু যুগ থেকে যুগের যে ভাগ তার মাপক কি? এবং যুগ থেকে যুগান্তরে বিবর্তনে কি কোনরূপ উপবিভাগ মেনে নেবার প্রয়োজন আছে?

এবিষয়ে সুস্পষ্ট একটা নীতি মার্কসবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। মোটাদাগের সূত্রটা হল এই যে, অর্থনৈতিক ভিত্তির বদল ঘটাটাই যুগান্তরের মূল বিভাজিকা। অন্যেরা অত সুনির্দিষ্ট করে কিছু না বলে সাধারণভাবে বলেন, সমাজে-রাজনীতিতে-অর্থনীতিতে-সংস্কৃতিতে যখন কোন মূল পরিবর্তন ঘটে,

তখন জাতির ইতিহাস এক যুগ থেকে পরবর্তী যুগে উত্তীর্ণ হয়। মার্কসবাদীরা সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসেবে দেখেন অর্থনীতিকে। তাকে বলেন বেস, অন্য সবকিছু সুপারস্ট্রাকচার। ভিত্তি বদলালে সাহিত্য প্রভৃতি উপরিসোধও একেবারে গুণগতভাবে বদলে যায়।

দেখা যাক, গোপাল হালদার মার্কসবাদীদের কাছে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ উক্ত ধারণাটি কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে তুর্কি-বিজয়ের ফলে বঙ্গের অর্থনৈতিক ভিতের বদল ঘটেনি। তাই তুর্কিবিজয়কে মধ্যে রেখে আদিযুগ মধ্যযুগ—এইরূপ পরিকল্পনা যুক্তিসহ নয়। করা সঙ্গত নয়। বৃটিশ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত একই ধাঁচের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি—সে কারণে বাংলা সাহিত্যের একটাই যুগ। গোপালবাবু এ যুক্তি মানেন নি। তুর্কিবিজয় নামক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডটি পুরানো বাংলার জীবনে এমনই একটি ঘটনা যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী—যুগান্তকারী, সমাজে, ধর্মক্ষেত্রে এবং সাহিত্যেও। যদিও ফিউডাল অর্থনীতির প্রচলিত কাঠামোটি ভেঙে ভেঙে পড়েনি। গোপাল হালদারের মতো মার্কসবাদী পণ্ডিত বেস-সুপারস্ট্রাকচারের সিদ্ধ ধারণার অনুবর্তী না হয়েও এখানে ইতিহাসের যুগবিভাগ করেছেন। সাহিত্য ইত্যাদি সুপারস্ট্রাকচার নয়—একথা অবশ্য ঘোষণা করেন নি। কিন্তু কার্যত এই তত্ত্বের পোষণ করেছেন। আটের দশকে অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্তের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব, মার্কসবাদের মৌল প্রত্যয়ে আস্থা রেখেও, কিন্তু পাঁচের দশকে গোপাল হালদারের মতো মুক্তবুদ্ধি মার্কসবাদীর পক্ষেও সেটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

যদিও তৃতীয় যুগের পরিকল্পনায় সমস্যা ছিল না। সেখানে রাজনীতির পালা ও অর্থনীতির ভিত একই সঙ্গে বদলেছে। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনার ফলে মধ্যযুগের ফিউডাল ব্যবস্থার স্থানে আধা ঔপনিবেশিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে।

দেখা যাচ্ছে গোপাল হালদার ঐতিহাসিক যুগবিভাগে, যদিও প্রত্যক্ষত সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে—আসলে জাতির জীবনেতিহাসের সমগ্রতায়ই, রাজনৈতিক ঘটনাকেই সামনে রেখেছেন—যদি অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তন তার সঙ্গে মিলে থাকে তো ভালো, না মিললেও রাজনৈতিক কালবিভাজনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কমে না।

দুই খণ্ডে বিস্তৃত বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা বইয়ে আমরা তিনটি যুগ-

বিভাগের মুখোমুখি হই ঃ (১) প্রাচীনযুগ (২) মধ্যযুগ (৩) নবযুগ। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এসে তার কাল মোটামুটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডকে নবযুগ নামে উল্লেখ করে,তার প্রথম ভাগ, প্রস্তুতির পর্ব পর্যন্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন লেখক। এ থেকে বোঝা যায়, নবযুগের অন্তর্গত আরও কিছু কিছু পর্ব আছে, যার আলোচনা পরবর্তী কোন খণ্ডে করার পরিকল্পনা লেখকের ছিল। তবে বৃটিশ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তি তথা দেশবিভাগের সূচনা থেকে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের কোন নতুন যুগের পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা তা অনুমান করার উপযোগী কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই।

ছয়

বইটির প্রথম খণ্ডের কথায় ফিরে আসি। লেখক স্পষ্ট করে দুটি যুগকে কতগুলি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগের মধ্যে একটিই পর্ব। তুর্কি বিজয়ে ১২০০ সালে যার শেষ। দ্বিতীয় যুগ—মধ্যযুগকে তিনি ভাগ করেছেন তিনটি উপযুগ বা পর্বে ঃ

১. প্রাক্-চৈতন্য পর্ব ১২০০-১৫০০ সাল
২. চৈতন্য পর্ব ১৫০০-১৭০০ সাল
৩. নবাবী আমল ১৭০০-১৮০০ সাল

পর্ব এবং যুগ নাম দুটিকে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন, একথা বলা যায় না। তার একটা বড় কারণ এই, বাংলায় এসব ব্যাপারে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার আজও প্রথাসিদ্ধ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে যে দুটি স্তর পরিকল্পিত হওয়া সঙ্গত—এবিষয়ে গোপালবাবুর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। প্রথমটি মূলের পরিবর্তন-গুণগত, দ্বিতীয়টি রূপ ও ভাবগত। আজকাল যুগ এবং উপযুগ বা পর্ব এই নাম মোটামুটি গৃহীত, যদিও সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। ইতিহাসে অগ্রগতির একটা ছন্দ থাকে, তা অবশ্যই সমমাত্রিক নয়। চলতে চলতে হঠাৎ জাতির জীবনে যখন সবকিছু নাড়িয়ে, পুরনোকে ভেঙেচুরে নতুন বোধ ও মূল্যমান এসে যায় সেই পরিবর্তনটাকে বলি বৈপ্লবিক। তখন ঘটে যুগান্তর। কিন্তু যুগান্তরের প্রতীক্ষায় তো সবকিছু স্থির হয়ে থাকে না। পরিবর্তন তো নিরন্তর ঘটতে থাকে। একটি যুগের মধ্যবর্তী সময়ের বিবিধ অদলবদল—ভাব ও রূপ দুদিক থেকেই যা ঘটে তারও দাম কিছু কম নয়। ধরা

যাক চৈতন্য-আবির্ভাবের কথা। বাংলার জীবনে সামগ্রিকভাবে তার যে প্রভাব গুরুত্বে তা অসাধারণ। তবুও তাকে একটি উপযুগই বলব কারণ মধ্যযুগের মৌল স্বভাবে তা একটি অত্যুজ্জ্বল পর্ব-অন্তকারী পর্ব নয়, যেমন মধ্যযুগের অন্তকারী হিসেবে দেখা দেয় বৃটিশ অধিকার। পর্বগুলির পারম্পর্যই শেষ পর্যন্ত যুগান্তরের মুখে পৌঁছে দেয়। তবু প্রবল নাড়া যার মধ্যে প্রলয়ংকর শক্তি থাকে তাকে বাদ দিয়ে নতুন যুগের আগমন ঘটে না। যুগের তুলনায় পর্বের তাৎপর্য অবশ্যই গৌণ কিন্তু পর্বের ভূমিকাকে লঘু করে দেখলে ঐতিহাসিক অগ্রগতির প্যাটার্নটাই ধরা যাবে না।

গোপাল হালদার সেই প্যাটার্নটা নিশ্চিত ভাবে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় প্রতিটি যুগ ও পর্বের ভূমিকায় দেশের এবং সময়ের সম্ভবমতো স্পষ্ট পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে, তাতে অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলেও প্রয়োজনমাফিক তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানেও যুগ ও পর্বের পার্থক্যটি বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা আছে। লেখক এই পটভূমিকাকে সেই কালপর্বের সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ সূত্রে বন্ধ করেছেন কোথাও এই সম্পর্ককে অতি উৎসাহে সর্বব্যাপী করে দেখাবার চেষ্টা নেই। সাহিত্যে সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব যেমন অনিবার্য বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু তাতে এই সত্য ভোলেন নি যে, সাহিত্য মূলত ব্যক্তির সৃষ্টি, সমাজ কাজ করে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে।

এইভাবে অনেক 'ডগমা' যা মার্কসবাদের নামে দীর্ঘকাল এদেশে ও বিদেশে কার্যকর ছিল, গোপাল হালদার তাঁর এই ছোট বইয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে সেইসব বিতর্ক তোলেন নি, বোধের গভীরতা নিয়ে তাকে প্রয়োগে কার্যকর করে তুলেছেন।

সাত

গোপাল হালদার কতটা যাথার্থ্য নিয়ে পুরনো বাংলা সাহিত্যের বর্গ-উপবর্গগুলিকে যুগ ও পর্বগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখছেন তা নিয়ে বেশ কিছু বলার আছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ অন্য আলোচনার জন্য স্থগিত রেখে আমি আরও দু-একটি দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই—ইতিহাসবোধের মূল সূত্র হিসেবে যা লক্ষ্যণীয়। সে-সবের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে বসলে লেখা অনেক বেড়ে যাবে!

১. ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু কোনো দেশের স্ফুট অস্ফুট ধর্মচেতনা ও আন্দোলনের পেছনে এবং ভেতরে একটি সমাজতত্ত্ব থাকে। গোপালবাবুর বই সেদিকে অভ্রান্ত তর্জনী তুলেছে। ধর্মসর্বস্ব মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে বিচরণ করতে, তাকে গুরুতর বিশ্লেষণের বিষয় করে তুলতে একজন বস্তুতন্ত্রবাদীর যে সংকোচ নেই, বিরূপতা নেই, চল্লিশ বছর আগে বাঙালির ঐতিহ্য সন্ধানে তার গুরুত্ব অসাধারণ।

২. তুর্কিবিজয়ের পরবর্তী বাঙালির সমাজ-সংগঠনে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের যে তত্ত্বটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি তার অপব্যাখ্যা করতে পারে জেনেও তিনি আপন প্রত্যয় থেকে সরে আসেননি। এখনও এই 'অন্ধকার পর্বে'র' ধর্ম—সমাজতত্ত্বের-ব্যাখ্যায় চিন্তাবিভ্রাটের যে অস্পষ্টতা আছে, তার মধ্যে হালদারের তত্ত্ব আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের স্বল্প উপস্থিতি গোপাল হালদারকে ভাবিয়েছে, যে কোন সাহিত্যের ইতিহাসকারকে ভাবাবে। তখনও পূর্ববঙ্গ-বাংলাদেশের গবেষক-পণ্ডিতেরা মুসলমান লেখকদের বিপুল সংখ্যক পুঁথি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেননি। তখনও সেই ভূমিকার যথাযোগ্য বিশ্লেষণের উপযোগী উপাদান গোপালবাবু সামনে পাননি। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান আলোচ্য তা নির্দেশ করেছেন বেশ গুরুত্ব দিয়ে।

৪. মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি তাঁর কাম্য ছিল। এবিষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লেখকের জনমুখিনতা প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্য যে ভদ্রলোকের লেখ্য বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়, নিরক্ষর নিচুপাড়ার রচনার দামও যে মেনে নিতে হবে—এটা একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক প্রত্যয়।

আট

রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেন) কথিত মার্কসবাদীর ঐতিহ্যবিচার নিয়ে উত্তেজনা ৫৪ সালে কিছু কমলেও, প্রগতিশীলদের ভেতরে যে উগ্রতার বীজ বোনা হয়েছিল তার জের সমানে চলছিল। সেই ভূমিতে গোপাল হালদারের এই অতীত সন্ধান, এর বস্তুবাদী অভ্রান্ততা এবং আশ্চর্য ভারসাম্য তথা সাহিত্যসৃষ্টির আংশিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস বাংলার বুদ্ধিজীবীর সামনে পথচিহ্ন হয়ে রইল।

লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে গোপাল হালদার

সুধীরকুমার করণ

বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পরিমণ্ডলে, 'গোপাল হালদার'-কে কোন বিশ্লেষণ দিয়ে চিহ্নিত করার কথা আমরা ভাবি না—যদিও তাঁর বিচিত্র জীবনধারা এবং সাহিত্য সৃষ্টির কথা মনে রেখে তাঁকে বলতে পারি, বিশ্বপথিক গোপাল হালদার কিংবা মনীষী গোপাল হালদার। 'গোপাল হালদার' জীবৎকালে এ কথা শুনলে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাতেন। কারণ খ্যাতি ও ক্ষমতালাভের প্রয়াস কোনোদিনই তাঁর ছিল না। তাঁর মানবতা বোধ, এবং সাহিত্য ও সমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা-ই তাঁকে পরিণত করেছিল এক হৃদয়বান সাহিত্যিক রূপে এবং শ্রমনিষ্ঠ লেখক রূপে। বস্তুতঃ সাহিত্যিক শ্রমনিষ্ঠায় তিনি এক অসামান্য কারিগর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করার পর, কখন-ও পেশাগতভাবে তিনি অধ্যাপক, কখনও ব্যবহারজীবী,—কখনও সম্পাদক। কিন্তু তাঁর প্রাণের সম্পর্ক ছিল সাহিত্যের সঙ্গেই—যার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অথবা রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সম্পর্কের সাযুজ্য-ও ছিল। এই ভাবনা-চিন্তাই তাঁকে সমাজবাদের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৪১ খৃস্টাব্দে তিনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি-তে যোগদান করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ-র মানবিকতাবোধও তাঁকে মানবকল্যাণের পথ অনুসন্ধানের সাহায্য করে। গোপাল হালদার এমন কথাও বলেছেন যে তাঁর গুরু, আচার্য সুনীতি-

কুমার সজ্ঞানে না হলেও গবেষনার পথনির্দেশের মাধ্যমে তাঁকে সমাজবাদের দিকেই চালিত করেন। না, কোন হাল্‌কা-মেজাজে তিনি এ কথা বলেন নি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আচার্য সুনীতিকুমারের গবেষণা সহায়ক রূপে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করে লোকভাষা চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন গোপাল হালদার। তাঁর প্রাথমিক গবেষণার পত্র দেখে, আচার্য সুনীতিকুমার বলেছিলেন,—উঁহু—এ ভাবে নয়;—সংগ্রহ করতে হবে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলি—তাদের মুখের ভাষা থেকে। অতএব তাঁকে পৌঁছে যেতে হলো গ্রামীণ পরিমণ্ডলে, যেখানে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মানুষকে, মানুষের সমাজকে জানার সুযোগ পেলেন। তাই এ কথা তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন যে লোকভাষা এবং লোককথাই তাঁর ভাবনা চিন্তার উত্তরণ ঘটায় সমাজবাদে। বস্তুতঃ সুনীতিকুমারের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনার পার্থক্য অবশ্যই ছিল কিন্তু তিনি আজীবন সুনীতিকুমারকেই গুরুমান্য দিয়ে গেছেন। লোকভাষা গবেষণার সূত্রে, লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ততই সমাজবাদের মূলসূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাই, সমাজবাদে পৌঁছানো, তাঁর ক্ষেত্রে আকস্মিক নয়; তাৎক্ষনিক-ও নয়। তাঁর গভীর মানবিকতাবোধ-ই তাঁকে মার্কসবাদের দিকে আকর্ষণ করে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্বেই সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। তার আগেই যুগান্তর পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তাঁর কারাবাস ঘটে গেছে এবং ১৯৪০-এ তিনি সারাভারত কিষান সভার সম্পাদক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমাজ ও সংস্কৃতিকে না জানলে, রাজনীতি, অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মানবসমাজকে জানতে হলে মানবসমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানা একটি জরুরী বিষয়। এই দৃঢ় ধারণার জন্যই অসাধারণ শ্রমনিষ্ঠায় তাঁকে সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজনীতি-ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়কে আত্মস্থ করতে হয়েছে। এও বোঝা যায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানস্পৃহার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রেখে চলেছিল, তাঁর অনুধ্যান। আদিম মানব সমাজ থেকে শুরু করে,—আধুনিক সমাজ পর্যন্ত বিবর্তনের ধারার মধ্যে শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণীসংঘাতের মূল সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করতে করতে তিনি সংস্কৃতির রূপান্তরের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কখনও একথা বলেন নি যে তাঁর জানার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বস্তুতঃ গোপাল হালদারের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জান্‌তে জানতে চলা, যার পথ প্রশস্ত করেছে তাঁর মার্কসীয় ধারণা। 'সংস্কৃতির

রূপান্তর' নামক গ্রন্থ-ই তাঁর চলার পথের ইতিহাস—যার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪১-এ। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তা যে কত গতিশীল ছিল—তা বোঝা যায় তাঁর আরো দুটি গ্রন্থ—বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৭) এবং বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (১৯৫৩) পাঠ করে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে দীর্ঘজীবী গোপাল হালদার আজীবন তাঁর সংস্কৃতি-চিন্তাকে অব্যাহত রেখেছিলেন এবং এ বিষয়ে মার্কস্‌বাদ তাঁর সহায়ক হলেও মার্কস্‌বাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনও ছিলেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মনে বারবার অনেক প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে, কারবার সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন নিজের গভীর চিন্তার মধ্যে, মনন-শীলতার মধ্যে এবং এ কথা বলতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল যে তিনিই শেষ কথা বলেছেন। তাই উক্ত তিনটি গ্রন্থের সমাহারে গ্রথিত 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' গ্রন্থটিকে,—'সংস্কৃতির জিজ্ঞাসার' ভূমিকা হিসাবেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। বলেছেন—'সংস্কৃতি বিষয়ে আমার মনে কিছু জিজ্ঞাসা প্রায় শিক্ষাশেষেই জেগেছিল ;—পড়াশোনা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট ধারণা কিছুটা পরিচ্ছন্ন হতে থাকে. ক্রমে তা দানা বেঁধে ওঠে। সাহস করে তখন লিখতে বসি সংস্কৃতির রূপান্তর,—ও বিষয়ে আমার প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা।" এই চিন্তার পিছনে-ও ছিল তাঁর অনেক প্রশ্ন ; তাঁর মানবিকতাবোধের মধ্যে যার উদ্ভব ঘটে যাচ্ছিল। তারই সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছিল মানুষের অধিকারের প্রতি এবং কর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস—"মহামানবের সাগরতীরের" ভারতবর্ষ এখনো আধুনিক জীবন-প্রবাহে যোগদান করতে এগিয়ে আসছে না কেন? আর তার খণ্ডাংশ পূর্ব-উপকূলের বাঙলাদেশ যার বাণী নাকি বিশ্বসভায় চাপা দেওয়া যায় না? অথচ কেন তার এই দুর্বিপাক? পরাধীনতায় খর্বিত কর্মোদ্যমের শক্তি আমাদের ; পৃথিবীর কর্মোদ্যমে স্বস্থান অধিকার করতে হবে, আপনার সৃষ্টিশক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে। পৃথিবী জোড়া মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় 'দিন আগত ঐ'। সংক্ষেপে 'সংস্কৃতির 'রূপান্তরে' এই ছিল আমার কথা। মানুষের মূল সৃষ্টিধারা ও বিকাশের নীতি নিয়ম, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের অগ্রগতি, আর তারই সঙ্গে দেশের, জাতির ইতিহাস ও গতিধারা বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মোটা দাগে 'সংস্কৃতির রূপান্তরে' আগামীর আভাস ফুটিয়ে তোলা।" এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে গোপাল হালদারই প্রথম, যিনি 'সংস্কৃতি' নামক বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই জানতে চেয়েছেন ; সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নানা প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন ;—নানা—প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,—নানা

বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এ দিক দিয়ে তাঁর সংস্কৃতি-মনস্কতা সমস্ত সংস্কৃতি গবেষকদের কাছেই আদর্শের প্রতীক হয়ে থাকবে।

॥ ২ ॥

অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ, গ্রামজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। তখন লোকসংস্কৃতি শব্দটি প্রচলিত হয়নি। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তিনি মূলতঃ মানসচর্চার বিশিষ্ট ধারাগুলির কথাই বলেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি হচ্ছে, চিত্তের ঐশ্বর্য। বলেছেন—"সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ—সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথা পালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে।" পল্লীসংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন যে বাঙ্‌লাদেশের পল্লীসংস্কৃতির মধ্যেই পল্লীর প্রাণ নিহিত, এরই মধ্যে দেশের মৌলিক সৃষ্টিপ্রতিভার প্রাচীন পিতামহ বর্তমান। পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীসংগীত, পল্লীনৃত্য,—যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে উদ্ভূত, রবীন্দ্রনাথ তাকেই পল্লীসংস্কৃতি রূপে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুতঃ সংস্কৃতি যে চিৎ প্রকর্ষ বা চিত্তের ঐশ্বর্য্য—যা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, পরিশুদ্ধ করে—এই ধারণাই পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির কিছু রূপগত পার্থক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য নেই। আর-ও বলা চলে—রবীন্দ্রনাথের কাছে সংস্কৃতির অর্থ সম্যক্ কৃতিঃ—বা চারুশীল সৃষ্টি।

বলাবাহুল্য ইংরাজী 'কালচার'-এর প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতিকে' এইভাবেই গ্রহণ করা হয়। অধুনা নানা ধরনের সংস্কৃতি-সম্মেলনও এই ধারাকেই বহন করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ কখনও গ্রামীণ পরিমণ্ডলে উদ্ভূত সব কিছুকেই সংস্কৃতির চৌহদ্দীভুক্ত করতে চাননি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে—বাঙ্‌লা-ভূমির গ্রামজীবনকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল, সংস্কৃতির নামে সংস্কৃতির তলানিটুকু নিয়ে এক ক্ষমাহীন গ্রাম্যতার মধ্যে গ্রামের মানুষ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। এই গ্রাম্যতাকে তিনি পল্লীসংস্কৃতি বলে মেনে নেননি।

গ্রাম্যতা বলতে তিনি সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্মকে বুঝিয়েছেন যা গ্রামজীবনের বিকৃতিকে প্রতিফলন করে। মা ষষ্ঠী-মনসা-ওলা বিবি-শীতলা—ঘেঁটু-রাহু-শনি-ভূতপ্রেত ব্রহ্মদৈত্য-গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকা-পান্ডা পুরুত-বিধৃত গ্রামসমাজের বিকৃত জীবনচর্যাকে তিনি গ্রাম সংস্কৃতি নামে অভিহিত করেননি। গ্রামে উদ্ভূত যে সৃষ্টিধর্ম মানবধর্মের বিরোধী নয়, যার মধ্যে সুরুচি ও শালীনতা আছে,—চিরন্তন মানবপ্রকৃতির উর্ধ্বান্বিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে যার পরিচয়, তাকেই তিনি পল্লীসংস্কৃতি নামে অভিহিত করেছেন। যেখানে জীবনের উদ্বোধন নেই, আছে কেবল অন্ধ আনুগত্য—তাকেও তিনি সংস্কৃতি বলেননি। বিশেষ ধর্মসাধনার নামে গ্রামে যে উচ্ছৃংখল ধর্ম-সমাজের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তাকেও তিনি সংস্কৃতি বলতে নারাজ। মেলা কথকতা যাত্রা কীর্তন পল্লীসাহিত্য-পল্লীশিল্প পল্লীনৃত্য প্রভৃতির মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে গ্রামের প্রাচীন বৈশিষ্টকে ফিরিয়ে আনার কথা তিনি বলেছেন, যদিও তিনি মেলাগুলির কুৎসিত রূপ সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন।

বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতির যে সমস্ত দিকগুলি, সরল' গতিশীল, প্রাণবান, রুচিসম্মত ও অবিকৃত কেবল সেইসব দিকেরই আলোচনা, গবেষণা ও পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এর মূলে তাঁর কোন নৃতাত্ত্বিক-প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল অবশ্যই ছিল না কিংবা তাকে তিনি নাগরিক মনের বিলাসচর্চাতে পরিণত করতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে শুধু এই কথাই স্পষ্ট করার চেষ্টা হলো যে রবীন্দ্রনাথ যাকে কালচার বা সংস্কৃতি বলে মনে করেন,—তা' হচ্ছে 'চিত্তের ঐশ্বর্য।' এর সঙ্গে অবশ্যই সাংস্কৃতিক-নৃতত্ত্বের কিংবা ফোকলোর বা লোকযানের সম্পর্ক নেই।

আচার্য সুনীতিকুমার, কালচার বা সংস্কৃতি অর্থে সভ্যতার নির্যাসকেই বুঝিয়েছেন। বলেছেন—'সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটি-র নামকরণ হয়েছে ইংরিজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় 'কালচার'।" বলেছেন—"আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে 'কালচার'।" বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথাও বলেছেন যে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা যায় না; সভ্যতার প্রাণ,—সংস্কৃতি। সভ্যতা,—সংস্কৃতির বাহ্য রূপ; আর—সংস্কৃতিকে বলা চলে

মানস-সম্পদ' এই দৃষ্টিতে তিনি বাঙালীর বাস্তবসভ্যতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—খড়ের চালের কুটির, প্রাচীন কালের কাঠের কাজ, পোড়ামাটির ভাস্কর্য পুঁথির পাটা, পটুয়ার পট, রঙীন মাটির পুতুল, হাতীর দাঁতের কারুশিল্প, শাঁখের কাজ, সোনার কাজ, অলঙ্কার শিল্প, পিতলকাঁসার বাসন, শাক সুক্তুনি-ঘন্ট-কাসুন্দি ছড়া তেঁতুল, কদমা-খাজা-গজা,—বালুচরী, জামদানি শাড়ী, মাদুরশিল্প প্রভৃতির কথা। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন বাঙলার আধুনিক সংস্কৃতির কথা,—যেমন পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জামাইষষ্ঠী, পৌষ পার্বণ, নবান্ন, ইদের উৎসব ; আর বাঙলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—টোল-চতুষ্পাঠী, বৃন্দাবনের গোস্বামী, বৌদ্ধ চর্যাপদ, চৈতন্যদেব, কীর্তনগান, কবি-ঝুমুর-তর্জা-সারি, জারি, যাত্রা গান, রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী, মঙ্গলকাব্য, ব্রাহ্মধর্ম, রামকৃষ্ণপরমহংসদেব—উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, নাট্যশিল্প এবং আরও বহুবিধ মানস সম্পদের কথা।

রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের বক্তব্য-কে গোপাল হালদার অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এতেও তাঁর সংশয় দেখা দিয়েছে। স্বভাবতঃই তাঁর মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল যে সুনীতিকুমার যে বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলেছেন,—তা কি সমগ্র বাঙালী জাতির সংস্কৃতি! বলেছেন—"ইং ১৯৩৮ সালে রচিত এই সুদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙালী সংস্কৃতির যে পরিচয় আছে তাহাতে বড় বড় গ্রন্থ ও তথ্যরাশি যোগ করিয়া আর বেশী নতুন সত্য যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করিবার মত কথা এই যে এই অমূল্য তালিকায় মানস সম্পদের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও উল্লেখ আছে ; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার,—সমাজ সংস্থানের। তাই এই সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের সহায়ে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি। কিন্তু সর্বাংশে সেই সংস্কৃতি বুঝিতে পারি না।" বস্তুতঃ কালচার বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য—রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতি-কুমারকে যে বর্জন করেছে তা ও নয়, কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন,—সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ এবং সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থার উপর। সংস্কৃতির শেষ পরিচয়—মানস সম্পদকে তিনি সমাজ-সৌধের শিখরচূড়ার উপকরণ বলে মনে করেন। বলেছেন—"কাব্য, জ্ঞান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফুল ও ফল ; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও তাহার শাখা-প্রশাখা ; আর জীবিকার উৎপাদন প্রথা যেন গাছের মূল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভুলিবার নয়। ফুলই যে গাছ বা কাণ্ড এই কথা মনে করিলেও

ভুল হইবে। মূল যেমন ফুল নয়, তেমনি ফুলও আকাশে ফোটে না। আর একটি উপমা লওয়া যাইতে পারে—উৎপাদন প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি ; সমাজ-সম্বন্ধ যেন তাহার নিম্নতল বা গ্রাউন্ডপ্ল্যান, আর শিল্পকলা দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্য খচিত উপরতলা বা সৌধচূড়া। দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম ; তারপর নিম্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায় ; কিন্তু ভিত্তির কথা স্মরণ না রাখিলেও তো ভুল হইবে।”

গ্রাম্যসাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই এই ধরণের উক্তি করেছিলেন যদিও তা সংস্কৃতি সম্পর্কিত নয় ; সাহিত্য সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যকে সাহিত্য-বৃক্ষের শিকড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন ; এইভাবে সাধারণ গ্রামীণ সাহিত্যকে তিনি সাহিত্য-মর্যাদা দান করেছেন। বলেছেন—“গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনই সর্বত্র সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোকে প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রদেশের নিম্নস্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ উচ্চসাহিত্য ও নিম্নসাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল ও ডালপালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।”

রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-ধারণার মধ্যে সুপার-স্ট্রাকচার এবং সাব-স্ট্রাকচার—অর্থাৎ সৌধ-চূড়া ও ভিত্তির ধারণা অবশ্যই ছিল না। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে—সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ভিত্তি ও সৌধচূড়ার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না কিন্তু সংস্কৃতি-র অর্থ যদি ‘সংস্কার-সাধন’ হয় তা হলে এ প্রশ্ন না ওঠাই স্বাভাবিক।

গোপাল হালদার স্বাভাবিক কারণেই সমাজ নামক শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়েই সংস্কৃতি বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। কারণ,—সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বিচার করা—চলে না। তাই তিনি আদিমযুগ থেকে শুরু করে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ,—রাষ্ট্র, দাসপ্রথার যুগ, বিজ্ঞানযুগ, বণিকতন্ত্র, পুঁজিবাদের যুগ সম্পর্কে বিশ্ববীক্ষায় পৌঁছেছেন। এরপর—ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের ধারা, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

বহুক্ষেত্রেই তিনি সুনীতিকুমারের অনুগামী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কাব্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান, ধর্মচিন্তা,—ধর্মানুষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ—আচার বিচার প্রভৃতির কথাই বলেছেন ঃ প্রসঙ্গতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মধ্যে শ্রেণী সংঘাতের সূত্রগুলিও বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘বাঙলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ’ প্রসঙ্গে তিনি সুনীতিকুমারের বক্তব্যের বিশদ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু—উক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে লোকসংস্কৃতিচর্চার পটভূমিরূপে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির উপযোগিতার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ‘আধুনিক বাঙলার লোকসংস্কৃতি’ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ‘মধ্যযুগের বাঙালী জীবনযাত্রা যেমন অনেকাংশে (সর্বাংশে নয়) অখণ্ড ছিল, তেমনি পূর্বযুগ ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতিও ছিল অনেকাংশে অখণ্ড।” কিন্তু “ইংরেজ শাসনে বাঙালীর জীবনে ও সংস্কৃতিতে একেবারে ওলোট পালোট হয়ে গেল—পুরনো বাঙালী সংস্কৃতির অতি অল্প অংশই টিকে রইল তারপরে।”

বস্তুতঃ ইংরাজ রাজত্বের ফলে, নগরকেন্দ্রিক রিনাইসান্স, সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন,—প্রভৃতি বাঙালী সংস্কৃতির মোড় ঘুরিয়ে দিল।

প্রকৃতপক্ষে গোপাল হালদারই প্রথম ‘লোকসংস্কৃতি’ শব্দটির উপর গুরুত্ব দান করেন এমন এক সময়, যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঙলা ভাষায় লোকসংস্কৃতি চর্চা শুরুই হয় নি। বিষয়টি তাঁর কাছে বাবুবিলাস ছিল না। বাঙলার লোকসংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ না করেও—লোকসংস্কৃতির আধুনিক রূপটিকে যথার্থভাবেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর পঠন পাঠনের পরিধির বিস্তারই—তাঁকে লোকসংস্কৃতির মর্মমূলে পৌঁছে দিয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তাও বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিল। তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে “ইংরেজ আমলের নতুন বাঙালী সংস্কৃতি লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন। লোকসমাজও এই শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংস্কৃতির রসাস্বাদনে অক্ষম। তারা গান কীর্তন প্রভৃতি নিয়েই সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু এ-যুগে সে-সবে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে না পারায় ক্রমেই সে-সব লোক-শিল্পও ক্ষীণায়ু হয়ে পড়েছে।” এই কারণে তিনি লোকসংস্কৃতির প্রধান শাখাগুলিকে পুনর্গঠিত করে “মুমূর্ষু লোকসংস্কৃতি’ ও ‘ঘুণেধরা ভদ্র সংস্কৃতি’—এই দুই ধারাকে এক জন-সংস্কৃতিতে সমন্বিত করার জন্য পথনির্দেশও করেছিলেন। বলেছিলেন, জারি সারি ঝুমুর গম্ভীরা প্রভৃতি যে অঞ্চলে যা

লোক-গীতি আছে সে অঞ্চলের সে-সব গায়কদের উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য তাদের নতুন কথাবস্তু জুগিয়ে দিতে হবে। দেখতে হবে, এ কথাবস্তু যেন এমন হয় যা লোকের কাছে 'পরের জিনিস' বলে না ঠেকে, কিংবা দলের সূত্র বা শ্লোগান মাত্র না হয়, লোকের ভাষার, লোকের আশা ও অনুভূতির কথা যেন হয়—(যেমন হতে পারে দুর্ভিক্ষের কথা,নেতাদের জেলের কথা, মুক্তিসংগ্রামের কথা, স্বাধীনতার কথা ইত্যাদি)—আবার শুধুমাত্র সম্প্রদায় বিশেষের কথাবস্তু বা অনুষ্ঠানের জিনিস না হয়, যেমন মনসার ভাসান আজ হয়ে উঠেছে···।" আবার এ কথাও বলেছেন যে, এই লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি করে তুলতে পারেন তিনিই যাঁর জন্মগত-ভাবে সৃষ্টিপ্রতিভা আছে ;—যিনি নিজে এই লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে ও শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন।

এ সবই গণনাট্যসংঘের উদ্ভবের আগের কথা। লক্ষ্য করা যাচ্ছে—গোপাল হালদার, সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন রূপ অপেক্ষা সাহিত্য-সংগীত-নাট্যকলা-চিত্রকলার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

কিন্তু সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তার যে শেষ হয়নি তা' বোঝা যায়। তারই জন্য তাঁকে লিখতে হয় আর একটি গ্রন্থ—বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (১৯৫৩)। বস্তুতঃ গোপাল হালদার কে আবার সুনীতিকুমারের অনুগামী হয়ে 'মার্জিত মানসিকতা'-কে সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে দেখা যায়। সুনীতিকুমার—তিনটি জিনিসকে সংস্কৃতির প্রধান সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম হলো মনের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব মাইন্ড) দ্বিতীয় হলো বিশ্বমানবতা (ইউনিভার্সালিজম্), তৃতীয় হলো শালীনতা (আর্বানিটি—এই বিশেষ শব্দটিকে বৈদগ্ধ্য বা নাগরিকতা বলে অনুবাদ করা যেতে পারে)।

সাধারণ ভাবে একেই 'সংস্কৃতির সদর্থ' বলে গ্রহণ করার পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন গোপাল হালদার। কিন্তু এতেও তাঁর সংশয় কাটেনি। লোকসংস্কৃতিও তো সংস্কৃতি! তাকেই বা কোন্ আরবানিটির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে! তাই—সুনীতিকুমারের দৃষ্টিকে ভাববাদী বলে, তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেও বলেছেন—"সংস্কৃতির এই ভাববাদী বিচারকে তবু বলতে হয় পর্যাপ্ত নয়।" বস্তুতঃ গোপাল হালদার—সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের জন্য বারবার বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ কোন আপ্তবাক্যকেও তিনি শেষ আশ্রয় বলে মনে করেন নি। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে 'কৃতি' কথাটাই সংস্কৃতি-র প্রাণবস্তু—আসল জিনিস হলো কৃতি কর্ম বা অ্যাকশান। "In the beginning there was deed-সম্ উপসর্গ দিয়ে আমরা বোঝাতে চাই যে কর্ম শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, তার সম্পূর্ণতা।……বিলিতী কালচার কথাটি যা বোঝায় তার থেকেও বেশী স্পষ্ট করেই সংস্কৃতি কথাটা বোঝাতে পারে এই মূল সত্যটা—মানুষ সৃষ্টিশীল।…তাকে কিছু করতে হয়, কিছু গড়তে হয়, কিছু সৃষ্টি করতে হয়। জগৎকে interpret করলেই যথেষ্ট হবে না, জগৎকে Change করতে হয়। এই হল সংস্কৃতির দাবী—আর তাতেই মনেরও মুক্তি। আর, একেই বলতে পারি সংস্কৃতির সদর্থ।” কিন্তু ‘কৃতি’ শব্দের মাধ্যমে সুনীতি কুমার যা বুঝিয়েছেন,—তাঁর ‘কিরাতজনকৃতি’-তে,—তা যে পাহাড়ীয়া জাতিদের অমার্জিত জীবনধারাকেই তুলে ধরেছে ;—এবং তা যে সংস্কৃতি নয়,—গোপাল হালদার তেমন সংশয়ও প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ গোপাল হালদারের বহু জিজ্ঞাসু মন সংস্কৃতির মত জটিল একটি বিষয়কে নানাদিক থেকে দেখে, বিচার বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হয়েছে। ফলে তাঁর সংস্কৃতি-চিন্তা কখনও স্থাবর স্ট্যাটিক হয়ে পড়েনি। কারণ—সংস্কৃতির রূপান্তর তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন ; লক্ষ্য করতে করতে চলেছেন।

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি সহজভাবে বলেছেন—‘লোকসাহিত্য বলতে আমরা বুঝি folk literature অর্থাৎ যা লোকসাধারণের জন্য রচিত আর যার জন্মউৎস লৌকিক জীবন—কার্যত যা অলিখিত এবং প্রায়ই নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি।” লোকসাহিত্যের মধ্যেও যে ভালো এবং মন্দ দুই-ই আছে,—তাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই এমন কথাও দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে শতকরা ৯৫টি লোককবিতা বা লোকগীতি সাহিত্য হিসাবে আসলে শুধু গ্রাম্যই নয় ‘অচল’। বস্তুতঃ ‘সংস্কৃতির রূপান্তরে’ তাঁর সংস্কৃতি চিন্তা-যা ছিল,-সেইখানেই তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাই ‘বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ’ গ্রন্থে সংক্ষেপে হলেও আবার তিনি সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাববার পথ প্রশস্ত করে দিলেন। বাঙলা লোক-সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করেও তার আলোচনার পথ খুলে দিলেন অনেক প্রশ্নের মাধ্যমে।

॥ ৩ ॥

একেবারে জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসেও তাঁর সংস্কৃতি চিন্তা যে স্থবির হয়েও পড়েনি,—তাঁর ভাবনা চিন্তা তখনও যে গতিশীল,—তা-ও বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করতে হয়। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ডাঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ‘লোকসংস্কৃতির

তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন, গোপাল হালদার। গ্রন্থের দীর্ঘভূমিকা-তেও তিনি তাঁর বহু পুরোনো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। এমনকি 'কৃষ্টি'-শব্দের—উপযোগিতা সম্পর্কে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের অভিমতকে তিনি তুচ্ছ বলে মনে করেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আর নতুন করে ভাবতে চান নি এই কারণে যে 'সংস্কৃতি' শব্দটি যে কারণেই হোক্ না কেন, কালচার-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। গোপাল হালদার 'সংস্কৃতি' শব্দের বিভিন্নার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে,—বললেন—'সর্বাপেক্ষা যে অর্থে সংস্কৃতি শব্দটা আমরা বাঙালীরা ব্যবহার করি, তা মার্জিত ও গৌরবের হলেও ব্যাপক নয়। প্রায়ই শিল্প সাহিত্য অর্থে—সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা, নাট্যাভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি যা মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৃষ্টি তার অনুশীলন, সে সকলকেই আমরা সংস্কৃতির বিষয় বলে বুঝি। নিশ্চয়ই ঠিক বুঝি। সংস্কৃতির আর-ও কিছু ব্যাপক অর্থ আছে, তা-ও তিনি মানেন, কিন্তু তার গুরুত্ব সাহিত্য-শিল্প সংগীত-চিত্রকলা-নৃত্যকলা অর্থেই,—এ কথাও তিনি বেশ জোর দিয়েই মানেন। এই অর্থে লোকসংস্কৃতি-ও ঐ সব মানসিক সৃষ্টিকলার সঙ্গেই জড়িত। বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতির বিষয় বললে,—ঐ সবই গ্রাহ্য। মুখ্যতঃ লোকসংগীত, লোকসাহিত্য—(লোককথা, প্রবাদ-ধাঁধা, কিংবদন্তী প্রভৃতি, লোকনাট্য, লোকচিত্রকলা পট-আলপনা, দেওয়াল চিত্রণ প্রভৃতি)—লোকবাদ্য-লোকশিল্প প্রভৃতি—লোকসংস্কৃতি নামে প্রসিদ্ধ। একে অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু যখন তিনি বলেন, 'সামাজিক জীবনযাত্রার রূপ-ই (a way of life) সংস্কৃতি, তখন তা' অবশ্যই বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কারণ—'way of life' বলতে শুধু পরিমার্জিত পরিশীলিত জীবনধারা বোঝায় না;—গ্রামীণ পরিমণ্ডলে উদ্ভূত অনেক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসও তার পরিমণ্ডলে চলে আসে—রবীন্দ্রনাথ যে-সব ধারণা ও আচরণকে 'গ্রাম্যতা' বলেছিলেন এবং গোপাল হালদারও তার সমর্থন করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যা 'ফোক্লোর' নামক বিষয়ের ব্যাপক পরিমণ্ডলে বিচার্য,—তা' কেবলমাত্র মানসিক সৃষ্টিসম্পদ নয়, তার মধ্যে প্রবহমান বা ট্র্যাডিশনাল অন্ধ-বিশ্বাস কুসংস্কার—ডাইনী-ভূতপ্রেত-ষষ্ঠী-ওলাবিবি মন্ত্রতন্ত্র তুক্তাক যাদুবিশ্বাস—মারণ উচাটন, পূজা-পার্বণ বলিদান অন্ধ ধর্মাচার—সহজিয়া যৌনাচার,-এবং আরো অনেক কিছুই তার আলোচ্য বিষয়। এই কারণেই ফোকলোর-এর বাঙ্লা প্রতিশব্দ 'লোকসংস্কৃতি' নয়; হওয়া উচিতও নয়, যদিও 'লোকসংস্কৃতিও

ফোকলোর-এর বিশেষ একটি দিক। গোপাল হালদার অবশ্যই, ঐ ভূমিকা লেখার সময় সচেতন ছিলেন যে—ফোকলোর-এর প্রতিশব্দরূপে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি যথাযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এবিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করে 'লোককৃতি' নামক একটি শব্দের কথাও ভেবেছিলেন,—যা ফোকলোরের প্রতিশব্দ হতে পারে।— "হয়তো লোককৃতি শব্দটাই সবচেয়ে যোগ্য ছিল—কারণ লোকজীবনের গীত-গাথা-কাব্য-কথা-নৃত্য-চিত্র ইত্যাদি থেকে বাস্তব জীবনযাত্রা ও সমস্ত বস্তু উপকরণই বোঝায় কৃতি শব্দটায়—আর শিক্ষা সাপেক্ষতার ধারণাও তাতে নেই।" এক্ষেত্রেও তিনি সংস্কৃতি শব্দটিকে তার প্রচলিত অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং 'কৃতি' শব্দটিকে 'লোক' শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত করে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দরূপে গঠন করতে চেয়েছেন। সুনীতিকুমারের 'কিরাতজন কৃতি'-এ কথা তাঁর মনে পড়াই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু কি কারণে তিনি লোককৃতির কথা ভেবেও শেষপর্যন্ত শব্দটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। বস্তুতঃ 'কৃতি' শব্দটির অর্থ, কাজ এবং 'কার' দুই-ই হতে পারে। আকার-বিকার এবং আকৃতি-বিকৃতি মূলতঃ একই। সুকৃতি বললে, ভালো কাজ বোঝায়, দুষ্কৃতি অর্থে খারাপ কাজ। লক্ষ্য করা যায় কোন উপসর্গ ছাড়া কৃতি শব্দটি একটি খঞ্জ শব্দ। ফোকলোরের—যাথার্থ্য বোঝাবার ক্ষমতা তার নেই। কারণ, যে-কোন কাজই ফোকলোর অথবা ফোককালচারের অঙ্গভূত-, এ ভাবনা, ঠিক নয়। A way of life-এ-ও 'বিশেষ ধরণের জীবনযাত্রা'র ইংগিত আছে; জীবনযাত্রার সব কিছুই তার মধ্যে পড়ে না। যেমন, লাঙল চালানো, শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, খাল কাটা, স্নান করা, ঘুমোনো, খাওয়া প্রভৃতি কাজ ফোকলোরের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ক্ষেত্রপূজার অনুষ্ঠান, গঙ্গাপূজা, শিকার-উৎসব, ধর্মীয় স্নান,—প্রভৃতি ফোকলোরের বিষয়বস্তু। তাই গোপাল হালদার যখন 'সমুদয় কৃতি' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে আবার ফোকলোর-এর প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করেন, তখন বলতেই হয়, সমুদয় কৃতি, নয়—সম্যক্ কৃতি-ই সংস্কৃতি।

সাধারণভাবে এ-ও তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে সংস্কৃতি গবেষকরা—কোন একটি শব্দ নিয়ে খেলা করেন বেশী;—সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করেন কম। গোপাল হালদারের গবেষণা আমাদের শিখিয়েছে—চিন্তা করতে; সংস্কৃতিকে বিলাসচর্চার মধ্যে ফেলতে নয়। তবু, তাঁকে ভাবতে হয়েছে যে ফোকলোরের একটি প্রতিশব্দ থাকা উচিত। কিন্তু তা কি হবে? লোককৃতি! গোপাল হালদার নিজেই তা' বাতিল করেছেন। সম্ভবতঃ এই সব অকারণ

ব্যাপারে শেষ বয়সের সীমায় এসে তিনি,—শেষপর্যন্ত 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' মনে করে ঘুরে ফিরে আবার 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিকে ফোকলোরের 'কাজচালানো' শব্দ বলে সম্মতি দিলেন। বললেন—লোকসংস্কৃতি (ফোকলোর অর্থে) শব্দটা যখন চলে গেছে তখন মনে হয় ওটা গ্রাহ্য হতে পারে—বিশেষতঃ সম উপসর্গের দ্বারা আভাসিত হতে পারে সমুদয় লোক-সমুদয় (ব্যক্তি বিশেষ নয়) এবং 'কৃতি সমুদয়'—এই অর্থ, অন্তত আমি তাই মনে করি। সমুদয় অর্থ বোঝাতেই লোকসংস্কৃতিতে folklore অর্থে চলুক, যখন চলে গেছে, অন্তত যতদিন না সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষার প্রচলন হচ্ছে।'—বস্তুতঃ শিল্প-সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে যিনি লোকসংস্কৃতি-র কথা বলেছেন; তিনি কেন যে, ফোকলোর অর্থেও তার প্রয়োগ করতে চাইলেন,—তা বোঝা যায় না। অনুমান করা যায়,—আধুনিককালের ফোকলোর-এর বৃহৎ পরিমণ্ডল সম্পর্কে তিনি তেমনভাবে অবহিত ছিলেন না,—তা'হলে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন গ্রামীনজীবনের নানা কুৎসিত আচরণ,—প্রভৃতিও যে ফোকলোরের বিষয়বস্তু,—সে-ই ফোকলোরের প্রতিশব্দ হতো না লোকসংস্কৃতি। গোপাল হালদার যে এ বিষয়ে সংশয়ে পড়েছিলেন, তা বোঝা যায়—'চলুক, যখন চলে গেছে,—অন্তত যতদিন না সর্বজন গ্রাহ্য পরিভাষার প্রচলন হচ্ছে'—ত'ার এই উক্তিতে। বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতি যে ফোকলোরের প্রতিশব্দ রূপে প্রচলিত হয়ে গেছে—তাও ঠিক নয়।

অনেক আগেই ত'ারই গুরু সুনীতিকুমার ফোকলোর-এর প্রতিশব্দ করেছিলেন 'লোকয়ান'। ত'ার ব্যাখ্যাও ছিল এই যে—'যান' শব্দটি 'যা' ধাতু থেকে উদ্ভূত—যার মধ্যে চলমানতা বা ট্র্যাডিশানের ব্যঞ্জনা আছে এবং বৌদ্ধমতে হীনযান, মহাযান—শব্দ দুটি way of life হিসাবেই প্রচলিত ছিল। তাই লোকয়ানের অর্থ a way of the life of the people. সুনীতিকুমার কখনও লিখিতভাবে শব্দটিকে বাতিল করেন নি। 'লোকযান' শব্দটিও এখন অপ্রচলিত নয়। 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' (folk lore of western Bengal) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া 'উত্তরবঙ্গ লোকযান' নামক প্রতিষ্ঠান ও মুখপত্র সংস্কৃতি বিলাসীদেরও অজানা নয়। তাই ফোক্‌লোরের যথার্থ বাঙলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত লোকযান। 'লোকসংস্কৃতি' যে ফোকলোরের যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ নয় তা অবশ্যই গোপাল হালদার স্বীকার করেছেন।

বিদ্যাগ্রহী মনীষী গোপাল হালদার যে কত বেশী চলিষ্ণু ছিলেন, চিন্তায়-ভাবনায় কত বেশী মননশীল ছিলেন—সে কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁকে এক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু কোনভাবেই তা' আপ্তবাক্যতে পরিণত হয় নি। তাঁর নিজস্ব বিচার বিশ্লেষনের ধারা-কে যথার্থভাবেই গোঁড়ামিহীন দৃষ্টিভঙ্গী বলা যায়। তাঁর "বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসবোধ, পরিচ্ছন্ন মনন, গোঁড়ামিহীন দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শোষণ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠা"—তাঁকে প্রকৃত পক্ষেই 'অজাতশত্রু' করে রেখেছে।

আকর-গ্রন্থ ঃ সংস্কৃতির বিশ্বরূপ (গোপাল হালদার) ঃ কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি নীহার রঞ্জন রায়; সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়); লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ (সুধীরকুমার করণ)

সাহিত্য-সমালোচক গোপাল হালদার

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারের বোধহয় আলাদা কোন সমালোচক-সত্তা ছিল না, এক্ষেত্রেও তিনি একজন সৃষ্টিশীল লেখক। একজন উদার ও হৃদয়বান আলোচক। বুদ্ধির ধার তাঁর রচনায় অবশ্যই আছে, যুক্তি ও বুদ্ধিকে ক্ষুরধার অসির মতো তিনি সর্বদা ব্যবহার করতেও পারতেন। কিন্তু তাঁর মনের সহজ প্রসন্নতা তাঁকে কখনো নিষ্প্রাণ বুদ্ধিজীবী সমালোচকে পরিণত করে নি। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার আড়ালে নিঃসন্দেহে একটি মতবাদের উপস্থিতি রয়েছে, তবে সরোজ আচার্য সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছিলেন গোপাল হালদার সম্পর্কেও সেটা অনায়াসে বলা যায়, "তাঁর সাহিত্যিক মতবাদ উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু অনুভব করতে হয় এ মতবাদগ্রস্ত লোক নয়।"[১] সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে মতবাদের ভূত কখনো গোপাল হালদারকে তাড়া করে নি, বলা চলে তিনি তাড়া করতে দেন নি। পার্টির নির্দেশ বা গোষ্ঠীর নির্দেশ মেনে সাহিত্য রচনা করা মনে প্রাণে যে তিনি অনুমোদন করতেন না, তার প্রমাণ আছে। 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' সঙ্গে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন কিন্তু শিল্প-সাহিত্য জগতের মতাদর্শগত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। সেযুগের বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি বা সাহিত্য সম্পর্কিত অনেক ধারণা তিনি মেনে

নিতে পারেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিও করেছে, "ডকট্রিনিয়ারিজম্ (মত সর্বস্বতা) শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন দিনই মেনে নিতে পারি নি।"[২] প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে কখনোই তাঁর আগ্রহ ছিল না। তা ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম বিরোধী। প্রগতি লেখক সংঘে তারাশঙ্কর বা বিষ্ণু দে-র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ঝ্‌দানভ-আরাগ' বনাম রজার গারোদিদের নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে অথবা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' পত্রিকার ৮টি সংকলনে শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ণের প্রবল আলোড়নের সময়ও তিনি প্রায় নীরব। 'মার্ক্সবাদী'র কোন সংকলনেই তাঁর ছদ্মনামেও কোন লেখা নেই। অবশ্য তাঁর মনের কথা ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য লিখিত "কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব" নামক রচনাতেই বলা হয়ে গিয়েছিল, 'শিল্প মানে কোনো নীতি বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। শিল্পীর কাজ হল বাস্তব (Concrete) নিয়ে—মানুষ নিয়ে। সে মানুষ নানা সূত্রে বাঁধা, তার মনুষ্যত্ব জটিল বিচিত্র, ভালোবাসায় দেশভক্তিতে লোভে ভয়ে সব জড়িয়ে সে এক একটি বিশেষ মানব (Individual)। তাই আমাদের শিল্পীরা এই পার্টি শ্লোগান বলবার ঝোঁকে শিল্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান, মানে রূপ সৃষ্টি করতেই ভুলে যান। তাঁদের গান, ছবি, নাটক, কবিতা তাই অনেক সময় হয় নিষ্প্রাণ, হাস্যকর। অথচ কমিউনিজম্-এ জ্ঞান থাকলে এ ভুল ঘটতেই পারে না।''[২ক]

শেষের পংক্তিটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কমিউনিজম্ থেকে এক পাও সরে যেতে রাজি নন গোপাল হালদার। কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য অনেকের থেকেই কমিউনিস্ট কালচার সম্পর্কে তাঁর ধারণা আলাদা, "সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা, শ্রমিকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মানবতার বাহক, পরিপোষক। কিন্তু সংস্কৃতির মহত্তর রূপান্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা। কিন্তু প্রশ্ন হইবে সংস্কৃতির মহত্তর রূপের অর্থ কী? কী সংস্কৃতির লক্ষ্য? হয়তো এক কথায় বলিলে তাহা নতুন কালের অর্থে সেই চিরকালের উত্তর, 'মানুষ।'[৩] অবশ্যই এই মানুষ মার্কসের Complete Man বা সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁর উপন্যাসের নায়ক অমিতও এই কারণেই জানিয়েছিল, 'আমি মনুষ্যবাদী···আর এ যুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম।' সাহিত্যে জীবনসত্য ও মানবসত্যের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে কিনা সমালোচক গোপাল হালদার তার সন্ধানেই আগ্রহী। তাই তাঁর মতে প্রকৃত কমিউনিস্ট-কর্মীর কাজ হল, "শিল্পী ও লেখকদের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করা। সচেতন হলে সেই সত্য কিভাবে শিল্পে-সাহিত্যে

রূপ দিতে হবে, তা তাঁরা নিজেরাই ভালো জানেন। আমরা শুধু শিল্পী ও লেখকদের যোগাব সত্য তা হলেই হবে।”[৪] এই 'সত্য' শব্দটিকেই সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গোপাল হালদার বারেবারেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। সোভিয়েত লেখক নিকোলাই টিখোনোভ্-এর 'hero of our literature is truth', এই বাক্যটির প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। সত্য অর্থে জীবনসত্য। তাঁরই নিজের ভাষায় “সাহিত্য মানেই সেই জীবন জিজ্ঞাসা, জীবনরস স্বীকৃতি–বিপ্লবী বাস্তববাদ এ সত্যই জিজ্ঞাসুর চোখে আরও পরিষ্কার করে তোলে।”[৫] যেখানে এই জীবনজিজ্ঞাসা বা জীবনরসের স্বীকৃতি তাকে সাদরে বরণ করতে সমালোচক গোপাল হালদারের কোন দ্বিধা নেই। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধিতা রয়েছে এমন সাহিত্যকেও অভিনন্দন জানাতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাস-সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নটি ধরা যেতে পারে। 'জাগরীর' কমিউনিস্ট চরিত্র নীলু-র প্রতি সতীনাথের বিরূপতা সহজেই চোখে পড়ে। 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠায় এজন্য লেখক সমালোচিতও হয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন, “বিলুর সহিত নীলুর বিরোধে তাঁহার পক্ষপাত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি গোপন রাখিতে পারেন নাই”, আর গোপাল হালদারের আক্রমণ আরও তীক্ষ্ণ, “মাইয়োপীয়া পীড়িত অলডাস হাক্সলি যেমন আক্রোশের বশে তাঁর প্রায় উপন্যাসেই কোনো ব্যর্থ ও বিকলাঙ্গকে কমিউনিস্ট করেন, মনে হবে, এক্ষেত্রে 'জাগরী'র লেখকও তেমনি একটা মনোভাবের চোরা বালিতে আটকে গেছেন।”[৬] কিন্তু কমিউনিস্ট নীলু চরিত্র অংকনের জন্য তিনি সতীনাথকে যতই তিরস্কার করুন না কেন, তাঁর সমালোচক-সত্তা এক্ষেত্রেও “মতবাদগ্রস্ত” হয় নি। কমিউনিস্ট নীলুচরিত্র অংকনে লেখকের ব্যর্থতা যেমন তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে, তেমনি গান্ধীবাদী পিতার চরিত্র অঙ্কনে সতীনাথের সাফল্যে তিনি উচ্ছ্বসিত, “বাংলা সাহিত্য সত্যকারের এমন একটি মহৎ চরিত্র এই বোধ হয় প্রথম পেল–খাঁটি গান্ধীবাদী মানুষ, শুধুমাত্র ছাঁচে ঢালা মানুষ নয়, কোনোরূপ বিকৃত বা কৃত্রিম নয়।”[৭] কোনো দলীয় চরিত্র আঁকাতে গোপাল হালদারের আপত্তি নেই, কিন্তু সে যেন নিছক ছাঁচে ঢালা মানুষ না হয়। নীলু ছাড়া জাগরীর আর কোনো চরিত্রই নিছক মতবাদগ্রস্ত নয়, তারা বৃহত্তর জীবনের উপাসক। তাই তিনি জাগরীর চূড়ান্ত মূল্যায়নে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, “জাগরী'র লেখককে তবু অভিনন্দন জানাতে হবে অকুণ্ঠচিত্তে, কারণ রাজনৈতিক উপন্যাসের মূল তিনি পরিষ্কার করে নির্দেশ করেছেন–সে হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। উপন্যাস শুধু

জীবন্তকালের প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে তা নয়, এ উপন্যাসে জীবনের বাণীও রূপ নিয়েছে। সে বাণী মানুষ—মানবসত্য”।[৮] উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। কমিউনিস্ট বিদ্বেষী লেখক হিসেবে দীপক চৌধুরী বামপন্থী মহলে তখন প্রবলভাবে ধিক্কৃত। তাঁর ‘পাতালে এক ঋতু’ উপন্যাসটিকে কমিউনিস্টদের পক্ষে সঙ্গত কারণেই মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয় নি। উপন্যাসটি গোপাল হালদারেরও সমর্থন পায়নি। কিন্তু একই সঙ্গে দীপক চৌধুরীকে চিরকালের মতো ধিক্কৃত লেখক বলে চিহ্নিত করতেও তাঁর আপত্তি। এবং তিনি সাগ্রহে তাঁর মতবাদ-পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন এবং কোনো নিদর্শন পেলেই তাকে স্বাগত জানান। তাই ‘পাতালে এক ঋতু’ গ্রন্থের লেখকের পরবর্তী কালের উপন্যাস ‘ঝড় এলো’ পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল, “দীপক চৌধুরী মুখ ফেরাচ্ছেন। তাঁর ভাবনা ও কল্পনা-কুশল মন যখন জীবনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে তখন তাঁর সৃষ্টিশক্তি যথার্থ সার্থকতা অর্জন করবে। নিশ্চয়ই সেজন্য অপেক্ষা করবে সাহিত্য রসিকেরা (পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬৩)।” এই উদার, সত্যনিষ্ঠ ও মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিই সমালোচক গোপাল হালদারের জাত আলাদা করে দিয়েছে।

দুই

আত্মসমালোচনায় গোপাল হালদার সবসময়ই অকুণ্ঠ। তাই দলীয় সাহিত্যিকদের রচনাকেও তিনি সহজে ছেড়ে দেন না। বিশেষ করে তাঁদের সম্পর্কেই তিনি যেন বেশি সতর্ক। কেননা যে মার্কসবাদী সে অনিবার্যভাবেই মনুষ্যবাদী। তাই যেখানে মার্কসবাদীদের রচনা নিছক মতবাদ প্রচারে পর্যবসিত সেখানে তিনি ক্ষমাহীন। সমসাময়িক প্রগতিশীল ঔপন্যাসিকদের একাংশের সমালোচনা করেছেন তিনি এইভাবে, “মার্কসবাদীদের হাতে উপন্যাস ডকুমেন্টারি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য—আখ্যান, চরিত্র এবং প্রকাশরীতি তাদের বক্তব্যের বাড়াবাড়িতে প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র বক্তব্যের জোরে অবশ্য উপন্যাস উপন্যাস হয় না তার প্রমাণ আমাদের প্রগতিবাদী লেখকদের লেখা।”[৯] মণীন্দ্র রায়ের ‘অন্যপথ’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় সামগ্রিকভাবে আধুনিক বাংলা কবিতা এবং বিশেষভাবে প্রগতিশীল কবিতা সম্পর্কে গোপাল হালদারের মতামত সুস্পষ্ট, “রবীন্দ্রোত্তর যুগে যুগোত্তীর্ণ কবিই আমরা পাই,

মাইনর থেকে যাঁরা গ্রেট মাইনর হবার সাধনা করছেন, এমন কবি।" ওই একই প্রবন্ধে তিনি কবিদের দুটি ভাগে ভাগ করে তাঁদের আখ্যা দেন, 'একলা কবি', ও 'জনতার কবি'। বোধ হয় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এটি নতুন সংযোজন। সামাজিক অভিজ্ঞতা যেখানে কবির ব্যক্তিচেতনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সেখানে কবিত্বেরও সার্থক প্রকাশ, নইলে 'জনতার কবি'র কবিতা হত বক্তৃতা।··· কাব্যবস্তু ও প্রকাশভঙ্গি (বিশ্লেষণ সাধ্য হলেও) অখণ্ড, দুয়ে মিলেই সৃষ্টি।' ঝ্দানভ-আরাগঁ এবং গারোদি বিতর্কে যোগদান এবং 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্র গুপ্তের নেতৃত্বে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে মার্কসবাদের নামে একবাক্যে নস্যাৎ করার প্রবণতা—এই দুইয়েই তাঁর সমান অনাগ্রহের কারণ বুঝতে এবার আর অসুবিধা হয় না। এব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। গোপাল হালদারের জানা ছিল যে তাঁর বিপক্ষ দল আক্রমণ করবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। তাই পরিচয়ের কার্তিক ১৩৫৫ সংখ্যায় 'সংস্কৃতির সঙ্কট' সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্যও (বাঙালী সংস্কৃতির এ 'সংকট' আসলে সংকট নয়, বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবি, বাঙালী মজুর-কৃষক-বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কৃতি রূপে বিকাশোন্মুখ) তাদের কাছে রেহাই পায় না। প্রকাশ রায়ের ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনায়' (মার্কসবাদী চতুর্থ সংকলন, জুলাই ১৯৪৯) সরাসরি রায় দেন, "গোপালবাবুর জবাব বুর্জোয়া যুক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ—তাঁর সিদ্ধান্ত আদর্শগত সংগ্রাম বর্জনেরই সিদ্ধান্ত।"

অভিজ্ঞতার এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নৃত্যনাট্য 'ভারতের মর্মবাণী' দেখে গোপাল হালদার অভিভূত। তাঁর দুই অ-কমিউনিস্ট সাহিত্যিক বন্ধু সজনীকান্ত দাস ও বনফুলও এই নৃত্য দেখে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার কথাই তিনি লিখেছিলেন 'পরিচয়' (ফাল্গুন ১৩৫১) পত্রিকায়। কিন্তু সেখানেও ক্ষমা নেই। গোপাল হালদার যেহেতু এর মধ্যে ভারতের চিরন্তন মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন তাই তীব্র কটাক্ষের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, "এই নৃত্যনাট্যের, 'মর্মবাণী' আসলে জওহরলাল 'আবিষ্কৃত' ভারতেরই প্রেতাত্মা।" আর তিনি এই ধরণের মতামত প্রকাশ করেন বলেই 'মার্কসবাদী'র লেখক অনায়াসে গোপাল হালদার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "বুর্জোয়া ভাবধারা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদদের সম্পর্কে তাঁর লেখনী শাণিত হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে।"[১১] এক অর্থে এই অভিযোগ

হয়তো সত্যি। কোনো পূর্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি প্রগতি শিবির থেকে নির্বিচারে সকলকে বহিষ্কারে সম্মত ছিলেন না। প্রগতি সাহিত্যের ধারাকে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু বলে মনে করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই মূল ধারার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলাটা তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখার কাজে প্রধান অবদান ছিল অজাত শত্রু গোপাল হালদারের—মাঝে মাঝে তাঁকে 'সর্বঘটে কাঁঠালি কলা'র মতো ব্যবহার হয়তো আন্দোলন করেছে কিন্তু হাসিমুখে সর্বাধিক কর্মে যোগ দিতে কুণ্ঠিত তাঁকে কখনো দেখা যায় নি।"[১২] নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন বলে কোন তিরস্কার বা সমালোচনায় গোপাল হালদারকে বিচলিত দেখা যায় নি। রবীন্দ্র গুপ্তদের রবীন্দ্র বিরোধিতার জবাব তিনি দিয়েছিলেন তাঁর নিজের মতো করে,..."যখন দেখেছি বাংলা সাহিত্য 'ঔপনিবেশিক অভিশাপে' কতটা ব্যাহত ও বিকৃত আর রবীন্দ্রনাথও সেই পরিবেশেরই মানুষ হিসাবে কোথায় অসম্পূর্ণ ও কতটা অবাস্তব তখনও জানি-মোটের উপর এই বাংলা সাহিত্য এই ভাঙন ধরা বাঙালী জাতির এক প্রধান আশ্রয়, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদ শুদ্ধ এক অনলস অগ্রগামিতার প্রতীক।"[১৩] এখানেও কিন্তু মানবতার আদর্শটিকেই সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম মানদন্ড হিসেবে তিনি দেখেছেন। একটি নির্দিষ্ট কাল ও দেশের আধারে সকল দেশের জীবনসত্যের ও মানবসত্যের স্বরূপসন্ধানে যে লেখক সার্থক তিনিই মহৎস্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ এখানে এই মাপকাঠিতেই বিচার্য হয়েছেন। এই কারণেই 'ঘরে বাইরে' বা 'চার অধ্যায়ের' মতো উপন্যাসে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত যখন তীব্রভাবে আক্রান্ত হয় তখনও গোপাল হালদার অন্যান্য অনেকের মতো আবেগের দ্বারা তাড়িত হন না, বরং এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পান, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যে বিশেষ পথটি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সেটি বিশেষ করে আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথ, আবেদনের নিবেদনের পথ নয়, সৃষ্টিমূলক জাতীয় সাধনার পথ, ধ্বংসমূলক বিদ্রোহের পথ নয়। এ রাজনীতিকে বলা যায় সৃষ্টিমূলক রাজনীতি—ক্রিয়েটিভ পলিটিক্স।"[১৪] রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত প্রসঙ্গে 'সৃষ্টিমূলক রাজনীতি' কথাটি বাংলা সাহিত্যে গোপাল হালদারের নিজস্ব সংযোজন।

তিন

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সমালোচনায়ও তাঁকে নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হতে দেখা যায়। সেখানে তিনি তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক নন, সেই মর্যাদার যথার্থ অধিকারীদের গোপাল হালদার যথাযোগ্য সম্মান করেন, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বদা মানেন না। 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'-র ১ম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও সুস্পষ্ট, "আধুনিক ভারতবর্ষে বাঙালীর পরিচয়—তার সাহিত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামে। মূলত তা একই সত্যের দুপিঠ। বাঙালীর পক্ষেও তা ছিল একই প্রেরণার দুই ধারা, একই সাধনার দুই দিক, সে প্রেরণা আত্মপ্রকাশের প্রেরণা, সে সাধনা আত্মবিকাশের সাধনা।" তাই সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা নির্ণয় করতে বসে তিনি সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কোনো ধারাকেই অবজ্ঞা করতে চান নি। কারণ, "বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসও বাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা।" এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলেই অনেকক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত আলাদা হয়ে যায়। তাই চর্যাপদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়, 'যুক্তিবাদী, রসিকতাপ্রিয়, বাস্তব-নিষ্ঠ বাঙালী মনের পরিচয় পাব এমন প্রাচীন সাহিত্য টিকে নেই।' তুর্কী আক্রমণোত্তর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনিই প্রথম একটা ব্যাপক অর্থে 'শাসক-ধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাসিত-সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য' আখ্যা দেন। এই একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অথবা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর নানা অত্যাচারের কাহিনীর উল্লেখের রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন আর তাকে নিছক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বিচার করা সম্ভব হয় না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসকদের আনুকূল্যে হিন্দু লেখকদের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির চমকপ্রদ ব্যাখ্যা তিনি করেন এইভাবে, 'বলতে গেলে 'বাঙালীর' একটা রাষ্ট্র, জাতি বা নেশন হয়ে ওঠার মতো অনুকূল অবস্থা তখনই দেখা দিয়েছিল।' সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে যে এর প্রত্যেকটিই নতুন কথা। বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য সম্পর্কেও প্রচলিত আবেগ বা উচ্ছ্বাসের তিনি বশবর্তী নন। বরং কাব্য সৌন্দর্যের বিচারে মাত্র কয়েকটি পদকেই তাঁর রসোত্তীর্ণ বলে মনে হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতেও তাঁর কোনো দ্বিধা নেই, 'একই রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর অতি সুচিহ্নিত কয়েকটি ঘটনা ও ভাবকে নিয়েই

এই অজস্র পদ রচিত—তাই পদাবলীতে একঘেয়েমি অবশ্যম্ভাবী। সে একঘেয়েমি আরও বেড়ে যায় রসতত্ত্বের নিয়মে বাঁধা নির্দেশের জন্য, এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মে বাঁধা কাব্যরীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতির আতিশয্যে।"

সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান বা রোসাঙের রাজসভার মুসলমান কবিদের রচনার বিশ্লেষণও গোপাল হালদারের সম্পূর্ণ নিজস্ব, 'বুঝতে পারি বাঙলা সাহিত্য আর শুধু হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহিত্য নেই, ওই সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দু মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠেছে।' প্রতিরোধের সাহিত্য কিভাবে সংযোগের সাহিত্য হয়ে ওঠে এটা তাঁরই প্রথম চোখে পড়ে। সৈয়দ আলাওলের মূল্যায়নেও গোপাল হালদার নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন, "তাঁর কাব্যে বাংলা কবিতা নব্য ক্লাসিকতায় সমৃদ্ধ, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণে পরিচ্ছন্ন, বুঝতে পারি—বাঙলা কবিতার শৈশব শেষ হয়েছে, এবার সে আপনার রূপকে চিনে উঠতে পারছে। পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ ও ধর্ম সংস্কার মুক্ত আধ্যাত্মিকতায় আলাওল যেমন সভ্য মানুষের (Civilized man) কবি, এমন আর মধ্যযুগের কোনো বাঙালী কবিকে মনে হয় না। শেষ কথা এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা আলাওল বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপয়িতা।" প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসে আলাওলকে মানবীয় প্রেমকাহিনীর প্রবর্তয়িতা বলা হয়েছে। কিন্তু গোপাল হালদারের কাছে যেহেতু সাহিত্য আত্মবিকাশের সাধনা তাই কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরই নয় উনবিংশ শতাব্দীতেও যে যে লেখকের রচনায় সমগ্র জাতির আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিকাশ ঘটেছে একমাত্র তাঁদেরই তিনি আলাদা গুরুত্ব দিতে চান। 'মেঘনাদ বধ' তাঁর কাছে মহত্তম সাহিত্য কারণ তা 'বাঙলার নবজাগরণের নিগূঢ় অন্তর্জীবনের চিত্র—নবজাগরণের নেতাদের মুখচ্ছবি রাবণের মুখে, ইন্দ্রজিতের মুখে, প্রমীলার মুখে এবং চিরন্তনী বঙ্গনারী সীতার মুখেও।'[১৫] এখানেই তিনি থামেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে মেঘনাদবধের জনপ্রিয়তার যে কারণটি তিনি নির্দেশ করেছেন সাহিত্য বিচারের প্রচলিত মাপকাঠিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা। রাম বা লক্ষ্মণের তুলনায় রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ যে বাঙালীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠল তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। "কোনো গভীর ও গহন, বিরাট ও ব্যাপক রাষ্ট্রিক সামাজিক বিদ্রোহ-চেতনা যদি বাঙালি সাধারণের অন্তরে না থাকত তাহলে তারা রামের শত্রু রাবণ ও রাক্ষসদের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য আত্মীয়তা অনুভব করত না, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার কোনো সুখ-দুঃখ, বেদনা—

অনুশোচনা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করত না—মেঘনাদবধ হত না কিছুতেই গ্রাহ্য বাঙালি পাঠকসমাজে। এইখানেই মেঘনাদবধের তাৎপর্য নিহিত—পাঠকের দিক থেকে বিচার করলে যা পণ্ডিতদের বুঝতে বেগ পেতে হত না। মেঘনাদবধ কাব্য বাঙালি কবির এই প্রথম সার্থক রাজনৈতিক প্রতিবাদ।"১৬

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের জনক বলেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কোন্ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই গীতিভাবনার অবতারণা তাও তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। বিহারীলালের অন্তর্মুখিনতা যে উনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন মধ্যবিত্ত বাঙালীর নৈরাশ্য, পলায়িনী মনোভাব এবং বাস্তব বিমুখতার ফলশ্রুতি এটা গোপাল হালদারের নিজস্ব ব্যাখ্যা। যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদে পদে পরাভূত তাদের পক্ষে যুগধর্মের প্রেরণায় মনে মনে উদ্বেলিত হয়ে না উঠে উপায় কি? বিহারীলালও তাঁর লিরিক সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন, "আমাদের বাস্তববিমুখ জাতীয় পরিস্থিতিতে।"১৭ কেন গোপাল হালদারের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাহিত্য সাধনা সামর্থক হয়ে ওঠে মধুসূদন ও বিহারীলালের সাহিত্য আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়। এই ব্যাপক ও উদার মানসিকতাই তাঁর সাহিত্য সমালোচনার মূল ভিত্তি। তাই 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় অথবা অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম মানসে' যে মনগড়া-কাঠামোয় বঙ্কিম-বিচার চোখে পড়ে তার সীমাবদ্ধতা তিনি লেখকদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেন, "প্রতিভা ছকে ধরা পড়তে চায় না, আর যখন ধরা পড়ে তখন আর তা সৃজনী প্রতিভা থাকে না, বড় জোর Constructionist কারুকলা হয়, creative নয়। বিশেষ বঙ্কিম শুধু স্রষ্টা নয়, তিনি আবার জীবনরচনার দায়িত্বও গ্রহণ করতে অগ্রসর হবেন। সেই creative process বা কারয়িত্রী চেতনা বঙ্কিম এগিয়ে নিয়ে চলতে চলতে আপনার নিয়মেই ভাবতে বসেছে জগৎ ও জীবনের ভাবনা। তাতে বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী চেতনার সঙ্গে কারয়িত্রী চেতনার ক্রমেই দ্বন্দ্ব মিলনের পালা আরম্ভ হবে। বঙ্কিম-প্রতিভার সেই জটিল চরিত্র অস্বীকার করা অসম্ভব।"১৮

চার

এই ধরনের মোহমুগ্ধ ও নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য তাঁকে নেতৃত্বের কাছে সরকারীভাবে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। একে বলা হয়েছে সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' গঠনের অপচেষ্টা।

“আসল কথা, সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট' বলতে গোপালদা বোঝেন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে রফা করে চলা। মার্কসবাদের সঙ্গে মার্কসবাদ-বিরোধিতার ঐক্য স্থাপন করা। এরই নাম সুবিধাবাদ।”[৯] অথচ এই ধরনের সুস্পষ্ট বিভাজন সম্পর্কে গোপাল হালদার নিজেই সুনিশ্চিত নন। ১৯৪৬ সালে লেনিনগ্রাদ শহরে লেখকদের সভায় ঝদানভ বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে গলিত ও বিকৃত আখ্যা দিয়ে তাকে অস্বীকার করা ও আক্রমণ করা প্রতিটি প্রগতিশীল লেখকের কর্তব্য বলে ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়া গোপাল হালদারের মনঃপূত না হওয়ায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি ঝদানভ নির্দেশিত 'তীব্রতম ঘৃণাও' তাঁর পক্ষে অকারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর এই নির্দেশ মেনে চললে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সমস্ত ঐতিহ্য থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হত। কিন্তু শনিবারের চিঠি, সবুজপত্র এবং প্রবাসী যাঁর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে, যাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি কংগ্রেসী রাজনীতিতে, গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্রে যাঁর গভীর শ্রদ্ধা তাঁর পক্ষে উৎসকে অবজ্ঞা করা সম্ভব ছিল না। গোপাল হালদার ছাড়া ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউই নেই যিনি সগর্বে ঘোষণা করতে পারতেন যে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এমনকি কিছুটা গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন[৯ক], অথচ এই সুনীতিকুমার 'মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের ব্যাপারে আমার অনাত্মীয়।' এর আসল তাৎপর্য হল এই যে সবকিছুর মিলিত প্রভাবে সমগ্রভাবে জীবনকে তিনি দেখতে শিখেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন বা পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যের জগৎ-কে উপেক্ষা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তাঁর দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ, “রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে বয়সের মতো করে পৃথিবীর এই বিস্ময় উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলেই স্বদেশীর রূপরসস্পর্শহীন কৃচ্ছ্র-সাধনার দিকটা আমাকে গ্রাস করতে পারে নি। স্বদেশী দলের সংযম, শৃঙ্খলা, নীতিনিয়মে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগ ছাড়ি কি করে? রূপ-রস-আনন্দে লোভও আমার অপরাজেয়। বরং মনে হয় বিবেকানন্দের 'অভীঃ' মন্ত্রের সঙ্গে এই আশীর্বাদই আমাদের কালে আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন।”[০] আর গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার শেখালেন যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার ব্যবহৃত শব্দের যোগ

আছে। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন জীবিকা।

এটা কোন স্ব-বিরোধিতা নয়। এটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। বিবেকানন্দের নির্ভীকতার দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনবোধকে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন। তাই কোনো অঘোষিত বা ঐতিহ্যবিহীন তত্ত্বের মাপকাঠিতে সাহিত্যবিচার তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যিক বা সাহিত্য-গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মত সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। শনিবারের চিঠি বা প্রবাসীর সাহিত্যগোষ্ঠীতে কমিউনিস্ট লেখক তেমন একটা কেউ ছিলেন না। বরং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু গোপাল হালদার তাঁর সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুই পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রভাবের কথা কখনো গোপন করেন নি, "শনিমণ্ডলের যাঁদের সান্নিধ্য আমাকে কৃতার্থ করেছে তাঁদের বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, রসবোধের মতই তাঁদের স্নেহ, প্রীতি, সৌহার্দ্য আমার এক প্রাপ্তি। মোহিতলাল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, নীরদ চৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি—এমন একটা সমাবেশ কি মিথ্যা হতে পারে? এমন সুধী সমাবেশ যে-কোনো লোককে ধন্য করত, আমাকেও না করে ছাড়েনি।"[২১] এই তালিকায় সজনীকান্ত দাসের নাম নেই, কিন্তু তিনিও গোপাল হালদারের "নিকটতম মানুষ।" আর 'প্রবাসী'র রচনাতে যেহেতু তিনি 'আবাল্য পুষ্ট' তাই সেখানে যোগ দেওয়া তাঁর কাছে যেন পবিত্র কর্তব্য ছিল। সেখানে যাদের সাক্ষাৎ পান "শুধু লেখার গুণে নয়, আমি জানি চরিত্রগুণেও প্রত্যেকে বিশিষ্ট।" অথচ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে গোপাল হালদারের এঁদের প্রশংসা করবার কথা নয়। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তিনি "যথারীতি কমিউনিস্টদের শ্রাদ্ধও করেন" তবে তিনি যে মূলত সাহিত্যপ্রেমী একথা বুঝতেও তাঁর কোন অসুবিধা হয় না, "প্রথম পরিচয়েই তা অনুভব করি, আর তাঁকে ভালোবেসে ফেলি। এই সাহিত্যপ্রেম নির্ভেজাল একচ্ছত্র। শেষদিকেও যখন তিনি দুর্ধর্ষ এ্যাণ্টি-কমিউনিস্ট, এ্যাণ্টি-রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি আরও অনেক 'এ্যাণ্টি' তখনো সে ভালোবাসা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। শুনেছি, সেই মহর্ষি দুর্বাসাও এই পাপিষ্ঠের প্রতি একটু প্রীতি রাখতেন। দুর্মুখরা অনেকে সৎ ও সহৃদয়।"[২২] কোনো কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীই মোহিতলালের সাহিত্য সাধনার এরকম সহৃদয় মূল্যায়ন করেননি। "Unknown Indian" নীরদ চৌধুরী সম্পর্কেও তাঁর একই জাতীয় শ্রদ্ধা এবং গুণমুগ্ধতা, "ব্যক্তিগতভাবে এই দুর্জয় মেধাবী

মানুষটির সঙ্গলাভ আমার অপরিমিত সৌভাগ্য। আমি কত কথা সেই Unknown Indian-এর মুখে শুনেছি, তাঁর কাছে শিখেছি···অসংখ্য বিষয়ে যা শুনেছি, তার এক-দশমাংশও আমি স্মৃতিতে সঞ্চয় করতে পারিনি, অবশ্য তাঁর মতের এক-দশমাংশও পারিনি মনে অঙ্গীকার করতে।"[২৩] মতান্তরকে তিনি কখনো মনান্তরে পরিণত হতে দেন না। নীরদ চৌধুরীর অনেক মতামতই গোপাল হালদারের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। কিন্তু "তাঁর মনীষা, শিল্পানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, মেধা, স্মরণশক্তির" প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়েই বা উপায় কি?

সাহিত্য-সমালোচনায় এই সুভদ্র বিনয়ের প্রকাশ সত্ত্বেও সবসময় তিনি যে রেখে ঢেকে কথা বলেছেন তাও নয়, নিজের সাহিত্যবোধ সম্পর্কেও নয়। জীবনানন্দের 'ঝরাপালক' বা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে তিনি যেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি, তেমনি আবার নিজের মতামতকেও চূড়ান্ত বলেন নি। বরং এ ব্যাপারে কিছুটা সময় চেয়েছেন, "সত্য কথা, নতুনের হয়ে উঠতে যেমন সময় লাগে, নতুনকে বুঝে উঠতেও লাগে সময়।"[২৪] কল্লোলীয়দের মধ্যে শৈলজানন্দ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের যথাযথ গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে তিনি বাকীদের তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ তীব্র ভাষায় প্রায় নস্যাৎ করে দেন, "সে সময়কার মধ্যে বুদ্ধদেববাবু, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি মূল 'কল্লোলী'দের লেখা কয়টি রচনা স্থায়ী? দু'চারটি কবিতা দু'চারটি ছোটগল্প—উপন্যাস তাঁরা বুঝতেনও না, নাটক তাঁরা লেখেন নি। এসব সে যুগে নেই। তবে সে যুগটি যুগ হল কিসে[২৫]?" তবে গোপাল হালদারের পক্ষে এই আক্রমনটুকুই যথেষ্ট, এর চেয়ে রূঢ় বাক্য উচ্চারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে অতিকথন তাঁর খুব একটা পছন্দ নয়। কিন্তু মাঝে মাঝেই দুএকটি ঋজু ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইচ্ছে করলেই তিনি গভীর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারেন! প্রমথ চৌধুরীর তথা সমগ্র সবুজপত্রের সাহিত্যিক মেজাজ গোপাল হালদার তুলে ধরেন মাত্র কয়েকটি বাক্যে, "রোমান্টিক দুঃসাহসে ও আবেগ উচ্ছ্বাসে যে প্রাণের প্রধান পরিচয়, প্রমথ চৌধুরী মনে হয় তা মানতেন না। তাঁর বিচারে, প্রাণের পরিচয় মনে, বিশেষ করে বুদ্ধির যুক্তিতে, মনের স্বচ্ছতায়, সত্তার সচেতনতায়। ···আসলে সব মিশিয়ে সবুজ পত্রের প্রধান কাজটা হয়েছিল বুদ্ধির চাষ, র‍্যাশানালিজ্‌ম্‌ না হোক, রিজন্‌-এর অনুশীলন[২৬]।" শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর তেমন বেশি আলোচনা নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তাই যথেষ্ট, "চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, অভাগীর স্বর্গ এসে বৈঠকখানা ছাড়িয়ে অনিবার্য গতিতে অন্তঃপুরে চলে গেল—সকলকেই ভাবনায়

ফেলে দিলে। বাঙালি সাধারণ মধ্যবিত্ত নিজের মুখচ্ছবি দেখতে পেল। বাইরে সকলের তাতে সরব আপত্তি। মনে নীরব স্বীকৃতি তবু, এযে আমাদের মুখচ্ছবি। বাঙালি ভদ্রলোকের মনকে বছর বিশেকে শরৎবাবু যে ভাঙাচোরা করেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই[২৭]।" এত সংক্ষেপে বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্তঃপুরে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার আসল কারণটি এইভাবে বোঝানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হত না। হিউমারিস্ট রাজশেখর বসুর মূল্যায়ন তিনি করেছেন এইভাবে, "তিনি যুক্তিমার্জিত বৈজ্ঞানিক চেতনার মানুষ। আমার ধারণা তাই আদর্শবাদী হলেও বস্তুবাদী বলেই একটু সংশয়বাদীও, আবার, বস্তুবাদীবলেই জীবনযাত্রার আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন, অসঙ্গতি দেখে তাঁর কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়[২৮]।" আধুনিক কবিতা সম্পর্কে গোপাল হালদারের তেমন আলোচনা নেই। বস্তুত তাঁর আত্মজীবনী পড়ে মনে হয় প্রধানত তিনি মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির অনুরাগী। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তরী হতে তীরে' বিষ্ণু দে সম্পর্কে যতটা প্রবল উচ্ছ্বাস গোপাল হালদারের ততটা নেই। 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় তিনি লেখেন, "বিষ্ণু দে স্বকীয় সাধনায় অনলস যদিও তিনি কখনও সাধারণ পাঠকের নিকট সহজ বোধ্য হবেন না, 'অন্বিষ্টও তা হয় নি। জীবনানন্দ সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব ঢং-এ মন্তব্য, "জীবনানন্দ দাশ স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গে সমরূপে কাব্যধর্ম-নিষ্ঠ[২৯]।" তুলনায় সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর কাছে বেশি মনোযোগ পেয়েছেন, "বাঙলা কবিতার আধুনিক ধারা যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাতে ভাবাধিক্যের বদলে মননশীলতার ও ললিত মাধুর্যের বদলে গাঢ় ঘননিবদ্ধ দার্ঢ্যের প্রয়োজন ছিল। তিনি বাঙলা কবিতার দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়েছেন[৩০]।" মোহিতলাল বা সুধীন্দ্রনাথের প্রতি এই মনোভাব কি গোপাল হালদারের ক্লাসিক প্রীতির নিদর্শন?

আসলে গোপাল হালদার কোনো কিছুকেই সহজে গ্রহণ করেন না, সহজে বর্জনও করেন না। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মতো সাহিত্যজীবনেও গতানুগতিক ভাবে স্রোতের অনুকূলে তিনি চলেন নি। তাই বিবেকানন্দ থেকে যাত্রা সুরু করে, কংগ্রেস, বিপ্লবী আন্দোলন হয়ে সর্বশেষে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। আর তাঁর সাহিত্য ভাবনায় সূত্রপাত প্রথমে মিড-ভিক্টোরিয়ান ধ্যানধারণায় পুষ্ট বাঙালী আর্নল্ডীয়ান পিতা সীতাকান্ত হালদারের কাছে, পরে 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্র ভাবধারায় পুষ্ট সুরেশ চক্রবর্তী ও রঙীন হালদারদের কাছে। তাঁর আত্মজীবনীতে এই তিনজন সম্পর্কে যত পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়েছে কোনো প্রথম

শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা তাঁর অর্ধাংশও পান নি। এঁদের সম্পর্কে 'অরিজিন্যাল' এবং 'কালচারড' শব্দদুটি তিনি বারবার ব্যবহার করেন। এরা সব কিছুকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখতেন, দেখার ক্ষেত্রেও এঁরা পরিশীলিত মনের অধিকারী। এঁদের পরেই তিনি পেয়ে যান তাঁর মানবিকী বিদ্যার গুরু সুনীতিকুমারকে। "আর যে গোপাল হালদার কমিউনিস্ট তিনি শেষ পর্যন্ত মানবিকী বিদ্যায় অ-কমিউনিস্ট সুনীতিকুমারের একমাত্র উত্তরসাধক[৩১]।" এই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের ফলেই তার সাহিত্য-সমালোচনা একমুখী না হয়ে সমন্বয়মুখী হয়ে ওঠে। তবে মূল বিশ্বাস থেকে তিনি কখনো সরে আসেন না, 'সাহিত্য হচ্ছে জীবনের স্বীকৃতি' জীবনরসের পরিবেশন। বিশেষকরে মানুষের স্বীকৃতি-মানবরসের আস্বাদন[৩২]।' এই বিশ্বাসে অবিচল থেকেই তিনি বিভিন্ন লেখকের রচনার মূল্যায়ন করেন, মতবাদের প্রচার খোঁজেন না, খোঁজেন কেবলমাত্র সাহিত্যে মানবস্বীকৃতি। সেটুকু পেলেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই তাঁকে কোন নির্দিষ্ট শিবির ভুক্ত সমালোচক বলা যাবে না। তিনি নিজে তা মেনেও নেবেন না। কিন্তু একপক্ষের দৃষ্টিতে সবসময় তিনি যেন অন্যপক্ষের। এটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন দেবেশ রায়, "বুদ্ধিজীবী সহকর্মীরা তাঁকে ভাবেন হয়ত আর একটু বেশি স্বদেশী বাঙালি। 'বামপন্থীদের ভেতর রাবীন্দ্রিক, 'রাবীন্দ্রিকদের কাছে কমিউনিষ্ট। সাহিত্যিকদের মধ্যে পণ্ডিত, পণ্ডিতদের সভায় স্বাধীন লেখক। সাংবাদিকদের সমাজে বুদ্ধিজীবী, আর গবেষক মহলে যেন একটু চঞ্চল বহুবিষয় সন্ধানী।"[৩৩]

তথ্যসূত্র :

১। ভূমিকা, সরোজ আচার্য রচনাবলী (২য় খণ্ড)।
২। কালান্তর, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৬।
২।ক. সাংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃঃ ২৮২।
৩। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃঃ ১৭।
৪। কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব।
৫। বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, সাহিত্যে মতবাদ।
৬। সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, ভূমিকা, উদ্ধৃতি।
৭। বাংলাসাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি।
৮। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।
৯। উপন্যাস পরিক্রমা, পরিচয়, আশ্বিন—কার্তিক ১৩৬২।
১০। পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৫৯।

১১। উদ্ধৃতি, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম খন্ড) ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত।

১২। তরী হতে তীর, পৃঃ ৩৭২।

১৩। নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, উদ্ধৃতি, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (২য় খণ্ড), ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত।

১৪। শান্তি–সংস্কৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ঃ পরিচয়, বৈশাখ ১৩৭৯।

১৫। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, পৃঃ ৭১।

১৬। তদেব, পৃঃ ৬৯।

১৭। তদেব, পৃঃ ১৫২।

১৮। তদেব, পৃঃ ৯৩-৯৪।

১৯। বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা, রবীন্দ্র গুপ্ত (মার্কসবাদী-৫)

১৯।ক. রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭।

২০। রূপনারায়ণের কূলে, ১ম খণ্ড, ১১৮–১৯।

২১। রূপনারায়ণের কূলে ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।

২২। তদেব, পৃঃ ২৩০।

২৩। তদেব, পৃঃ ২৪১।

২৪। তদেব, পৃঃ ২২৭।

২৫। তদেব, পৃঃ ২২৭।

২৬। তদেব, পৃঃ ১০৬।

২৭। তদেব, পৃঃ ১০৯।

২৮। তদেব পৃঃ ২৫৪।

২৯। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃঃ ৪৩২।

৩০। রূপনারায়ণের কূলে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

৩১। স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ অনিলকুমার কাঞ্জিলাল, পরিচয় জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ (ধনঞ্জয় দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)।

৩২। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃঃ ৩৯৮।

৩৩। ভূমিকা, গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী ১৯৮০।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

ক. গোপাল হালদার জীবন ও সাহিত্য, অমিয় ধর।
খ. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত।

দেশপ্রেমিক, বিপ্লববাদী, কম্যুনিষ্ট গোপাল হালদার : ১৯২০-৪৫

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

গোপাল হালদারের জন্ম হয় ১৯০২-এর ১১ ফেব্রুয়ারি। তাঁর ৮০ বছর পূর্ণ হয় ১৯৮২তে। সে বছর ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। সেই সম্মেলনের মধ্যেই সম্বর্ধনা জানানো হয় পার্টির পক্ষ থেকে গোপাল হালদারকে! সম্বর্ধনার উত্তরে আবেগপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণে গোপাল হালদার বলেন ঃ "আমার এই জন্মদিনে পার্টির কাছ থেকে যে ভালবাসা ও অভিনন্দন পেলাম, আমার কাছে তাই শ্রেষ্ঠ সম্মান। আমি কমিউনিষ্ট, মানবজীবনে এটাই আমার সবচেয়ে সার্থক পরিচয়। বহু অভিজ্ঞতা পেরিয়ে, বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমি গ্রহণ করেছি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ। ভরসা রাখি শেষ দিন পর্যন্ত সে সভ্যপদের গৌরব বহন করেই চলব।"

গোপাল হালদারের জীবনাবসান হ'ল আরও এক দশক পরে, ১৯৯৩-এর অক্টোবরে, কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোষণা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল।

ইতিহাসের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক গোপাল হালদার, সহজে সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন নি, যোগ দেননি একদিনে কমিউনিষ্ট পার্টিতে। বাংলা

ভাষাও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক তরুণ গোপাল হালদার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে, স্বরাজ দলে যোগ না দিলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করছিল। তাঁর বিদ্রোহী যৌবন তাঁকে সংযুক্ত করছিল জাতীয় বিপ্লববাদীদের সঙ্গে। আবার তাঁর যুক্তিবাদী মন তাঁকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। প্রবল টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে সে যুগের বহু শ্রেষ্ঠ তরুণের মতই চলেছিলেন গোপাল হালদারও, যার অসামান্য চিত্র তিনি এঁকে রেখেছেন তাঁর অনন্য উপন্যাস "একদা"তে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে গোপাল হালদারের প্রায় সাত দশকের বর্ণময় সৃষ্টিধর্মী জীবনের প্রথম পর্বের কথাই শুধু বলবার চেষ্টা করব,—১৯২০-র এক দেশভক্ত বিপ্লবী তরুণ ১৯৪১-এ কি ভাবে এসে তরী বাঁধলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাটে।

"রূপনারাণের কূলের" সূচনা-পর্বেই গোপাল হালদার তাঁর জীবনের মূলমন্ত্রটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"একালে জন্মেছি বলে দুঃখ করিনা। কারণ আমরা দুঃখ পেয়েছি। এদেশে এ যুগে জন্মে তা এড়িয়ে যেতে গেলে বঞ্চনাই পেতাম! ···দুঃখকে যারা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছে এমন মহৎ মানুষকে আমরা এ যুগে দেখতে পেয়েছি। বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের সঙ্গেই সেই ধারা শেষ হয়ে যায় নি, সব কালেই তাঁরা ছিলেন। কিন্তু এ যুগে সাধারণ মানুষের রূপেও তাঁরা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। হাসিতে-গল্পে বেদনায়, করুণায় একই গাড়ির যাত্রী। সেই সাধারণ মানুষের অসাধারণতা আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা আমাদের এ শতাব্দীর একটা বড় আবিষ্কার। তাই আমার কাছে পৃথিবীতে সব থেকে আশ্চর্য মনে হয়েছে মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের, অসাধারণ মানুষের, সকল মানুষের। তাতেই তো বুঝেছি এ জগৎ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।" (গোপাল হালদার ঃ রূপনারাণের কূলে, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৭০, পৃঃ ১২১০)।

গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বরাজের দাবিতে ভারতের আপামর জনসাধারণের জাগরণ গোপাল হালদারকে গভীরভাবে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধাবনত করেছিল, কিন্তু অভিভূত করেনি। তাঁর চরখার কর্মসূচীতে তাঁর তেমন আস্থা ছিলনা, সেখানে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতবাদের অনুগামী। গান্ধীজি যখন নোয়াখালিতে গেলেন, তখন জেলার কংগ্রেস নেতার অনুরোধে যুবসমাজ কর্তৃক গান্ধী সম্বর্ধনার দায়িত্ব গোপাল হালদারই গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্বর্ধনার পর, বৈঠকী আলোচনার সময় তিনি গান্ধীজিকে বলেন যে আপনি কেন শুধু চরখা ঘোরানোর

উপর এত জোর দিচ্ছেন ? উত্তরে গান্ধীজি বলেন ঃ চরখা হচ্ছে গ্রামের মানুষের স্বনির্ভরতার প্রতীক। চরখার বদলে স্বনির্ভরতার অন্য কোনও প্রতীককেও আমার আপত্তি নেই। গান্ধীজির এই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে গোপাল হালদার বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে গান্ধীজির সঙ্গে পূর্ণ একমত হতে পারেননি।

হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ছাড়া বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন এগোতে পারবে না, একথা উপলব্ধি করেছিলেন তরুণ গোপাল হালদার। তাই কাউন্সিল প্রবেশে স্বরাজ্য দলীয় রাজনীতির সমর্থক না হলেও, দেশবন্ধুর "বেঙ্গল প্যাক্টের" তিনি ছিলেন দৃঢ় সমর্থক। ১৯৮০-তে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে গোপাল হালদার বলেছিলেন যে দেশবন্ধুর সমর্থকদের অনেকেই মনেপ্রাণে মানতে পারেননি তাঁর বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তাবলীকে। দেশবন্ধু তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে মুসলিমদের আস্থা যদি জাতীয়তাবাদীরা এখন অর্জন করতে না পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলিম বিভেদকে প্রজ্বলিত করে ইংরেজ শাসকরা জাতীয় আন্দোলনকে প্রবল আঘাত করতে সক্ষম হবে। দেশবন্ধুর এই প্রাজ্ঞ বুদ্ধির প্রশংসা করে গোপাল হালদার বলেন যে ১৯২৪-২৫ এ যদি বাংলার কংগ্রেস নেতারা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল প্যাক্ট'কে ভেঙ্গে না দিতেন, তাহলে হয়তো উত্তরকালে ভারত ও বাংলা ব্যবচ্ছেদের ট্র্যাজেডি আমরা এড়াতে পারতাম।

১৯২৬ সাধারণভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হতাশা ও নৈরাশ্যের বছর। একদিকে সাম্প্রদায়িক ভেদপন্থী শক্তিরা দিকে দিকে মাথা তুলেছে, অন্য দিকে প্রতিবাদী আন্দোলন নির্জীব ও অবসাদগ্রস্ত।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী তরুণেরা তখন পৃথিবীর চারিদিকে তাকিয়ে, নতুন আদর্শ, নতুন এগোবার পথ খুঁজছেন। সেই অনুসন্ধিৎসাই গোপাল হালদারকে পৌঁছে দিল সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি। কলকাতার এক ইংরেজি মাসিকপত্রে তিনি লিখলেন ঃ

"প্রাচ্য জগতের অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতাকে ভেঙে সমাজতন্ত্রের আলো ঢুকে পড়েছে। ভারতের যুবশক্তিকে সে আদর্শ এখনও আকৃষ্ট করতে না পারলেও, চীনের যুবশক্তিকে তা সুনিশ্চিত ভাবে আকৃষ্ট করেছে। ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি সমাজতন্ত্র আকৃষ্ট করছে। ভারতের সমাজতন্ত্রীদের এখন জাতীয়তাবাদীও হতে হবে, নির্বাচিত সরকারের জন্য সংগ্রামে তাদের যোগ দিতে হবে। আজ তাদের সংগ্রাম করতে হবে ভারতের ধনবাদী শিল্পপতি ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।" (গোপাল হালদার ঃ হোপ্‌স অব্

অ্যান ইন্ডিয়ান সোসালিস্ট, "ওয়েল ফেয়ার" কলকাতা, মার্চ ১৯২৬)

ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আদিপর্বের সংগঠকদের অসামান্য আদর্শ নিষ্ঠা, দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার এবং শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে একাত্মতা সত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সংকীর্ণতা ছিল, যা তাঁদের বার বারই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে ১৯২৬ এ গোপাল হালদারের চিন্তা ও চেতনায় সে বিচ্যুতি বা বিভ্রান্তি ছিল না। ভারতের সাম্যবাদীদের যে সর্বাগ্রে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়তে হবে এবং তারজন্য ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীসহ সমস্ত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী শক্তিদের ও শ্রমজীবীদের হাত মেলাতে হবে, তা তাঁর "ওয়েল-ফেয়ার" পত্রিকার প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট।

১৯২৭ থেকে ভারতের রাজনৈতিক চিত্র দ্রুত বদলে গেল। বছরের শেষে সাইমন কমিশনকে বর্জন করার ডাক দিল জাতীয় আন্দোলন। কলকাতা-বোম্বাই-কানপুর-লাহোরে বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল হ'ল দেশ, আর এই সব ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন তরুণ কমিউনিষ্টরা ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় তরুণ বিপ্লবীরা আত্মাহুতি দিয়ে দেশে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করলেন। সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে জাতীয় মঞ্চ থেকে সমাজতন্ত্রর আদর্শর সপক্ষে প্রচার শুরু করলেন জওহরলাল নেহরু। অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী নেতা ও স্বামী বিবেকানন্দর অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশে ফিরে ছাত্র-যুবসমাজের কাছে মার্কসবাদের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। এ সবই রক্তে দোলা দিল বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের। গোপাল হালদার সক্রিয় হয়ে উঠলেন বিপ্লববাদী দলে। কিন্তু তাঁর মন সায় দিল না বিপ্লবীদের অন্তর্বিরোধে, যুগান্তর-অনুশীলন বিবাদ বিতণ্ডায়। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে নতুন পথের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন তিনি কিন্তু সাম্যবাদীদের উগ্র সংকীর্ণতা তাঁকে তাদের থেকে কিছুটা দূরে রাখল। পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর সমর্থক গোপাল হালদার সশ্রদ্ধ হলেন তরুণ জননায়ক সুভাষচন্দ্রর প্রতি, যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁর অক্ষুন্ন ছিল সারাজীবনই।

১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ! ১৯৩০এ শুরু হয়ে গেল গণ আইন-অমান্য সংগ্রাম। বাদশা খানের নেতৃত্বে পাঠানদের গণজাগরণে উত্তাল হল পেশোয়ার থেকে খাইবার গিরবর্ত্ম পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শোলাপুরে অহিংস শ্রমিক অভ্যুত্থান দেশকে সচকিত

করল। অন্য দিকে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ দেশে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। সারা ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে চলল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসী কাঠে প্রাণ দিলেন অবিস্মরণীয় যুবনেতা সর্দার ভগৎ সিং। দেশে গণবিস্ফোরণ আসন্ন বুঝে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সন্ধি করলেন জাতীয় নেতৃত্বর সঙ্গে। বিপ্লবভীত জাতীয় নেতৃত্বও সম্মতি জানালেন তাতে। স্বাক্ষরিত হ'ল গান্ধী—আরউইন চুক্তি।

বিদ্রোহী হল দেশের যুবশক্তি। করাচীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তাঁরা কালো গোলাপের তোড়া উপহার দিয়ে ধিক্কার জানালেন গান্ধীজীকে। তরুণ গোপাল হালদার গিয়েছিলেন করাচী কংগ্রেসে যোগ দিতে। ফিরে এসে তাঁর তৎকালীন চিন্তাভাবনাকে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন “নওজোয়ানের রাষ্ট্রচিন্তা” প্রবন্ধে, প্রসিদ্ধ “প্রবাসী” পত্রিকায়।

তাতে তিনি লিখলেন ঃ

“নওজোয়ান ভারত সভার প্রকাণ্ড প্যান্ডালের উপরে রক্তপতাকা উচ্চে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে—তোরণের শিরে সোভিয়েট সাম্যবাদের প্রতীক কাস্তে ও হাতুড়ী—'রাজগুরু ময়দানের' এই তোরণের নাম 'যতীন দাস নগর'। এই নবযৌবনের ঘাঁটি পার হইলে কংগ্রেস মন্ডপে পৌঁছানো যায়। করাচীর দুই চোখ—এক চোখ সেই হরচন্দরায় নগরের দিকে, আর আর এক চোখ এই 'যতীন দাস নগরের' উপর। ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় লাহোরের কারাগার তলে তিনটি যুবকের প্রাণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—ভারতবর্ষের লাল চোখ আজ নওজোয়ানের লাল পতাকার দিকে, আশা ও উৎকণ্ঠায় তাকাইয়া আছে, হরচন্দরায় নগরীর স্তিমিত দীপ্ত চোখটিও লাল হইয়া উঠিবে নাকি ?

…লাল ঝাণ্ডার তলে নওজোয়ানের সভা বসিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী গোবিন্দানন্দ। কোমাগাতামারুর সঙ্গে তাঁহার নাম বিজড়িত। এই লালে লাল আকাশের তলে…তিনি কহিলেন ঃ “ভগৎ সিং-এর ফাঁসীর পর ভারতবর্ষের নওজোয়ান আর ইংরেজের সঙ্গে কোনও রকম নিষ্পত্তিতেই রাজী হইতে পারে না। তাহারা চায় জনগনের শাসন। ভারতীয় পরিচ্ছদে তাহারা রুশের সাম্যবাদকে বরণ করিতে চাহে—সেই সাম্যতান্ত্রিক পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই যুবকদল প্রাণ দিবে। গান্ধী—আরউইন চুক্তিপত্র যৌবন ধর্মের বিরোধী। এইসব

ধনিক ও রাজনীতিকদের উড়াইয়া দিয়া, হে নওজোয়ান, তোমার কৃষাণ ও মজদুর-শক্তি সংগঠন কর।” (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৮)

১৯৩২ এ গোপাল হালদার গ্রেপ্তার হলেন বিনা বিচারে আটকবন্দীরূপে। বন্দী রইলেন প্রেসিডেন্সী জেল, রাজশাহী জেল, বক্সা বন্দী শিবিরে। গোপাল হালদার ৮০ বছর বয়সে সেই স্মৃতিচারণ করে লিখছেন : “আমরা তিনজন বক্সা রোড স্টেশনে এসে নামলাম। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আমরা—নলিনী গুহ, বীরেন ভট্টাচার্য ও আমি—প্রেরিত হয়েছিলাম বক্সা বন্দীশালায়। ত্রিশের দশকের রাজবন্দী। পাহারাদার সঙ্গে ছয় জন বন্দুকধারী, গোর্খা পুলিশ।

বন্দীশালা বলেই বাঙালির কাছে বক্সা ত্রিশ থেকে পরিচিত। ··(সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য) দেশের জীবনযাত্রা থেকে এমনভাবে বিপ্লবপন্হীদের সরিয়ে দিতে হবে যাতে দেশের মন থেকে তাদের নামগন্ধ লোপ পায়। ···কিন্তু শাসকদের এই চিরকালের ক্রূরতা ও মূঢ়তা দেশের জনমানসে তাদের থেকে অনেক বেশী জাগিয়ে রাখে ক্ষোভ ও বিরোধিতা। বন্দী বিদ্রোহীদের মনে জাগিয়ে রাখে আদর্শরক্ষার সতর্ক বুদ্ধি···” (রূপনারাণের কূলে, 'পরিচয়' শারদীয় ১৯৮২, পৃঃ ১১৭-১৮)।

এই কারাগারেই অসুস্থ গোপাল হালদার রচনা করেন এই যুগকে জীবন্ত করা তাঁর অসামান্য উপন্যাস “একদা”। এই কারাবাসের যুগেই গভীর অধ্যয়ণ করে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন সাম্যবাদী আদর্শকে। কারামুক্ত হয়ে ১৯৩৮ থেকে তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গেই একত্রে কাজ করেন কিন্তু তখনও সম্মত হন না কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে। ১৯৮২তে এক ঘরোয়া আলাপে তিনি আমাদের বলেন : এর একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ আমার সাহিত্যিক মন সর্বস্তরে যে মুক্তি চাইত, তা পার্টির কঠোর শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়বে, এটাই আমার মন চাইত না। দ্বিতীয়তঃ সুভাষচন্দ্রের প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধাও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একাত্ম হবার পথে একটা বাধা ছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্হী নেতারা যখন ১৯৪০-এ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করলেন, তখন সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করলেন তাঁর ইংরেজি সাপ্তাহিক মুখপত্র “ফরোয়ার্ড ব্লক”। তার অন্যতম সহ-সম্পাদক পদে তিনি নিযুক্ত করলেন গোপাল হালদারকে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্বর কথা জেনেও। বহু পরে ১৯৬৮তে স্মৃতিচারণ করে গোপাল হালদার লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্র একদিনের জন্যও তাঁর সাংবাদিক স্বাধীন মতামতে হস্তক্ষেপ করেন নি। ফ্যাসী-

বাদ বিরোধী জনযুদ্ধের যুগে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন সুভাষচন্দ্রকে জাপানের চর বলে তীব্র নিন্দা করেছিল (যে বক্তব্য অবশ্যই ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল), গোপাল হালদার তাঁর সঙ্গে কোনদিনই একমত হতে পারেন নি। তবে ততদিনে তিনি সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে যোগ দিয়েছেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে। ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার বিপুল বাহিনী নিয়ে সমাজতন্ত্রের লালদুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমন করলে, গোপাল হালদার আর ইতঃস্ততঃ করলেন না। তাঁর মনের মধ্যে সেদিন অনুরণিত হয়েছিল গোর্কির সেই ধারালো প্রশ্নঃ On which side are you, master of Culture! গোপাল হালদার দৃপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন ; ভারতের সংগ্রামী মানুষ সোভিয়েতের পাশেই থাকবে।

এই যুগে তিনি অবিশ্রান্ত লিখেছেন ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সক্রিয় থেকেছেন সারা ভারত কৃষক সভার সহ-সম্পাদক রূপে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠক রূপে—সে অভিজ্ঞতার কথা সাংবাদিক গোপাল হালদার চমৎকার ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ১৯৪২-এর "অরণি"তে—"কানপুর থেকে নাগপুর" প্রবন্ধমালাতে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির তিনি তখন সহ-সভাপতি এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখকও ও শিল্পী সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রসিদ্ধ "নবান্ন" নাটকে তিনি দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট চাষীর ভূমিকাতে মর্মস্পর্শী অভিনয়ও করেছেন। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে নীরেন্দ্রনাথ রায় ও রাধারমণ মিত্রর সঙ্গে স্কোয়াড করে বিক্রী করেছেন পার্টির মুখপত্র—সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ।

গোপাল হালদার কখনও ছোটখাট প্রাত্যহিক রাজনৈতিক দায়িত্বপালনকে অবহেলা করতেন না. কি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কাজকর্ম আর কি কমিউনিস্টদের দৈনন্দিন কাজ। ১৯৯৪-র মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে গোপাল হালদারের বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বিপ্লবী ও কমিউনিষ্ট নেত্রী কমলা মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, সংকটের সময়ে গোপাল হালদার নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার যখন বিপ্লবী নলিনী দাসের সঙ্গে হিজলী বন্দীশিবির থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হ'ন, তখন জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়ে দীনেশ মজুমদারকে কলকাতায় তৎক্ষণাৎ কোনও নিরাপদ আস্তানায় রাখা, সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন গোপাল হালদার।

সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি দৃষ্টান্ত। পঞ্চাশের দশকে গোপাল হালদার তখন "পরিচয়" সম্পাদনা করছেন, বই লিখছেন। প্রগতি লেখক সংঘকে পুনর্জীবিত করছেন। এই সময়ে কলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের ইউনিয়ন রবীন্দ্র-পক্ষে তাঁকে

অনুরোধ জানালেন ট্রাম শ্রমিকদের এক বড়সাধারণ সভায়, ভারত সভা প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁকে বলতে হবে শ্রমিক সাধারণের বোধগম্য ভাষা ও ভাবে। সানন্দে রাজী হলেন গোপাল হালদার এবং ট্রাম শ্রমিক নেতা শিশির মিত্র বলছেন যে এক অসামান্য দীর্ঘ বক্তৃতা করেন গোপালদা ও ট্রাম শ্রমিকদের বহু উদগ্রীব প্রশ্নের ধৈর্যশীল উত্তরও তিনি দেন। এই জন্যই কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী বলতেন গোপালদাই শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবান কমিউনিষ্ট।

তাঁর এই বিপুল ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যেই চল্লিশের দশকে চলেছিল সৃষ্টিধর্মী একটি তিন খণ্ডের উপন্যাসের কাজ—পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী ও তের শ’ পঞ্চাশ—অধ্যাপক সুশোভন সরকার যার মূল্যায়ণ করে বলেছেন যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ তথা ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের যুগে বাংলার সমাজ জীবনের এক অনবদ্য চিত্র গোপাল হালদারে এঁকেছেন।

এই যুগের কথা বলতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখছেন “ত্রিশের নিশীথ-শেষ থেকে দিন-বদলের পালা ঝাঁপিয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে··শতাব্দীর শেষার্ধ-ছাড়িয়েও শেষ নেই—ঝড়ো যুগের যাত্রী নৌকো চলেছে ডুবে ভেসে” (রূপনারাণের কূলে, পরিচয়, শারদীয় ১৯৮২) আর সেই নৌকাতে দাঁড় টেনে চলেছেন ঝড়-তুফান মাথায় নিয়ে চিরতরুণ গোপাল হালদার। প্রকৃত অর্থেই তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সব্যসাচী।

'ত্রিদিবা'-র গোপাল হালদার

রবীন্দ্র গুপ্ত

বাংলা উপন্যাসের মূল খাত তৈরি হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্রের হাতে। সরল প্রেমের ত্রিভূজ নিয়েই তাঁরা নানা জটিল বৃত্তে উপন্যাস-শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। স্বদেশ, সমাজ ও তার বন্ধনমুক্তির আর্তিও উপন্যাসের শ্রেয়স্‌-সন্ধানের পরিচয় দেয়। তবু অনেক কিছু বাকি ছিল ; বাকি আজও আছে। উপন্যাস যেহেতু সমগ্র জীবনের শিল্প এবং পরিধি ও অন্তর্গভীরতায় জীবন ক্রমশ পরিবর্তমান, তাই উপন্যাসের অমিত সম্ভাবনা এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। গোপাল হালদারের একদা-অন্যদিন-আরএকদিন ('ত্রিদিবা') উপন্যাসত্রয়ীর আলোচনায় এরকম অবতরণিকা কেন, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। চল্লিশের দশকের তরুণ প্রজন্ম যখন 'সংস্কৃতির রূপান্তর' পড়ে দ্বিজ, তখন যাঁরা ডবল ক্রাউন সংস্করণ 'একদা' পড়েছেন, সে-পাঠের বিস্ময় এবং উপার্জন, আজও তাঁদের স্মৃতিকে আপ্লুত করে রেখেছে। তার জন্য চৈতন্যপ্রবাহরীতি বুঝতে হয়নি। লিওন ইডেলের আয়নায় একদা-র শিল্পসম্মিতি যাচাইয়ের উৎসাহ নিরর্থক। তবে জয়েস-প্রুস্তের চৈতন্যপ্রবাহরীতির সীমাবদ্ধতা সাহিত্যরসিকদের সেকালে অনীহা জাগিয়েছিল। জে. বি. প্রিস্টলে ইউলিসিস ও ফিনাগানস্ ওয়েক সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'But they are both outside fiction'. তিরিশ বছর আগে বর্তমান লেখকের ধারণা ছিল, এক ধরণের মরবিডিটি এই সব

উপন্যাসের স্বভাবলক্ষণ। অর্থাৎ সামাজিক দায়বোধহীনতার দিকে এই উপন্যাসের দর্শন নিয়ে যায়। আত্ম-কণ্ডূয়ন, গৃহবদ্ধতা, চিন্তাবিলাস তাই উপন্যাসের আধারে পরিবেশিত। জয়েস ছিলেন প্রায়-অন্ধ, তাই শ্রবণের শক্তি ছিল অসামান্য ; প্রুস্তে অতীত মুখ্য, জয়েসে বর্তমানই প্রধান—অতীত ও ভবিষ্যৎ যেন বর্তমানেরই বিস্তার।' 'চেতনাপ্রবাহরীতি সুস্থ সুখী প্রাণোচ্ছল মানুষকে দেখে না', সেকালের এই মার্কসবাদী মূল্যায়ন কেবল ধূর্জটিপ্রসাদ ও গোপাল হালদারের উপন্যাসে খণ্ডিত হয়নি, বর্তমান কালের সবচেয়ে সমাজ সচেতন তথাকথিত 'কালো উপন্যাস' এই রীতি ইতিবাচক জীবন বোধে উদ্দীপ্ত।

তিরিশ বছর আগেই মনে হয়েছিল, 'যে নৈঃসঙ্গ্যের পীড়া, অলস আত্মকণ্ডূয়ন, নিষ্ক্রিয় জগৎ-দর্শন এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিশিষ্ট্য,' গোপাল হালদার তা পরিহার করেছেন। উপন্যাস-ত্রয়ীর একসূত্রে নিবিষ্ট পাঠ বরং অন্য অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়। মার্কসবাদী জীবনবীক্ষার যথার্থ অনুধাবনেই তিনি বুঝেছিলেন, উপন্যাস উপরিসোধের নিয়মেই পরিবর্তমান, শিল্পের আধার নানাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে আধার যিনি গ্রহণ করবেন, প্রয়োগ করবেন, তাঁর শিল্পগত অভিপ্রায়, সৃজনের তাগিদ এবং অভিপ্রায় ও সৃষ্টির অন্বয়ের ওপরে। সেই অর্থে চল্লিশের দশকে একদা-র প্রকাশ জোরালো চ্যালেঞ্জ। অমিতের Commitment সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ নেই।

সে দেশের মুক্তি সাধনায় একজন কর্মী। বাবার আদর্শবাদ, মার বুকভরা ভালোবাসা, ভাইবোনের গভীর শ্রদ্ধার সুখী পরিমণ্ডল ছেড়ে সে সুনীলের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সহযোগী। ইন্দ্রানী ও সবিতার আকর্ষণ অমিতের হৃদয়ে যথেষ্ট আবেগ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তবু Life Marches জীবন আগাইয়া চলিয়াছে।

সুনীলের কর্মসূচী ঠিক কি, অমিত জানেনা। কিন্তু যে অনিল দত্ত সবরকমের আদর্শবর্জিত, তারই অনুজ—দেশের কাজে পরিবারের নিশ্চিন্ত সুখনীড় ছেড়ে বাস করেছে মেসে, খাওয়া-থাকার ঠিক নেই, সর্বদা টিকটিকি পেছনে, তার সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করতেও ইন্দ্রানীর দেওয়া ঘড়িটা তেত্রিশ টাকায় বিক্রি করাটা এমন কিছু নয়। অন্তত দেশের মুক্তিযজ্ঞে সে কিছু আহুতি দিল।

কিন্তু অমিতের জিজ্ঞাসু মন কখনও কোন ব্যক্তি বা মতের অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেনি। ইনফর্মারের হাত থেকে সুনীলের নিষ্কৃতি পাবার সুযোগ এসেছে, বরানগরে নিকুঞ্জ চক্রবর্তীর আস্তানায়। কিন্তু বরানগর নাকি বড় দূর

হবে,' 'শহরের ওপর' তার থাকা চাই। তিরিশ টাকা থেকে কথায় কথায় একশো, পরে দেড়শো টাকার দরকারে পৌঁছনো অমিতের নজর এড়ায়নি। গোপন কার্যক্রমের মধ্যে একটা এ্যাডভেঞ্চারিজম্ আছে, বিপ্লবীদের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। প্রত্যেকটা এ্যাকশনের আগেই এত বাহাদুরির পর্যায় ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব খবর গোয়েন্দাদপ্তরে পৌঁছে যেত। সুনীল অমিতের বন্ধু, তার জন্য নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে অমিত তাকে অর্থসংগ্রহ করে দেয়; তবু অমিতের কাছে তার কার্যক্রম গোপন রাখে। পাঠকের কাছে ক্রমশঃ সুনীলের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু অমিতের দেশপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি, বড়ো-আমির সাধনা, মা-বাবা-ভাইবোন, এমন কি কানাইয়ের মার সম্পর্কেও যে আবেগ—সমৃদ্ধ স্মৃতি তার তুলনা নেই।

একদিনের ভাবনাচিন্তার সূত্রে যে প্রাক্-গুপ্তযুগ ইতিহাস থেকে গান্ধীর ডাণ্ডী অভিযান, সোস্যালিজম,-কমিউনিজম্, কংগ্রেস—কমিউনিষ্ট-ট্রেড ইউনিয়ন এবং হল-কেন, ডারুইন, ফ্রয়েড, ইয়ুং, হ্যাভলক এলিস সব গ্রথিত হতে পেরেছে—এর মধ্যে অলস আত্ম-কণ্ডুয়ন নেই। কারণ অমিতের চোখ ও মন বাইরের দিকে সর্বদা খোলা; সে অত্যন্ত অনুভবশীল, যুক্তিবাদী। অনুভব ও মননের অন্বয়ে অমিতের পথ চলা, জীবনের অগ্রগতি। লেখকের অমিত-চরিত্রে এই আত্মবিকাশমানতাই মুখ্য, তাই রাজনৈতিক উপন্যাসের নিছক (যেমন অতীন বসুর 'বি-কেলাশ') তথ্যগত ডিটেলস্ একদা-য় নেই। অমিত জানে, Time is out of joint; আবার ব্রজেন্দ্রবাবু সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়দের আশাবাদ, ইতিবাচক মূল্যবোধ তাকে টানে। অমিতও আশাবাদী। আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ হয় 'মানব' শব্দের নিহিত মহত্ত্বের নতুন নতুন তাৎপর্য ফুটে ওঠে। অমিত ভাবুক এবং কর্মযোগী। সুনীলের মেসে যাবার পথে বাসযাত্রী অমিত—যখন নির্দিষ্ট গন্তব্যের অভিমুখী, তার মনও চলমান ঃ

> বাড়িগুলির শিশিরভেজা সকালবেলাকার সূর্যালোক চমৎকারই না দেখাইতেছে! লাল বাড়িটার লাল আভা যেন গাঢ়তর হইয়াছে, সাদা বাড়িটার রূপ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। সকালবেলাকার আলোতে না হইলে ইহাদের এই রূপটি খোলে না। অমিত দিনে কতবার এই বাড়িগুলির পাশ দিয়া যাতায়াত করে; পরিচিত, অতিপরিচিত, তাহার কাছে এই বাড়িগুলি। চোখ বুজিয়াও সে শিয়ালদহ হইতে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাড়ির হিসাব বলিয়া যাইতে পারিবে। কোন কোন

> বাড়ির অধিবাসীদের মুখ পর্যন্ত সে চেনে। ওই যে বাড়িটা—এবাড়িতে—হ্যাঁ, ওই যে দাঁড়াইয়া আছে। এ পাড়ায় এমনতর মুখ সত্যই আশ্চর্যজনক। এ মুখ যদি পোলক স্ট্রীটে, ক্যানিং স্ট্রীটে দেখা যাইত, তাহা হইলে বিস্ময়ের কিছু থাকিতনা। বেশ সুশ্রী ভাটিয়া মুখ, মধ্যবয়স্ক কোন গুজরাটি বেনে।···অমিত কতবার ভাবিয়াছে, ইহারা কে—গুজরাটি, না বাঙালীই? বাসের জানালার ফাঁকে আজ আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমিত দেখিয়া লইল। অমিত রবীন্দ্রানুরাগী শেকস্‌পীয়ার শিষ্য, তাই ষোল-আনা জীবনরসের রসিক। তিরিশের দশকের ভোরের কলকাতা, মানে উত্তর কলকাতার সব রূপ রঙ রস, ভোরের বাতাস, স্নিগ্ধতা, জীবনকে জানার বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

বিখ্যাত বিদেশী চৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাসের সঙ্গে এখানেই গোপাল হালদারের উপন্যাসের পার্থক্য। তাঁদের দর্শন হাইডেগার-কিয়ের্কগার্ড—সার্ত্র প্রমুখের চিন্তানুসারী। সেখানে সামাজিক দায়বোধ, অবান্তর; বন্ধুপ্রীতি ভালোবাসা, সমবেদনা নিরর্থক—কেবল অস্তিত্বের যন্ত্রনা এবং ভেসে বেড়ানো। অমিত বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও সাংবাদিক, সর্বোপরি অমিত কবি। তাই সে ভাবতে পেরেছে শৈলেন ফটিক সুধীর মনীশের কথা। কত কাছের মানুষ গেল দূরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন শৈলেন এখন শ্বশুরের দৌলতে বৈষয়িক অর্থে সম্পন্ন গৃহস্থ, ইতিহাসের গবেষণার স্বপ্নটুকুও নিঃশেষিত। সব অনন্যতা-বর্জিত শৈলেন নিছক একটি সুখী সংসারী জীব, মনে ও মননে যে মৃত। 'এমনই জীবন—ইহাই নিয়ম।' উজ্জ্বল শৈলেন নিভে যায়, বনেদী সুখী পরিবারের সুনীল বিপ্লবের ঘোর-লাগা চোখে বাড়ির নিরাপদ আশ্রয় ছাড়ে এবং আয়েশী, হয়ত বা কর্মভীরু অমিতই জীবনকে অভিজ্ঞতার বিচিত্র পাত্রে অনুভব করে, ভেতরে-ভেতরে পাল্টায়, নতুন মানুষ হয়ে ওঠে।

সুনীল শৈলেন সুহৃদ সাতকড়ি বা মনীশের সান্নিধ্যের চেয়ে অমিতের আত্মবিকাশের, হয়ে ওঠার দিক থেকে অমিতের পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় চরিত্রটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অমিত ও ব্রজেন্দ্রবাবু দুই প্রজন্মের দুই প্রতিনিধি; জীবন, স্বদেশ ও স্বকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাসী; তবু দুজনের মধ্যে আছে একটা শ্রদ্ধাও স্নেহের গভীর বন্ধন। অমিতদের কার্যক্রম স্বদেশের মুক্তি-সাধনা, তার মত ও পথ, ট্রেড ইউনিয়ন বাদে তাঁর যথেষ্ট আস্থা নেই, অথচ হ্যামলেটীয় অমিতদের ওপরই তিনি ভরসা রেখেছেন। তৃতীয় খণ্ডে ব্রজেনবাবু

ও তাঁর মেয়ে সবিতা নতুন প্রেক্ষিতে আবার ফিরে এসেছে। তখন দুজনের মধ্যেই অমিতের মনে গভীর বেদনা এবং দায়বোধ। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে আলাপেই কেবল অমিত তার ভাবনার জগৎ মেলে ধরেছে—কোন সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে আলাপে মন সেরকম সায় দেয়নি।

> অমিত কহিল, চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টি, এখন ওসব অসম্ভব ; ওসব বাজে কথা। যারা রাষ্ট্রপ্রয়াসে ভেসে পড়েনি, তারা নিজেদের ভয়কে নানারূপ পোশাক পরিয়ে নিজেদের আর অপর সকলকে ফাঁকি দেয়। কেউ হন বীরবলের অনুকরণ—Pun এর সস্তা রসিকতায় শব্দ গাঁথেন ; ভুলে যান এই নওরতনের দরবারে আবুল ফজল, ফৈজীর আসন খালি পড়ে আছে। কেউ হন গল্প লেখক, হয় দরিদ্রের জন্যে চোখের জল ফেলেন, না হয় দেখান প্রেমের হিস্টিরিয়া, না হয় সস্তা সিনিসিজ্‌ম। ওসবই আসলে আত্মপ্রবঞ্চনা, নিজেদের মন থেকে এই গ্লানিবোধ ওঁরা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না তাই। যারা কর্মের একটা নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে নিজেদের জীবনকে সঁপে দিতে পারছে, তারা তো বেঁচেছে। যারা তা পারেনি, তাদের মধ্যে অর্ধেক নিজেদের মধ্যেই নিজেরা দগ্ধ হচ্ছে। তাদের জীবন অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যেন একটা জতুগৃহ-তারা পুড়ে খাক হচ্ছে হ্যামলেটের মতো, Time is out of joint. O cursed time! that ever I was born to set it right! তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি To be or not to be! আর বাকি অর্ধেক এই ট্র্যাজেডির হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে at the cost of their soul—কাব্য লিখে, গল্প লিখে। এটা Escapism, তারা সবাই এই কথাটাই প্রমাণ করছে যে তারা spiritually নিঃসম্বল, emotionally defunct, morally banal.

একি কেবল অমিতের কথা? তিরিশের দশকের একদা আদর্শবাদী পরে সংসারে গ্রস্ত, স্বপ্নভ্রষ্ট, মনে ও মননে দেউলিয়া অধিকাংশ মধ্যবিত্ত যুবকের ট্র্যাজেডি। বলা যায়, আমাদের রিনাইসান্সের ট্র্যাজেডি, তারই সীমাবদ্ধতা। যারা 'নিজেদের মধ্যেই নিজেরা দগ্ধ হচ্ছে,' তাদের মধ্যে তবু অঙ্গারে আগুনের মতো কিছু শ্রেয়স্‌-চেতনা অবশিষ্ট আছে। কেবল তিরিশের দশকের সাহিত্যিকদের কিছু continent বিলাসে যেটুকু ফাঁকি, সেটুকু বাংলা সাহিত্যে নতুন অভিঘাতের দিক থেকে কিছুটা ইতিবাচক। নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়েছে জলের দরে—সে তো শৈলেনরা। শৈলেন যেমন যৌবনের আদর্শভ্রষ্ট হয়, তেমনি

এ্যাটর্নি সাতকড়িও। সংসারের সাফল্যচক্রের নিচে পিষে 'শৈলেন হয় সাতকড়ি'। ইহাই জীবন—ইহা এইরূপই হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বশিষ্ঠের উত্তরের মতো, 'মহারাজ ইহা এইরূপই হয়'। এও চরিত্রের ভেতরে-ভেতরে আত্মস্খলন, বড়ো থেকে ছোট হওয়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অর্থ-যশ-সমৃদ্ধির লোভে বিলিয়ে দেওয়া। তাই আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিকাশ, আত্মসম্প্রসারণ কেবল অমিতেরই। অমিতের জীবনবৃত্তে এরা বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছে সমকাল ও সমবয়সের সূত্রে, আপাতিক যোগে; ফুলের মালার মতো কোন অচ্ছেদ্য অন্বয়সূত্রে নয়। অথচ বাংলাদেশের বিশেষ কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানা টাইপ, বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ এবং সেই প্রেক্ষিতে নায়ক অমিতের জীবনচর্যার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য চরিত্রগুলি অপরিহার্য। গভীর অর্থে, সমাজ-বাস্তবতা চরিত্রের ভিতর দিয়েই রূপ পরিগ্রহ করে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর, শিল্প-সাহিত্যের মানসভিত্তি হল superstructure, তার বনিয়াদ আর্থসামাজিক বাস্তব ভিত্তি বা structure, ইগব ফ্রিডেলের A culture of the modern Age, ডিজেলের Germany and the Germans ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এসেছে। ততদিনে গোরা যোগাযোগ শেষ প্রশ্নের বিতর্ক-প্রীতি ঔপন্যাসিক বাস্তবতার উপকরণ হিসেবে পাঠকের কাছে সমাদৃত। কিভাবে প্রত্যেক দেশের ইতিহাস এক অখণ্ড মানবসভ্যতার ইতিহাসে মিলে যাচ্ছে তার প্রমাণ শিল্পবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, পুঁজিবাদ, বস্তি-তত্ত্ব-সবই বিশ্বতাৎপর্যে বিচার্য। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার ফলভাগী সারা বিশ্বের মানুষ। অমিত-ব্রজেন্দ্র সংলাপে ভারত আত্মার স্বরূপ সন্ধান এবং য়ুরোপের চিন্তাজগৎ কিভাবে অমিতের চিত্ততটে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে, উপন্যাসের শিল্পগত প্রাপ্য (ফলশ্রুতি?) হিসেবে তার মূল্যও কম নয়। য়ুরোপীয় চৈতন্যপ্রবাহী উপন্যাসের নায়কেরা সাধারণতঃ অহংকৃত, অহংবৃত, অন্তর্বৃত। অমিতের জীবনযাত্রা আত্মসংপ্রসারণের দিকে, ইতিহাসের ভবিষ্যতের দিকে।

একে একে কাছের মানুষ ইন্দ্রানী সুরো সুধীর সুধীরা সুহৃদ শৈলেন সাতকড়িরা দূরে সরে যাচ্ছে, সুনীলও; ঝরে-পড়া এইসব স্মৃতিবেদনার পাশে ছিঁচকে চোর, ওড়িয়া, দীনু ও মোতাহের, বিলাত ফেরৎ কমরেড দাশ এবং ইশাকের অভিজ্ঞতা, থার্ড ইন্টারন্যাশনাল অমিতের জীবনে যেন একটির পর একটি পর্দা তুলে দিচ্ছে। বজবজের মজুর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, মালিকের দালাল ছদ্ম-শ্রমিকনেতার চেহারা, শ্রমজীবী মানুষের সাংবাদিকতা, 'শেষ প্রশ্ন' থেকে ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার

পর্যন্ত গণচেতনাশ্রয়ী সাহিত্যে শিল্পের মুক্তি, নতুন শ্লোগান নয়, জীবনের নতুন দিগন্ত অমিতের জীবনানুভব—উপন্যাসেরও বৈভব।

গৌণ চরিত্রের কয়েকজনের প্রসঙ্গ আলাদা ভাবে আলোকিত হতে পারে। যুগল, অনিল-ললিতা, শৈলেন, সুহৃদ, সাতকড়ি, মনীশ, মনীশের অনুগামী সুনীল, সুনীলের সহযোগী অমিত। তিনবন্ধু, কৈশোরে প্রথম-যৌবনে খুব অন্তরঙ্গ। ক্রমশ দূরত্ব বেড়েছে। স্বদেশের মুক্তিসাধনায় দুজনে ঘরছাড়া, অমিত বাড়িতেই থাকে। তবে তার চলা-ফেরার মধ্যে রহস্যজনক গোপনতার অংশটি বাড়ির সবার জানা! বিশেষত অমিতের মার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। তবু কিছুই সে বলেনা। কারণ সুনীল সবই গোপন রাখে। কেবল টাকার চাহিদা জানায়। কারণ মণীশও সব কথা সুনীলকে বলেনা। বন্ধুত্বের মধ্যে সন্দেহের আশ্চর্য অন্ধকার। লেখকের এই কর্মপদ্ধতিতে সায় দিতে পারেন নি। তাই দুচারটি মুহূর্ত তুলে এনেছেন উপন্যাসে, যেখানে দেশের মানুষ বাদ দিয়ে বিপ্লবীয়ানা বড়ো! জন-বিচ্ছিন্নতাই-এর ব্যর্থতার বীজ বহন করছে।

ত্রয়োদশীর ফুটফুটে জোৎস্নায় সুনীল অমিত মনীশের দেখা! অমিত দেখেছে, হাতে-হাত ধরা দুই বন্ধু। সুনীলকেই সন্দেহ করছে মনীশ। সুনীলের দাদা নিখিল গান্ধীর চরকার আদর্শে মুগ্ধ। মনীশ কেবল একটু আশ্রয় চেয়েছে রাত্রির জন্য, আবার সে পরের রাত্রিতে চলে যাবে। কোথায়, সে জানে না। আর কিছু সে প্রত্যাশা করে না? সুনীলের এই প্রশ্নে মনীশ জানিয়েছে, আর শ' তিনেক টাকা যদি হয়। মণীশ কি মানুষ না পাথর? সুনীল কেবল টাকার জোগানদার? সে যেন ধরিয়ে দিতে পারে। তাই মণীশ বলেছে, প্রাণ বাঁচানোর সমস্ত আয়োজন আমার সম্পূর্ণ আছে-তোদের মাজল-লোডারের ওপর অত ভরসা রাখিস না। অর্থাৎ বন্দুক দেখিয়েও মনীশের গতি প্রতিরোধ করা যাবে না। সুনীলের কথায় সন্দেহের মেঘ অন্তত কিছুক্ষণের জন্য কেটে গেছে—'এত ছোট তোর মন,—ভাবতে পারলি, আমি তোকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছি।'— জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর এক আশ্চর্য সাক্ষাৎকার। দেবব্রত নাম নিয়ে মণীশ পরদিন থেকে সুনীলের পরিবারে পরিচিত হবে। সেই রাতে সে রইল আত্মগোপন করে। লুকিয়ে সুনীল এনে দিল সামান্য কিছু খাবার। কঠিন বিপ্লবীর ভেতরের মানুষটা তখনই বেরিয়ে পড়ল।

ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুনীল চমকিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে মনীশকে ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল। নীরব জলের ধারা বহিয়া

চলিল। কেহই কথা কহিল না। এরকম মুহূর্তেই Silence is more eloquent than speech !

> মাফ করিস, সুনীল। বড় অন্যায় করেছি, অন্যায় কথা বলেছি, অপমান করেছি—তবু মাফ করিস। ভাবছিস, একি দুর্বলতা! সত্যিই তাই। কিন্তু আজ একমাস আমার চোখে ঘুম নেই। দিন সাত-আট মাত্র শুতে পেয়েছিলাম। শুতে পেলেই যে ঘুমুতে পারি, তা তো নয়—তবু শুতেই পাইনা। তাছাড়া রাত্রেই চলতে হয় পথ, দিনের বেলা পথে বেরুনো নিরাপদ নয়। এই সত্তর আশী ক্রোশ পথ চলে এখানে এসেছি—পায়ের জুতো ছাড়তে হয়েছে অনেক পূর্বেই; গায়ের জামা দু-একবার নতুন কিনে নিয়েছি; ফোস্কা পড়ে আজ পা অচল হয়ে এসেছে। অথচ কোথাও তিষ্ঠোবার উপায় নেই—চল—চল—চল; একঘন্টা আগে যেখানে ছিলে একঘন্টা পরে সেখানে আর যেন তোমার রেখাটি না থাকে। প্রতি মিনিটে পথ বদলাও, প্রতি মোড়ে পাল্টা চল—যেন কোন চিহ্ন তোমার কোথাও কেউ খুঁজে না পায়। শিকারী কুকুরের পাল তোমার দেহের আঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে তোমার পেছনে আসছে। নেকড়ের মতো জিব বার করে তারা তোমায় তাড়া করছে। দাঁড়ালে কি মরলে। ভুল করলে কি শেষ হলে। একটিবার অমনযোগী হয়েছে তো আর নেই।···

বিক্ষুব্ধ বাংলার তিরিশের দশক। ইংরেজ সাম্রাজ্য কেঁপে উঠেছে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যুবসমাজকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। বিনয়, বাদল, দীনেশের দুঃসাহসিক রাইটার্স অভিযান গোয়েন্দা ও পুলিশ-বাহিনীকে লাগাম ছাড়া স্বাধীনতা দিয়েছে। সারা দেশই যেন বন্দীশালা। গান্ধীবাদীরাও সত্যাগ্রহের পথে আইন ভেঙে জেলে ভরছেন। সেই সময়ের নাম না জানা অনেক বিপ্লবপন্থীদের জীবনে এরকম মানস-সংকট উপস্থিত হয়েছে। জেলে তবু নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবকাশ আছে। এ্যাবসকন্ডারের জীবন বড় দুঃসহ। দেশপ্রেমিক হয়েও দেশের মানুষের কাছে আত্ম গোপন করতে হয়, নেতার নির্দেশ যন্ত্রের মত পালন না করলে মৃত্যু; পুলিশের হাতে বা বিপ্লবী ঘাতকের হাতে। সুনীলের কথায় গভীর বেদনা-আশংকা-ক্লান্তির প্রকাশ। লেখক সুনীলের সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি এধরনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সুনীলের জন্য আমরা সমবেদনাও অনুভব করি। শুনতে শুনতে অমিতের মন ভালোবাসায় দ্রব হয়েছে। সুনীল বলেছে, 'বুঝলাম, অবসাদ দেহে মনে চেপে বসছে। আবার

পথে পথে হেঁটে চললাম। এমনই করে আজ কত রাত, কত দিন গেল—এই ত্রস্ত, দগ্ধ দিন রাত,—দুঃস্বপ্নভরা দিন, দুশ্চর রাত, যাতনাময় অস্থিরতা। মানুষের সহজ প্রশ্নকে মনে হয় কুটিল, সোৎসুক দৃষ্টিকে মনে হয় সাপিল। মাফ করিস সুনীল, অবস্থার চক্রান্তে আমার মন বেঁকে-চুরে যাচ্ছে, ভেঙে খান খান হয়ে গেছে।' এরপর আর কথা চলেনা। বিপ্লবী তার মুক্তিসাধনায় শপথবন্ধ। তবু সুখী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, কেবলই লক্ষ্যহীন চলা আর তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত 'পালাও পালাও'; সত্তর-আশি ক্রোশ পালানো দুশ্চর তপস্যা হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে যথার্থ স্বদেশ সাধনা নেই। রবীন্দ্রশিষ্য গোপাল হালদার কোন সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচী সমর্থন করতে পারেননি; অন্তর্দলীয় সংঘাতকেও নয়; তবু ঘরছাড়া এই সুনীলদের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল।

দি হাণ্টেড এ্যাণ্ড দি হণ্টেড। মনীশ সুনীলের তুলনায় আরও ফাঁপা মানুষ। গোপাল হালদার সমকালের কোন ব্যক্তির দিকে বিদ্রূপের তর্জনী তোলেন নি। কিন্তু হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখা 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' পড়লে বেশ কিছু আহাম্মক কাগুজে বিপ্লবীর আগুনে-মুখোশ খুলে যায়।

কিন্তু মনীশের ভেতরেও এক নির্জিত ব্যক্তিমানুষ আছে। অমিতের অর্থাৎ লেখকের চোখে তার পরিচয়ও উদ্ঘাটিত। অমিতের আপাতঅসংলগ্ন মানস-চারণার মধ্যেই জানা গেছে মনীশ বিপ্লবের পথে বেরিয়ে দিশা পাচ্ছে না। সে মুখে বলছে, 'বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো আমাদের নয়—আমাদের কাজের সম্পর্ক, যমের দুয়ারে এগিয়ে দেবার সম্পর্ক', কিন্তু সুনীলের মায়ের ভালোবাসা, বউদিদের অন্তরঙ্গতায় সে জীবনরসের কবোষ্ণতা পেয়েছে, তার স্বাদে সে অভিভূত, অন্তত সাময়িকভাবে আবিষ্ট। তাই বলেছে, 'এখানে পথে ঘাটে একটা বিমূঢ় অন্ধ মানবশ্রেণীর সঙ্গে দেখা হয়।' মনীশের মনে পড়েছে নিজের মায়ের কথা। আর সব রকম প্রতিকূলতায় অমিতের শক্তি তার মা, মায়ের স্মৃতি। দেশমাতার সেবকদের পক্ষে কি এই মাতৃশক্তি বিশেষ Elan Vital? দেবব্রত-মনীশ-ললিতা ও মেজবৌদির মধ্যে হয়ত সেই মাতৃকাশক্তির অংশই প্রত্যক্ষ করেছিল। তাই কোমরের অস্ত্র উঁকি দিতে পারে, সেকথা ভেবেও জামা খুলে সে বিশ্রাম করেছিল। শেষপর্যন্ত ঐভাবেই তো মনীশ পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। কি আশ্চর্য! অনিল তখনও ন্যাশনাল স্কুলে মাসে মাসে চাঁদা পাঠায়। কিছুদিন সে স্বদেশীও হয়েছিল। কার যে কি পরিণাম ঘটে। অবশেষে, অমিতের অভিজ্ঞতা, 'একটা আগুনের ফুলকির মতো মনীশ নিভিয়া গেল।'

সাতকড়ি অমিতের সতীর্থ—একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। উচ্চাশা ছিল, দেশহিতের কল্পনা ছিল। সময়ের নিয়মে সব গেছে। সে প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ। ঘরে সাজানো আলমারি ভর্তি বই। পড়ুক না পড়ুক, ঘর আলো করে আছে। আট ভল্যুম ইউনিভার্সাল হিস্টরি। একটা সম্পত্তির লেনদেনে আটশো টাকা অমিতের প্রাপ্য। টয়েনবির সার্ভে অফ ইনটারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ১৯২৯-এর বাকি দাম চুকিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর অবশ্য সুনীলের দাবি।

প্রথম সাক্ষাতেই পরিতৃপ্ত সুখলালিত সাতকড়িকে চেনা যায়। 'গোল আলুর মতো গাল দুটি হাসিতে একটু কাঁপিবার চেষ্টা করিল।···মাংসের স্থূলতা ও নিদ্রার জড়তায় মিলিয়া সে হাসি চাপা পড়িয়া গেল।'

খাঁটি বিলাতী ক্লিকেট ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। দামী শাল। হীরার বোতাম। সোনার সিগারেট-কেস। অমিত সম্পর্কে ঔৎসুক্য নেই, তাই মনে থাকে না যে কলেজের অধ্যাপনা নয়, এখন সে সামান্য সাংবাদিক। অথচ একদিন অমিত সম্পর্কে ইন্টারেস্ট ছিল। 'এই সেদিনের কথা মাত্র। এমনই জীবন! শুধু ছাড়াইয়া যাওয়া। শৈলেন আর সাতকড়ি এক হইয়া যাইতেছে; অথচ দেহে-মনে এমন স্বতন্ত্র দুটা মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট।' শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী smug, self-complacent, worldly.

শৈলেন সংসারতৃপ্ত ভালোমানুষের আর এক টাইপ–তাকেই ছাড়িয়ে যেতে হয়, কারণ শৈলেন মনের দিক থেকে অমিতকে ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। পরীক্ষায় প্রথম। কৃতী ইতিহাসের ছাত্র। অমিত ও শৈলেন ইতিহাসের দুই অন্ধকার অধ্যায়ে নতুন আলো ফেলবে। এই ছিল প্রতিজ্ঞা। বিশেষ উৎসাহে ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরুও হয়েছিল। তারপর সুখ-তৃপ্তি-স্থিতির প্রলোভন-প্রবাহে প্রথম যৌবনের স্বপ্নসাধ, প্রতিজ্ঞা খড়-কুটোর মতো ভেসে গেছে। বিগত দিন, বিগত-আয়ু, বিগত-আলো। হাইকোর্টের উকিল শ্বশুরের দৌলতে সে নাকি মুন্সেফ হিসেবেই অনেক জটিল মামলার রায় দিতে পারে, তখন সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছে। বার-লাইব্রেরিতে পুরনো বন্ধুদের খুঁজে নিয়ে আড্ডা দিয়েছে এবং ব্যর্থ উকিল যুগীনকে শ্বশুরমশায়ের মাধ্যমে দাঁড় করাতেও চেয়েছে। সংক্ষেপে, শৈলেন সাতবছর পরে মৃত বা বিলুপ্ত— 'জাস্টিস দে—শ্বশুরমশায়—স্পেশ্যাল পাওয়ার··· শ্বশুর মশায়—বার লাইব্রেরি ··ল অব মগেজ···শ্বশুর মশায়।'

বিকাশ বা সুহৃদ অত 'বোর' নয়, তবু আটপৌরে, বর্ণহীন, যৌবনস্বপ্নবিচ্যুত

নিজেকে দেশ জাতির বা সমাজের চালচিত্রে রেখে দেখে না। অথচ সময় ১৯৩০, তিরিশের দশক। অসহযোগ খিলাফৎ পার হয়ে নরমপন্থী পলিটিক্স নতুন মোড় নিচ্ছে। যুগান্তর অনুশীলন প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের অ্যাকশনে ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত, নিরাপত্তার নামে দমন পীড়ন চূড়ান্ত। তবু উচ্চাশী মধ্যবিত্ত তরুণেরা অধিকাংশ নির্লিপ্ত; ব্যক্তিগত জীবনে নীড়াশ্রয়ী সুখসন্ধানী। যে ইন্দ্রানী-সুরোর মাধ্যমে শৈলেনের স্ত্রী ও শ্বশুরভাগ্য, তাদের কথাও মনে নেই। এমনই হয়, জীবনই এরকম। Intense Living, তার জন্য আকুতি থাকে ক'জনের? অমিতের ছিল। তাই অমিতের চোখে ও মনে, নিভৃত মনন-চারিতায় অনেক মানুষের আদর্শের রাঙতার রঙ্ ধরা পড়েছে, আবার অনেক পতিত মানুষ বা উপেক্ষিত মুহূর্তের বিশেষ তাৎপর্য উন্মোচিত হয়েছে। শীতের রাত্রি বারোটা উত্তীর্ণ। অমিত যুগল ব্রজেন্দ্র রায় বঙ্কিমবাবু সুহৃদ ইন্দ্রানী ইত্যাদির সংস্রব সেরে বাড়ি ফিরে এল। তবু ঘুম নেই। নানা চিন্তা। রাত্রি শেষের আলো এবং পুলিশের সবুট পদধ্বনিতে 'একদা' সমাপ্ত।

'অন্যদিন' আঠারো বছর পরের রচনা। ঘটনাপ্রবাহ ১৯৩৭-৩৮ সালের; রচনাকাল ১৯৪৮। তখন লেখক প্রেসিডেন্সি জেলের রাজনৈতিক-বন্দী। তাই 'ছোবড়ার' বা 'ঘানিঘরে'র কোন আশংকা নেই। জেলের 'লপ্‌সি' নয়, খাদ্যই বরাদ্দ।

শরৎকালে সকালের উপন্যাসের সূচনা। 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে। শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি···' অমিত রবীন্দ্র শিষ্য, 'পশ্য দেবস্য কাব্যম্' উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল; অমিতও সেই দৃষ্টির অধিকারী। প্রেসিডেন্সি জেলের গরাদের ফাঁক দিয়েই অমিতের অনুভব ঃ 'আশ্চর্য বাংলাদেশ! আশ্চর্য তার শরৎকাল। কথা না বলিয়াও কথা কহিয়া উঠিল অমিতের মন। ···আশ্বিনের বাংলা যেন স্নেহসজল বাঙালী মায়ের মতো পরগৃহ হইতে কন্যার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।' একপেশে রাজনীতি এবং সামাজিক বোধে প্রায়শঃ প্রকৃতিমনস্কতার অপহ্নব ঘটে। প্রকৃতির রূপ রঙ, ঋতুর পরিবর্তন যে জীবনের স্বাদকেই বদলে দিতে পারে, তার প্রমাণ পেয়েছে বারবার অমিত। পৃথিবী বড় সুন্দর। মনে পড়ছে—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' 'অমিত মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছে।' যখন মানুষের আকাংক্ষা, 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,' তখনই সকলের শ্রদ্ধেয় সুশীলদা অর্থাৎ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু অমিতকে একটা ধাক্কা দিয়ে

কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পুরুষকারের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

যিনি মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে বিধাতাকে 'প্রশ্ন' করেছিলেন ঃ 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো / তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো,' তাঁর কলমেই লেখা হ'ল 'চারঅধ্যায়'। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মিত, আশাহত। 'একদিন সেই বিক্ষুব্ধ হতাশ শত যুবকের অন্তরে তর্কের তুফান উঠিয়াছিল—কবি, তুমি দিলে তাহাদের ললাটে এই কলঙ্কের ছাপ ?'

এ ধারণা সুশীলদার মতো সেদিনের অনেক বিপ্লবীর, বারীনদার শিষ্যদেরও, কিন্তু অমিতের নয়। কারণ অমিত জানে, উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভেসে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হারানো যায় না। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, পলাতক, সন্দিগ্ধ কয়েকটি মানুষ অস্ত্রধারণ করলেই দেশ শোষণমুক্ত হবে না। সমস্যার মূলে পৌঁছতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ—পুঁজিবাদেরই বিশেষ চেহারা, একটা বিশ্বব্যবস্থা। এর বিকল্প ব্যবস্থা কি, ভাবতে হবে। অমিতের স্বপ্ন সোভিয়েট ইণ্ডিয়া। তিরিশের দশক-স্পেনে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড তৈরি হয়েছে। ক্রিস্টোফার কডওয়েল গোব্রিয়েল পেরি র‍্যালফ ফক্সের মতো লেখক-বুদ্ধিজীবী তাতে যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানিয়েছেন। অমিতের স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ভারতের একটা গঠনমূলক চেহারা বাস্তবায়নের সব সম্ভাবনা নিয়ে জেগে উঠছে।

তাই সে স্বভাবের বিপরীত এবং বয়সে প্রবীণ সুশীলদাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। অমিতের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেন না, তবু জানতে চান এঙ্গেলসের বক্তব্য, 'পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র', সমাজবাদী চিন্তার ইতিহাস, মার্কসের 'ক্যাপিটাল,' 'বিপ্লবের সাধনা শুধু আত্মার আত্মবিনাশ ?' 'দুইটি বেদনাহত চোখের সানুনয় দৃষ্টি' অমিতের স্মরণে-মননে চিরকালের হয়ে রইল, মিলে মিশে রইল গম্ভীর শান্ত স্বভাব চিরজিজ্ঞাসু বাবা এবং সংসার সমরাঙ্গনে ব্যথাহত কিন্তু অপরাজিত পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্ররায়। এভাবেই সুনীল-সুহৃদ-শৈলেনের বন্ধু বারবার বদলেছে অমিত হয়ে উঠেছে। নিজেকে বারবার ছাড়িয়ে যাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা, জীবনের অভিজ্ঞতা, দেশ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং 'বন্দীশালার বিশ্ববিদ্যালয়ের' শিক্ষা—সব নিয়েই অমিতের সমৃদ্ধি।

অমিতের আত্মবিকাশে লক্ষীধর ঘোষ, শশাঙ্কনাথ, জ্যোতি, নীহার মিত্র,

নরেন মিত্র, কালীকিংকর এবং দাগী তালাতোড় রঘু ওড়িয়া, সকলেরই ভূমিকা আছে। মুক্ত রাজবন্দী কালীকিংকর বন্দী ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে আড়কাঠি। আসলে ইংরেজের দালাল। তাই সে 'শ্বেতকিংকর'। লক্ষ্মীধর ব্যায়াম করেন, গীতা পড়েন ; কমিউনিজম বোঝেন না, কিন্তু ঘোর কমিউনিস্ট-বিরোধী। নরেন মিত্র অন্যবন্দীর টাকা চুরি করে, অথচ চোর রঘুর কাছে বন্দীদের টাকাকড়ি নিরাপদ, অমিত অসুস্থ, গোপনে সে তার সেবা করেছে, ভালো চামচ-প্লেট জোগাড় করে এনেছে। অনেকবার রঘু ঘানিঘরে, ছোবড়া-ঘরে গেছে। তবু সে অকপটে বলতে পারে, চোরকে বিশ্বাস নেই। তার বউ-ছেলে-আত্মীয় আছে, তাদের কাছেও সে চোরমাত্র। তবু ছাড়া পেলে আবার সে চুরিই করবে। 'চোর-অকে বিশ্বাস নাই।' অথচ পোষা বিড়াল ছেনির মৃত্যুতে সে দারুণ শোক পেয়েছে। রঘুর মতো দাগী আসামীর মধ্যে ছাই-চাপা মনুষ্যত্বের আবিষ্কার অমিতেরই শ্রেয়স-সন্ধানকে পূর্ণতা দেয়।

একদা-য় যে মমতাময়ী মায়ের কথা অমিত না ভেবে পারে নি, ছদ্মকলহে যার কাছ থেকে তার রহস্যময় কর্মসূচী গোপন রেখেছে, অন্যদিন-এ সেই মা মারা গেছেন। অনু-মনুর পাঠানো চিঠি জেলের সেন্সর পার হতে পারে নি। বরং তাঁরা খবর দিয়েছেন, মায়ের স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।

বাংলার মন্ত্রীসভায় রদবদল হয়েছে, ফজলুল হক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছেন ; বাইরে বন্দীমুক্তির জোর আন্দোলন চলেছে। অমিতের মুক্তির সংবাদ এসেছে। জ্যোতির্ময়, শশাংক, লক্ষ্মীধর, নরেন, নীহার ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া সবার মনেই মুক্তির ইশারা, একে একে এবার ছাড়া পাবে। সকলেই অমিতের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ করছে—যেন জেলখানার এক বৃহৎ পরিবারে থেকে সে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে, এই তার অনুভূতি। মা নেই, 'মা বড় জঞ্জাল, মা কেন মরে না,' একদার এই মাতৃঅভিভব 'অন্যদিন'-এ নেই। মায়ের মৃত্যু যেন অমিতের নির্মোহ আত্ম আবিষ্কারের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু সুনীল? যার জন্য অমিতের এত দুঃখবরণ? সে দিশাহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট। তাই প্রথমে সঙ্গীতের মধ্যে জীবনের সব কান্না উজাড় করে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কোন সুইসাইড নোট রাখেনি, কারো প্রতি কোন বক্তব্য নেই বলেই তো ঐ 'নোট' অর্থহীন। জীবনই তার কাছে অর্থহীন।

এখানেই অমিতের সঙ্গে সুনীলের জীবনবোধের পার্থক্য। সব অন্ধকার পরিয়ে Life marches on, জীবন আগাইয়া চলিয়াছে। এই হল অমিতের জীবন-

দর্শন। সে ইতিহাসের ছাত্র ; চার্চিলের 'ওয়ার্লড ক্রাইসিস' পড়েছে, জানে, 'দি ইন্টার ন্যাশনাল ইউনাইটস দি হিউম্যান রেস,' তার মনে পড়ে, What man has made of man শেক্সপীয়রে অমিতের আত্মদর্শন—What a piece of work is man ! এবং quintessence of dust !

সুনীল বা মনীশের মতো অমিত যে মুষড়ে পড়েনি, তার কারণ হয়ত তার অধীত বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ জনসংঘট্ট ; কিন্তু পারিবারিক পরিমণ্ডলকেও মনে রাখতে হবে। মা নেই, বাবা আছেন ; ছয় বছরের দুর্ভাবনায় ও পত্নীশোকে স্থবির, কানে কম শোনেন, তবু অমিত এসেছে শুনেই খুশী। 'কতক্ষণ থাকবে···' স্থবিরতা ভেদ করে পিতার প্রশ্ন, স্নেহের শোকের অশ্রুও নির্গত! অমিতের কর্মধারায় বাড়ি, বাপ-মা, অনু-মনু তো এতদিন তুচ্ছ ছিল।

কিন্তু, অমিতের বিরল সৌভাগ্য যে, কেউ তাকে দোষারোপ করেনি। অনু মনু বড় হয়েছে, তবু দাদাকে ঘিরে তাদের অনর্গল কলকাকলি, কাননবালা বড়ুয়া-লীলা দেশাই···মুক্তি, সোনার সংসার। অকুণ্ঠ ভালোবাসাই তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। 'প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা'। কোন কটূতির্যক উক্তি শুনতে হয়নি। সেজন্যই বলা সম্ভব হয়েছে, 'অপরূপকে দেখে এলেম দুটি নয়ন ভরে।'

ইন্দ্রাণী, সবিতার সম্পর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। তবু সেখানেও কোন বিরূপতা নেই। সবিতা বিধবা হয়েছে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেছে, পূর্বতন লজ্জা-সংকোচ-ভীরুতা নেই, বয়সের ছাপ পড়েছে। ছ'বছরের ব্যবধানে যৌবন তার লাবণ্য হারায় যথানিয়মে, অমিতের দৃষ্টি এড়ায়নি। ব্রজেন্দ্র রায় বাড়ির নাম রেখেছেন 'সবিতাসদন'। অমিতের জীবনে অন্য নারী ইন্দ্রাণী। সপ্রতিভ সেই বৌদি আজও অমিতের প্রতি আশ্চর্য স্নেহময়ী, তবে যৌবন-চাপল্য অনেক স্থির, সমাহিত। একদা-র ইন্দ্রাণী আড়ালে ছিল, অন্য দিন-এ নিরাবরণ, সংশয়মুক্ত! নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার চূড়ান্ত করেই সে অমিতকে নতুনভাবে পেয়েছে। বস্তুত সে বউদি নয়, পরস্ত্রী নয়, সে ইন্দ্রাণী। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অমিতও জেল-জীবনের অন্ধকারে চিনেছে ইন্দ্রাণীকে নিজের রক্তের আলোয়। 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি।' এখানেও রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ইন্দ্রাণী-অমিত সংলাপ নাটকের মতো সাজালে এরকম দাঁড়ায়।

কি দেখছিলে অমিত ?

তোমাকে।
কি বুঝলে?
বুঝলাম?—না, বুঝলাম না—তুমি কি স্নেহময়ী, না প্রাণময়ী?
কাকে তোমার বেশি ভয়, অমিত-দেহকে, না প্রাণকে?
ভয়? না, ভালোবাসা? জানিনা কাকে।
আমি জানি, আমি ইন্দ্রাণী, কারও ভার্যা নই, বউদিও নই।
আমি ইন্দ্রাণী—তোমার অন্তরাত্মাও তা স্বীকার করেছে
স্বতোচ্ছ্বাসে—সেই প্রথম মুহূর্তেই, আজ পথের উপরে।

অমিতের সঙ্গে আলাপে ইন্দ্রাণীর চোখে আলো ফুটিল, স্বপ্ন ফুটিল, ফুটিল বুঝি জ্বালাও।'

অমিত-ইন্দ্রাণীর এই আরক্তিম ভালোবাসার ছবি একদা-য় অস্ফুট ছিল। বরং একদা-র ইন্দ্রাণী কিছুটা প্রগল্ভ। অমিত একটা গোটা মানুষ, ব্যক্তিপ্রেমে' পরিবারের স্নেহে, দেশের মানুষের প্রতি কর্তব্যে ও ভালোবাসায়। বিশেষ মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর ডাক 'অমিত' যে কণ্ঠস্বর শুধু নয়, রক্তের সম্ভাষণ, অমিতও বুঝে আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত। অনেক ব্যর্থতার পরেও সার্থকতা আছে—জীবন ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। মানুর সঙ্গে অমিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিভৃত মুহূর্তেই মালা-বদল শরৎচন্দ্রীয় ছকে ভালো মানায়, অন্যভাবেও, রোহিণী-পন্থায় ইন্দ্রাণী 'আপন ভাগ্য জয়' করার অধিকার পেতে পারত।

হক মন্ত্রীসভা, শ্রমিকদের প্রতি কথার খেলাপ, জেল থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ বিপ্লবীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান, ডিমিট্রভ-থিসিস, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন, বিলাত ফেরৎ কমরেড দাস ও শরফুদ্দীন সম্পর্কে হুঁশিয়ারী আজও অস্থির তিরিশের দশকের ইতিহাস-আলেখ্য হিসেবে সার্থক। এরই ঘটনাবর্তে অমিত মোতাহের-সংস্রবে চটকল-আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে (কি এবং কেন চটকল আন্দোলন তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, সমরেশ বসুর 'জগদ্দল')। অমিত কি লেনিন-পন্থানুসারী হবে? মজুরের দাবি আদায়ের লড়াই এবং কলম-চালনা? সে তো একদা-তেই সোভিয়েট ইণ্ডিয়া চেয়েছিল। দু'বছরের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতায় অমিতের একটি বিশেষণে উচ্চারিত 'অপরূপ, অপরূপ, অপরূপ'। মানুষের বিচিত্র মিছিল, নতুন পৃথিবীর প্রসববেদনা, দেবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিঃ স্টিমারের বাঁশি, ল্যানসডাউন জুটমিলের সাইরেন-আহ্বান, সব মিলিয়ে নতুন দিন, অন্যদিন।

'আর-একদিন' ত্রিদিবা–র শেষ খণ্ড। লেখক বারবার জানিয়েছেন, তিনটি রচনাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারণ 'একদা' লেখার সময় তার অনুবৃত্তির কথা তিনি মোটেই ভাবেননি। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় একদা-র অনুকূল-প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া মনে রেখেই সম্ভবতঃ তিনি 'অন্যদিন' লিখতে শুরু করেন। ভারতের ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ ১৯৩০-৩৬ ; ইংরেজ প্রশাসন ঘরে-বাইরে বিব্রত হয়ে ক্ষমতার কিছু ভাগ দিতে চাইছে লীগ-কংগ্রেসকে। অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতা পেলও ; কিন্তু কৃষক সমিতির আন্দোলনে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যে চিড় ধরল প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য। ফ্যাসিবাদের প্রভাব ও তার প্রতিরোধে বিশ্বজনমত —এই প্রেক্ষিতে গোপাল হালদারের 'অন্যদিন'।

ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়', 'শেষ আঘাত হানো' এইসব স্লোগানে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৭-৪৮ সালে সভাসমিতি মিছিল করেছে। বস্তুতঃ দাঙ্গা দেশভাগের মধ্য দিয়ে কবন্ধ স্বধীনতা দেশের মানুষ চায়নি। কোন বড় আন্দোলনেরই মূল কথা এরকম ছিল না। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' প্রস্তাব ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। কার্যতঃ ভ্রাতৃঘাতী পরিণাম হল। জওহরলালজী কমিউনিস্টদের নিরাপত্তা আইনে ধরেছেন—একই জেলকোড মেনে বা না মেনে অত্যাচার পীড়ন, থার্ডডিগ্রি, টিকটিকি চালিয়েছেন। তবু প্রথম পার্লামেন্টে পার্টির নির্দেশ ছিল, জওহর প্রগতিশীল, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ প্রধান মন্ত্রীকে বিপাকে ফেললেই কমিউনিস্ট সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন জানাবে।

এই পটভূমিতে 'আর-একদিন'। দেশ স্বাধীন, জাতীয় পতাকা উড়ছে বড়লাট ভবনে, তার নাম রাষ্ট্রপতি ভবন, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দেশ শাসন করছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। এইসব পট-পরিবর্তন সত্ত্বেও অমিত লর্ড সিনহা রোডে আসতে বাধ্য। সে জানত, পুলিশের আধঘণ্টা আপ্যায়ন ছ' বছরও হতে পারে। তাই বাক্সবন্দী বইপত্তর ও দরকারী জিনিসপত্র এনেছে। গোয়েন্দা দপ্তরে গিয়ে অমিত দেখে, চেনামুখের মেলা। এসেছে চটকলের লড়াকু শ্রমিক বুলকন, সুরবালার মেয়ে মঞ্জু, কৃষক সমিতির কানাই হাজরা, ভাটপাড়ার পণ্ডিত গোলোক ভট্টাচার্যের ছেলে তপন, জ্যোতির্ময়, দিলীপ, বিজয় আরও অনেকে। দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে, আনন্দ আছে। অন্তত পরিণত বুদ্ধি লড়াকু মানুষ মাত্রেই জানে, লক্ষ্য এখনো দূরে, হতাশা নয়, উগ্র বিপ্লবীয়ানাও অবাস্তব। তাই আলীর তাস না হলে চলে না, অমিতের চাই শেকসপীয়র, কারও অবশ্য-অবশ্য বিলাতি সিগারেট। এসব নিয়েই জীবন। গোয়েন্দা

দপ্তরে জড়ো-হওয়া মানুষগুলি আটক রইলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। এই আধ ঘণ্টার কড়ার শেষে ভিন্ন ভিন্ন গাড়িতে তাঁদের জেলে চালান করা হল। আর-একদিন সমাপ্ত। উপন্যাসের বিষয় হল আটক-অবস্থায় পরস্পরের কথোপকথন, সঙ্গে সঙ্গে অমিতের অনুক্ত ভাবনা, অনুচ্চারিত মূল্যায়ন।

একথা বলতেই হয়, রীতির দিক থেকে প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ডের বাঁধুনি আর-একদিনে নেই। একদা অন্যদিনে অমিতের কর্ম, অমিতের চিন্তা, তার সামাজিক দায়বোধ, রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মসমালোচনাই মুখ্য। ফ্ল্যাশব্যাক, মণ্টাজ, স্মৃতিচারণা, পরম্পরা-বিপর্যয় ('arbitrary dial')—সবই অমিতকে নিয়ে। তুলনায় আর-একদিন টুকরো ছবির এ্যালবাম।

রেলস্টেশনের বা এয়ারপোর্টের প্রতীক্ষালয়ে জড়ো হয়েছে অনেকে। যারা পরস্পরকে চেনে, অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হলে যে-ধরনের উচ্ছ্বসিত আলাপে মত্ত হয়, তারই অনুরূপ কিছু। শক্তিমান, মননশীল লেখক রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় পরিণত, উপন্যাসের শিল্পশৈলী বিষয়ে অবহিত গোপাল হালদার অনেক জায়গাতেই ত্রুটিমোচন করেছেন। কিছু কিছু অংশ অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট থেকেও গেছে। পশুপতি-সুরবালা কাহিনী পুরনো জট পাকিয়েছে; শোভা-পশুপতির দ্বিতীয় বিবাহ, মঞ্জুরী প্রতিবাদী চরিত্র, মহিলা সমিতি গঠন, শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা দপ্তরেই প্রতিবন্ধী বিজয়কে বিবাহের অঙ্গীকার। রাজনীতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত প্রবীরের মৃত্যু ডিকসন লেন হত্যাকাণ্ড (সুশীল চট্টোপাধ্যায়—ভবমাধব ঘোষের মৃত্যু) স্মরণ করায়। কংগ্রেসরাজ না পুলিশরাজ, ভেবেছে অমিত। এই মর্মে ডাঙ্গের বক্তৃতা পাঠকের মনে পড়বে।

অমিত প্রৌঢ় হয়েছে। সেই আবেগ-অনুভূতি, প্রকৃতির রূপরঙ অনুভবের সেই কমনীয় বোধ যেন বয়সের ধর্মে ক্লান্ত, আবেগ বর্জিত। অমিতের দর্শন কর্মের দর্শন, শেষপর্যন্ত ফৈজপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তও তাই তাকে অনুপ্রাণিত করে। ফৈজপুর কংগ্রেসের তাৎপর্য (surcharged with socialist slogans) অমিতকে আশান্বিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদের নিন্দা এবং ভারতের মেহনতী জনগণ ও বিশ্বশ্রমজীবী মানুষ এবং রাশিয়ার জনগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের নীতি ঘোষিত হল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রোমহর্ষক বিবরণে কমিউনিস্ট বিরোধিতায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য মিথ্যার বেসাতি ধরা পড়ল। তবু অমিত ভাবছে, ফৈজপুর কংগ্রেস তো সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার পথ খুলে দিচ্ছে। দেখা যাক, কি হয়। তার জিজ্ঞাসু মন চটজলদী সিদ্ধান্তে আস্থা রাখে

না ; কারণ সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়, সত্য ও জীবনের দিগন্ত যেন ক্রম অপসৃয়মান। শ্রমিকের অধিকার অর্জনের হাতিয়ার ধর্মঘট এবং তেভাগার কৃষক আন্দোলনের সে শরিক হতে পেরেছে। দীনু মোতাহের তপন একসূত্রে কর্মযোগী। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সীমাবদ্ধতা অমিতের আত্মসমালোচনাতেই ব্যক্ত হয়েছে।

মনীশের মা, সুশীলের মা, অমিতের মা নেই। একদা-র মা-চরিত্র শরৎচন্দ্রীয় মেজাজ থেকে উত্তরণ, অথচ শরৎচন্দ্রীয় ছকেরই কাছাকাছি। আমাদের ভালো লাগে, হৃদয়কে আবিষ্ট রাখে। আর একদিনে এসে গেছে নতুন প্রজন্ম—তপন, বিজয়রা। ইন্দ্রাণী যা পারেনি, হয়ত মানু পারবে। সুরোর অসহায় আত্মহননের বিপরীতে মঞ্জু। অমিত যা ভেবেছে, জীবনে তার প্রয়োগ হয়নি সব। তারই বোন অনু এবং তার স্বামী শ্যামল তা পেরেছে। প্রেমে ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ঐক্য রচনা করেছে। ঘরে বাইরে তাদের অখণ্ড জীবন বা জীবনসংগ্রাম।

সবিতার পরিবর্তনও এক ধরনের পরিণতি—জীবনের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে হয়ত সবচেয়ে অনুজ্জ্বল, কিন্তু সর্বদিক দিয়ে ইতিবাচক ; মঞ্জুর আন্দোলনের চেয়ে মেয়েদের আর্থিক স্বয়ংভরতার লক্ষ্যে তার কর্মসূচী অনেকখানি সফলতা আনতে পারবে। অমিতের প্রতি নীরব ভালোবাসার এই রূপান্তর নিছক ঐতিহ্যানুসরণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেটি ঔপন্যাসিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি বেদনাদায়ক অপূর্ণতা অমিতকে ভাবিয়েছে। লেখকের অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপ এখানে চরিত্রেরই অন্তর্গত। বাংলার শ্রমিকেরা মূলত বাঙালী নন ; তাঁরা হিন্দীভাষী এলাকার মানুষ। বাহাদুর ট্রাম শ্রমিক যেমন শ্রমিক মনস্তত্ত্বে শিক্ষিত, তার 'নারা' দুনিয়ার মজদুর এক হও ; মিশিরজী-ইসমাইল ট্রাম চালকের হাতুড়িকে মিলনের প্রতীকে পরিণত করে দাঙ্গা-বিরোধী মিছিল বের করতে পারে। ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই আর ১৬ আগস্ট। দুটি দিনের মধ্যে দূরত্ব অল্প। কিন্তু অভিজ্ঞতার বিচারে, ইতিহাসের বিচারে বিরাট পার্থক্য। ২৯শে জুলাই সব রকম ভয় সন্ত্রাস সত্ত্বের সারা ভারত ডাক-তার ধর্মঘট, জাতিধর্মভাষার বিরোধ নেই। ঐতিহাসিক এই উজ্জ্বল আশাদীপকে নেভালো চোরাপথে ? ১৬ আগস্টে বিভেদ বিদ্বেষে কলংকিত দিনের সূচনা। আবার দেশ-ভাগের পরেও দাঙ্গার পরেও তে-ভাগার সফল কৃষক আন্দোলন হয়। অমিতের মনে সবই রেখাপাত করে। তবে একদা বা অন্যদিনে আন্দোলনের কোন-কোন পর্যায় যেমন অমিতের চেতনায় গভীর নাড়া দিয়েছে,

আর-একদিনের বিস্রস্তসংলাপের মধ্য দিয়ে জমিদার কংগ্রেস-পুলিশেরসন্ত্রাসকে ব্যর্থ করে তে-ভাগা লড়াইয়ের সে-রকম কোন মুহূর্ত ফুটে ওঠেনি। চন্দ্রকান্ত-গোয়েন্দা, মঞ্জুর লঘু চপলতা, আলীর আড্ডাধারী মেজাজ—সচেতনভাবেই লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যত কাছে চলে আসা যায়, তত সাংবাদিক নিত্যভাষণের প্রবণতা বাড়তে পারে। উপন্যাসের শিল্পের দিক থেকে সেটা ক্ষতিকর। সেজন্যই লেখক হাস্য-পরিহাস-হিউমারের দিকে ঝুঁকেছেন।

তবে জীবনরসরসিক, মানবরহস্যের জিজ্ঞাসু অমিত তার জীবনদর্শনে অবিচল। মানুষ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আবার What man has made of man. কীট্‌সের বিশ্বাস The poetry of earth is never dead অমিতেরও স্থিতধী পর্যুৎসুক মনের কথা। এই খণ্ডে যেন অমিতের নতুন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরিচয়। লেখক প্রথম খণ্ডে বলেছিলেন, 'মহাকালের হাতের অক্ষমালা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে', কিন্তু সেতো চক্রাবর্তের পথ নয়, চরৈবেতি, Life marches on, অন্ত্যখণ্ডেও সেই 'অয়মহং ভোঃ!'

> এক-একটি মানুষের মধ্যে—প্রতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও এখন সেই বিচিত্র বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি, সম্পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি, সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর ঃ ঐ মহামানব আসে।

একদা-য় যেমন শরৎ-প্রভাতের বর্ণনা ; আর-একদিনে তেমনি পাই ঃ

> আশ্চর্য সুন্দর চন্দ্রালোকিত এই পৃথিবী। বাহিরে যে কৃষ্ণ-প্রতিপদের আকাশ এতক্ষণ এত জ্যোৎস্না ঢালিতেছিল কে জানিত? দেবদারুর পত্রান্তরাল হইতে আকাশের আলোক ছক কাটিয়া দিয়াছে গোয়েন্দা আপিসের প্রাঙ্গণের পথে, ঘাসে। চৈত্রের হাওয়া মাতলামি করিতেছে নবপত্রে, রোমাঞ্চিত বৃক্ষরাজির ডালে ডালে। আর ইহারই মধ্যে বসন্তের কোকিলও ডাকিতেছে এই গোয়েন্দা আপিসের ছায়াঘন গাছের শাখায়। কেনা বলিবে পৃথিবী পরমা সুন্দরী? কে না বলিবে দি পোয়েট্রি অব আর্থ ইজ নেভার ডেড্।

তৃতীয় খণ্ডে চেতনাপ্রবাহরীতি সর্বাত্মক নয়, বরং রণেশ দাশগুপ্তের কথায় 'অসংখ্য নানামুখী··· চরিত্র অনেকাংশে নায়ক অমিতের চিন্তাস্রোতের বহুমাত্রিক আয়নায় প্রতিফলিত।' তাতে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার অপলাপ ঘটে নি। বয়সের, অভিজ্ঞতার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে অমিত পরিপূর্ণ

মানুষ হয়ে উঠেছে 'অভীঃ' মন্ত্রে উজ্জীবিত—বড়-আমির দিকে, মানব তীর্থের দিকে তার মহাযাত্রা—অল রোডস্ লীড টু কমিউনিজম··· ।

কেন যে ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলা—আবর্ত—মোহানার সঙ্গে গোপাল হালদারের ত্রিদিবার তুলনা করা হয়, জানি না। দুটিক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী রূপে সমধিক পরিচিত, দুজনের উপন্যাসই তিনখণ্ডে বিবৃত, দুজনেরই নায়ক-নায়িকা বঙ্কিম-বরীন্দ্র-শরৎ আদর্শানুসারী নয়। এসবই আপাত সাদৃশ্য-আর একটু গভীর সাদৃশ্য হয়ত বলার ভঙ্গিতে—দুজনেই চেতনাপ্রবাহ-রীতির উপন্যাসশিল্পী। কিন্তু খ-বাবুর আত্মম্ভরিতা এবং প্রায়শ উপন্যাসে সমাজতত্ত্ববিদ ধূর্জটিপ্রসাদের সশরীরে আত্মপ্রকাশ পাঠকদের সংবিদকে আহত করে। মোহানায় শ্রমিক আন্দোলনের কথা এসেছে; কিন্তু সাবিত্রীর মৃত্যুতে নিস্পৃহ খ-বাবুর হৃদয়বত্তার অভাব এমনভাবে মনে দাগ কাটে যে রমলাকে তিনি কিভাবে-গ্রহণ করেছেন অথবা সবটাই আত্ম প্রবঞ্চনা—সন্দেহ থেকে যায়। 'এ বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী—তুমি আছ আমি আছি' খ-বাবুর হৃদয়ে আলোড়ন জাগায় না। তবু এ কথা অনস্বীকার্য, দু'চারকথায় দুই বিদগ্ধ মননশীল স্রষ্টার সুচিন্তিত ত্রিধারা-সৃষ্টির তুলনায় সুবিচারের আশা কম। একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে প্রয়াস করা যেতে পারে। শুধু এটুকু বলা যায়, গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'-র অমিত একটি সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ মানবসমাজের পথে যাত্রী, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র না থাকলেও—কমিউনিজমই পূর্ণতর মানবসমাজের লক্ষ্য—সেদিকে সে আজও আমাদের দৃষ্টি ফেরায়।

নীতি। ইংরেজী প্রতিশব্দ দিয়েছেন 'culture'। বিকল্প শব্দ 'কৃষ্টি' এখানে স্থান পেয়েছে। কৃষ্টি না সংস্কৃতি এই তর্ক বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জোর চলছিল। রবীন্দ্রনাথ তার অবসান ঘটালেন—বিশেষ করে তাঁর তাসের দেশ নৃত্যনাট্যের মধ্যে। কৃষ্টি আর সংস্কৃতি শব্দ দুটির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তার মীমাংসা হয়ে গেল। 'এলেম নতুন দেশে। তলায় গেল ভগ্নতরী, কূলে এলেম ভেসে।'

তবে এই concept পুরাতন। ভাবজগতের অন্ধিসন্ধি খোঁজাখুঁজি জোর চলছে উনিশশতকে, আগস্ট কম্‌টে 'Sociology' শব্দ আনলেন এবং সমাজ-বিজ্ঞান নামে একটি নতুন শাস্ত্র গড়ে উঠল।

বঙ্কিমচন্দ্র কম্‌টে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় culture-এর স্বরূপ খুঁজেছেন। অধ্যাপক লেকি ও কালহিলের কয়েকটি প্রবচনকে তিনি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন।

ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে Doctrine of culture প্রসঙ্গটি এনেছেন। Mathew Arnold এর নাম উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম 'বিলাতী' অনুশীলন তত্ত্ব নিরীশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রফেসর Seely-র লেখা Ecce Homa ও Natural Religion-এর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। একবার 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে তার প্রতিধ্বনি হোল। ধর্মতত্ত্বে তার বিশদ উল্লেখ আছে—'The essence of religion is culture.' কিন্তু পরে culture থেকে religion অনেকটাই সরে গিয়েছে। Spencer ও Darwin-এর মতবাদ (Theory of Evolution) বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করলে culture চেতনাটি ধর্ম সম্পর্কশূন্য হয়ে গেল। সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটল। গোপাল হালদার মহাশয় যখন 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থটি লিখছেন তখন সংস্কৃতির অচলত্ব খারিজ হয়ে গিয়েছে। নৃ-বিজ্ঞান ও প্রত্নপুরাতত্ত্ব যখন সাবালক হয়ে উঠল তখন সমাজ বিজ্ঞানেরও চরিত্র পালটালো। গোপাল হালদার মহাশয়ের জীবন হল বাঙালীর সংস্কৃতি-মনস্কতার ইতিহাস। অনেকেই বাঙালী সংস্কৃতি নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, কিন্তু কেউ এত দীর্ঘকাল ধরে এই ভূমিতে জল সেচন করেননি। তাঁর সমকালে এই বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, সুশোভন সরকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের কারো সংগৃহীত মালমশলা এক নয়; আর দেখার রীতিও একরকম নয়। নির্মলকুমার বসু একজন নৈষ্ঠিক সমাজবিজ্ঞানী। তিনি প্রধানত ব্যবহারিক

জীবনের স্থূল পরিবর্তনের বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। মুড়ি এক বিশেষ অঞ্চলের খাদ্য উপকরণ। মুড়ি ভাজার এই বৈশিষ্ট্য তিনি উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষের সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

নির্মলকুমার 'Anthropological Survey of India'-র মহাপরিচালক ছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের চিন্তায় তিনি Max Weber এর অনুসারী ছিলেন।

অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর নামের মতই কথায় ও লেখায় অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত। তিনি সংস্কৃতির ইতিহাস বলেছেন ঐতিহাসিকের মেজাজ নিয়ে। তাই সাহিত্যের প্রসাদগুণ তাঁর সেই সব বিরল সুকথিত কথিকাগুলির মধ্যে দেখতে পাই। তিনি যদিও বুদ্ধির চর্চার পরিধির মধ্যে সংস্কৃতির বোধকে আবদ্ধ রেখেছেন, কিন্তু তিনি তাকে বন্দী করেন নি। তাঁর সমাজজিজ্ঞাসার মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন ক্রিয়াশীল ছিল। Notes on Bengal Renaissance মূল্যবান লেখা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তর্কপ্রবণ ব্যক্তি। তিনি তাঁর সময়ে যতটা বাকপটুত্বের জন্য স্মরণীয়, ততটা বিষয়ের বস্তুগত উপস্থিতির জন্য নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ সংস্কৃতির প্রসঙ্গে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের উত্তরণের কয়েকটি সূত্র হাজির করেছেন। প্রধাণতঃ তিনি ফরাসী সমাজবিজ্ঞানের চাল চলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী সংস্কৃতি-র ত্রিশের দশকের যে পরিবর্তন এটা নিয়ে সুস্থির ভাবে ভাববার তাঁর সময় ছিল না।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সেই সময় জেল থেকে বেরিয়ে এলেন গোপাল হালদার, এবং দশ বছরের পরিশ্রমের পরে তিনি 'সংস্কৃতির রূপান্তর' লিখলেন, যা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি 'সংস্কৃতি' শব্দটি তখন সবে সুস্থির হয়ে বসেছে। কিন্তু তার রূপান্তরের ব্যাপারটাই বা কি? রূপান্তরের অর্থ এই নয়, পুরাতনের আমূল বর্জন আর নূতনের আবাহন। সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রটি পৃথক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র রূপে গড়ে উঠেছে চার দশক ধরে। কমটেপন্থী যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র ও শম্ভুচরণ মুখার্জি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের থেকে একটু পৃথক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কমটের প্রভাব খর্ব হতে থাকে। যদিও তিনি সর্বপ্রথম sociology শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁর 'Sociologic Positive' গ্রন্থে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বইটি প্রথম ছাপা হয়।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে Durkheim-এর আবির্ভাব। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। পরে লেসিয়া লেভিব্রুলের সঙ্গে একযোগে অধ্যাপনা করেন। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে নতুন সমাজবিজ্ঞানীদের পার্থক্য হল একটি।

নতুন সমাজবিজ্ঞানীরা রাশিবিজ্ঞানের (Statistics)-এর উপর বেশী নির্ভরশীল। ডুরকাইম Organic Solidarity তত্ত্ব পরিবেশন করেন। জর্জ রিচার্ড এককালে ডুরকাইমের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর মত হল সমাজবিজ্ঞান শুধু মানুষের সামাজিক অবস্থাটা বর্ণনা করে না। মানুষ সমাজবদ্ধ অর্থাৎ নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত। সমাজ-বিজ্ঞানীর কাজ হবে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদান প্রদান চলছে তার তাৎপর্য্য খুঁজে বের করা—between phenomena of co-operation and mental interaction (G. Richard—La Sociologic Generalleet les lois Sociologiques p. 180, Paris 1812)।

ডুরকাইম তার সমাজবিজ্ঞানে ধর্মকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। অনেকটা তাঁর পথ ধরে Max Weber তাঁর সমাজতত্ত্ব গ্রন্থের তিনটি খণ্ড রচনা করেন। তবে Weber তার মার্ক্সীয় অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অনেকগুলো সূত্র আত্মস্থ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় যখন মার্ক্সীয় তত্ত্ব অগ্রাধিকার পাচ্ছে তখন রক্ষণশীল সমাজ নীরব দর্শক থাকে নি। Weber তাঁদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার জুগিয়েছেন।

৪

আমাদের সমাজবিজ্ঞান চর্চায় অধ্যাপক বিনয় সরকার আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্রে রচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথম তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞান চর্চা এদেশে আমদানী করেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী টোনীশ ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডুরকাইম, ইটালীয় সমাজবিজ্ঞানী পেরেতোর সমাজবিজ্ঞান চর্চার এক তুলনামূলক আলোচনা অধ্যাপক সরকার ১৯৩০ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন, এই সময় মাদারীপুরের সেই বিদ্রোহী শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 'সমাজ বিজ্ঞান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অধ্যাপক সরকার দীর্ঘকাল ধরে সমাজ বিজ্ঞানের নানা ধারা এদেশে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর এইসব বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সংহত হয়ে একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে।

১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয়, তবে এই পরিষদের অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল 'আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদ গঠনে'। এই বঙ্গ পরিষদের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সমাজবিজ্ঞান। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন বিনয় সরকার। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, ডক্টর মনীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী, চিকিৎসক ডক্টর অমূল্যচরণ উকিল, প্রাচ্যবিদ ডক্টর, প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হুমায়ুন কবীর। বাংলাদেশে সমাজকে বুঝতে সমাজবিজ্ঞান চর্চার এই অগ্রগতি বিবেচনার যোগ্য।

সমাজবিজ্ঞানে অর্থনীতির প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়, প্রথম যুগে বিদেশীদের লেখা বই এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করত। Knowles এর লেখা 'Economic Development of the Overseas Empire" (১৯২০), Vera Anstey-র লেখা Economic Development of India (১৯২৯), Sir John ও Richard Strachey-র লেখা 'Finances & Public Works of India' এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য বই। ভারতবর্ষের অর্থনীতি চর্চার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল রমেশচন্দ্র দত্তর 'ভিক্টোরিয় যুগের অর্থনীতির ইতিহাস'। তাঁর সঙ্গে আছেন জাস্টিস রানাডের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে প্রথম বই লিখলেন যোগীশচন্দ্র সিংহ—Economic Annals of Bengal (১৯২৭)। এছাড়া অধ্যাপক কালীকিঙ্কর দত্ত ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের বহু নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নতুন সমাজ ভাবনার বই প্রথম লেখার কৃতিত্বের অধিকারী হলেন রেবতীমোহন বর্মন। তাঁর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, সমাজের বিকাশ, কৃষক ও জমিদার প্রভৃতি পুস্তিকা ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীতে তাঁর লেখা 'Society & its Development' প্রকাশিত হলে সমাজবিজ্ঞান চর্চার নতুন ধারাটি পুষ্ট হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ১৯২৫ সালে Peasants & Workers Party গঠিত হয়েছে এবং 'লাঙ্গল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে Labour Party of India গঠিত হল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোপাল হালদার মহাশয় এইসময় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করছেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তাঁদের মুখপত্রের তিনি অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন শ্রদ্ধেয়া লীলা নাগের (তখনও রায় হননি) সহকর্মীরূপে।

৫

গোপাল হালদার লিখিত ‘সংস্কৃতির রূপান্তর’ ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতি বলে তিনি শুধু সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতকে বোঝাতে চান নি। মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে তার সেই ছাঁদটিকে সংস্কৃতি অর্থে ধরেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি হল জীবনযাপনের সমগ্র বিবরণ, তার ওঠানামা তার চড়াই উৎরাই। ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজদর্শনের ভূমিকায় বলছেন: “দর্শন চিরন্তন, সনাতন নয়, যুগানুযায়ী, প্রত্যেক যুগোপযোগী দর্শন যুগের প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করতে পারে।” ঠিক এই অর্থটিকে গোপাল হালদার তাঁর গ্রন্থের নামকরণের মধ্যে অঙ্গীকার করেছেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের সূচীপত্রে নৃতত্ত্ব ইতিহাস ও নানাবিধ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার স্থান দিয়েছেন। প্রাণী-বিজ্ঞান, জলবায়ুসহ ভূগোল ও লোকবিদ্যা ও প্রজননবিদ্যা প্রভৃতি পাঠ তাদের তালিকাভুক্ত। গোপাল হালদার তাঁর সংস্কৃতির রূপান্তরে এত গভীরে নামেন নি। এমনকি সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি তত্ত্বকে তিনি এক সারিতেও দাঁড় করাননি; যে বিপদ নির্মলকুমার বসু স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

‘সংস্কৃতির রূপান্তর’ প্রকাশনার ছয় বৎসর পরে বের হল ‘বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রসঙ্গ’। আরও ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত হল বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ।

সংস্কৃতির আলোচনায় অবশ্যই সাহিত্যের একটি বড় স্থান থাকে। আমাদের দেশে রামমোহন-পূর্ব সাহিত্য এবং রামমোহন-পরবর্তী সাহিত্য এই দুটি পর্যায়কে ঔপনিবেশিক সাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য বলে অভিহিত করা যায়, পরে গোপাল হালদার দুই খণ্ডে ‘বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা’ (১৯৫৪-৫৫) লেখেন। তখন প্রকারান্তরে তিনি সংস্কৃতি আলোচনার পরিধি বিস্তৃত ও বিচিত্র করেছেন। ১৯৬৬ সালে ‘রুশ সাহিত্যের রূপরেখা’ প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকারের লেখায় যে উচ্চ ভাষণ ছিল, তা গোপালবাবুর নেই, বরং আছে বিজ্ঞানসমূহের সঙ্গে দেশজ অনুভব ও আনুগত্য সচেতনতার নানা স্তর—প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ধর্ম ও পুরাণ-ভাবনা থেকে নোয়াখালির উপভাষা তাঁর কৌতূহলের পরিধি এবং গবেষণার বিষয়।

১৯২৯ সালে তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে (Oriental Conference) পড়লেন ‘Goapichand Legend’, একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় বাংলা সংস্কৃতির প্রণিধানে। গোপীচন্দের গান সুদূর উড়িষ্যার প্রত্যন্ত

প্রদেশ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল কোরাপুট থেকে বারেন্দ্র ভূমি হয়ে একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের শেষ প্রান্তে আরাকানে গিয়ে উপনীত হয়েছে। গোপীচন্দের কাহিনী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-সহ পাঞ্জাবেও সুপরিচিত। গোপাল হালদার বাংলার সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই রকম একটি সর্বভারতীয় উপাদানকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছেন। অমূল্যচন্দ্র সেনের লেখা 'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' বইটি যখন সরকার নিষিদ্ধ করেন, গোপাল হালদার তার প্রতিবাদ করেছিলেন। সংস্কৃতির আলোচনার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

সংস্কৃতির এমন ব্যাপক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন ব্যতীত আর কেউ তেমন ভাবে বুঝতে চান নি। ইতিহাসের বড় বড় ধাপ ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, তক্ষশীলার উৎখনন যেমন যেমন এগোচ্ছে ভারতের ইতিহাসে প্রত্ন যুগের চেহারা তেমন তেমন স্পষ্ট হচ্ছে।

এখন তাঁর প্রধান বই দুটির অন্তর জগতে দৃষ্টি দেওয়া যাক। সংস্কৃতির পরিকাঠামো তাঁর মতে তিনটি—প্রথম হল তার বাস্তব উপকরণ, দ্বিতীয় হল তার সামাজিক রূপ, দেহটি হল মানুষ সম্পদ।

মোটামুটি বুঝতে পারা যায় জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ ও মানসিক সম্পদ, এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিযুগে সেই যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির রূপান্তর কি ভাবে ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তার পরে এলো পশু পালনের যুগ—অর্থাৎ কৃষির কাল। তারপর ঘটল ধাতুর আবিষ্কার। ধাতুর আবিষ্কারের নানা স্তর আছে প্রথমে তাম্রযুগ। মেয়েদের অবস্থার কী রকম পরিবর্তন ঘটল, তার হিসাব করতে হবে।

এই পর্ব আলোচনায় গোপাল হালদার স্টুয়ার্ট পিগট, বিরজাশংকর গুহ, সুনীতিকুমার, ম্যাকে, গর্ডন চাইলড্ সিলভাঁ লেভির বক্তব্যের গবেষণা করেছেন। তবে সম্ভবতঃ গর্ডন চাইল্ডের প্রাচ্যের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত দেখবার সুযোগ হয়নি।

আর্য সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, হালদার মহাশয় এই সব অভিধা প্রচলিত ইতিহাস বই থেকেই নিয়েছেন। শ্রমভিত্তিক সমাজের ইতিহাস লিখতে হলে এইপ্রকার চরিত্রায়ন বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সব থেকে কূট প্রশ্ন যেটি—ভারতের 'জাতিভেদ' তিনি শুধু লিখিত সাহিত্যের উপরে নির্ভর করে ব্যাখ্যা করতে বসেন নি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুর মানব ধর্মশাস্ত্র (সংক্ষেপে মনুসংহিতা) এই দুই গ্রন্থের ওপর তিনি নির্ভর করেন নি। বর্ণভেদ থেকে জাতিভেদ কিনা, এ তর্কের মীমাংসা হয়নি। এই যুগের বিবর্তন ব্যাখ্যায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জয়শোয়াল, বাহুলনী তাঁর প্রধান নির্ভর। মনে হয় ডাঃ ডি ডি কৌশম্বীর গবেষণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। অবশ্য কৌশাম্বীর রচনাসমূহ জার্নাল থেকে পাঠকদের হাতে এসে পৌঁছায়।

ভারতীয় সমাজ জীবন ব্যাখ্যায় ইসলাম-অনুপ্রবেশে এক নতুন তর্ক দেখা দিল। ইসলামপন্থীরা সমাজজীবনে নতুন কোন ব্যবস্থার পত্তন করেছিল? সম্ভবত নয়। শুধু নব আগন্তুকদের ধর্মীয় আনুগত্যের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হল। আলউদ্দীন খলজীর শাসন-সংস্কার নতুন কোন ব্যবস্থার পত্তন করেনি। রাষ্ট্রের কাঠামো সমাজের কাঠামো মোটামুটি সাবেকী চালে চলতে লাগল।

তুঘলকদের সময়ের একটা ছবি উৎকলিত করা গেল। তখন সৈনিক সংগ্রহ হোত খোলা ময়দান থেকে। রাজারাজড়ার দল তাদের সৈন্যদল সহ এই সংগ্রহ-বাণিজ্যে অংশ নিল। তানজানিয়ার সেই দুর্ধর্ষ পর্যটক বলেছেন, মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু রাজাদের শিবিরে জাঁকজমক বেশি। লোক-লস্করের সমাবেশও বেশি।

হালদার মহাশয় একটি মন্তব্য খুবই মূল্যবান—"ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির রূপ এই ভূমি ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয়। তবে তিনি সোজাসুজি বলেছেন, "তাহা কার্যগত মৌলিক কোনো পরিবর্তন সেদিকে সাধন করে নাই।" গৌণ পরিবর্তন তো কম নয়।

শহরে, বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুসলিম কাল বাড়িয়া উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর নেতাদের কদর বাড়িল। খানাপিনার নূতন বিলাসিতা দেখা দিল, মুসলিম হাকিম ও মুসাফিরেরা সমাদৃত হইল।"

এরপর গোপাল হালদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব-সূচনায় কি পরিবর্তন হল, সে কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন—কর্ণওয়ালিস ভূমি ব্যবস্থার গুরুত্ব তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

পুরানো জমিদার শ্রেণী লোপ পেতে লাগল, নতুন জমিদারেরা শিক্ষায়

রুচিতে নিম্নস্তরের ছিলেন না। কথাগুলি সকলেই বলে, তিনিও বলেছেন। মহাসমারোহে কালীপুজো করলেন নাটোর রাজবংশ, দুর্গাপুজা করলেন তাহিরপুর, কৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন দিনাজপুর। নতুন সংস্কৃতি কোথায় ? পুটিয়ার মন্দিরে টেরাকোটার কাজ আছে, নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ির মন্দিরেও টেরাকোটার কাজ ছিল, ছিল দিনাজপুরের কৃষ্ণ মন্দিরে। এইসব কাজ বহুকাল ধরে চলছিল—বিষ্ণুপুর, তমলুকে। আর নৃত্যগীত ? বিষ্ণুপুরে একটি সঙ্গীত কেন্দ্র ছিল। কিন্তু দিনাজপুরে যা গান-বাজনা হত, তা দিল্লী আগ্রা থেকে মুজরো দিয়ে আনা নর্তকীদের সমাবেশে। এর সঙ্গে নতুন জমিদারদের সংস্কৃতিচর্চার বিশিষ্টতা কতটুকু ধরা পড়ল ?

গোপাল হালদারের দ্বিতীয় গ্রন্থের তিনটি অংশ উল্লেখযোগ্য—বাঙালী সংস্কৃতির রূপরেখা, বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার, মুসলমান বাঙালীর কালচার।

জাতীয় সংস্কৃতির জন্ম কাল—গুপ্তযুগ ধরলে ঠিক হবে না। দিনাজপুরে গঙ্গারামপুরের নিকটে পরপর খনন কার্যের ফলে এক গুপ্তযুগীয় কেন্দ্র পাওয়া গেলে তার নাম বৈশিষ্ট এবং ইতিবৃত্ত থেকে বাঙালীর নিজস্বতা কেমন মালুম করা যায় না। পাল যুগ থেকেই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির পত্তন হয়। পালযুগের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের জন্মকাহিনী নিয়ে অলৌকিক কাহিনী আছে। সমুদ্র থেকে তাঁর উৎপত্তি—এই গল্প মধ্যযুগীয় প্রলাপ। তবে ধর্মপাল ও ধর্মপালপুত্র দেবপালের অনুশাসন মধ্যযুগীয় প্রলাপ নয়, ইতিহাসে দৃঢ়ভাবে উপস্থিত। নানারকম বিপর্যয় ও ভাঙ্গাগড়া নিয়ে পালদের শাসন প্রায় চারশো বছর চলেছিল। বাঙালী জাতি তখন নানা গোষ্ঠী ও কৌম পরিচয় লুপ্ত করে এক জাতিরূপে দেখা দিল—তার শিল্পে, মনে, সাহিত্যে এক নতুন পর্যায় দেখা দিল। পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, ভাগলপুরের মহলগাঁও-এর কাছে বিক্রমশিলা মহাবিহার, দিনাজপুর-মালদহের সীমান্তে মহানন্দা নদীর তীরে জাগদ্দল মহাবিহারের স্থাপত্য-কীর্তি সর্বভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে ভিন্ন। মূর্তি শিল্পেও ভিন্নতা দেখা যায়। সদ্যোজা নামে এক বিশেষ মাতৃকা মূর্তি ভারতীয় মূর্তিশিল্পের অঙ্গনে বরেন্দ্র ভূমির এক বিশেষ অবদান। সোমপুর মহাবিহারে চর্যাপদ লিখিত হয়, সংকলিত হয়।

এই সাহিত্যের বাঙালীত্ব নিয়ে সব তর্কের সদুত্তর দিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার। এই চর্যাপদগুলিতে যে সব লতাপাতা, পশুপাখির উল্লেখ আছে,

তার সঙ্গে বাঙালীর ভৌমজ আত্মীয়তা আছে, বিশেষ করে 'সুভাষিত রত্নকোষ' আবিষ্কৃত হবার ফলে চর্যাপদ থেকে সুভাষিত রত্নকোষে উপনীত হলে তার জাতিগত স্বরূপ নিয়ে আর দ্বিধা থাকে না। 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়' নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তারই পূর্ণবয়ান পাচ্ছি 'সুভাষিক রত্নকোষে।'

সংস্কৃতি রূপান্তর প্রকাশনার সময় এইসব কথা অজ্ঞাত ছিল। তবে গোপাল হালদারের কৃতিত্ব তাঁর অনুমান অনেকখানি সত্য প্রমাণিত হল। সংস্কৃতির রূপান্তর থেকে বাঙালী সংস্কৃতির রূপ বহুদূর পথ পরিক্রমা নয়। কিছু কিছু প্রসঙ্গ বিশদ হয়েছে একথা স্বীকার করতে হবে। মার্শাল, ম্যাকে, বীরবল সাহানী, ডঃ কৌশাম্বী, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, মেদিনীপুরের এস, কে রায় এই পর্যায়ের ভারত সংস্কৃতির আলোচনার বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির বিবরণ সাময়িক পত্রে উপস্থিত আছে। আর আছে নানা জাতীয় নকশা। তার মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বিখ্যাত। এছাড়া পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতি কথায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি উনিশ শতকের সংস্কৃতির টানাপোড়েনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাঙালী সংস্কৃতির অতীত যুগের বিবরণ, ক্ষিতিমোহন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন আবেগমথিত ভাষায় লিখে গিয়েছেন। বাংলার পট, আলপনা, হাতের কাজ, নানা উপকরণ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা সংগ্রহ করেছেন, আমাদের অনুভবের পরিধি বিস্তৃত করেছেন। ধ্রুপদী ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির এই বহমান ধারা সম্পর্কে গোপাল হালদারের কৌতূহল সমভাবে জাগ্রত। তিনি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু সম্পর্কে লিখেছেন।

তবে বাংলার সংস্কৃতির মূল রহস্য উদ্ঘাটনে তিনি সাহিত্যকে মুখ্য অবলম্বন করেছেন। তাঁর 'রূপনারাণের কূলে' যদিও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, তবু এ গ্রন্থেও তাঁর সমকালীন জীবন ও মানুষের কথা চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্য যেমন তাঁকে সাহায্য করেছে বাংলা সংস্কৃতিকে বুঝতে, তেমনি ভাষাতত্ত্বের মধ্যে দিয়েও তিনি বাঙালী সংস্কৃতির অনেক কূট প্রশ্নের মীমাংসা পেয়েছেন। কোন একটি বিশেষ শব্দকে ধরে এগোলে যেমন সমকালীন জীবন পাওয়া যায়, তেমনি দূর অতীতের জীবনের প্রসঙ্গও তার মধ্যে দিয়ে ধরা যায়। তাঁর 'Eastern Bengali Dialect' যেমন তাঁর ভাষা সম্পর্কে কৌতূহল

সপ্রমাণ করে, তেমনি বাংলা সংস্কৃতির আরেকটি পর্যায় তাতে আলোকিত হয়ে ওঠে। গোপাল হালদারের সংস্কৃতি চর্চা বহুমুখী। কখনও মনে হয় তিনি নির্মলকুমার বসুর সহযোগী, কখনও মনে হয় তিনি সুনীতিবাবুর যোগ্য শিষ্য— ।' Eastern Bengali Dialect' এর লেখক হবার জন্য বলছি না। তাঁর 'Vidyapati & his Language' নিবন্ধটি তিনি প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে পাঠ করেন (বরোদা, ১৯৩১)। গোপাল হালদারের এই সংস্কৃতি সচেতনতা, নানা মহলে বিবরণ করার এমন পারদর্শিতা অন্যের মধ্যে দেখিনি। গোপাল হালদার নিজে ছবি আঁকেন নি, গান করেন নি। কিন্তু তিনি 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি শম্ভু মিত্র প্রযোজিত 'রক্তকরবী' নাটকের রূপান্তর নিয়েও ভেবেছেন। 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার এ বিষয়ে তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন।

ভাবতে বিস্ময় হয়, গোপাল হালদার কোন কালেই বলিষ্ঠ মজবুত দেহের অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু এই ক্ষীণ দেহের মধ্যে যে এত শক্তি ছিল, তা কে জানত ? তিনি এই শতাব্দীর সমবয়সী। এই শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোন প্রসঙ্গই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। সাংবাদিক হিসেবে নয়। সাংবাদিক তিনি অবশ্যই ছিলেন। Modern Review প্রবাসী হয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের মুখপত্র থেকে তিনি স্বাধীনতা ও পরিচয়ের সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করে গিয়েছেন। তাঁর কর্ম তৎপরতা এ যুগের এক বিস্ময়। এত বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ এতগুলি উপন্যাস, রম্য প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন যার তালিকা তৈরী করতে একজন গবেষকের কয়েক বৎসর লেগে যাবে। সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে বাঙালীর সংস্কৃতি বিষয়ে যে কৌতূহল, তার জীবনকথা গুলিই বলেছেন। সাফল্যের পরিমাপ করছি না।

পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাচর্চায় গোপাল হালদার

প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত

কলকাতায় হেদুয়া অঞ্চলকে একজন এসে বলতে লাগল 'সেদুয়া'—সে নাকি 'সোটেলে' খায়। অবাক হয়ে আশপাশের লোকেরা এরকম হেদুয়াকে 'সেদুয়া', হোটেলকে 'সোটেল' বলার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল সে দেখেছে যে 'কলিকাতায় গেল লোক হ-রে স-কয়।' সে তো 'হালা' কেও 'শালা' বলতে শুনেছে কলকাতায়। 'ছাগল-ও' নিশ্চয়ই 'সকল' বলে উচ্চারিত হয় কলকাতায়। যাকে বলি ধ্বনির লিপিরূপ তা এক হলেও এক এক অঞ্চলে তা এক এক ধ্বনি উচ্চারণ সূচিত করে। এই গল্পটিই তার প্রমাণ। যা শিস ধ্বনি তার লিপিরূপ দেখেও নইলে এই গল্পের লোকটি কেন তাকে মহাপ্রাণ বলে চিহ্নিত করে এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মজার কথা বলে ?

অঞ্চলভেদে একই ধ্বনির উচ্চারণ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। গোষ্ঠী ভেদেও হয়, একই অঞ্চলে একই সময়ে অবস্থান করেও হয়। এই উচ্চারণভেদ, শব্দ নির্বাচনে পার্থক্য, বাক্য-বাক্যাংশগত প্রভেদ-এর একটা পরিচয় জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা না হলে ভাষার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয় না। এমন কি ভাষার যা মূল উদ্দেশ্য মনের ভাবকে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যের মনের ভাব বোঝা সেই মূল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ধ্বনিগুলির সর্বমান্য সুনির্দিষ্ট রূপে বলেও

কিছু নেই। বাংলা-ভাষী বিরাট জনসম্প্রদায় (Bengali speech Community) বলতে উত্তরে জলপাইগুড়ি কোচবিহার রংপুর গোয়ালপাড়া; পূর্বে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল পেরিয়ে এখনকার আমাদের কাছাড়, ত্রিপুরার সমতল-অঞ্চল, এখনকার বাংলাদেশের যে অঞ্চল মিয়াম্মার বা আগেকার ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত ছড়ানো ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর দিয়ে সীমাবদ্ধ বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত তটরেখা যা নদীর মোহনায় মোহনায় খাড়িতে খাড়িতে বিশেষত্ব পেয়েছে; পশ্চিমে পূর্ণিয়া ধলভূম মানভূম সিংভূম পর্যন্ত ছড়ানো এত বড়ো অঞ্চলের মধ্যে যে বাঙালি বসবাস করছেন তাদের বোঝাচ্ছে। এই এত বড়ো অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলাভাষী জনসম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষায় কিছু না কিছু বৈষম্য তো থাকবেই। পাশাপাশি অঞ্চলে হয়তো এই বৈষম্য সত্ত্বেও কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু দুটি দূরবর্তী অঞ্চলের মুখের কথা দু অঞ্চলের লোকেরা চট করে বুঝতে পারবে না। অনুমান করতে অসুবিধা নেই পুরুলিয়ার চাষী চট্টগ্রামের চাষীর কথা বুঝতে পারবে না—আর অতদূরে যাবারই বা দরকার কী? চট্টগ্রাম নোয়াখালির লোকের মুখের ভাষা বা সিলেট কাছাড়ের লোকের মুখের ভাষা কি বরিশাল ঢাকা-ফরিদপুর খুলনা যশোরের লোকই বোঝে, বুঝতে পারে? এ অবস্থায় ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রের করণীয় হল অঞ্চলভেদে উচ্চারণ কোষ তৈরি করা, আঞ্চলিক শব্দ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং অঞ্চল ভেদে ভাষার পার্থক্য বুঝবার জন্য ব্যাকরণ তৈরি করা। তা না হলে সম্পূর্ণত ভাষার পরিচয় লাভ করা সম্ভব হবে না।

ভাষা-সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার প্রথম স্তর থেকেই অঞ্চলভেদে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে অঞ্চল-ওয়াড়ি সাজিয়ে বিশ্লেষণ করে ধরে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল। ধ্বনিবিজ্ঞানের ছাত্ররা এর থেকেই সমশব্দগণ্ডি, সমধ্বনিগণ্ডি এবং সমরূপগণ্ডি রেখাচিহ্নিত করার কথা ভেবেছিলেন, ইংরাজিতে যা যথাক্রমে Isogloss, Isophone এবং Isomorph বলে পরিচিত।

একটা ভাষাসম্প্রদায় ছোটো ছোটো অঞ্চলভিত্তিক বা গোষ্ঠীভিত্তিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিহ্নিত হলে তাকে বলি উপভাষা সম্প্রদায়। উপভাষা কেবল অঞ্চলভিত্তিক বা কেবল গোষ্ঠীভিত্তিক নয়, দুইই। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হলেও উপভাষা হবে যেমন সিলেটি উপভাষা বা মানভূমি উপভাষা। আবার একই ভৌগোলিক অঞ্চলে নারীর ভাষা একধরণের উপভাষা, অপরাধজগতের ভাষাও একধরণের উপভাষা। নির্দিষ্ট পেশাগোষ্ঠীর মানুষও একধরণের উপভাষায়

কথা বলে। মান্য চলিত বাংলাও এই অর্থে আলাদা উপভাষা। ভাষার থেকে উপভাষা আলাদা। যাকে আঞ্চলিক উপভাষা বলি তা হয়তো রাজনীতিক-আর্থনীতিক বা সামাজিক কারণে উপভাষারূপেই থেকে যায়—আবার তেমন সুবিধা পেলে একটা বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাই মূল ভাষারূপে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। অন্য উপভাষাগুলিই তখন মূল ভাষার উপভাষা রূপে পরিচিতি পায়।

উপভাষাসমূহ এবং মূলভাষার মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল হয় না ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে হয়, ধ্বনিপরিবর্তনের তারতম্য থেকে হয়, কথা বলার মধ্যে ঝোঁকের পার্থক্য সুর বা টানের পার্থক্য থেকে হয়। এছাড়া পার্থক্য হয় শব্দ নির্বাচনের দিক থেকে, একই শব্দ ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহৃত করার প্রবণতার দিক থেকে। নতুন পদ-সমাস-সন্ধি নতুন রকমের সন্ধি-আগম-লোপ, নতুন অনুকারধ্বনি থেকে পার্থক্য হয়। কদাচিৎ পদবিন্যাস বিধির/পরিবর্তন বা Syntactical changes থেকে হয়। এসব বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে বিশ্লেষণ করে সাজিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জেনে না রাখলে মান্য ভাষার বা সাহিত্যিক ভাষারও পুষ্টি হয় না।

একটা মূলকেন্দ্র থেকে চারিদিকে বি-ভাষা-সম্প্রদায় বৃত্তাকার তরঙ্গের মতো ক্রমেই বৃহত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এমন হয় না। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউটা গোল হয়ে চারদিকে ক্রমে বেড়ে যায় তেমনটা ঠিক হয় না। আসলে এ উপমা ঠিক লাগসই হয় না। কোনটা মূল কথা বলে চিহ্নিত হবে তার স্থান ইতিহাসই নির্ধারিত করে দেয়। কিন্তু সেখান থেকে সমান তরঙ্গ নিয়ে উপভাষা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে পেতে এগিয়ে চলে না। নদীর উপমাই বরং ভালো। তাতে শাখা প্রশাখা বেরোয়, উপনদী এসে মেশে, বন্যায় ঢল নামে, বন্যা কমে গেলে চারদিকে শাখা নদী উপনদী উপ-উপনদী বা বিছিন্ন জলাশয় অথবা হাওড় দেখা দেয়। ভাষার ক্ষেত্রেও প্রায় তেমনই হয়। নদী বিজ্ঞানকে তার এলাকা ছাড়াও পলিবিজ্ঞান দিয়ে ধরতে হয় তেমনি ভাষার ক্ষেত্রকেও বুঝতে হয় তার কালিক গতি দিয়ে এমনকি শাখানদী উপনদী হাওড় মজানদীর মত গতিশীল বা লুপ্ত উপভাষা দিয়ে। আর তা বুঝতে হলে পুরো এলাকাটির জরিপ করে নক্সা আঁকা দরকার।

এই জরিপের প্রয়োজন গত শতাব্দী থেকে অনুভূত হয়েছিল। ম্যাক্সমূলের কী ভেবে বলেছিলেন যে ‘The real and natural life of language is in its dialects তা বোঝা খুব কঠিন নয়। ইংরেজি ভাষায় *Dictionary of obsolete and Provincial English* প্রকাশ করেছিলেন Thomas Wright ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তেইশ বছর খেটে ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে Dr.Joseph Wright প্রকাশিত করেন *English Dialect Dictionary* যা আজও পর্যন্ত প্রামাণ্য পুস্তক বলে ভাষাচর্চাকারীদের মান্যতা পেয়েছে। Aj Allis ১৮৮৯ সালে *Existing Phonology of English Dialects* নামে পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে উপভাষা অভিধান সংকলনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। FE Pargiter ১৯২৩ সালে বার করেছিলেন *Vocabulary of Peculiar Bengali words*, কিন্তু ভাষা উপভাষা ধরে জরিপের কাজ এই শতাব্দীর প্রথমেই শুরু হয়েছিল যাঁর তদারকিতে তিনি হলেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন। সরকারি প্রয়াসে ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ এর মধ্যে ছাব্বিশ বছর ধরে *Linguistic Survey of India*-র বইগুলি বার হয়। এর আগে তিনি ১৮৮৫ সালে *Bihar Peasant Life* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন—এতে গ্রাম্যজীবনের সর্বদিক আশ্রয় করে শব্দ সংগ্রহের জন্য একটি বিষয়সূচিও তিনি তৈরি করেছিলেন, জীবনে ব্যবহৃত শব্দাবলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো সূচি আর কিছু হয় না। গ্রীয়ার্সন তখন ছিলেন বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট।

লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে-তে গ্রীয়ার্সন সারা ভারতের ৮৬৫টি উপভাষার নমুনা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আজ সকলেই জানেন এবং বলেন যে সে সময় ভাষাবিজ্ঞান ধ্বনিবিজ্ঞান এতটা উন্নত হয়নি তাই ওই নমুনাসংগ্রহ এবং অঞ্চল বিভাগে নানান ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে। ভাষাবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ নমুনা সংগ্রহকারর জন্যও সিদ্ধান্তে যৎসামান্য ভুল থেকে গেছে। তবু একথা বলতেই হবে ১৯২৮ এর পর আজ পর্যন্ত ৬৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও, স্বাধীনতার পর ৪৭ বছর কেটে গেলেও নতুন করে বৃহৎ আকারে সার্ভে করা সম্ভব হয়নি। এখন মনে হয় যে সে রকম সার্ভে করাও অসম্ভব। হয়তো রাজনীতিক—আর্থনীতিক কারণ এর পিছনে আছে। ভাষা উপভাষা—ভিত্তিক মাত্রাতিরিক্ত সংবেদনশীলতা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। অসমোন্নত অঞ্চলগুলির পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, বিভেদকামী শক্তিগুলির তৎপরতার জন্য এ কাজ করাটাও আপাতত অনুচিত। তথাপি এরকম মহাগ্রন্থ রচনার এবং তাকে সর্বদাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হবে।

আরও একটি নতুন অসুবিধার দিক আছে। যথার্থ আঞ্চলিক উপভাষার নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এখন কঠিন প্রায় অসাধ্য হয়ে ওঠার একটা কারণ জনগোষ্ঠীর যাতায়াত। এখন অঋণী-অপ্রবাসী দিনান্তে শাকাহারী থাকার মূল্যবোধ অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে। যাতায়াত বাড়াতে উপভাষার মধ্যেকার সংরক্ষণশীল চেহারার বদল ঘটেছে এবং ঘটছে। শুদ্ধ নমুনা যোগাড় করা কঠিন। শুধু স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোকের চলে আসাটাই এর কারণ নয়—জীবিকার জন্যও দূর দূরান্তর থেকে ক্রমাগত আসা-যাওয়াও এর কারণ।

এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রেডিও-টেলিভিশন রেকর্ড-প্লেয়ার গ্রামোফোন, রেকর্ড করা গান কথা ক্যাসেটে ধরে রাখার এবং বারবার শোনার অভ্যাস রপ্ত করা এবং শুনতে বাধ্য হওয়াও। এতে উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে কথাব সুর বা টানের মধ্যে ঝোঁকের বদলের বিষয়েও এমন প্রভাব পড়ছে যে সমশব্দগণ্ডি সমধ্বনি-গণ্ডি চিহ্নিত করা কঠিন প্রকৃত প্রস্তারে প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এরকম অবস্থায় সেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব কাজ হয়েছিল তার মূল্য নতুন করে অনুভূত হচ্ছে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভাষাচর্চা এবং স্বদেশীয় যা কিছু তার মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল। এই প্রয়োজনীয়তার বোধ থেকেই ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development of Bengali Language* গ্রন্থখানি। ১৯২৬-এ প্রকাশিত হলেও এটি আসলে ১৯২১ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত ডি, লিটের থিসিস। সুনীতিকুমার এর আগে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য ১৯২৬ সালে রচনা করেছিলেন *An essay towards an Historical and Comparative Grammer of Bengali Language*। ভাষাচর্চার এই নতুন মূল্যবোধ যে কী রকম নতুন স্বীকৃতি পেয়েছিল দেশবাসীর মনে তা অনুধাবন করা সহজ হবে এই জেনে যে ১৯১৭ সালে ইউনির্ভাসিটি জুবিলি রিসার্চ প্রাইজের জন্য যে বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছিল তাহল Comparative Philology with Special reference to the Bengali Dialects.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্বদেশীয় সংস্কৃতির খুঁটিনাটি সংগ্রহ করার যে মনোভাব কাজ করছিল স্বদেশপ্রেমের বাস্তব অবলম্বন হিসাবে

তার দু একটা নমুনা দিই। প্রথম অবস্থায় উপভাষার নমুনা সংগ্রহ বিবরণ সংগ্রহ করার দিকটা ছিল। যেমন সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা, (১৯০৫); সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমাদিগের ভাষাতথ্য' (১৯০৬); অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য' (১৯১১); হরিদাস পালিতের 'মালদহের পল্লীভাষা (১৯১৯); বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'চট্টগ্রামে প্রচলিত বাংলাভাষা' (১৯১৯); নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' (১৯২৪)। এসব আলোচনায় যে যথেষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছিল এমন নয় কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বছর ১৯০৫-কে মনে রেখে বলা যায় দেশের লোকের মনে করণীয় কাজ সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পূর্ণ প্রবন্ধ এরপর থেকেই পাচ্ছি, যেমন ঃ মুহম্মদ এনামুল হকের 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ' ১৯০৫)।

বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সুনীতিকুমারের পন্থায় শুরু করেছিলেন গোপাল হালদার। ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর *A Brief Phoneticsketch of the Noakhali Dialect of South Eastern Bengali* এছাড়া ১৯৩৩-এ প্রকাশিত হয় *A skeleton Grammer of the Noakhali Dialect in Bengali* নামে লেখাটি! সুনীতিকুমার সে সময় উপভাষা চর্চার এই নির্দিষ্ট খাতটি পরিচালনা করেছিলেন এবং সহায়তা করেছিলেন। গোপাল হালদার তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহায়ক কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে অচিরে বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্পে অন্তরীন। এই অবস্থায় সুনীতিকুমার তাঁর লেখা ছাপাবার তদারকি করেছেন—বন্ধুর মতো চিঠি দিয়েছেন আশ্বস্ত করেছেন তাঁকে ঃ

> আরব্ধ গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করুন। আপনার *Grammer of Noakhali Dialect* Uoniversity Press-এ ছাপা হইতেছে, সমস্তটিরই তিনটি প্রুফ আমি দেখিয়াছি, প্রথম ফর্মার Pirnt order কাল দিলাম। মাস দুই আরও লাগিবে সবটা ছাপা সম্পূর্ণ হইতে! ৫০ খানি off print-এর ব্যবস্থা করিতেছি। একেবারে তৈরি প্রবন্ধ পাঠাইব। আপনি notes সংগ্রহ করিয়া যান।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিনাবিচারে জেলে বন্দী থাকার সময়ই গোপাল হালদার *Comparative Grammer of East Bengali Dialects* -এর প্রথম খসড়া করেছিলেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ছাপালেন ১৯৮৬ সালে!

প্রথমে ছাপাতে পারেননি প্রেসের কারণে। তারপর রাজনীতিক আন্দোলনের ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে গিয়ে। তারও পরে স্বয়ং লেখক বলেছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রেস বইটি ছাপাতে রাজি হন কিন্তু ছাপানো হয়নি কারণ এর মধ্যে বিদেশ যাওয়ার ফলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের লেখাই তাঁর দেখবার ও পরিবর্তন করার সুযোগ হয়। এরপর ১৯৮০ সাল নাগাদ তিনি তা জমা দেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে—কিন্তু তখন তরুণ নিরীক্ষক স্পষ্ট ভাষায় অনুকূল মতামত না দেওয়ার সেখান থেকে ছাপানো মুস্কিল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত 'পুথিপত্র' প্রকাশনসংস্থার মালিকের সাহায্যে ও মডার্ন প্রিণ্টার্সের সহায়তায় বইটি প্রকাশিত হতে পারল। দেশবাসী এরজন্য নিশ্চয়ই পুথিপত্র প্রকাশন সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ পাকবে।

এর মূল পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছিলাম এশিয়াটিক সোসাইটিতে যখন তিনি ছাপাবার জন্য জমা দেন তখন। সে পাণ্ডুলিপি আয়তনে ছিল বিশাল। কাগজগুলি ততদিনে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সোসাইটি প্রথমেই চেয়েছিল প্রেসোপযোগী পাণ্ডুলিপি। বৃদ্ধ বয়সে সে অবস্থায় সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তিনি সংক্ষিপ্ত এবং ছিমছাম করে দেন! যদিও তিনি বারে বারে জানান যে এই বয়সে নতুন করে নতুন গবেষণালব্ধ বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারবেন না, তবু মোটের উপরে ১৯৩৫-এর গবেষণাকে এখনকার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি দিয়ে যাচাই করিয়ে নিয়েছেন।

ইতোমধ্যে দেশ জুড়ে উপভাষা নিয়ে এদিকে ওদিকে কম কাজ হয়নি—উপভাষার শব্দ সংকলন এবং উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ অল্পস্বল্প চলছে। নোয়াখালির ভাষা নিয়ে গোপাল হালদার; চট্টগ্রামের ভাষা নিয়ে প্রথাগত ব্যাকরণের রীতি অনুসারে লিখেছেন মহম্মদ এনামুল হক 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ'। এগুলির কথা আগেই বলেছি। ঢাকার উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন মহম্মদ আব্দুল হাই, মনিরুজ্জমান প্রভৃতি। ঢাকার গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ করেছিলেন পরমেশপ্রসন্ন রায়। মানভূমি অঞ্চলের একটি বৈয়াকরণিক রীতিতে আঞ্চলিক উপভাষা বিশ্লেষণ করেছেন ড. রেখা সিং *Manbhumi Bengali A Linguistic study* (১৯৮৫) বরিশালের উপভাষা নিয়ে একটি চমৎকার পুস্তিকা পেয়েছি। এটি লিখেছিলেন (১৯৭০) মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বহু ব্যক্তি নিয়মিতভাবে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা

পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের পরিকল্পনা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পরিষদ গঠিত হয় এবং নতুন নামকরণ হয় গবেষণা পরিষদ (১৯৭৪)। অত্যন্ত সীমায়িত সাধ্যের মধ্যে গবেষণা পর্ষদের কর্মীরা এর পরিচালক সমিতির সদস্যদের ও বিশেষত পরিচালক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে প্রায় তিন লক্ষ শব্দ সংকলন করেছেন। এর মাত্র প্রথম বই ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে বেরিয়েছে—তাতে অন্তত ১৪৬ পৃষ্ঠায়, অ আ এবং ই এর শব্দগুলি সংকলিত। এই গ্রন্থের আদর্শ অবশ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সম্পাদনায় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।' এর কাজ ১৯৫৮ সালে আরম্ভ হয়েছিল। কাজটিসম্পন্ন হতেই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—When Bangla Academy has completed this work, it seems, all that will remain for us to do in West Bengal, would be to supplement it by similar folk words with illustrative sentences in the remaining districts of Bengal as a whole. আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধান এই পরিপূরকতার কাজে অগ্রসর হল।

সংকলনগুলির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কী পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে কী পশ্চিমবঙ্গে কোথাওই উপভাষাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব নিয়ে রীতি অনুযায়ী ব্যাকরণ লেখা সার্থক হয় না। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে শব্দ বা অক্ষরের উচ্চারণ আলাদা আলাদা ভাবে মূলত করা হয়নি। কলকাতার আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধানে তার জন্য IPA-র সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ভূমিকায় গ্রিয়ার্সনের শ্রেণী বিভাগ মান্য করে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

গোপাল হালদার Comparative Grammer of East Bengali Dialects গ্রন্থটিতে গ্রিয়ার্সনের মতের সঙ্গে সুনীতিকুমারের গৃহীত অঞ্চলভেদ স্বীকার করে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। আগেই বলেছি তিনি ১৯৩৬ এর কাজ ১৯৮০ সালে প্রকাশ করার আগে বয়স ও শারীরিক অক্ষমতার সূত্রে অপারগতার কথা বললেও বইটিতে আধুনিক তথ্য সংযোজিত করেছেন এবং সর্বত্র শহীদুল্লাহে গৃহীত অঞ্চল বিন্যাস স্বীকার করে নেন নি। একদিকে তিনি যেমন যশোর খুলনা উপভাষা কথাটি পূর্ববাংলার উপভাষা বলে শহীদুল্লাহের

মতোই গ্রহণ করেন নি অন্যদিকে শহীদুল্লাহের হাজং মায়াং চাকমাদের অন্তর্ভুক্তি না করার সিদ্ধান্তকেও সমালোচনা করেছেন ঃ

Prof. Shahidulla's exclusion of Haijong from the perview of EB as Haijong is a caste or nomenclature is formally right but linguistically weak reasoning. These sub-dialects do exist with their respective distinctiveness in zones which are as good as 'districts.' Haijong being close to Maimonsing East-Sylhet were Mayong (Bistupuria) to Sylhet-Kachar ; and Chakma to Chittagong ; and these should be taken and compared with the respective varieties for proper apprehension.

গোপাল হালদারকৃত অঞ্চল বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে ১। ঢাকা বা কেন্দ্রীয় পূর্ববঙ্গীয় গোষ্ঠী। ২। মৈমনসিং পূর্ব—সিলেট পশ্চিম অঞ্চল গোষ্ঠী। ৩। সিলেটি বা উত্তর-পূর্ব গোষ্ঠী এবং ৪। চট্টগ্রাম-নোয়াখালি বা দক্ষিণ-পূর্ব গোষ্ঠী। পশ্চিমবাংলার ও পূর্ববাংলার ভাষা গোষ্ঠীর মাঝখানে খুলনা যশোরের উপভাষাকে রেখে তাকে যথার্থ পূর্ববঙ্গীয় ভাষাবিচার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দু এক জায়গায় ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে আব্দুল হাইয়ের মতের ক্ষেত্রেও গোপাল হালদার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ঘ ধ ঢ ভ এই ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনি যে চট্টগ্রাম উপভাষায় সংরক্ষিত এবং তা যে অবরুদ্ধ গ' দ' ড়' ব' নয় ড হাইয়ের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গোপাল হালদার বলেছিলেন ঃ

My own impression even now (at Calcutta) is that the 'recursives' occur in Chittagong too and before further field study I would not change my view.

পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনগুলি ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করে তিনি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলির সুনিপুণ তালিকা পেশ করেছেন। এক একটি ব্যঞ্জনের আদ্য মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে তার পরিবর্তনের চেহারা উপস্থাপিত করেছেন। দেখা যাচ্ছে মান্য চলিত ও ঢাকা কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে যতদূরে আঞ্চলিক অবস্থান ততই পরিবর্ধিত হচ্ছে তার উচ্চারণ পদ্ধতি। [ব্যাকরণ অংশে মৌলিক, গঠিত এবং সমাসবদ্ধ শব্দ দিয়ে তৈরি শব্দভাণ্ডার কারকবিভক্তি বচন

বিশ্লেষণ নির্দেশক প্রত্যয় সংখ্যা ও পূরণ বাচক শব্দ, সর্বনাম ও বিভিন্ন কারকে তার রূপ ক্রিয়াপদ ধাতুবিভক্তি কাল কালভাবানুসারে ধাতুরূপ, ক্রিয়া বিশেষণ স্বার্থিক প্রত্যয়, বিভিন্ন বাক্যের ব্যবহার (যেখানে লেখক দেখিয়েছেন দ্বারা কর্তৃক দিয়ে তৈরি সাধু কর্মবাক্য প্রায়ই বইয়ের লেখার মতো কৃত্রিম মনে করে বর্জিত হয়েছে) অনুসর্গ, অব্যয় অসমাপিকা ক্রিয়া অনুসর্গ সংযোগমূলক সর্বনাম। বিস্ময় সূচক সর্বনাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিরুক্ত সহচর শব্দ এ সব বিষয়ের আলোচনা বিশ্লেষণ উদাহরণ সংযোজন এত সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয় যে মুগ্ধ হতে হয়।

প্রকৃত পক্ষে উপভাষার শক্তি তার ব্যাকরণ অংশ বিশ্লেষণ না করে বোঝা সম্ভব নয়। তার সূক্ষ্ম প্রকাশক্ষমতা অনেক সময়েই মান্যচলিত ভাষায় থাকে না—এই প্রকাশ ক্ষমতা নিয়ে আসার জন্যই উপভাষার কাছে হাত পাততে হয়।

[বাক্যের অন্বয়ের পার্থক্যহীনতা এক ভাষা-উপভাষার সঙ্গে অপর ভাষার তফাত বুঝিয়ে দেয় তবু কতগুলি প্রয়োগ ও অন্বয়গত সূক্ষ্ম পার্থক্য কোনও কোনও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় আছে। গোপাল হালদারের এই বইতে সেগুলির ইঙ্গিত আছে, যদিও বিস্তারিত বিশ্লেষণ নেই। দুএকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১. মান্য চলিত বাংলায় পুরাঘটিত বর্তমানের এবং তার নিষেধ যুক্ত বাক্যে প্রয়োগ এইরকম হয়

(আমি) গেছি	(তুমি) গেছ	(সে) গেছে
(আমি) যাইনি	(তুমি) যাওনি	(সে) যায়নি
করেছি	করেছ	করেছে
করিনি	করোনি	করেনি

মৈমনসিং সিলেট কাছাড় ও কুমিল্লায় এর রূপ দাড়ায়

গেসি	গ্যাসো	গ্যাসে
গেসি না	গ্যালা না	গ্যালে না
করসি	করসো	করসে
করসি না	করসো না	করসে না

প্রথম পার্থক্য যা তা ধ্বনিমূলক। ছ > স এই তফাত। কিন্তু না বা নিষেধ বোঝাতে মান্য চলিতে যেখানে সাধারণ নিত্যবৃত্ত রূপের পর 'নি' (বা সাধু প্রয়োগে যেখানে 'নাই') এর ব্যবহার সেখানে এই উপভাষার ক্ষেত্রে পুরাঘটিত রূপের পরে 'না' এর প্রয়োগ হচ্ছে এটা লক্ষণীয়।

২. ক্রিয়ার আগে না-বাচক শব্দের ব্যবহার সাধারণভাবে বাংলায় বা তার বেশিরভাগ উপভাষাতে নেই। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে ধরা যাক চট্টগ্রাম অঞ্চলে না এর বদলে ন এবং ক্রিয়াপদের পূর্বেই তার ব্যবহার। যেমন

মান্যবাংলায় ঃ করি না
দক্ষিণপূর্ব উপভাষায় ন ক'রির (ক'=ক্‌হ)

৩. ভবিষ্যত বোঝাতে ব এর বদলে ত উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্বের উপভাষায়। যেমন,

মান্যচলিতে করবে এখানে করতো
করব ··· এখানে করতাম

৪. সর্বনামে প্রথম পুরুষে মান্যচলিত বাংলায় লিঙ্গভেদ নেই কিন্তু সিলেটি উপভাষায় আছে পুংলিঙ্গে সে (হ্যা) স্ত্রীলিঙ্গে সে (তাই), চট্টগ্রামী উপভাষায় স্ত্রীলিঙ্গে তাই তেই এবং হিতি—ঢাকার উপভাষায় হাতাই নোয়াখালির উপভাষার হেতি। শহীদুল্লাহ সাহেব অনুমান করেছিলেন অসমীয়াতেও সর্বনামের প্রথম পুরুষে স্ত্রীলিঙ্গে তাই-এর প্রয়োগ ও আরও কয়েকটি রূপতাত্ত্বিক মিল দেখতে পাওয়ার কারণ এমন হইতে পারে প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি স্রোত উত্তরবঙ্গ হইতে পূর্ব অভিমুখে আসামে প্রবেশ করে। পরে সেই স্রোত আসাম হইতে দক্ষিণ অভিমুখে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।'

গোপাল হালদারের এরকম অনুমান নেই। কিন্তু প্রশ্নটা অনুমান করা না করা নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হল সামগ্রিক উপভাষাকে ব্যাকরণের একটি নখদর্পণিকায় প্রতিবিম্বিত করা।

ভাষার কামড়কে কচ্ছপের কামড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন একবার গোপাল হালদার। সেই কামড় জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত ছিল বলে ১৯৩৫ এর কাজকে মোহশূন্যভাবে সংক্ষিপ্ত করে তাঁর এই অসাধারণ মূল্যবান ব্যাকরণকে পরবর্তীকালের গবেষকদের দিগ্‌দর্শিকারূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

১৯৩৫ এর মূলকাজ ১৯৮৬-তে প্রকাশের সময় বা আজও যে মূল্যবান হয়ে রয়েছে তার কারণ দুটি। প্রথমত নিজের গবেষণাকর্মের সাধুতা বিষয়ে তার আস্থা-যে কারণে আধুনিক মতামতের অনেক ক্ষেত্রেই তিনি পুনরায় ক্ষেত্রসমীক্ষা না করে মত পাল্টাতে রাজি হননি। দ্বিতীয়ত স্বদেশের প্রতি ঋণ বোধ যা তাঁকে সংস্কৃতির অন্যজগতের মত ভাষা বিষয়ক চর্চাতেও সেই নিরত করিয়েছিল—যেই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব। সেই জন্যই উৎসর্গ পত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সুকুমার সেনের কাছে লিখেছিলেন ঃ With apologies for the unconscionable delay in publication—কিন্তু দেরিতে হলেও এই পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা প্রকাশিত হওয়াতে তাঁর ঋণ শোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীও ঋণী হয়ে রইল লেখকের কাছে।

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ঃ তেরশ ‘পঞ্চাশ’

সুব্রত রায়চৌধুরী

লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমিব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছিল, চল্লিশের দশকে এসে সেই বাঙালী মধ্যবিত্তের বিকাশের পথ রুদ্ধ হল। যে শুধু ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হল তাই নয়, সে তার শিক্ষা রুচি আদর্শ থেকেও ছিন্ন হয়ে এক নিরালম্ব অবস্থানে এসে দাঁড়াল। বাঙালী মধ্যবিত্তের এই ভাঙ্গণ ধরা জীবনের শেষ পর্বটি শিল্পরূপ পেয়েছে গোপাল হালদারের মন্বন্তরের ট্রিলজি—উনপঞ্চাশি—পঞ্চাশের পথ ও ১৩৫০-এ।

১৩৫০ অর্থাৎ ১৯৪৩-এ গোটা বাঙলায় দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে এল। তারই পথ ধরে এল মহামারী এল দুর্ভিক্ষ। অধিকাংশ গবেষকই আজ স্বীকার করে নিয়েছেন এই দুর্ভিক্ষ ছিল মানুষেরই তৈরী। এর জন্য দায়ী যেমন ব্রিটিশ সরকার, তেমনি দায়ী তদানীন্তন বাংলার নাজিমুদ্দীন সরকার। আর এই উভয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কালোবাজারী ব্যবসায়ীরাও সেদিন মানুষের প্রাণের বিনিময়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছে। বাংলার বুকে নেমে আসা এই অন্নাভাবের প্রতি ইংরেজ সরকার উদাসীন ছিলেন বলেই তা দুর্ভিক্ষের রূপ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করতেই বাংলার গোলা শূন্য করে নিয়েছিল সেদিন। অন্যদিকে কলকাতায় যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের অত্যাবশ্যক কাজকর্ম, লোকজন, সৈন্য

সামন্তকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এবং কলকাতাকে ঘিরে যুদ্ধের অত্যাবশ্যক নিজের শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য গ্রামের মানুষের মুখের ভাত কেড়ে আনাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। সেদিন প্রতিরক্ষা বিভাগের খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ সরকার Standing committee তৈরী করলেও সাধারণ মানুষকে বাঁচবার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। বরং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় চাল বাংলাথেকে সরবরাহ করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে ইস্পাহানিকে নিয়োগ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই জনবিরোধী কার্যকলাপের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাজিমুদ্দীন সরকারও মুনাফার মৃগয়ায় মেতে ছিল। এই সময় ৬ টাকা বেশি দরে খাদ্য বিক্রি করে বাংলার মুসলীম লীগ সরকার মাসে প্রায় ৫ লক্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফা করে।

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পিছনে মানুষের লোভই সব হেকে বেশি কাজ করেছে। এ অবস্থায় ১৯৪৩-এ ফসল খুব কম হল। যা হোল তার অনেকটাই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গেল। সামান্য যা ছিল সরকারী এজেন্টদের প্রলোভনে পা দিয়ে সে সব বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়ে মানুষ সেদিন খাদ্যের অন্বেষণে শহরের পথে পা বাড়াল। অপুষ্টি জনিত মৃতুতে দেশ ছেয়ে গেল। এই দুর্ভিক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামের ভূমিহীন কৃষক। তুলনায় শহর কলকাতায় খাদ্যের অভাব ছিল না, ছিল নীতিবোধের অভাব। তাই মধ্যবিত্ত মানুষ বহুশতাব্দীর নীতিবোধ ও সংস্কার বিসর্জন দিয়ে খাদ্য সংগ্রহে নেমেছিল। গোপাল হালদারের উপন্যাসত্রয়ীতে নায়ক বিনয়ও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একজন প্রতিনিধি। চরম খাদ্যসংকট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ কিভাবে তার আদর্শ থেকে, ন্যায়বোধ থেকে, বহুশতাব্দীর সঞ্চিত মূল্যবোধ থেকে সরে সরে যাচ্ছে—সে দৃশ্যকেই বিনয় দেখেছে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে।

উপন্যাসত্রয়ীর মোট ঘটনাকাল ১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৪-এর এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্যন্ত। অর্থাৎ কালগত দিক থেকে বিচার করলে উপন্যাসত্রয়ীতে দুর্ভিক্ষের সূচনা বিকাশ ও পরিণতির পরের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বিনয় বর্মা থেকে জাপানী আক্রমণের ভয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে তার নিজস্ব গ্রাম সোনাপুরে ফিরে এসে দেখেছে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় সেখান থেকে ইংরেজ সৈন্য লোক সরাতে শুরু করেছে। বিনয় নিজের গ্রামে ফিরে এসে দেখে নিজ দেশে যে পরবাসী হয়ে পড়েছে। ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গিয়ে দেখেছে অসংখ্য অসহায় গ্রামবাসী একই ভাবে পুনর্বাসন আর ক্ষতিপূরণের আশায়

ঘুরছে। সুধা, অনিল, মজিদ, প্রমথরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাবী আদায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই সূত্রেই সুধা অনিলদের মত কম্যুনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে অরাজনৈতিক সমাজকর্মী বিনয়ের পরিচয় ঘটেছে। কলকাতায় বোন ভগ্নীপতির বাড়ীতে পরিচয় হয়েছে মথুরাদাসজী, হরমুখরায় এর মত শিল্পপতিদের সঙ্গে। বিনয় লক্ষ্য করে মানুষের দুর্গতি, জাপানী বোমাবর্ষণ, আকালের দিনে কংকালের মিছিল। বর্মাপ্রত্যাগত বিনয় ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বহু মানুষের দুঃখ,অসহায়তা তাকে ক্রমশই ব্যক্তি আমির সংকীর্ণ গন্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত করে দেয়। নানা কাজের মধ্য দিয়ে সে বোঝে পলিটিক্স মাত্র সঙ্কীর্ণ দলানুবৃত্তি নয়, পলিটিক্স মানে বেঁচে থাকার সম্মিলিত সংগ্রাম এবং এ পথেই একদিন মানুষের ক্রম মুক্তি হবে।

উপন্যাসত্রয়ীর নায়ক বিনয়ের কর্মসূত্রে এবং তার দৃষ্টিতে আমরা পরিচিত হই শিল্পপতি, আমলা, কৃষক, সাংবাদিক, ছাত্র, বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের দিনে দেশীয় শিল্পপতিদের ভূমিকা কি ছিল তা ফুটে উঠেছে শচীপ্রসাদ, মথুরা দাসজী, হরমুখরায় প্রমুখের সঙ্গে বিনয়ের সংলাপে। জাতীয় আন্দোলনের দিনে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পাশাপাশি দেশীয় পুঁজিপতিরাও একটি বিকল্প দেশীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাইছিল. তারা বুঝতে পারছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে একসময় কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকায় চলে আসবে। তাই তাদের আন্দোলনকে তারা শুধু সমর্থন করেন নি, অর্থ দিয়ে সে আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছে। অথচ তারাই দুর্ভিক্ষের দিনে মন্বন্তরের মোকাবেলায় তেমন ভূমিকা নেয় নি। মানুষ মরছে দেখেও তারা বিচলিত হয় নি। গোপাল হালদারের উপন্যাসত্রয়ীতে শিল্পপতিদের এই শ্রেণী স্বার্থ ফুটে উঠেছে। আসলে তারা চেয়েছিল দেশীয় বাজার দখল করতে। গোপাল হালদার তাদের এই মেকি দেশপ্রেমকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিল্পপতিদের পাশাপাশি নীতিজ্ঞানহীন আমলাদের কথাও বলেছেন লেখক। বিবেকহীন অসাধু সরকারী কর্মচারীদের নীতিজ্ঞানহীনতার ফলেই সরকারী রিলিফ যা আসত তাও সাধারণ মানুষের কাছে ঠিকমত পৌঁছুতে পারে নি। রিলিফ কমিশনার মার্টিন সাহেব এ প্রসঙ্গে বলেন,সে সেক্রেটারিয়েট চোরাবাজার হয়ে উঠেছে। আসলে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়েই সেদিন চোরা কারবারীদের সঙ্গে এই দুর্নীতি পরায়ণ সরকারী কর্মীদের একাংশ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মেতে উঠেছিল। অবশ্য একই সঙ্গে সৎ নিষ্ঠাবান উচ্চশিক্ষিত আমলাদের পরিচয়

রেখেছেন গোপাল হালদার। এরা বিবেকবান ছিলেন বলেই মানুষের দুর্নীতিতে এরা পীড়িত হয়েছেন, গোপাল হালদারের উপন্যাসে মিঃ নির্মল দাশগুপ্ত, মিঃ ব্যানার্জীর মত আমলরা এই বিবেকের নির্দেশই দুর্গত মানুষকে সাহায্যের জন্য বিনয়দের মত সমাজকর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তবে এদের অনেকেই সুধা, মজিদদের মত কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশ্বাস করতেন না। দেশের সাধারণ জনসাধারণের মত এদের কাছেও কমিউনিস্টরা ছিল বিদেশী শক্তির দালাল।

মন্বন্তরের দিনে শিল্পপতি, সরকারী কর্মচারী, মজুতদার আর চোরা-কারবারীদের অশুভ নৈকট্য গ্রামীণ কৃষক সমাজের তৃণমূলে আঘাত করেছিল। উপন্যাসত্রয়ীর সূচনাতেই আমরা দেখতে পাই জাপানী আক্রমণের মোকাবেলা করবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য গ্রামবাংলায় আশ্রয় নিয়েছে। ফলে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। এই উদ্বাস্তু কৃষকেরা অর্থের লোভে ব্রিটিশ সরকারের দেশীয় এজেণ্টদের কাছে চাল বিক্রি করে দিতে শুরু করেছে, এরই পরিণতিতে তারা ক্ষুধার জ্বালায় অন্নের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পা বাড়িয়েছে। আর এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে সংগঠিত করে ক্ষতিপূরণ আদায়ে এবং মজুতদার আর বিদেশী এজেণ্টদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। দুর্গা মণ্ডল, হারু মোল্লা, যতীন দা, বাঈ আম্মা—এই উদ্বাস্তু কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। গোপাল হালদার ব্যক্তিগত জীবনে এই সময়পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষকফ্রণ্টে কাজ করেছেন। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট তৈরীর কাজ করেছেন, তাই কৃষক সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার ছিল। তবে কৃষকজীবন বিশ্বস্তভাবে তাঁর উপন্যাসে উঠে এলেও বলিষ্ঠ কোন কৃষক চরিত্র এখানে তিনি তুলে ধরেন নি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাই সেদিন কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। তারা কৃষকের মুখে মুখে তুলে দেয় বাঁচার মন্ত্র 'জান দেব তবু ধান দেব না।' কিন্তু এই সংগ্রামী পরিমণ্ডলে 'আর এক দিন' উপন্যাসের মত বলিষ্ঠ কোন কৃষক চরিত্রের মুখ পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে না। বোধ হয় দুর্ভিক্ষের দিনে তেমন কোন সংগ্রামী লড়াকু মানসিকতার জন্মও সম্ভব ছিল না। প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন খুদকুড়ো সংগ্রহের চিন্তায়। মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট কর্মীরাই সেদিন কৃষক সমাজের চেতনা জাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছে। তবে কৃষক সমাজের (নেতৃত্ব না দিলেও তাদের) মধ্যে যে আত্মসচেতনতা জাগছে তার আভাস কিন্তু লেখক যতীনদা,, বাঈ আম্মার মত চরিত্রের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন। বিশেষতঃ

বাঙ্গী আম্মা চরিত্রটি উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে তার লড়াকু মানসিকতার জন্য। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে, ছেলেদের যুদ্ধের মারন যজ্ঞে পাঠিয়ে সে সব হারিয়েছে বটে, তবে গ্রামের সমস্ত যুবককে সে আত্মজ হিসাবে ভাবতে শিখেছে। সমষ্টির মুক্তিতেই যে ব্যক্তির মুক্তির সম্পূর্ণতা—তা সে অনুভব করেছে। কমিউনিজমের তত্ত্ব সে জানে না, তবে কাজের মধ্য দিয়ে, আঘাতের পাহাড় ডিঙিয়ে যে সেই তত্ত্বকেই বুকের ভেতরে অনুভব করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার পথে পৌঁছেছে।

উপন্যাসটিতে লেখক সমকালের ইতিহাসকে কথারূপ দিতে চেয়েছেন। তাই শুধুমাত্র বিত্তবান শিল্পপতি, উচ্চবিত্ত আমলা বা নিঃসহায় কৃষক সমাজের কথারূপ অঙ্কন করেন নি, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দল ও দুর্ভিক্ষের দিনে সেই দলগুলির ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্যই ছিল রাজনৈতিক দলগুলির নানা অবস্থানকে চিহ্নিত করা। তিনি নিজেই বলেছেন "মন্বন্তরের কথায় ও চিত্রে আমি অন্তত তেমন কোন কালাতীত কাহিনী বলতে চাই নি, জেনে বুঝেই প্রাধান্য দিয়েছি রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও আলোচনাকে, কর্মী ও মানুষের কথা ও চরিত্রকে।" (লেখকের কথা ; তেরশ পঞ্চাশ) তাই দেখি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে যেমন মন্বন্তর, মহামারীর শ্মশানচারী ভৈরবীমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়েছে, তেমন এসেছে উত্তালচল্লিশের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলিও। ক্রিপস প্রস্তাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেল 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেমন কংগ্রেসের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা গেল, কংগ্রেস, কংগ্রেস—সোসালিষ্ট, কমিউনিস্ট প্রভৃতি দলগুলির মধ্যে বিরোধও তীব্র আকার নিল। গান্ধীজীসহ সমস্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—এই শ্লোগান দেশবাসীর মুখে তুলে দিয়েই বন্দী হলেন। ফলে কংগ্রেস কর্মীরা বিশেষত বিনয়ের মত দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষ সেদিন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিনয় ভেবেছে "করেঙ্গে করেঙ্গে করেঙ্গে—তুমি কি করবে, বিনয়? আমি কি করব? আমি কি জানি এর? আমি সাধারণ মানুষ।" (পঞ্চাশের পথ, পৃ. ৩১২) গান্ধীজী 'করেঙ্গে' বলতে সেদিন কি বুঝিয়েছিলেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ছিল না। জওহরলাল নেহেরু এ সম্পর্কে বলেন "Neither in public nor in private nor at the meeting of Congress Working Committee did he hint at the nature of the action he had in mind…So neither he nor Congress Working Committee issued any kind of direction (Discovery of India—P. 476) ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সঞ্চার হল। 'উনপঞ্চাশী' উপন্যাসের শুরুতেই এই উদ্‌ভ্রান্ত বিনয়কে আমরা খুঁজে পাই। 'বিনয় বুঝেছে কিছু কাজ করতে হবে, সেও তো মানুষ, এ দেশের মানুষ।" মানুষ সেদিন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে দেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে নাশকতা মূলক কাজে হাত লাগিয়েছিল। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির কর্মীরা সেদিন কংগ্রেসের মূল অহিংস নীতিকে উপেক্ষা করে রেললাইন উপড়ে, থানা-পোষ্ট অফিস পুড়িয়ে, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে, রাস্তাঘাট অবরোধ করে স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল বিনয় দেখেছে "ট্রাম থেমে গেছে···সামনে মারামারি হচ্ছে। একটা ট্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সবাই ছুটছে। ছেঁড়া চপ্পল হাতের বই পড়ে রয়েছে সার্জেণ্ট এসে তাড়া করছে। মাথা ফেটে গেছে কারো কারো" "ভারতছাড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ আগষ্টের পরবর্তী কয়েকদিনের কলকাতার এ ছবি যে কোন ইতিহাস বইয়ের পাতাতেই পাওয়া যাবে। দেশবাসীর এই চরম সংকটে ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি অনেক বেশি আন্তর্জাতিক ভাবনায় ভাবিত হ'ল; ভুলে গেল দেশের সঙ্কটের কথা। জাতীয় আকাঙখার কোন মূল্য সেদিন তারা দিলেন না। তাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার দাবী জানানোর অর্থ প্রকারান্তরে হয়ে উঠবে মিত্রশক্তির বিরোধিতা ও ফ্যাসীবিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করা। মূলতঃ এই কারণেই সমকালীন কমিউনিষ্ট কর্মীরা 'ভারতছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেন নি। তারা জানিয়ে ছিলেন, "We welcomed the first part of the resolution." ফলে জনমানসে তারা সেদিন বিশ্বাসঘাতকরূপেই পরিচিত হলেন। তাদের এই দেশহীন আন্তর্জাতিকতাবোধই দেশীয় মুক্তিকামী মানুষের কাছে তাদের করে তুলেছিল দেশ ও জাতির শত্রু—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল। পার্টি ও জাতির এই সংকটময় মুহূর্তকে আমরা খুঁজে পাই 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে কুমারের প্রশ্নে। যে তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছে। "আমরা কি ট্রেটর হব নাকি দেশের কাছে?" দিদি অসহায় ভাবে উত্তর দিয়েছে "কি করে এ সময়ে কিছু বলব? জাপান রয়েছে দুয়ারে।" নিশীথনাথও প্রশ্ন তুলেছে "স্বাধীনতা চাইছে দেশের মানুষ বুঝি একথা সত্য। কিন্তু ভুলি কি করে জাপান

দুয়ারে" আবার বিনয়ও তার একই রকম ভেবেছে "মনে হচ্ছে তোমরা যা বলছ তাও মিথ্যা নয়।" এই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে একমাত্র জওহরলাল নেহেরু ছাড়া আর কোন জাতীয় নেতাই দেশীয় পরিস্থিতিকে বিচার করেন নি। তাই সাধারণ মানুষ তো বটেই জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছেও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা হয়ে গেলেন বিদেশী শক্তির দালাল। ভ্রান্তিমুক্ত মন নিয়ে বিনয় যেদিন কমিউনিষ্টদের সমালোচনা করেছে "তোমরা সাধারণ মানুষের পথ নিলে না বুদ্ধিমানের পথ নিলে" এই বুদ্ধিমানের পথ নেওয়ার ফলেই ভারতছাড় আন্দোলনের দিনে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা হয়ে রইলেন জনগণ বিচ্ছিন্ন এক বিপরীত মেরুর অধিবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতছাড় আন্দোলন নিয়ে যখন দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলি নানা তর্কবিতর্কে ব্যস্ত ঠিক তখন সেই যুদ্ধের খরচ মেটাতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণামে মন্বন্তর এসে বাংলার নিভৃত পল্লীতে বসল। বিনয় দেখল, "দলে দলে আজ পথে অন্নহীন নারী চলেছে—বালিকা বিগত যৌবনা, বর্ষিয়সী, বৃদ্ধা আর বালক ও বৃদ্ধ, হাতে মাটির ভিক্ষাপাত্র—পরিধানে কি ওদের তার ঠিক নেই—বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে এক কথা 'মা, খুধা, খুধা,' (তেরশ পঞ্চাশ—পৃঃ-১৫১)। এই দুর্দিনে নিরন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা। সেদিন মানুষ রুটির জন্য সবকিছু দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন "রুটি দাও রুটি দাও বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাক! সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ! হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা"—এই রুটি আর অন্ন তুলে দিতেই ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফলে জনবিচ্ছিন্ন এই পার্টির কর্মীরা মন্বন্তরের দিনে আবারও সাধারণ মানুষের সঙ্গে লগ্ন হবার সুযোগ পেল।

এই সূত্রে লেখক বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের সীমাবদ্ধতায় দুর্ভিক্ষের দিনে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসের সুরেশবাবু, যাদববাবু প্রমুখের কথায় এই স্বার্থসর্বস্ব কংগ্রেস কর্মীদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের দ্বন্দ্বকে বড় করে দেখিয়ে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সমিতির কর্মযজ্ঞ থেকে তারা দূরে সরে রইলেন, সুরেশবাবুর মত কংগ্রেস-কর্মীরা মনে করতেন "মানুষকে খাওয়ানো সরকারের কাজ, ত্রাণসমিতি চালানো কংগ্রেসের কাজ নয়।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মুসলীম লীগ তখন সরকার চালাচ্ছে। এই সূত্রে কংগ্রেস ও লীগের একটি স্থায়ী দ্বন্দ্বও তৈরী

হয়ে গেছিল। এই দ্বন্দ্বের পিছনে আদর্শগত কারণ যত না ছিল তার থেকে বেশি ছিল যুদ্ধের বাজারে মজুতদারী ব্যবসাকে আশ্রয় করে ব্যক্তিগত মুনাফাকে বাড়িয়ে তোলার প্রবণতা।

উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের মুসলীম কর্মীদের একটি পৃথক সংকটের কথা লেখক খুবই বিশ্বস্তভাবে তুলে এনেছেন। মুসলীম লীগ কর্মীরা এই কংগ্রেস কর্মীদের বিশ্বাস করতেন না। অন্যদিকে হিন্দু কংগ্রেস কর্মীদের কাছেও এরা ছিলেন অপাঙক্তেয়, মজিদের মত কমিউনিষ্ট কর্মী কিংবা শাহেদুদ্দীনের মত ন্যাশানালিস্ট কংগ্রেস কর্মীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ব্যথিত চিত্তে বিনয় তাই ভেবেছে "মজিদ তার স্ব-সমাজেও ঠাঁই পাবে না। হিন্দুদের কাছেও পাবে না আত্মীয়তা।. এই কি নিয়তি আজ মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীর? এই নিয়তি শাহেদুদ্দীনের, এই নিয়তি মজিদেরও।" এক বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের জগতে তাই সেকালের মুসলীম-কংগ্রেস কর্মী বা কমিউনিষ্ট কর্মীদের নির্বাসন দিয়েছিল দেশের মানুষ। জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার দিনে এও ছিল এক ভিন্নতর সংকট।

রাজনৈতিক কর্মীদের এই মানসিক অবক্ষয়ের দিনে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা সেদিন অনেক বেশি সততা, ত্যাগ আর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। '১৩৫০'-এর পাতায় পাতায় রয়েছে, তার বর্ণনা। কলকাতায় সুধা-অমিত, সোনাকান্দিতে মজিদ, প্রমথ এই ভাবেই শাহেদুদ্দীন, বিনয়ের মত রাজনৈতিক অরাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছিল। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি তার কর্মীদের প্রতি এই নির্দেশই দিয়েছিল, কোনরকম বিভাজন নয়, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে, মহামারীর প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। মানুষ আজ মরছে, তাই সমস্ত রকম দলীয় নীতির উপরে উঠে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সুধাও বার বার তাই বিনয়কে জানিয়েছে এই কথা। কমিউনিষ্ট পার্টির দলিলেও এই ভাবনার সমর্থন মেলে। "Our Party sunk all its resources and workers in Organising the most wide spread relief movement with the co-operation not only of local Congressmen but also of Leaguers and even Mahasabhaites, on as board and united ona basis as possible (War and National Liberation by P, Bandhu and P. G. Jacob) আমরাও দেখেছি গোপাল হালদারের উপন্যাসে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা গভীর আন্তরিকতায় রিলিফের কাজে হাত লাগিয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনের

কাজে দিনরাত গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছে। আর তাদের এই কাজে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও বিবেকের নির্দেশে বিনয় অংশ নিয়েছে। তবে সে শুধু অমিত সুধাদের সঙ্গেই সবার মত জড়িয়ে পারে নি, সে একইভাবে সমাজের নানা মানসিকতার নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশেছে। বলা যায় বিনয় এই পুরো বৃত্তের নানা প্রান্তে একাধিকবার বিচরণ করেছে। সে যেমন সোনাপুরের কৃষক আন্দোলনের সহযাত্রী হয়েছে, তেমনি কলকাতায় বণিক সভাতেও বক্তব্য রেখেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। পথে নেমে কাজের মাধ্যমে তাদের চিনতে শিখেছে। দেখেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের সীমাবদ্ধতা, তাদের দলানুবৃত্তি, চক্রান্তের নীচতায় ক্ষুধিত মানুষের হাহাকার। তুলনায় কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের নিষ্ঠা, সততা, আন্তরিকতা তাকে তাদের কর্মক্ষেত্রে লগ্ন হতে সাহায্য করেছে, যদিও পলিটিক্সে তার বিশ্বাস নেই, যদিও কমিউনিস্টদের মত সে গ্রহণ করতে চায়ও না, তবুও কর্মসূত্রে তাদেয় সঙ্গেই যেন সে গভীরতর আত্মীয়তা অনুভব করেছে।

লেখক তাঁর এই উপন্যাসত্রয়ীকে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক কথারূপ হিসাব চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাই অসংখ্য ঘটনা, নানা শ্রেণীর অসংখ্য মানুষ উপন্যাসত্রয়ীর পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিহাসের এই সত্যকে অগ্রাধিকার দেবার ফলে চরিত্রগুলি অনেকাংশেই তার সঠিক চেহারা নিয়ে উঠে আসতে পারে নি। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করলে এ ঘটনা অভিযুক্ত না হলেও ডকুমেন্টারি নভেলের ক্ষেত্রে এটি প্রথাসিদ্ধ রীতি। লেখক সচেতন ভাবেই এই রীতিকেই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। লেখক বলেছেন, "জেনে বুঝেই প্রাধান্য দিয়েছি রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও আলোচনাকে, কর্মীও মানুষের কথা ও চরিত্রকে,……এ পরীক্ষা পশ্চিমে মালরো বা স্টাইনবেকের হাতে সার্থক হয়েছে। আমাদের দেশেও সার্থক না হবার কারণ নেই। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও জানি শক্তিমান লেখক প্রস্তুত হচ্ছেন। আর এ দেশের পাঠকও তাই প্রস্তুত হয়ে উঠবেন।" (লেখককের কথা, তেরশ পঞ্চাশ) লেখকের এই ইতিহাস সচেতনতার জন্যই এবং বাংলা উপন্যাসে পরীক্ষামূলক ভাবে নতুন রীতি প্রয়োগ করবার জন্যই তিনটি উপন্যাসেরই পাতায় পাতায় রয়েছে ইতিহাসের নৃত্য চপল গতি। অসংখ্য মানুষ অসংখ্য ঘটনা—বিরাট ব্যাপ্ত জনজীবন এই উপন্যাসত্রয়ীর পটভূমি রচনা করেছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকে আমরা অবশ্য 'মন্বন্তর,' 'অশনিসঙ্কেত' 'জাগরী', 'অগ্নি' বা 'মন্ত্র মুখরের' মত উপন্যাসেও

খুঁজে পাই। তবে এই উপন্যাসগুলির সঙ্গে গোপাল হালদারের উপন্যাসত্রয়ীর একটি চরিত্রগত তফাৎ আছে। এই তফাৎটি বুঝে নেওয়া দরকার. গোপাল হালদার 'অন্যদিন' উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছিলেন—এখন আর একজন বা দুই জনকে নিয়ে সাহিত্য রচনার দিন। একক মানুষ নয়. মানুষের মিছিল হয়ে উঠবে নতুন যুগের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। 'উনপঞ্চাশী' উপন্যাসের ভূমিকাতেও লেখকের একই ভাবনার পরিচয় পাই। "কোন এক জনের কথাকে একান্ত না করে, প্রাধান্য দেওয়া। নানা মানুষের কথাকে, ঘটনা চিত্রকে।" (লেখকের কথা), কাজেই বিশেষ কোন নায়ক বা নায়িকা নির্ভর সাহিত্য রচনার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন একটি বিশেষ মানুষকে ইতিহাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে ইতিহাসকেই নায়কের আসনে বসাতে। অবশ্য তাই বলে চরিত্রকেও তিনি উপেক্ষা করতে চান নি। তাই তাঁর উপন্যাসত্রয়ী সাংবাদিকতাধর্মী উপন্যাস হলেও একটি বিশেষ মানুষের হয়ে ওঠাকে আমরা এখানে অনুভব করি। উপন্যাসের নায়ক বিনয় কিভাবে নানা ঘটনা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ হতে হতে একটি বৃহত্তর জীবনভূমিতে এসে প্রতিষ্ঠা পেল. সে কথাই লেখক তুলে ধরেছেন; "বিনয় সাধারণ মানুষ. সাধারণ মানুষের জীবন সে চায়—চায় গৃহ আত্মীয় পরিজন, চায় কর্ম, আর সে চায় সাধারণ মানুষের মত তার দেশের স্বাধীনতা.' (পঞ্চাশের পথ, পৃঃ-২৮৭) সে আরো চায় সুধাকে নিয়ে গৃহ রচনা করতে, এ চাওয়া নিতান্তই সাধারণ এক ছোট্ট চাওয়া। সুধাও স্বীকৃতি জানিয়েছে বিনয়কে, কিন্তু তথাকথিত প্রথাগত উপন্যাসের মত ঘরের ছোট্ট কোনে কিংবা দ্বৈতজীবনের সীমাবদ্ধ ভূমীতে এ প্রেম তার পরিণতি খুঁজে পায় নি। দেশের আহ্বান আজ এসে পৌঁছেছে। তাই পথের বাঁধনেই বিনয়কে যে বাঁধতে চেয়েছে, কিন্তু 'পঞ্চাশের পথে' 'উনপঞ্চাশী'তে, বিনয় পথের মানুষ হয়ে ওঠে নি। তাই সুধার বারবার নিরাসক্ত প্রত্যাখ্যান তাকে রক্তাক্ত করেছে। বিনয়ের আত্মগত ভাবনায় যে রক্তাক্ত হৃদয়ের স্বরলিপি তৈরী হয়েছে। "এই মুহূর্তেই আজ যে বুঝেছে, সুধা তার একান্ত নিকটের অথচ এই মুহূর্তেই সে জানছে যে বহুদূরের। পথ যার পৃথক, পার্থক্য তার সঙ্গে মানতেই হবে।' (উনপঞ্চাশী, পৃঃ-১১৩) রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভাবনার ভিন্নতাই এই দুটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। 'তেরশ পঞ্চাশে' পৌঁছে বিনয়ের বিচ্ছিন্নতার এই বেদনা আরো তীব্র হয়েছে। বিনয় ভেবেছে, "সুধা গুপ্তা তুমি জাননা, জানো না তোমরা, তোমাদের নিষ্করুণ উগ্রতায়, তোমাদের মতবাদের মত্ততায় মানুষের পথে তোমরা কতখানি বাড়িয়ে

দাও জ্বালা, জটিলতা, জঞ্জাল—আর মিথ্যা।" (পৃঃ-২৩) এই প্রেম—আত্মগত ভাবনা—একান্তই ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, আর অন্যদিকে আর্ত মানুষ, ঘর ছাড়া হয়ে পথিক হয়ে উঠবার আহ্বান।—এই উভয় প্রান্তের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে লেখক নিপুণ ভাবেই বিনয়ের হয়ে ওঠাকে দেখিয়েছেন। কিন্তু বিপরীত প্রান্তের চরিত্র সুধাকে যথার্থ অর্থেই মতবাদ-সর্বস্ব একটি কমিউনিষ্ট কর্মী হিসাবে এঁকেছেন লেখক। ফলে সম্পর্কের টানাপোড়েনের অভাবে কোন চরিত্রই তেমনভাবে প্রাণ পেল না। সুধা গুপ্তা প্রেম বিরহ, সুখে দুঃখে গড়া একটি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে নি। ফলে বিনয় চরিত্রের বিকাশও বিঘ্নিত হয়েছে। অথচ লেখকের চরিত্র অংকনে দক্ষতা ছিল না, তেমন বলা যায় না। কারণ লেখকের একদা—অন্যদিন-আর একদিনের নায়িকা চরিত্র ইন্দ্রানী অনেক বেশি আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে দীপ্ত অথচ প্রেমময়ী একটি আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। সেখানেও ইন্দ্রানী সুধার মতই অমিতকে পথের সাথী হিসাবেই গ্রহণ করেছে। সেখানেও অমিত ইন্দ্রানীর মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক মতাদর্শ গত তফাৎ। কাজেই লেখকের দুর্বলতাই এমন একটি ব্যর্থ চরিত্র সৃষ্টির মূলে ক্রিয়াশীল—একথা বলা যায় নি। আবার এই জাতীয় উপন্যাসে চরিত্র-ও ঘটনারও যে একটি নিজস্ব দায়িত্ব আছে তা তিনি স্বীকার করেছেন। বলেছেন "বলা বাহুল্য, কথা-চিত্রের ও তার চরিত্রের নিজস্ব দাবীও এ বিচারে একেবারে বিস্মৃত হলে চলবে না। কারণ এ গ্রন্থ ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক কথা চিত্র, অর্থাৎ ইতিহাসকে বিকৃত না করেও স্বীকার করা মানুষকে।" (লেখকের কথা / উনপঞ্চাশী)। এ ক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে তবে কেন চরিত্রটিকে এমন একটি মতবাদ সর্বস্ব চরিত্র করে তুলেছেন লেখক? আর কেনই বা বিনয়, শিবুদা, সীতা রায় প্রথম প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে স্নেহমমতা দুর্বলতা কর্তব্যবোধ সব মিলিয়ে এতখানি মানবিক করে তুলবেন? আসলে চরিত্রের নিজস্বদাবী মেটাতেই লেখক উক্ত চরিত্রগুলিকে মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম সুধা গুপ্তা। নায়িকা চরিত্র হিসাবে তাকে যদি কামনা-বাসনায় সংরক্ত একটি মানুষ করে তুলতেন তাহলে সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি পাঠকের চোখের সামনে থেকে যাবার একটি সম্ভাবনা ছিল। বোধ হয় এই কারণেই 'চার অধ্যায়ের' অন্তিম পরিণতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তটি পাঠকের সামনে থেকে সরে যায়, পরিবর্তে অতীন এলার হৃদয়গত টানাপোড়েনের সমস্যাই পাঠককে বেশি আকৃষ্ট করে। এখানও এই বিষয়টির প্রতি বোধ হয় লেখকের

নজর ছিল। ফলে বিনয় সুধার হৃদয়গত সমস্যার কেন্দ্র বিন্দুতেই পাঠক আবদ্ধ হয়ে পড়েন না। লেখক অনায়াসেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন ইতিহাসের বিরাট পর্ব তাই ইতিহাসই হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় চরিত্র।

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী—'পঞ্চাশের পথ-উনপঞ্চাশী-তেরশ পঞ্চাশ'—সাংবাদিকের 'চোখ ও মন' নিয়ে লেখা চল্লিশের বছরগুলির বাঙালীর সামগ্রিক সমাজ-জীবনের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ। পটভূমিও বিশাল—বহুবিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণে উপন্যাসটি যে সমকালীন ইতিহাসের দলিল-চিত্র হয়ে উঠেছে, এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। লেখকও এরকম দাবীই করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "কৃষক সভার সভ্য হিসাবে আমি মফঃস্বলে ঘুরেছি, দেখেছি এবং তা নিয়ে রিপোর্টও করেছি।···এইসব থাকাতে আমার স্বভাবতই মনে হল কতটা পারি ডকুমেণ্টারি জিনিসকে গল্পের আকারে রাখব, এবং গল্পটাকে অত্যন্ত গৌণ করে ফেলে আমি একটা—ঐ যাকে বলে ডকুমেণ্টারি যদি রাখতে পারি তাই রাখার চেষ্টা করলাম। গল্প এলো—তবে সম্ভবত আমি যে শিল্প প্রয়োজন ছিল, তাকে ক্ষুণ্ণ করেও তার তথ্যগত প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। সচেতনভাবেই দিয়েছি।" (সাক্ষাৎকার / সমাজ ও সংস্কৃতি) এই হল মন্বন্তর ট্রিলজির জন্মকথা। অর্থাৎ ডকুমেণ্টেশনের প্রতি লেখকের ঝোঁক ছিল। তাই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে একক, বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে তোলেন নি। দেশকালের পটভূমিতে বহু মানুষের সঙ্গে অন্বিত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের হয়ে ওঠাকে দেখিয়েছেন। তাই যে বিনয় উপন্যাসের শুরুতে বলেছিল "আমি রাজনীতিতে নেই।" সেই বিনয়ই উপন্যাসের পরিণতিতে পৌঁছে বুঝেছে জীবন সংগ্রামেরই আর এক নাম রাজনীতি। সর্বমুখী ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে অরাজনৈতিক বিনয়ের এই রাজনৈতিক চেতনায় উত্তরণ চরিত্রটিকে আকর্ষনীয় করে তুলেছে। কাহিনীটিকেও দিয়েছে কথাসাহিত্যের মর্যাদা। তবে লেখক বিনয়ের এই হয়ে ওঠাকে সুন্দরভাবে আঁকলেও নায়িকা সুধা বা অন্যান্য চরিত্রকে এমন আকর্ষণীয় করে তোলেন নি। আসলে নায়ক-নায়িকা নির্ভর কাহিনী রচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। ঐতিহাসিক কালপর্ব এখানে নায়ক-নায়িকার দ্বৈত জীবনভূমিকে দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয় নি। লেখক ইচ্ছা করেই ঘটনার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে ঐতিহাসিক কালপর্বকে ফুটিয়ে তুলতেই চরিত্র-পাত্রকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এতে অবশ্যই মানবরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসও তাই মন্বন্তরের ট্রিলজি হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এতে উপন্যাস ত্রয়ী ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। ডকুমেণ্টারি নভেল হিসাবে এই উপন্যাসত্রয়ীকে বাঙালী পাঠক চিরকাল মনে রাখবেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক ব্যক্তি চরিত্রের অস্পষ্টতার জন্য এবং ঘটনা, তথ্য, তর্ক-বিতর্কের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য এই উপন্যাস ত্রয়ী সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে নি।

বাংলার রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার

জ্যোতির্ময় ঘোষ

> বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলেফুলে তার পরিচয় আছে।
>
> রবীন্দ্রনাথ ॥ ৫ ফাল্গুন ১৩৪৩ ॥

মনস্বী লেখক গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা' (একদা—১৯৩৯, অন্যদিন—১৯৫০, আর একদিন—১৯৫১)-র আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রায় সব সমালোচকেরই মনে হয়েছে, 'ত্রিদিবা'-র নায়ক অমিত এবং তার স্রষ্টা দেশী-বিদেশী বহুবিধ প্রেরণা সত্ত্বেও প্রথমত ও প্রধানত রবীন্দ্রসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যপুষ্ট। বাংলার নবজাগৃতি বা নবযুগ, রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁস ও গোপাল হালদার বিষয়ক এই প্রাথমিক পর্যায়ের রচনারম্ভে তাই সুচিন্তিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক নির্ণয় বেছে নিয়েছি।

বাংলার এই নবজাগৃতি বা রেনেসাঁসের চেহারা-চরিত্র, মেজাজ-মর্জি নিয়ে বহু আলোচনা-তর্কবিতর্ক হয়েছে এবং আরো অনেক হবে। তবু, সম্ভবত, বঙ্গীয়

মনস্বিগণের মধ্যে গোপাল হালদারই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁর সমগ্র রচনাকর্মেরই মর্মবস্তু এককথায়, প্রথমত ঃ 'জাগরণ', দ্বিতীয়ত ঃ 'জাগরণ' এবং অন্তিমেও ঃ জাগরণ'। আমার এই প্রতিপাদ্য গুণিজনের বিচার্য হলেই আমি কৃতার্থ।

'হ্যাঁ। গোপাল হালদার নবজাগৃতি, নবযুগ, রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁস, বঙ্গপ্রসঙ্গে কোনো অভিধাতেই বিশেষ কোনো আপত্তি তোলেন নি, তবু, 'ইংরেজিতে তাকে Awakening বলাই নিরাপদ মনে' করেছেন।

গোপাল হালদার মনে করেছেন, 'সমগ্রভাবে দেখলে বাংলার জাগরণ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত।'—বাংলার জাগরণের কালপর্যায়কে সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় এই জাগরণের ধারাবাহিক বিকাশের সূচনা এবং ১৯২০–২১ পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি একশো বৎসর কালব্যাপী তা প্রবাহিত। ১৯২০-২১ সালে তার খাত বদল, ভারতব্যাপী জাগরণের মধ্যে তা মিশে যেতে থাকে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগে তার প্রবাহচ্ছেদ—'একইকালে তাই তার জয় ও পরাজয়'।

তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৮১৭ থেকে ১৯২০-২১ কালপর্বের শতাব্দীব্যাপী জীবনপ্রবাহই কারও বিবেচনায় 'নবজাগৃতি', কারও মতে 'নবযুগ', ইংরেজিতে 'রিনাইসেন্স', ফরাসি ধরণের উচ্চারণে 'রেনেসাঁস'। তাঁর অভিমত ঃ ইংরেজিতে 'Awakening' বলাই শ্রেয়, কেননা, 'রিনাইসেন্স' বা 'রেনেসাঁস' শব্দ-ব্যবহারে অনেকেরই গুরুতর আপত্তি। বিদেশী ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে যাঁরা সুবিদগ্ধ, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে তাঁরা রিনাইসেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পান না।

'রিনাইসেন্স' বলতে কী বুঝি, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী, আমাদের বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিক যা-কিছু ঘটেছিল, সামগ্রিক বিবেচনায় তাকে আক্ষরিক অর্থে 'রিনাইসেন্স' বলতে পারি কী-না ঃ এসব নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকালে সাধারণত যে-প্রশ্নটি আমরা তুলে থাকি বা এড়িয়ে যাই, ঠিক সেখানেই গোপাল হালদার তাঁর অন্তর্ভেদী সন্ধান চালিত করেছেন। উল্লিখিত 'একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহকে' যাঁরা রেনেসাঁস বলেন, তাঁরাও সকলেই জানেন —ইতালি তথা ইউরোপের রেনেসাঁসের একটি 'কার্বনকপি' নয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁস। তাঁরাও মনে করেন না, 'দুটি সমতুল্য'। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের উল্লেখ করেছেন গোপাল হালদার এই প্রসঙ্গে। জানিয়েছেন, অধ্যাপক সরকারও ইউরোপের রেনেসাঁস আর আমাদের রেনেসাঁসকে তুলনীয়

মনে না-করলেও আমাদের আলোচ্য কালপর্ব প্রসঙ্গে 'রেনেসাঁস' শব্দটির ব্যবহার 'বাতিল করে দেন নি।' অধ্যাপক হালদারও অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে সহমত। বস্তুত, ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত Notes on the Bengal Renaissance-এর লেখক অধ্যাপক সরকার পুস্তিকাটির নামকরণের মাধ্যমেই তাঁর পক্ষপাত অনাবৃত রেখেছিলেন। পুস্তিকাটির সূচনাবাক্য এই প্রসঙ্গে অদ্যাপি স্মরণীয়—

> The impact of British rule, bourgeois economy and modern western culture was felt first in Bengal and produced an awakening known usually as the Bengal Renaissance.

অধ্যাপক সরকারের সুবিদিত পুস্তিকার সূচনা-অনুচ্ছেদের পরবর্তী দুটি বাক্যেই পরিস্ফুট, বিগত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল জুড়ে বাংলার রেনেসাঁসের যাবতীয় আলোচনায় তাঁর মূল্যায়নই প্রায়শ অক্ষুণ্ণ আছে। রেনেসাঁসের কালপর্ব এবং য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তুলনার সূত্র কোথায় কতটুকু, সে-বিষয়েই শুধু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যদু'টি আলোকপাত করে না, স্পষ্টতর হয়। রেনেসাঁস প্রসঙ্গে আলোচনায় অধ্যাপক সরকারের মূল্যায়ন মূলত অধ্যাপক হালদারেরও মনঃপূত—

> For about a century, Bengal's conscious awareness of the changing modern world was more developed than and ahead of that of the rest of India. The role played by Bengal in the modern awakening of India is thus comparable to the position occupied by Italy in the story of the European Renaissance.

রেনেসাঁসের কালপর্ব, গোপাল হালদারের মতে, 'একশত বৎসরের জীবন প্রবাহ', অধ্যাপক সরকারও লিখেছেন, 'for about a century' এবং এ-ও লক্ষণীয় যে, হালদার ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে একপ্রান্তে রেখে ১৯২০-২১ সালকে অপর প্রান্তে রেখেছেন। অধ্যাপক সরকার রেনেসাঁসের সমগ্র শতবর্ষকে পাঁচটি কালপর্বে বিভক্ত করতে গিয়ে প্রথম পর্বের সূচনা-বৎসরটিকে ১৮১৪ বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, রামমোহন যখন থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন, সেই ১৮১৪ সালই 'easiest starting point।' অপর প্রান্তে, সরকার রেখেছেন, 'the coming of nonco-operation and the leadership of Mahatma Gandhi'.

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অধ্যাপক সরকার-কৃত পাঁচটি কালপর্বের বিভাজনসীমা নিম্নোক্তরূপ—

১ ১৮১৪-১৮৩৩

এক সীমায় রামমোহনের কলকাতায় স্থায়ী বাস ও কর্মময় জীবনারম্ভ, অন্য সীমায় ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডে তাঁর জীবনাবসান। এই কালপর্বের তিনি অবিসংবাদী কেন্দ্রীয় চরিত্র।

২. ১৮৩৩-১৮৫৭

রামমোহনের জীবনাবসান থেকে ভারতীয় বিদ্রোহের বিস্ফোরণ-পর্ব।

৩. ১৮৫৭-১৮৮৫

ভারতীয় বিদ্রোহ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাপর্ব।

৪. ১৮৮৫-১৯০৫

কংগ্রেসের সূচনাকাল থেকে বঙ্গভঙ্গ।

৫. ১৯০৫-১৯১৯

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন থেকে অসহযোগ-আন্দোলনের সূত্রপাত এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব।

১৯৪৬ সালে অধ্যাপক সরকার ১৮১৪ থেকে ১৯১৯, কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের এই 'জাগরণ' কালটিকে উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক হালদার, ১৯৭১ সালে, বাঙলাদেশ-এর আবির্ভাবকে মনে রেখে লিখছেন—

> আজকে ১৯৭১-এর প্রান্তে পৌঁছে, ১৮১৭ থেকে ১৯২০-২১ অথবা ১৯৪৭ পর্যন্ত কালে এই মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের গতিপ্রকৃতি বুঝবার প্রয়োজন নতুন করে উপস্থিত হয়েছে। এ আশ্চর্য কালকে আরো একটু নতুনভাবে বিচার করা দরকার—তার তাৎপর্যও নতুন করে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক গোপাল হালদার বঙ্গীয় রেনেসাঁস-বিচারে বহুলাংশে অধ্যাপক সরকারের সমীপবর্তী, প্রায়শ অভিন্নমত। কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাষান্তর সত্ত্বেও রেনেসাঁস-কালটিকে পর্বে-পর্বে বিভাজনকালে বছর পঞ্চাশেক আগে থেকে শুরু যেমন করেছেন, তেমনি শেষ সীমাটিকেও আরো পঞ্চাশ বছর প্রসারিত করে বস্তুত দুশো বছরের বেশি সময় জুড়ে পটভূমি ও পরিণামসহ রেনেসাঁসকালের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই পর্ববিভাজন তাঁর ভাষাতেই বুঝে নেওয়া যেতে পারে—

> 'বাঙালি সমাজের আধুনিকতার পথে বিবর্তনে বাঙালির সৃষ্টি প্রয়াস, তার শতাধিক বৎসরের ভাবনা ও সাধনাকে আমরা কয়েকটা কালানুক্রমিক পর্বে অনুসরণ করতে চাই—বিশেষ করে তার সাহিত্যসৃষ্টির তাৎপর্য অনুধাবন করা হবে আমাদের উদ্দেশ্য। সামগ্রিকভাবে আধুনিককালের পর্বগুলি (অন্যত্রও) আমি এই ভাবেই গ্রহণ করেছি—
>
> ১ আদি পর্ব ঃ গোড়াপত্তন (আনুমানিক ১৭৬৫ খ্রীঃ—১৮০০ খ্রীঃ)।
>
> ২. প্রস্তুতি পর্ব ঃ (আ. ১৮০০—১৮৫৭ খ্রীঃ)।
>
> ৩. প্রকাশ পর্ব ঃ ক. প্রথমার্ধ (আ. ১৮৫৭ খ্রীঃ—১৮৯৪ খ্রীঃ)।
> খ দ্বিতীয় পর্ব (আ. ১৮৯৪ খ্রীঃ—১৯২০ খ্রীঃ)।
>
> ৪ দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি ঃ (১৯২৬ খ্রীঃ—১৯৪৭ খ্রীঃ)।
>
> ৫. বিপর্যয়ের মাশুল ঃ (১৯৪৭ খ্রীঃ—১৯৭১ খ্রীঃ)।
>
> অবশ্য আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের অর্ধাংশ একশত বৎসর (১৮১৭—১৯২০/২১)। আর প্রথম আলোচ্য প্রস্তুতিপর্ব ও প্রস্তুতির গোড়ার কথা—এক নিঃশ্বাসে ১৭৬৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত কাল।',

এই ধরনের পর্ববিভাজন প্রায়শ যান্ত্রিক হয়ে ওঠার আশংকা থাকে, বিশেষ পর্বগুলির নামকরণেও তাৎক্ষণিক আকস্মিক ব্যক্তিগত ঝোঁক লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রেও হয়তো পাঠকের মনে হতেই পারে, ১৯২০-১৯৪৭ পর্বটিকে 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি' নামে চিহ্নিত করা যথোচিত হয়েছে কী না! ১৯৪৩-১৯৪৭ কালপর্বের বছরগুলিতে 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি'র অভিঘাত লক্ষণীয় বটে কিন্তু ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সম্পূর্ণ কালপর্বটিকে এইভাবে চিহ্নিত করলে সময়ের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এ কালের পাঠকের কাছে সত্যিই পেঁাছোয় কি ?

মনে রাখতে হবে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগেই তাসখন্দে ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়ে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে তার কেন্দ্র সাময়িকভাবে মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়। 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর সঙ্গে পার্টির সংযুক্তিকরণের সপক্ষে তখন থেকেই প্রবাসী বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—'কমুনিস্ট পার্টি তো ১৯২০ সাল থেকেই গান্ধীকে লেনিনের ভূমিকায় দেখতে চাইছেন।'

সুতরাং অধ্যাপক সরকার ও অধ্যাপক হালদার দু জনেরই পর্ব-বিভাজনে

১৯১৯ অথবা ১৯২০–১৯২১ যথাক্রমে একটি পর্বের অবসান অথবা অন্য নতুন একটি পর্বের সূচনা অথবা এককথায় পর্বান্তর রূপে চিহ্নিত হতেই পারে। সরকার ১৯১৯-এর সীমারেখা প্রসঙ্গে লিখেছেন, আসন্ন অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধী-নেতৃত্ব। হালদার '১৯২০-২১' সীমারেখারূপে চিহ্নিত করেছেন। কখনো-বা শুধু ১৯২০-কেই। এ থেকে তাঁর দ্বিধাজড়িত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। হালদার যখন শুধু ১৯২০ লিখছেন, তখন কি তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তনের সময়কে ধরতে চাইছেন? মনে হয় না। তিনি পর্ব-বিভাজনেও পুরোপুরি অধ্যাপক সরকারের সমীপবর্তী। তিনি নিশ্চয়ই ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসকে একটি সীমায় রাখতে চাইছেন। সরকার সরাসরি ১৯১৯ পর্যন্ত এসে রেনেসাঁস তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন থেকে সমাসন্ন অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধী নেতৃত্বের প্রাক্-প্রতিষ্ঠা লগ্ন পর্যন্ত তাঁর পঞ্চম পর্বটি প্রসারিত। হালদার অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীনেতৃত্বের সূচনাকে তাঁর পরিকল্পিত চতুর্থ পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'উনিশ শো একুশ-এ নতুন সংগঠন, নেতা ও কর্মপন্থা নিয়ে শুরু হলো ব্রিটিশ-বিরোধী প্রথম গণ আন্দোলন। ...বোম্বাইতে এ আই সি সি অধিবেশন ২৮ থেকে ৩০ জুলাই বিদেশীবস্ত্র বর্জনের ডাক দেয় ও স্বদেশী কর্মসূচী সমাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে আইন অমান্য পিছিয়ে দেয়। ...কলকাতার ওয়ার্কিং কমিটি (৫ অক্টোবর ১৯২১) প্রাদেশিক কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের নির্দেশ দেয়। সামরিক ও অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের চাকুরি ছেড়ে দেবার অনুরোধও জানানো হলো। দিল্লির ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই সি সি (৪-৫ নভেম্বর ১৯২১) প্রতি প্রদেশকে খাজনা বন্ধসমেত আইন অমান্য শুরু করার অনুমতি দেয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি, অন্তত অঞ্চলের অধিকাংশদের স্বদেশী গ্রহণ সাপেক্ষে। গান্ধী নিজেই বারদৌলিতে আইন অমান্য পরিচালনা করবেন স্থির হয়।' (পৃ/ ১০৩)

বস্তুত, অধ্যাপক হালদার ও তাঁর চতুর্থ পর্বটিকে 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি (১৯২০ খ্রী–১৯৪৭ খ্রী) নামে ঊনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের পরিণামপর্ব রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দুদিনের কালসীমা নির্বাচনে তাঁর মানদণ্ড কী? 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি' নামেও বা তা চিহ্নিত হবে কেন? ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৩) লিখেছেন. কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০) থেকে মাউণ্টব্যাটেনের আগমন (১৯৪৭)

পর্যন্ত নানা উত্থান পতনের মধ্য্য দিয়ে গান্ধীই কংগ্রেসকে ভেতর বা বাইরে নেতৃত্ব দেন।'—ত্রিপাঠী লিখছেন 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫–১৯৪৭)' গ্রন্থে। তাঁর কাছে তাঁর বিষয়বস্তুর উপরোধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীর সর্বাত্মক নেতৃত্বের দিক থেকে ১৯২০–১৯৪৭ কালপর্যায় যে সর্বাগ্রগণ্যতা দাবি করতে পারে, বঙ্গীয় ও ভারতীয় রেনেসাঁসের দিক থেকে ১৯২০–১৯৪৭ কালপর্যায়কে সেই একমুখীনতায় ও একমাত্রিকতায় যেমন দেখা যায় না, তেমনি সমগ্র কালপরিধিকে 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি' নামে চিহ্নিত করাও বোধহয় সঙ্গত নয়।

যদি ধরেও নিই, কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০) এবং গান্ধীনেতৃত্বের সূচনাই হালদারের বিবেচনায় রেনেসাঁসের পরিণামে ভিন্নতর এক পর্ব বা পর্বান্তর আর ফলত তা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদচিহ্ন, তা হলেও তিনি ১৯২০ ছাড়াও ১৯২১ সালের উল্লেখ করেন কেন? ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও প্রত্যক্ষত গান্ধীনেতৃত্বের প্রতিষ্ঠাকেও যদি তিনি ধরতে চান, তা-হলেও তো ১৯২০–২১ দুটি বছরকেই সর্বত্র উল্লেখ করতে হয়। কোথাও ১৯২০ এবং কোথাও-কোথাও ১৯২০–২১ ব্যবহারের মধ্যে দ্বিধা-মনস্কতা থেকে যায় না কি? এবং ১৯২০–২১ যদি হয়, তা-হলে ১৯২০-২১থেকে ১৯৪৭ কালপর্যায় কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তথা গান্ধীনেতৃত্বের বিবিধ অবিমৃষ্যকারিতার, পিছু টানের, পিছু হটার, ধনিক-বণিক, জমিদার-অভিজাততন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার অপচেষ্টাজনিত আন্দোলনের পর্ব বলেই হালদার 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি'-রূপে এই পর্বটিকে চিহ্নিত করতে চাইছেন? কিন্তু ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কালপর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকাও গান্ধীনেতৃত্ব ছাড়াও গুরুত্বে ও তাৎপর্যে ন্যূন নয়, বরং লক্ষণীয় ঘটনাবলী ও ব্যক্তিত্ব সুপ্রচুর। হালদার লিখেছেন, উনিশের শতকের বঙ্গীয় জাগরণ '১৯২০–২১এ খাত বদলায়—ভারতব্যাপী জাগরণের মধ্যে মিশে যেতে থাকে'। বস্তুত, এই কারণেই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃত্বকে, যে নেতৃত্ব ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অবিসংবাদিত, তার ভূমিকাকে 'একান্ত' করে দেখেছেন। এ-ও স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকাকে তিনি 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি'-পূর্ণ রূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর নেতৃত্ব ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে হালদারের মূল্যায়নের সঙ্গে অগণিত মানুষই সহমত পোষণ করতে পারেন,

এবং সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমি মনে রাখলে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জনসাধারণের সাড়া ও সংযোগের প্রশ্নে গান্ধীর মাহাত্ম্য, পাশাপাশি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও আত্মত্যাগকে নিয়ে অপব্যবহার. পরিণামে দাঙ্গা-দেশ ভাগ খণ্ডিত স্বাধীনতা ঃ এ সব মনে করলে 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি'-র ক্রুদ্ধ অভিযোগও প্রায়-স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। হালদারের মরমী ভাষ্য ঃ '১৯৪৭-এ স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগে তার প্রবাহচ্ছেদ—একই কালে তাই তার জয় ও পরাজয়'।

১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭-এর যে কালপর্ব, তাকে কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বদানে গান্ধীর দ্বিধা-পিছুটান-ব্যর্থতাকে নিশ্চিত পরাজয়ই বলতে হবে, কিন্তু সেই পরাজয় কার? দেশের জনসাধারণের নয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং গান্ধীনেতৃত্বের হতে পারে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃত্বে আস্থা রেখেছিলেন দেশের মানুষ। সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করা হল। জনসাধারণের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, চরম দুঃখ ও শহীদের মৃত্যুবরণের বিনিময়ে তাদের দেওয়া হল দাঙ্গা ও সমস্ত অর্থেই খণ্ডিত স্বাধীনতা। গান্ধীনেতৃত্বের পরাজয় কথাটাও জোরের সঙ্গে বলা যাবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, স্বদেশের বুর্জোয়ারা গান্ধীনেতৃত্বকে যেভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, সেইভাবেই গান্ধী তাঁর নেতৃত্বের অসামান্য শক্তিকে 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত' হতে দিয়েছেন, দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের চূড়ান্ত সংগ্রামী মানসিকতা ও ব্যবহারিক উদ্যোগকে বারংবার ব্যাহত করে দিয়েছেন, লক্ষ্যকে বর্জন করে উপলক্ষ নিয়ে প্রমত্ত করেছেন জনসাধারণের প্রাপ্ত আবেগ ও কর্মশক্তিকে.'ঈশ্বর'—'আধ্যাত্মিকতা'কে রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত করে তুলেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত জয় শুধুই সাম্রাজ্যবাদীদের, দেশী-বিদেশী বুর্জোয়াদের, এককথায় শোষকশ্রেণীগুলির—ভারতীয় জনসাধারণের মুক্তি সম্ভব ছিল যাদের সর্বাধিক পরাজয়ে। কিন্তু তবু, ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ সমগ্র কালপর্যায়টিকে, রেনেসাঁসের দৃষ্টিতে শুধুই গান্ধী বা তাঁর দলের কৃতি-অকৃতি দিয়ে বিচার্য হতে পারে না। এমনকি শুধুই ভারতীয় পটভূমিকাতেও বিচার্য হতে পারে না। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে বঙ্গীয় ও ভারতীয় রেনেসাঁসের বা জাগরণের কোনো পর্বেরই বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

বস্তুত, এক-একটা সময় আসে, যখন মানব-অভিজ্ঞতার চেতনার চৌহদ্দি (যা স্বভাবতই খুবই সীমিত এবং পর্ব থেকে পর্বান্তরে সামান্যই পরিবর্তিত হয়) হঠাৎই প্রসারিত হয়ে যায় এবং মানুষের সত্তা সেই নতুন দিগন্তকে জরিপ করতে অধিগত

ও আত্মস্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ্ব-ইতিহাসের এইগুলিই হলো স্মরনীয় ও মহান কালপর্ব। এ ধরনের ঘটনা অঙ্গুলিমেয়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশ্রুত গ্রন্থে বিশিষ্ট সমালোচক জি এইচ মেয়ার 'দ্য রিনাইসেন্স' প্রসঙ্গে আলোচনায় এই ধরনের সুবর্ণযুগ হিসাবে এথেন্সে পেরিক্লিসের যুগ, য়ুরোপ যে-যুগে' আত্মিক ও শৈল্পিক উৎকণ্ঠায় অন্ধকার যেকে মধ্যযুগের অভিযাত্রী সেই স্বল্প-ব্যাখ্যাত যুগ, রেনেসাঁস ও ফরাসী-বিপ্লবের যুগের উল্লেখ করছেন—

> The Renaissance was, and was the result of, a numerous and various series of events which followed and accompanied one another from the fourteenth to the beginning of the sixteenth centuries. First and most immediate in its influence on art and literature and thought, was the rediscovery of the ancient literatures.

স্বভাবতই তাই, ওই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীনেতৃত্বকেই রেনেসাঁসের একটি পর্বেরও (১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭) একমাত্র গণনীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত করা যায় না। ১৯২০-২১ বলতেই দু'-তিন বছর আগেই সদ্যসমাপ্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা ও বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব অক্টোবর (নভেম্বর বিপ্লব), ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন, কলকাতা কংগ্রেস, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন-এ গান্ধীনেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক ঘটনাই মনে পড়বে। ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে হিটলারের উত্থান, বিকাশ ও অবলুপ্তি যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অগণিত ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের উন্মোচিত যেমন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান, পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রভৃতিও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। দাঙ্গা-দেশভাগ তো আছেই।

১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বহু ঘটনাই গুরুত্বে ও তাৎপর্যে আদৌ ন্যূন ও উপেক্ষনীয় নয়। এই 'numerous and various series of events' এবং তার ফলাফল নিয়েই আলোচ্য কালপর্বের চেহারা ও চরিত্র।

বস্তুত, প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অথবা হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ (যখন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র গেল পরিবর্তিত হয়ে) পর্যন্ত হতে পারে একটি

পর্ব-পরিকল্পনা। কেননা, ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪৭ কালপর্বে অসংখ্য ঘটনার, পরস্পরবিরোধীও অনেক, সমাহার। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিচারেও এই কালপর্বের লক্ষণীয় চরিত্র গান্ধীই নয়, নেতাজী সুভাষও। এই কালপর্বে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগের পাশাপাশি নেতাজীসহ বামপন্থীদের ভূমিকাও প্রণিধানযোগ্য। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ থেকে অগণিত বৈপ্লবিক ও সহিংস আন্দোলন-প্রচেষ্টাও এই কালপর্বের চরিত্রদ্যোতক। তাই শুধু গান্ধীনেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনই এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের একমাত্র বা প্রধানতম ঘটনাও হতে পারে না।

যে-কালপর্বটির নামকরণ নিয়ে এত বিতর্ক, কিছু কম বেশি সেই 'একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহ' কি কোনোভাবেই ইতালি তথা ইউরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হালদারের উত্তরগর্ভ প্রশ্নটি সর্বাগ্রে উপস্থাপনার যোগ্য—

> কেমন করে পরাধীন জাতির মধ্যে আসবে সেই ইতালি বা ইউরোপ-ভূমির রিনাইসেন্স, আসবে ইউরোপের ১৪ শ-১৬ শ শতাব্দীর জিনিস ভারতবর্ষের ১৯ শ শতাব্দীতে?

বস্তুত, উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা শুধুই ইউরোপের ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর রিনাইসেন্সের ফলটুকু মাত্র পেতে পারি না। যদি শুধু সেইটুকুই পেতাম, তা-হলে সেই প্রাপ্তি আমাদের পক্ষে, সময়ের বিচারে তেমন মহার্ঘ্য বিবেচিত হতো না। হালদার খুব স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে ইউরোপের পঞ্চদশ, এমন-কী ষোড়শ শতাব্দীর ধ্যানধারণার উত্তরাধিকার নিয়ে পড়ে থাকলে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হতো না।

সময়ের দান পুরোপুরি পেয়েছিলাম আমরা। ইউরোপের রেনেসাঁসের পাশাপাশি আমরা ইংরেজাদর মাধ্যমে আধুনিক জীবনের তথা Modern Age'-এর স্পর্শ" পেয়েছিলাম গত শতাব্দীতেই। "সেই 'মডার্ণ এজ'-এর মধ্যে ইউরোপের রিনাইসেন্স রিফর্মেশন ও ফরাসি বিপ্লবের সম্পদ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মডার্ন এজ তখনকার মতো ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।"

'আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির রিনাইসেন্স তাই মানব-ইতিহাসের আধুনিকতম সম্পদসমূহ গ্রহণেরই প্রয়াস। এ শুধু সুকুমার শিল্পের ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিকাশ নয়। মডার্ণ এজ বা 'আধুনিকতার' অর্থ ফিউডাল সভ্যতা থেকে

অন্তত বুর্জোয়া সভ্যতায় প্রবেশ এবং মধ্যযুগের সমাজের রূপান্তর—ভাবী সভ্যতার দিকে যাত্রা।’

১৪শ-১৬শ শতাব্দীর ইতালীয় বা যে-কোনো দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক রেনেসাঁস উপরতলার মানুষের উদ্যোগে ও সক্রিয় ভূমিকাতেই উজ্জীবিত ও পরিচালিত হওয়া সম্ভব, সে সব দেশে তাই হয়েছিল—এই অভিমত ব্যক্ত করে হালদার আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মডার্ণ এজ বা আধুনিক জীবনের উদ্ভব ও উজ্জীবনের স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যটি ও সমস্যার দিকটাই তুলে ধরেছেন। মডার্ণ এজ বা আধুনিক জীবন উদ্ভূত হতে পারে উদ্যোগী মধ্যবিত্তের হাতে, যুগ-উদ্বোধনের দায়িত্ব অনেক সময়েই থাকে তাদেরই হাতে ‘কিন্তু মডার্ণ এজ-এর প্রাণশক্তি দেশের জনসাধারণ। এই আধুনিক যুগের প্রকাশ শুধু শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে নয়; কিভাবে, বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসায় পর পর বাস্তব উদ্যোগে, বিশেষ করে শিল্পে বাণিজ্যে, তেমনি আবিষ্কার ও জীবনযাত্রার প্রয়োগ বিজ্ঞানের সৌকর্যে।’

ঊনিশের শতকে আমাদের সামনে সেই রকম পরিস্থিতি এসেছিল একটি চ্যালেঞ্জের মতো। বাঙালি মধ্যবিত্তই তার বাহন হয়েছিল। অধ্যাপক হালদারের সতর্ক ভাষা ও বিশ্লেষণে—বাঙালি মধ্যবিত্তও সমগ্র ভাবে নয়—

> ···তারও একটি অংশ. প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক। ১৮১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙলার, তথা ভারতের ইতিহাস সেই ভদ্রলোকদেরই কীর্তি-অকীর্তির ইতিহাস। জাগরণ ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য পেল না। সমাজের আভ্যন্তরীণ দৈন্য ও মধ্যবিত্তের আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা প্রবল ছিল।

স্বভাতই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে অনেক জটিল কুটিল স্রোত ও অন্তঃস্রোত ছিল। তাই সেই নবজাগরণ সর্বদা জয়ের মুখে দেখেনি। অধ্যাপক হালদারের সাহিত্য গুণান্বিত বিশ্লেষণে—‘শেষ অবধি দেখতে পাই তার পদে পদে জয়-পরাজয়, জয়ে পরাজয় আর পরাজয়েও জয়—বিশুদ্ধ জয় নয় বা বিশুদ্ধ পরাজয় নয়।’

তবু, অধ্যাপক গোপাল হালদারের দৃষ্টিতে ও বিচারে—

> এই নবজাগরণ ভারতেতিহাসের এক অভূতপূর্ব মহোৎসব, এই কথাটিও দৃঢ় কণ্ঠেই জানাতে চাই। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে এই বঙ্গভূমিতে যে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়,

> সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন পরম উজ্বল প্রতিভার দীপান্বিতা আর কখনো আসে নি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ও বাঙালির জাগরণ আক্ষরিক অর্থে ইতালির রেনেসাঁস হওয়ার কথাই ছিল, অথবা ভাষান্তরে ইতালি তথা ইউরোপের কোন কার্বনকপি হলেও তা সময়ের পক্ষেও হতো নিতান্তই আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত বা 'fragmentary'। কেন না, উনবিংশ শতাব্দীতে পেঁাছে কেউ ১৪শ—১৬শ কালপর্যায়ের অর্জিত সাফল্যের পনুরাবৃত্তিতে মুগ্ধ অভিভূত হতে পারে না। অধ্যাপক হালদার বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্যূন তেরোটি পর্যায়ে মডার্ণ এজ-এর উদ্বোধন লক্ষ্য করেছেন—

১ ধর্মসংস্কারে, ২. সমাজসংস্কারে, ৩. শিক্ষাদীক্ষায়, ৪. নারীজাতির উন্নয়নে, ৫, লোক—সেবার আয়োজনে, ৬. সংস্কৃত চর্চায়, ৭, প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কারে, ৮. নব-বিজ্ঞানের গবেষণায়, ৯. সাহিত্যে, ১০ নাট্যকলায়, ১১, সঙ্গীতে, ১২. নৃত্যকলায় এবং ১৩. স্বাধীনতার আন্দোলনে।

অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের মাত্র একটি জাতির (বাঙালির) মধ্যে যত মনস্বীর যত কর্মীর, যত ভাবুকের, যত শিল্পী ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে, ভারতের ইতিহাসে—গুপ্তযুগে, আকবরের সময়ে, বৈষ্ণব আন্দোলনের বাঙলায়—কোনো যুগের কোনো আন্দোলনের সঙ্গে অধ্যাপক হালদার তার তুলনা খুজে পান নি। তাঁর ভাষায়—'এত দিকে এমন জাগরণ আর কবে দেখা গিয়েছিল ভারতবর্ষে ?

এই বহুমুখী প্রকাশ নিয়েই বাঙলার জাগরণ।

'পরাজয়ই তার শেষ কথা কেন মনে করবো ?—'এই উত্তরগর্ভ প্রশ্ন উপস্থাপনেই অধ্যাপক হালদারের বক্তব্য শেষ হয় নি। কেননা, হালদারের এই প্রবন্ধ রচনাকালে রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-এর আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয় হয়েছে। বাঙলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্যে অধ্যাপক হালদার ১৯৪৭-এর বিভেদবিভাগজনিত পরাজয়ের পরিণামে এক অসামান্য শাশ্বত জয়ের সংকেত পাঠ করেছিলেন। তাঁর 'রেনেসাঁস' বা 'জাগরণ' সমীক্ষায় ১৯৭১ সালের নির্ণয় ছিল—

> আজকে ১৯৭১-এর প্রান্তে পেঁাছে, ১৮১৭ থেকে ১৯২০-২১ অথবা ১৯৪৭ পর্যন্ত কালে এই মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের গতিপ্রকৃতি বুঝবার প্রয়োজন নতুন করে উপস্থিত হয়েছে। এ আশ্চর্য কালকে আরও একটু নতুন ভাবে বিচার করা দরকার—তার তাৎপর্যও নতুন করে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ' নামাঙ্কিত সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে আলোচনাকালে অধ্যাপক সুশোভন সরকার একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ বা রেনেসাঁসের প্রণিধানযোগ্য পার্থক্য আছে।

ইতালির তথা ইউরোপের রেনেসাঁস মনের যে মুক্তি ঘটিয়েছিল, তা ছিল যুগান্তকারী বহুমুখী জাগরণের একটি মাত্র দিক, অন্যান্য প্রাপ্তির তালিকায় ছিল—ইউরোপের বিশ্বাবিষ্কার, ধর্ম-ভাবনায় গভীর বিপ্লব, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, সংঘবদ্ধ রাজ্য, পুরোনো সমাজব্যবস্থায় ভাঙনের সূত্রপাত, শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিতে পুনর্গঠন।

অধ্যাপক সরকারের বক্তব্য, আমাদের রেনেসাঁস সম্ভবত এমন সর্বাত্মক প্রাপ্তি অথবা সঞ্জীবনী শক্তির অভিভব দাবি করতে পারে না। ভারতে ব্রিটিশ শাসন ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের পথ প্রস্তুত করেছিল কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ ব্যবস্থার পরিবর্তে কোনো নতুন সমাজ নির্মাণের সদিচ্ছা বা সামর্থ্য কোনোটাই তার ছিল না। আমাদের হতোদ্যম, উদাসীন দেশবাসীও কোনো তুলনীয় উদ্যোগ ও সংকল্প ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে নি।

দ্বিতীয় পার্থক্যটি প্রসঙ্গে সরকার ও হালদার দু'জনেই স্বভাবতই সোচ্চার। তা হলো, সংক্ষেপত, আমাদের রেনেসাঁস কলোনির রেনেসাঁস! পশ্চিম ইউরোপের মুক্ত ও স্বাধীন রাজ্যগুলিতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের স্ফূর্তি, ইতালি স্বাধীনতা হারিয়েছিল আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্যায়ে। পক্ষান্তরে, আমাদের 'জাগরণ' বিদেশী ও আধা-ঔপনিবেশিক রাজত্বের শৃঙ্খলিত পরিসরে, সে-জাগরণে স্বাধীন বিকাশের অবসর চূড়ান্তভাবেই সীমিত। পরাধীন, পদানত জাতির মানসিক মুক্তি ও জাগরণ বিজয়ী বিদেশী শক্তির আধিপত্যে ব্যাহত হতে বাধ্য।

অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হলো ঃ য়ুরোপীয় রেনেসাঁস তার পুষ্টি ও প্রাণরস সংগ্রহ করেছিল প্রাচীন য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার থেকে। ফলত, প্রাচীন গ্রীক চিন্তা ও মনন, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নতুন মানবতাবাদী কেন্দ্রগুলিকে প্রাণিত করেছিল, পুষ্ট করেছিল, ধ্রুপদী ঐতিহ্য আধুনিক উৎকণ্ঠা ও আকৃতিকে পরিতুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতি একালের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের

পক্ষে ততটাই যোগ্য ছিল কী-না, তা নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক। যদি এই প্রশ্নটি না-ও উত্থাপন করা যায়, তবু এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, বাংলার রেনেসাঁস তার মূল প্রণোদনা লাভ করেছিল আগন্তুক আধুনিক পাশ্চাত্য থেকে, প্রাচীন ভারত তার উৎস ছিল না! অথচ, সেই একই পাশ্চাত্য শক্তিদম্ভ সেই একই সময়ে আমাদের দেশটাকে নিঃসহায় দাসত্বে অবরুদ্ধ রাখায় জাগরণের যুগ আবর্তজটিল হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতির চাপে, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনায় বাংলার রেনেসাঁস স্বভাবতই তাই খণ্ড-বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ও কতকাংশে কৃত্রিম মাত্রাযুক্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

মহান য়ুরোপীয় রেনেসাঁসও, আধুনিক সমালোচকের বিচারে বিচ্যুতিবিহীন নয়। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের যাবতীয় অর্জন বা ইতিবাচক কীর্তিরও বিচিত্র সীমাবদ্ধতা ছিল। বিলুপ্ত অতীতের অন্ধ অনুবৃত্তি, ধ্রুপদী নয় এমন চিন্তন ও মনন এবং মধ্যযুগীয় অভিজ্ঞতাসমূহের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব এবং সুসংস্কৃত 'এলিট' ও নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ ঃ এ সবই তো ছিল নিশ্চিতরূপেই প্রকৃত দুর্বলতা। তা ছাড়া, যে-কোনো সাংস্কৃতিক জাগরণের মূল্য অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালপ্রসূত পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রেই বিচার্য। ভেবে দেখা উচিত, বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধিক ও সামাজিক জীবনের 'মান' যা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস সম্পর্কে নিশ্চয়ই উপেক্ষা বা অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করা নিতান্তই অসম্ভব। বস্তুত, আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল অবক্ষয়ের কাল, ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির যুগ। তুলনায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস তো অধ্যাপক গোপাল হালদারের ভাষায়—'অভূত-পূর্ব মহোৎসব' অথবা 'পরম উজ্জ্বল প্রতিভার দীপান্বিতা'।

অধ্যাপক গোপাল হালদারের সমগ্র রচনাবলীর মর্মবস্তু, এককথায়, আদ্যন্ত 'জাগরণ'—এই নিবন্ধের সূচনায় দাবি করেছি। 'দীপান্বিতা' শব্দটির প্রয়োগ দেখা গেল ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রস্তাবনা'য়। এই শব্দের টানেই সচেতন পাঠক অনায়াসে পৌঁছে যাবেন 'আর একদিন'-এর উপসংহারে, অন্তত পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে—

> ···কত কত জেল পার হইয়া ছুটিয়াছে—কত বিরোধ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া মানবমুক্তির তীর্থসঙ্গমে—কত 'ছোটো আমি' চূর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে

> কত 'বড়ো আমি'র দাবি—কত সত্তার খণ্ডতাকে মিলাইয়া দিতে সত্তার সম্পূর্ণতার দীপান্বিতায়।

'আর একদিন' 'ত্রিদিবা'র তৃতীয় পর্ব। 'আর একদিন' প্রথম সংস্করণের 'লেখকের কথা' রচনার তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫১, 'লেখকের কথা'য় আছে, 'লেখা শেষ হয়েছিল ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসে, পাটনায়।'—প্রথম পর্ব 'একদা'-র প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৩৯। কিন্তু ভূমিকায় আছে, 'গ্রন্থখানা লেখা হইয়াছিল রোগশয্যায় প্রেসিডেন্সি জেলে, ১৯৩০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হইতে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ 'একদা'-র রচনারম্ভ থেকে শুরু করে 'অন্যদিন' হয়ে 'আর একদিন'-এর রচনা সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র কালপর্বটি প্রসারিত বস্তুত কুড়ি বৎসর ব্যাপী।

গোপাল হালদারের সমগ্র রচনাকর্ম বিশ্লেষণের অবসর এখানে নেই। তাঁর প্রবণতা বহুমুখী। তবু, এখানে তাঁর 'ত্রিদিবা'-র উল্লেখ ও নিতান্ত আংশিক ব্যবহার নিতান্তই দৃষ্টান্তমূলক। বস্তুত, গোপাল হালদার প্রবন্ধই লিখুন বা রম্যরচনা অথবা উপন্যাস ঃ সর্বত্রই তিনি বাংলার তথা ভারতের 'জাগরণ' তথা রেনেসাঁস নিয়েই কার্যত আদ্যন্ত ভাবিত। রেনেসাঁসের উৎস, রেনেসাঁসের বিকাশ, রেনেসাঁসের বিচ্যুতি, রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা ও ফলশ্রুতি ঃ এই নিয়েই তাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা সদাজাগ্রত, সতত তৎপর। খুবই লক্ষণীয় যে, পাঁচ পর্বে বিভক্ত তাঁর রেনেসাঁস প্রসঙ্গ আদিপর্ব থেকে বিপর্যয়ের মাশুল পর্যন্ত, সে-পর্ব বিভাজন আমরা উদ্ধৃত করেছি। পরিকল্পিত ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ ছাড়িয়ে 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি' নামে চতুর্থ পর্বে ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রসারিত এবং পরিশেষে পুনরায় 'বিপর্যয়ের মাশুল' নামাঙ্কিত হয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ (?) পর্যন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন সহ পরিবর্ধিত। অর্থাৎ, তাঁর সমস্ত মননকল্পনার কাজই রেনেসাঁস কেন্দ্রিক। রেনেসাঁসের মানদণ্ড দিয়েই তিনি সমস্ত, গতি, প্রগতি, পিছুটান, সীমাবদ্ধতা জয় বা পরাজয়ের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। এই দিক থেকে ভেবে দেখলে, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত 'ত্রিদিবার' সমগ্র রচনাকাল লেখক-চিহ্নিত অন্যতম রেনেসাঁস-পর্বরূপে স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

'আর একদিন'-এর উপসংহারের কয়েকটি নির্বাচিত অংশ থেকে গোপাল হালদারের রেনেসাঁস-ভাবনার স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য দুই-ই চিনে নেওয়া যেতে পারে—

১. উঠিয়া পড়ো অমিত, চলো চলো এখনকার মতো এই তোমার ইতিহাসের পথ, জীবনের পথ, মানবতীর্থের পথ—জ্ঞানে কর্মে প্রেমে।...

উপনিষদের 'চরৈবেতি' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে-'র মর্মবস্তু যে-গতিশীলতা, সেই গতিশীল জীবনদর্শনের উৎস যেমন ভারতীয় দর্শনচিন্তায়, স্বাদেশিক ঐতিহ্যে, তেমনি তার আধুনিক কালোচিত পুর্ণায়ত রূপটি গোপাল হালদার এবং তাঁর নায়ক অমিতের জন্য অপেক্ষা করে থাবে 'ইন্টারন্যাশনালে'।

২. উঠিয়া আসিতেছে সকলে। গান ধরিয়াছে বন্ধুরা। ইঞ্জিন স্টার্ট লইতেছে। সমবেত কণ্ঠে সবল ধ্বনির মধ্যে তাহা শোনা যায় না—'ইন্টারন্যাশনাল মিলাবে মানব-জাত'—সকল মানুষ, সকল মানুষের সঙ্গে মিলিবে।'

জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, মানুষে-মানুষে যে-মিলন, যে-মিলন-মহোৎসবে কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী 'সবারে করি আহ্বান,' সেই মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন গোপাল হালদার তাঁর নায়ক অমিতের জবানীতে, 'সকল যাত্রীর সকল পথ কোথায় মিলিতে চলিয়াছে আজ' ?

৩. শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মজীবীর পথ; কবিতার পথ বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ, জীবনের পথ, সৃষ্টির পথ।

মহামানব আসিতেছে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়া মানবমুক্তির দিকে, ভালোবাসার রাজ্যে—অগণিত মানুষের সম্মিলিত তীর্থযাত্রা—'বড়ো আমির' তপস্যা—অল রোড্স লীড্ টু কমিউনিজম্—টু হিউম্যানিজম্।

এই পথেই, এই লক্ষ্যেই ভাবিত ও অগ্রসর গোপাল হালদার ও তাঁর রেনেসাঁস-ভাবনা, তাঁর রেনেসাঁস দর্শন, তাঁর সমগ্র কর্মকাণ্ড ঃ জীবন ও সাহিত্য।

শুধু 'ত্রিদিবার' অমিত নয়, অমিতের স্রষ্টাও বাংলার রেনেসাঁসের পুণ্যোদকে স্নাত, লালিত ও বর্ধিত। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রসারিত রেনেসাঁসের দীপান্বিতায় উদ্ভাসিত গোপাল হালদার তাই 'কমিউনিজ্ম ঃ হিউম্যানিজ্ম'-এর পরিণামী লক্ষ্য-ঘোষণার মুহূর্তেও অগণিত মানুষের সম্মিলিত তীর্থযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের "বড়ো-আমি"র তপস্যা'-কে অঙ্গাঙ্গি করে নিতে পারেন সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততায়, পারেন 'ঐ মহামানব আসে'র অনুষঙ্গকে প্রসঙ্গের অপরিহার্য উপাদানে উন্নীত করে নিতে।

বস্তুত, বঙ্গের শতাধিক বৎসরের যে-উজ্জীবিত জীবনপ্রবাহকে রেনেসাঁস বা

'জাগরণ নামে চিহ্নিত করেছেন অধ্যাপক হালদার, সেই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে তাঁর অন্যতম মুখ্য বিচার্য হয়েছে বাঙালি সমাজের আধুনিকতার পথে বিবর্তনে বাঙালির সৃষ্টি প্রয়াস, বিশেষত তার সাহিত্য সৃষ্টির তাৎপর্য-অনুধাবন। 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ'-এর পরিপ্রেক্ষিকায় বাংলার রেনেসাঁসের সাহিত্যের চরিত্র ও মর্জি বিশ্লেষণকালে লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশ এবং পরিণামী লক্ষ্যরূপে গণ-সাহিত্যের ঠিকানায় তাঁর অন্তিম ব্যাকুল করাঘাত অনুপুঙ্খ প্রণিধান-যোগ্যতা দাবি করে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অসঙ্গতিতে তিনি আহত হয়েছে কিন্তু যথার্থ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বলেই বিস্মিত হন নি, কেন না, সেই অসঙ্গতির কারণ তাঁর অজানা ছিল না—

> বাংলা দেশের ইংরেজ আমলের 'শিষ্টসাহিত্যের' দিকে তাকালে দেখব, লোকসাহিত্যের তুলনায় তা বড়ো কৃত্রিম। তার মূল দেশের মাটির মধ্যে ভালো করে প্রোথিত হয় নি এবং মাটির মানুষের কথাও সে সাহিত্যে স্পষ্ট হয় নি।
>
> অবশ্য তার একটা কারণ,সে সাহিত্য সেই বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের সৃষ্টি, যাদের বলা যায় 'কলোনির কেরানি,' জমিদারী প্রথার মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা সরকারী চাকুরে বা কেরানিরই সগোত্র উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার প্রভৃতি বৃত্তিজীবী।
>
> আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি ইং ১৮০০ থেকে আরম্ভ হয়, ইং ১৮৫৯-৬০-এ তার উদ্বোধন, আর রবীন্দ্রসাহিত্যে তার পরিণতি দেখি।

আধুনিক বাংলা সংস্কৃতিও, তাঁর মতে—

> সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরই সৃষ্টি এবং মোটের উপর তা জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহন। সে হিসাবে এর জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বলে পরিচিত হবার দাবি মিথ্যা নয়। তা সত্ত্বেও যা আমাদের ভুলবার উপায় নেই,সে এই যে, এ ভদ্রলোক শ্রেণী আসলে কলোনির কেরানি'।···আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তাই সাধারণ মানুষ বরাবর নেপথ্যে থেকে গিয়েছে—জাতীয় সাহিত্য হলেও তা গণতান্ত্রিক জীবনের সাহিত্য হয় নি।

এর কারণও হালদার বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক বিচার বিশেষণের আলোকেই নির্দেশ করেছেন। লিখেছেন, 'ইংরেজি শিক্ষার প্রেক্ষিতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুটো যেন স্বতন্ত্র জাতি হয়ে পড়লো'। ফলে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য

ও সংস্কৃতি সমাজের বৃহত্তম অংশকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে যেতে চাওয়ায় 'না পেয়েছে ইংরেজি-অভ্যাস বশে বাংলার মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নবায়িত করতে, না পেরেছে বাংলার লোক সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে সম্ভব মতো আপনার প্রেরণা গ্রহণ করতে'।—করতে পারলে 'কলোনির কেরানি' দৌর্বল্য কাটিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনাকে পরিপুষ্ট করে আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি অশিক্ষিতের কাছে হিন্দু-মুসলমান চাষী ও দরিদ্র জনতার কাছে পৌঁছে যেতে! যদি তা হতো, উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হতো না।

এ পর্যন্ত সমস্তই যা ছিল, হয়েছে, তারই বিশ্লেষণ। খণ্ডিত, অপুষ্ট রেনেসাঁসের এই তো ফলশ্রুতি! এখানেই কি থেমে যেতে পারেন গোপাল হালদারের মতো মার্কসবাদী মনস্বী? এখন কী করণীয়? গণ-সাহিত্য. গণ-সংস্কৃতি চাই। কী ভাবে?

প্রথমত, তাঁর পরামর্শ, বাংলার নিজের ঐতিহ্যকে আরো গভীর ভাবে চিনে নিয়ে তা নবায়িত করা প্রয়োজন। আধুনিক সাহিত্য ও মননের পুনরাবৃত্তি কিন্তু নয়। উনবিংশ শতাব্দীর নবার্জিত ঐতিহ্যর অস্বীকৃতিও নয় নিশ্চয়ই। দ্বিতীয়ত, লোক সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি না-করে পুনঃসৃষ্টিও 'দুঃসাধ্য তপস্যা'। তাই 'কী ভাবে কাব্যের কোন দুয়ার খুলতে লোককাব্যের কোন চাবিটি প্রয়োগ করা যাবে, তা নিতান্তই প্রতিভার ব্যাপার অন্যের তা সাধ্য নয়। তৃতীয়ত, ঐতিহ্যের উদ্ধারই শুধু নয়, চাই নতুন জীবন দর্শনকে নিজস্ব পদ্ধতিতে রূপায়ণ। এ কাজে 'শেকসপীয়র গ্যেটে থেকে গ্রীক পুরাণ ও ভারতীয় পুরাণ' কিছুই অপাংক্তেয় নয়। 'তবে আমাদের মাটিতে কোন্‌টি কী মাত্রায় আসবে তা প্রতিভাবান স্রষ্টাই জানেন এবং তা নির্ভর করবে অনেকাংশে জনচিত্তের গ্রহণশক্তির উপরে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের স্থিতিস্থাপকতার উপরে। কিন্তু আসল কাজ এরূপ দেশীয় উর্বশী বা গ্রীক আর্টেমিসের প্রদর্শনী স্থাপন নয়। আসল কাজ, জীবনের কথাকে বাণীরূপ দান, মানুষের মুক্তিকে গড়ে তোলা, জীবনরূপকে ভাষার পাত্রে ধরা। আসল কাজ সৃষ্টি।'

আধুনিক কালের পর্ব বিভাজন কালে গোপাল হালদার চিহ্নিত 'দুর্যোগ ও দুর্বুদ্ধি' নিয়ে এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে যত বাক্যব্যয়ই করে থাকি, শেষ পর্যন্ত রেনেসাঁসের মনস্বী সমীক্ষক 'দ্বিতীয় রিনাইসেন্স' লক্ষ্য করেছেন সেই আধুনিক জীবন দর্শনে প্রাণিত ও পুষ্ট, বিশেষত চল্লিশের দশকের গণমুখী সাহিত্য ও

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, যে জীবন দর্শনের সঙ্গে আমাদের জনসমাজকে পরিচিত করার অক্ষমতাই রেনেসাঁসের উৎকৃষ্ট ফসলগুলি আহরণ ও বিকীর্ণ করার সবচেয়ে জরুরি কাজটিকে অদ্যাবধি ব্যাহত করেছে।

এ যুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের জন্য মনস্বী গোপাল হালদার ১৯৮৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের শেষ তিনটি পংক্তিতে তাই উচ্চারণে অটল ও প্রত্যয়নিষ্ঠ—

> ···প্রয়োজন ঃ জনসমাজকে এই নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়া। তার অর্থ ঃ একদিকে প্রয়োজন সর্বজনীন আধুনিক শিক্ষা, অন্যদিকে কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক সমাজগঠন নতুন জীবনবোধ তখন স্বাভাবিক হবে, সাহিত্যেও নতুন সৃষ্টি দেখা দেবে।

কোন্ সৃষ্টিশীল জীবন দর্শন, কোন্ গতিশীল জীবনাদর্শের কথা বলছেন 'ত্রিদিবা'র নায়ক অমিতের স্রষ্টা? এই উত্তরগর্ভ প্রশ্নের উপযুক্ত উপসংহার হতে পারে অমিতেরই উচ্চারণ—মানব মুক্তির দিক, ভালোবাসার রাজ্যে অগণিত মানুষের সম্মিলিত তীর্থযাত্রা—'বড়ো আমির তপস্যা—অল রোডস লীড টু কমিউনিজম্—টু হিউম্যানিজম্···।

প্রগতি-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার

ধনঞ্জয় দাশ

প্রগতি-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক গোপাল হালদার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই বিবেকানন্দের 'অভীঃমন্ত্র' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৈশোরেই গ্রহণ করেছিলেন স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে দীক্ষা। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনা আর নান্দনিক রসে স্নাত হয়ে নানা বঙ্কিমপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বিশ্বমানবের সত্যিকার মুক্তির পথ। শেষ পর্যন্ত 'কমিউনিজম'-ই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের দিশারী। এই কারণেই পরিণত বয়সে পৌঁছে তিনি ১৯৮৯ সালে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছিলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি আমার কাছে সার্বিক মুক্তির বহমান ঝর্না।' [দ্র. কালান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯]

আমি পূর্বোক্ত চারটি বাক্যে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের যে-সারাৎসার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, নিঃসন্দেহে তা গোষ্পদে সিন্ধুদর্শনের মতোই এক ব্যর্থ প্রয়াস। আমরা তো জানি, গোপাল হালদার ছিলেন এই শতাব্দীরই প্রায় সমবয়সী। বিগত সাতটি দশক ধরে যাঁদের প্রতিভার দানে বঙ্গসংস্কৃতির ভাণ্ডার নানা দিক থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, আমার মতে, গোপাল হালদার ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-পুরুষদেরই এক সার্থক উত্তরসাধক। আর, বিংশ শতাব্দীর তিরিশ

আর চল্লিশের দশকে অবিভক্ত বাঙলায় মার্কসবাদী মতাদর্শে পরিপুষ্ট যে-সাংস্কৃতিক আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা-কেন্দ্রিক নবজাগরণকে অতিক্রম করে মফঃস্বলের শহর-নগর-গ্রামে সত্যিকার গণমুখী অন্য এক নবজাগরণের সূচনা ঘটিয়েছিল, গোপাল হালদার ছিলেন তারও অন্যতম প্রধান নায়ক।

এই 'অন্য এক নবজাগরণের' সূচনা-পর্বের কথা আমার কোনো নতুন আবিষ্কার নয়। সেই নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ গোপাল হালদার স্বয়ং 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় একবার নয়, দুইবার এবং পুনর্মুদ্রণ ধরলে তিনবার, আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন ঐ কথাটি। গোপালদা চলার পথের প্রান্তসীমায় পেঁৗছে তাঁর জীবন 'পৃথিবীর ঘাটে-ঘাটে দিয়ে-দিয়ে আর নিয়ে-নিয়ে কী দিল আর কী পেল' অতি প্রশান্ত মনে তার হিসেব-নিকেশে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অনবদ্য ভাষায় আনন্দ আর বিষাদের সংমিশ্রণে রচিত 'মন বলে—আমি চলিলাম' নামক তাঁর সেই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৮৪ সালের শ্রাবণ—আশ্বিন সংখ্যা (ইংরেজি ১৯৭৭ সালের আগস্ট—অক্টোবর) 'পরিচয়' পত্রিকায়। ঐ নিবন্ধে তিনি যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা পর্যালোচনা করে আত্ম-সমালোচনার ভঙ্গিতে স্পষ্টভাবেই লিখেছিলেন ঃ

"সমস্ত ভালোমন্দ ভুলভ্রান্তি সুদ্ধ সেই সংগ্রামের রূপও আজ এখন আর অস্পষ্ট নেই। যা করতে চেয়েছি, করে উঠতে পারিনি—তারও আর পরিবর্তন নেই। যা করতে চেয়েছি—জানি সামান্যই তা হয়েছে, অনেক কিছুই তার হয়নি। যা পেয়েছি তা অসামান্য সৌভাগ্য—স্নেহে প্রেমে দাক্ষিণ্যে আনন্দে সংসারের সহজ সত্যে। সে সত্যের তুলনা কই ? প্রণাম, প্রণাম সেই প্রেমপ্রীতিতে অপরিমেয় মানুষদের। যা দিতে চেয়েছি জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকলের সঙ্গে দেওয়া নেওয়ায়, তাও অপরিমিত সত্য—তা মানুষের মুক্তি—দেশের মানুষের, পৃথিবীর মানুষের। এই স্বপ্নে আমাদের দেশকে এই যুগের বিশ্বজীবনের প্রবাহে আমরা এগিয়ে নিয়ে সংযুক্ত করতে চেয়েছি। কিন্তু আত্ম-অপচয়ের আবর্ত-মধ্যেই পাক খেতে থাকে দেশ। 'নবজীবনের গান', 'নবান্ন', 'ভারতের মর্মবাণী'—সঙ্গীতে নৃত্যে নাট্যে সাহিত্যে সেদিন নতুন যুগের (renaissance-এর) সম্ভাবনা এনেছিল। জ্যোতিরিন্দ্র, বিজন, মানিক, স্বপ্নায়ু, সুকান্ত আর ফিরে আসবে না। দেশ তাদের প্রতিভা থেকে মূলত বঞ্চিত। আমাদেরও প্রয়াস অসম্পূর্ণ বিপ্লবের বিকৃত আঘাতে বিপর্যস্ত। তবু আজ যখন আমরা একে একে ঝরে যাচ্ছি তখন

জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে বলতে পারি—we have served the Cause of Man, মানুষকে অবিশ্বাস করি নাই। জয় হোক মানুষের। দেশের এযুগের মধ্যেও ফুটে উঠবে মানুষের মুক্তি—পৃথিবীতে মানুষে মানুষে ভালোবাসা—নাই বা রইলাম আমি।”

ঐ নিবন্ধটিতে এক বছর পরে গোপাল হালদার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সাতটি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আরও প্রায় তেত্রিশটি পংক্তি যুক্ত করেন। সংযোজিত পংক্তিসহ প্রায় চোদ্দ বছর পরে একই শিরোনামে নিবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় ‘পরিচয়’ পত্রিকার ১৩৯৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৯১)। নতুন পংক্তি যুক্ত হলেও পুনর্মুদ্রণকালে নিবন্ধটির পূর্বোক্ত উদ্ধৃতাংশ কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যায়, প্রাজ্ঞ সংস্কৃতিবিদ গোপাল হালদার জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে সবদিক বিবেচনা করেই বলেছিলেন, তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা মিলে একদা বাঙলার সংস্কৃতিতে এক নবযুগের, ‘রেনেসাঁস’-এর, সূচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সেই ‘প্রয়াস অসম্পূর্ণ বিপ্লবের বিকৃত আঘাতে বিপর্যস্ত’ হয়ে যায়।

যে-মানুষটি দীর্ঘ সাত দশকের অক্লান্ত সাধনায় বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন, ‘রেনেসাঁস’-সংক্রান্ত তাঁর অভিমত কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য তা বিচার-বিবেচনা করে দেখার জন্য ১৯৯১ সালেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বাঙলার ২০ জন বিশিষ্ট প্রবীণ লেখক-সমালোচক এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান তরুণ গবেষক। তিরিশ আর চল্লিশের দশকে মার্কসবাদী মতাদর্শের দ্বারা সূচিত ও পরিপুষ্ট সেই প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলন কীভাবে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা-কেন্দ্রিক ‘রেনেসাঁস’-এর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অন্য এক ‘রেনেসাঁস’-এর মাধ্যমে বাঙলার সামাজিক-রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সঞ্চারিত করেছিল সঞ্জীবনী শক্তি, পূর্বোক্ত লেখকবৃন্দ তার বিচার-বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের রচিত সেই প্রবন্ধাবলী নিয়ে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় ‘বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা’ নামক ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার এক সুবিশাল গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয় ‘প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার / শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়’কে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, গ্রন্থখানি প্রকাশের সময় গোপালদা কলকাতায় ছিলেন না। পাটনা থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর গোপালদার হাতে আমি ঐ গ্রন্থ

পৌঁছে দিয়ে আসি জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে। গোপালদা তখন নব্বুই-উত্তীর্ণ এবং নানা ব্যাধিতে দৈহিকভাবে খুবই ক্লান্ত ও অশক্ত। ফলে, তাঁর সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করে এবং সম্ভব হলে বইখানা পড়ে দেখার অনুরোধ জানিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। তারপর ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়' প্রকাশের প্রাক্কালে 'পরিচয়' অফিসে পৌঁছে হঠাৎ শুনলাম, ঐ গ্রন্থখানির সূত্র ধরে গোপালদা 'মার্কসবাদী রিনাসেন্স ?'—এই জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত শিরোনামে একটি নিবন্ধ পাঠিয়েছেন শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশের জন্য। বলাবাহুল্য, নিবন্ধটি 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৯২) যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং জীবদ্দশায় 'পরিচয়'-তে ঐ নিবন্ধটিই ছিল গোপাল হালদার-এর শেষ রচনা।

গোপাল হালদার কী বলেছিলেন তাঁর ঐ নিবন্ধে? তিনি তৃতীয়বার ব্যক্ত করেছিলেন 'মার্কসবাদী রিনাসেন্স' সম্পর্কে তাঁর মতামত, আরও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ। নিবন্ধে তিনি দুটি উপশিরোনাম ব্যবহার করেছিলেন। প্রথম উপশিরোনামটি হলো—'রিনাসেন্স কি জিনিস ?' 'রিনাসেন্স' শব্দ কোন অর্থে প্রযুক্ত হয় তা খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে প্রবীণ এই সংস্কৃতিবিদ তাঁর দীর্ঘদিনের চর্চিত বিষয়কে খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় 'ইতালীয় রিনাসেন্সের নতুন জীবনের দ্যোতনা' ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যযুগে 'প্রাচীন গ্রীস ও রোমক সভ্যতার যে কালান্তর' ঘটায় এবং তার অভিঘাতে 'গোটা ইয়োরোপের শিল্পজীবন কীভাবে নতুন জীবনবোধে নবজন্ম পেল'—তা আমাদের জানিয়েছেন। এরই প্রেরণায় 'ব্রিটেনে এর ধারা প্রবল না হলেও ক্রমে' কীভাবে জন্ম দিল 'Reformation'-এর তা ব্যক্ত করে গোপাল হালদার 'Reformation' এবং 'Renaissance'-এর পার্থক্য আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি বিবেচনা করার কথা বলেছেন। তারপর ঐ 'Reformation'-ই 'কোনো-না-কোনোভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্মে সচল চিন্তা এবং নতুন পৃথিবী সন্ধানের···বহুগামী পথ বেয়েই শিল্প-বিপ্লবোত্তর' যুগে পৌঁছে দেখেছিল 'নানা সংস্কৃতিকে জানা, বিভিন্ন দার্শনিক, শৈল্পিক ও মানববিদ্যা-কেন্দ্রিক ভাবধারার সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে অভ্যুদয়ের আলো।'

'রিনাসেন্স'-এর এই ব্যাখ্যার পটভূমিতে গোপাল হালদার 'বাঙলার রিনাসেন্স' কথাটা নিয়ে তর্ক এড়াবার জন্য 'বাঙলার জাগরণ'-ই বলতে চেয়েছেন এবং সেই সূত্রেই জানিয়েছেন "আন্তর্জাতিকতা, মানবতা ও বিজ্ঞান-চেতনার সঙ্গে দেশজ

চৈতন্যের সমাহারের প্রয়াসই বস্তুত উনিশ শতকের 'জাগরণ' কথাটিকে তাৎপর্য-মণ্ডিত করেছে।"

গোপাল হালদার উক্ত নিবন্ধের দ্বিতীয় উপশিরোনামটিকে 'রিনাসেন্স-এর ব্যর্থ আয়োজন ?'—এই জিজ্ঞাসা-চিহ্নে মণ্ডিত করে 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা' শীর্ষক গ্রন্থখানি যতটুকু পাঠ করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই জানালেন, 'বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় গ্রন্থ আর রচিত হয়েছে বলে জানি না' আর রিনাসেন্স' শব্দটিকে তিনি অতীতে কিভাবে প্রয়োগ করেছিনে তৃতীয়বার তা বলতে চাইলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, গোপালদা উপশিরোনামে কেন একটি করে জিজ্ঞাসা (?) চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন তা আমার অজ্ঞাত। ঐ জিজ্ঞাসা-চিহ্নের অর্থ কি তাঁর কথিত 'রিনাসেন্স' সম্পর্কে তিনি নিজেই কিছু সংশয় পোষণ করতেন? না, ঐ 'রিনাসেন্স' সম্পর্কে যাঁরা সংশয়ী তাঁদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন ওটা 'ব্যর্থ' কিনা তা জানতে চেয়ে? বিজ্ঞ পাঠকেরাই এর বিচার করুন, আমি শুধু এই অবসরে গোপাল হালদার-এর মতামত অতি সংক্ষেপে অবিকৃতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

গোপালদা কোনো সংশয় না রেখেই প্রথমে বললেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে বামপন্থী নানা আয়োজনককে বলেছিলাম বাঙলার নতুন এক রিনাসেন্সের আভাস বা উদ্যোগ।' এরপর তিনি ১ থেকে ৬ নম্বর ক্রম-পর্যায়ে ব্যক্ত করলেন, সেই রেনেসাঁস-এর (আমি 'রিনাসেন্স'-কে 'রেনেসাঁস' বলে উচ্চারণ করতে ইচ্ছুক) 'সমগ্র আবহ ছিল বাঙালী বামপন্থী রাজনীতিক চেতনা বা ভাবনা' এবং 'এর আরোহ ছিল আন্তর্জাতিকতায়।' তিনি স্বীকার করলেন, 'বহু সময় আমরা দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি এবং তার ফলে মার্কসবাদী রিনাসেন্স-এর উদ্যোগ··অনেক পরিমাণে খর্ব ও ব্যর্থ হয়েছে··।' এতদসত্ত্বেও গোপাল হালদার জানাতে দ্বিধা করেননি, '··এই বহুমুখী আন্দোলন-পর্ব (১৯৩০—১৯৪০) নতুন চিন্তা-ভাবনার বিশেষ করে বাংলার সেই 'জাগরণ'-এর এক স্পষ্ট শক্তি।' গোপাল হালদার তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও জানালেন, "Progressive Writers' Association (পরে Anti-fascist W. A.) ও তৎপ্রেরণার সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস-গল্প, পরে গণনাট্য সঙ্ঘ, তৎসহ নব নৃত্যকলা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির অভাবিত উদ্বোধন—শহরে, গ্রামে, প্রায় সর্ব অঞ্চলে এসবের প্রসারের

উল্লেখ করা এখানে অসম্ভব—সব কথা মনে না থাকলেও তার বিপুল শক্তির কথা ভোলা অসম্ভব।”

মার্কসবাদী রেনেসাঁস-এর উদ্যোগ ১৯৪৫-এর পরে এদেশে কেন আর প্রাণবন্ত হতে পারল না তার কারণস্বরূপ গোপাল হালদার যা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো ঃ যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক জটিলতায় মার্কসীয় মতাদর্শে চালিত জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রয়াসযুক্ত এই জাগরণ ক্রমেই আক্রমণস্থল হয়ে ওঠে। কংগ্রেস-পরিচালিত উগ্র জাতীয়তাবাদী কুৎসা প্রচার, জনযুদ্ধ-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে ‘কমিউনিস্টদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর সুপরিকল্পিত আঘাত সৃষ্টি’ এবং পরবর্তীকালে ‘রণদিভে-পর্বের হঠকারী [হঠকারিতা] কলোসাস চেহারা নিয়ে এই ‘জাগরণ’-এর ইতিবাচক ও বহুসঞ্চারী প্রভাবকে সংকীর্ণতার অসুখে একান্ত ক্লীন্ন করে তুলল।’ ফলে, ‘মার্কসবাদী রিনাসেন্স একটা স্বপ্নই রয়ে গেল, সত্য হয়ে উঠতে পারল না।’

‘মার্কসবাদী রিনাসেন্স’ সম্পর্কে গোপাল হালদার-এর এই দীর্ঘ বক্তব্য ‘প্রগতি-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক…’ শীর্ষক আলোচনায় কী করে আসে. এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। গোপাল হালদার তিরিশ আর চল্লিশের দশকে সংঘটিত যে-‘মার্কসবাদী রিনাসেন্স’কে তিন-তিনবার স্বীকৃতি জানিয়ে কলম ধরেছেন এবং সর্বশেষ রচনায় তাঁর স্বভাব-সুলভ সুভদ্র ও পরিশীলিত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিরপেক্ষ ইতিহাসদ্রষ্টার মতো তার সাফল্য-অসাফল্য ব্যাখ্যা করেছেন, আমার মতে, সেই রেনেসাঁস-এর অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন স্বয়ং গোপাল হালদার। আর, যেহেতু এই রেনেসাঁস এবং প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সমার্থক, সেইহেতু এই দুটি মিলিয়েই অনিবার্যভাবে আলোচ্য হয় গোপাল হালদার-এর অগ্রনায়কত্বের ভূমিকা। তবু একটি নিবন্ধের পরিসরে সেই আলোচ্য প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর, আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গোপাল হালদার-এর সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন কর্মময় জীবন এবং গৌরবোজ্জ্বল সৃজনশীল প্রয়াস আর মননচর্চার ইতিহাস নিয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনার জন্য আমিও আদৌ যোগ্য ব্যক্তি নই। সে-কাজ এই সংখ্যার বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে অন্যান্য যোগ্যতর লেখকেরা নিশ্চয় করবেন। আমি কিশোরকাল থেকে গোপালদার রচনাবলী পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল তাঁর অনুজপ্রতিম একজন নগণ্য সহযোদ্ধা রূপে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর যে অনন্য ভূমিকা প্রত্যক্ষ

করেছি অথবা জেনেছি, এই নিবন্ধে শুধুমাত্র সে-সম্পর্কেই কিছু কথা বলার যথা-সাধ্য চেষ্টা করবো।

গোপাল হালদার যে হঠাৎ রেনেসাঁস-পুরুষে পরিণত হন নি কিংবা প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক হয়ে ওঠেননি, তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গসংস্কৃতির প্রাঙ্গণে শত প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার জন্য তাঁকেও ব্যয় করতে হয়েছিল যথেষ্ট শ্রম আর নিষ্ঠা। সেই প্রাক-কথনের বিস্তৃত বিবরণ এখানে না দিলেও—গোপাল হালদারকে সম্যক উপলব্ধির জন্যই কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা একান্ত প্রয়োজন।

আমি পূর্বেই বলেছি, গোপাল হালদার কিশোরকাল থেকেই স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে নিবেদিতপ্রাণ এক সৈনিক। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত। শৈশবেই তিনি গৃহ-পরিবেশে বাবা-দাদাদের কাছ থেকে পেয়েছেন সাহিত্যপাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহণের উৎসাহ। এছাড়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকাও তাঁর মনে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করেছিল নতুন এক সাংস্কৃতিক চেতনা। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ গোপাল হালদার বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে কৈশোরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—সাহিত্যসাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম মূলত একই সত্যের দুপিঠ। উপলব্ধিগত এই সত্যই আরও দৃঢ়মূল হয়ে গোপাল হালদার-এর পরবর্তীকালের জীবন ও মননক্রিয়াকে চালিত করেছে, একথা বোধহয় নির্দ্বিধায় বলা যায়।

যাহোক, ১৯১৮ সালে নোয়াখালির গোপাল হালদার কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে আসেন কলকাতায় এবং কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে। এই সময় বাঙলার বিপ্লববাদী আন্দোলনে এসেছে ভাটার টান। বিপ্লববাদী তরুণ যুবক গোপাল হালদারও তা বুঝতে পেরেছেন। তাঁর অশান্ত মনে তখন জিজ্ঞাসা—জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু তরুণদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পথে এই বিশাল দেশের মুক্তি কি সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের 'ছোট ও বড়,' 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ইত্যাদি রচনা পাঠের মাধ্যমে তরুণ গোপাল হালদার যেন তাঁর জিজ্ঞাসার একটা সদুত্তর খুঁজে পেলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসীন হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে তিনি অহিংস গণজাগরণের মাধ্যমে পরিচালিত করতে চলেছেন। শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে গোপাল হালদার-এর রাজনৈতিক জীবনেও ঘটে গেল পর্বান্তর।

অর্থাৎ, বিবেকানন্দ-র অভীঃমন্ত্রে একদা তাঁর স্বাদেশিকতার যে-বোধন, রবীন্দ্রনাথের নতুন চিন্তার আলোকে তা শোধিত হয়ে গোপাল হালদার-এর মনে হলো: গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস-ই 'একটা জনভিত্তিক (পপুলার) প্রতিষ্ঠান, আর সত্যিকারের একটা জীবন্ত সংগঠন।' তবু গান্ধীজীর 'বয়কট' আন্দোলন ও 'চরকার তত্ত্ব' তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। এই দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-এর যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই ছিল তাঁর সমর্থন।

১৯২০-২১ সাল। গোপাল হালদার স্কটিশচার্চ কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছেন। থাকেন অগিলভি হোস্টেলে। এই ছাত্রাবাসেই তখন তাঁর সহ-আবাসিক এবং সহপাঠী-বন্ধু সজনীকান্ত দাসও থাকতেন। পরবর্তীকালে সজনীকান্ত হয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'-র ডাকসাইটে সম্পাদক এবং বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোপাল হালদার-এর বিপরীত মেরুর স্বনামধন্য এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এ-প্রসঙ্গে পরে দু-একটি কথা বলা যাবে। কিন্তু অগিলভি হোস্টেলে থাকা কালেই গোপাল হালদার এবং তাঁর বন্ধু সজনীকান্ত দাস, পরিমল রায়, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিধর চক্রবর্তী প্রমুখ মিলে গড়ে তোলেন এক সাহিত্যমজলিস। গোপালহালদার-সম্পাদিত অগিলিভি হোস্টেলের হাতে লেখা একটি পত্রিকায় শুরু হয় তাঁদের সাহিত্যচর্চা। এই হাতেলেখা পত্রিকায় গল্প-প্রবন্ধ কেউ লিখেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। কিন্তু ঐ হাতেলেখা পত্রিকা উদ্ধার করে সম্ভবতপঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সুধাংশু দে-র সম্পাদনায় 'পরিক্রমা' নামে একটি পত্রিকায় (সুধাংশু দে পরবর্তীকালে হয়েছিলেন দৈনিক 'বসুমতী'-র বার্তা-সম্পাদক এবং বর্তমানে প্রয়াত) আমার এক বন্ধু, অধুনা লণ্ডন-প্রবাসী কালিদাস দত্ত (ইনি 'স্বাধীনতা,' 'পরিচয়' 'যুগান্তর', 'অমৃত' প্রভৃতি পত্রিকায় বেশ কিছু ভালো ছোটগল্প লিখেছিলেন) গোপাল হালদার এবং সজনীকান্ত দাস-রচিত একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। 'পরিক্রমা' পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি দীর্ঘকাল আমার সংগ্রহে ছিল কিন্তু দুঃখের কথা, সেটি এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে আছে, গোপালদার এই কাব্যচর্চার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়া দিলে তিনি সম্মতিসূচক মৃদু হেসেছিলেন মাত্র। আমার ধারণা, অগিলভি হোস্টেলের হাতে লেখা পত্রিকার মাধ্যমেই হয় গোপাল হালদার এবং তাঁর বন্ধু সজনীকান্ত দাস-এর সাহিত্যিক-জীবনে হাতে খড়ি।

গোপাল-হালদার যখন বি. এ ক্লাসে চতুর্থবর্ষের ছাত্র সেই সময় এলো

আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে স্বরাজ-সাধনার ডাক, শুরু হলো গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। আপামর জনসাধারণ সেই ডাকে সাড়া দিল। গোপাল হালদার লক্ষ্য করলেন, এই প্রথম ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যিকার গণজাগরণ শুরু হয়েছে। ১৯২১ সালে আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচী ছিল জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে ছাত্রদের সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জন। এই সময় তাঁর অনেক ছাত্র-বন্ধু স্কুল-কলেজ বর্জন করলেও তিনি গান্ধীজীর নীতি—স্বদেশী সমাজ, আত্মশক্তি তথা জনশক্তির নীতিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা জানিয়েও 'বয়কট'-আন্দোলনে সামিল হননি। ঠিক এই সময় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ (পত্রাকারে রচিত) 'বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন' প্রকাশিত হলো ১৩২৭ সালের মাঘ সাখ্যা (ইংরেজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি) 'সবুজপত্র'-র পৃষ্ঠায়, অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে। এর পরেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ।

গোপাল হালদার-এর মন সে-সময় সত্যিই অস্থির। তাই বি. এ. পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার পর তাঁর মনে হলো, 'একি পরীক্ষার সময়? মুখ দেখাব কি করে—এমন বৎসরে স্বরাজের থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি?' ১৯২৩ সালেই পরীক্ষা দেবেন ঠিক করে মনে মনে ভাবলেন, 'একটা বছর আমার জীবনে—এই ১৯২২—থাক স্বরাজের জন্য উৎসর্গ করা।' 'সাহিত্যসাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম মূলত একই সত্যের দু'পিঠ'—একদা উপলব্ধ এই সত্য, কথায় ও কর্মে প্রয়োগ করতে গোপাল হালদার স্বরাজ-সাধনার জন্য গান্ধীজীর ডাকে কলকাতার পড়াশুনো, সাহিত্যমজলিসের আড্ডা সব কিছু ছেড়ে চলে গেলেন নোয়াখালি।

গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন: "চলে গেলাম নোয়াখালি। সজনী (সজনীকান্ত দাস) এসে শিয়ালদতে তুলে দিয়ে গেল। একেবারে বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়াতে হ'ল।··· সরকারের আইন অমান্য মোটেই দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু বাবা-মা'র কথা অমান্য করতে অনেক বেশি মনের জোর চাই। ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি জেলে পালিয়ে যাব ·· কিন্তু হ'ল বিপরীত। কংগ্রেসের নেতারা শহরে আমাকেই রাখলেন আপিস চালনার সহায়ক করে।···সংগঠন গঠনের লোক বেশি দরকার।"

এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন গোপাল হালদার। তিনি জীবনে প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন, গান্ধীজীর আহ্বানে স্বরাজের জন্য 'জনতার অদ্ভুত আগ্রহ, উত্তেজনা।' আর, যেহেতু নোয়াখালি জেলার শতকরা ৮০ জন মানুষ মুসলমান,

সেইহেতু তাঁরা খেলাফতের নামে ক্ষিপ্ত। হাজারে হাজারে এর জন্য তাঁরা জেলে যেতে চায়। কংগ্রেস অফিসের পাশে একটা করে খেলাফৎ কমিটির অফিস। যদিও দুয়েরই কাজ এক তবু দুটো অফিস চাই। 'দুটো সংগঠন কেন?'—এ প্রশ্ন তখনই জেগেছিল গোপাল হালদার এবং তাঁর কোনো কোনো সহযোদ্ধার মনে। তবু 'প্রশ্নটা এসময়ে না তোলাই ভালো। উপায় যখন নেই,···আপাততঃ এই চলুক'—এইভাবেই তাঁরা সান্ত্বনা খুঁজে নিলেন। হঠাৎ উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। ফলে, অহিংসার পূজারী গান্ধীজী বিচলিত হয়ে বরদৌলিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন। গোপাল হালদার লিখেছেন, 'স্বাধীনতার পরীক্ষার সমস্ত উদ্দীপনার উপরে জলভার ঢেলে দিয়ে তিনি (গান্ধীজী) সকলকে বিমূঢ় করে দিলেন।' কিন্তু গোপাল হালদার মূঢ় ছিলেন না। সুতরাং তিনি অতি দ্রুত ফিরে এলেন কলকাতায় বি. এ. পরীক্ষা দিতে। তখন পরীক্ষার জন্য আর মাত্র একমাস সময় বাকি। এবং বিস্ময়ের কথা, প্রায় প্রস্তুতিহীনভাবে পরীক্ষা দিয়েই ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ গোপাল হালদার বি. এ. পাশ করেন। এটা নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় এক কৃতিত্ব।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যায়, স্বরাজের জন্য সমগ্র দেশের অসংখ্য মানুষ যখন আবেগ আর উন্মাদনার শীর্ষচূড়ায় গান্ধীজী তখন যে-নীতি ও আদর্শের কথা বলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন গোপাল হালদার-এর তা মনঃপূত ছিল না। এমনকি এর আগেই আমরা দেখেছি, গান্ধীজীর 'বয়কট' ও 'চরকার তত্ত্ব'-কে রবীন্দ্রনাথ যে-যুক্তিতে খণ্ডন করেছিলেন তার প্রতিই ছিল গোপাল হালদার-এর বুদ্ধিগ্রাহ্য সমর্থন। এতদসত্ত্বেও গান্ধীজী যেভাবে কংগ্রেসকে 'জনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান' ও 'জীবন্ত সংগঠন'-এ পরিণত করেন তাও তিনি অস্বীকার করেননি। পঁচাত্তর বছর বয়সে পরিণত মন নিয়ে গোপাল হালদার যখন তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কূলে' (দ্বিতীয় খণ্ড) লিখছেন, তখন সঙ্গতভাবেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, গান্ধীজী যতই হোন 'Conscious instrument of non-Revolution', তিনি কি অন্য অর্থে 'Unconscious instrument of Revolution' নন? পরিশীলিত গোপাল হালদার-এর বৌদ্ধিক মননক্রিয়া এইভাবেই সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত ছিল।

যাহোক, ১৯২৪ সালে গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বি. এল. পরীক্ষাও পাশ

করেন ১৯২৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন সজনীকান্ত দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এ'দের মধ্যে সজনীকান্ত ও রবীন্দ্রকুমার বসুর সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। সজনীবাবু তাঁর 'আত্ম-স্মৃতি'-তে বন্ধু গোপাল হালদার সম্বন্ধে অনেক পুরনো স্মৃতিই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, আর সুহৃদ রবীন্দ্রকুমার-এর ভাষায় 'Gopal Haldar : A friend with a difference.' এই কথার সূত্র ধরেই অনিল কাঞ্জিলাল-এর মতো অনুজপ্রতিম সহযোদ্ধা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট গোপাল হালদার সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 'Gopal Haldar is a Communist, but with a difference.' প্রকৃতপক্ষে, গোপাল হালদার ছিলেন অন্য ধারার বন্ধু এবং ভিন্ন ধরনের এক কমিউনিস্ট। পরে নানা প্রসঙ্গে এ কথার সত্যতা আমরা হয়তো কিছুটা যাচাই করে নিতে পারবো! প্রসঙ্গত বলে রাখি, গোপালদা তাঁর আত্ম-জীবনী 'রূপনারানের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ডটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পূর্বোক্ত সহপাঠী-সুহৃদ রবীন্দ্রকুমার বসু-র উদ্দেশে।

গোপাল হালদার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবন শেষ করে ভাবছিলেন—এবার কোন কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করবেন। জীবিকা হিসেবে তাঁর 'প্রথম সাধ' ছিল সাংবাদিকতার পেশাকে গ্রহণ করা। কিন্তু ১৯২৫ সালে নোয়াখালিতে ফিরে যাওয়ার পর তাঁর বাবা "একটা ইংরেজি কথা ঘুরিয়ে' তাঁকে জানালেন, 'A Subject race can have no politics. A Subject race can have no journalism either'. গ্রন্থাগারিকতা এবং অধ্যাপনার বৃত্তিও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দেশের সেই সময়কার পরিস্থিতিতে এবং 'পিতার প্রতিকূলতায়' যখন তাঁর কোনো সাধই পূর্ণ হলো না তখন অগত্যা উকিলের ছেলেকে বেছে নিতে হলো উকিলের পেশা। গোপাল হালদার নিজেই বলেছেন, 'আমার আসল ঝোঁক—স্বাধীনতা ও সাহিত্য। সাংবাদিকতা তার যোজক, তাই প্রকাশ্যে স্বাধীনতা নয়, সাংবাদিকতাকেই বলতাম প্রথম সাধ।' আর 'আইনের আলোচনায় রস পেলেও আইনের ব্যবসায়ে আমার রুচি ছিল না।···তবু জিলা-কোর্টে ওকালতিতে বসলাম—বাড়ি বসে আছি বলে।'

এই অবস্থায় বছর দেড়েক নোয়াখালিতে কাটালেন গোপাল হালদার। আইন-জীবীর পেশার পরিবর্তে সেই সময় তাঁর প্রধান কাজ হলো—"বন্ধুগোষ্ঠীতে আড্ডা, লাইব্রেরিতে পড়া, স্থানীন সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী'তে যদিচ্ছা কলম চালনা, আর

কলকাতার ইংরেজি-বাঙলা কাগজে কখনো বা গল্প-প্রবন্ধ লেখা—অর্থাৎ সেই সাংবাদিকতা, নামমাত্র দক্ষিণায়।”

মুসলমানরা এই সময় কংগ্রেস থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। ভারতের নানা স্থানে চলছিল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। মুসলিম-প্রধান নোয়াখালি জেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা না ঘটলেও হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্কে বেশ তিক্ততা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে শহরের হিন্দুরা কিছুটা অপমান এবং হিন্দু-মেয়েরা কিছু অভব্য আচরণের সম্মুখীন হলেও গ্রামের গরীব ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা, বিশেষ করে হিন্দু গরীব মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছিলেন অম্মরণ অপমান ও নির্যাতনের শিকার। শাসকদের মনোভাব বুঝে পুলিশ ছিল নীরব। এইসব উৎপাত-উপদ্রব কয়েক মাস দেখে-শুনে গোপাল হালদার-এর মেজাজও গেল বিগড়ে। তিনি এইসব অমানবিক আচরণকে 'মনুষ্যত্বের দায়' হিসেবে গ্রহণ করে যথেষ্ট উত্তাপ নিয়েই এর বিরুদ্ধে 'দেশের বাণী'তে লিখলেন একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। সেই লেখা ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা ও নিষ্ক্রিয় পুলিশের বিরুদ্ধে। মুসলিম নেতাদেরও তিনি 'তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে কসুর' করলেন না। ফলে, সিডিশনের ও ক্লাশ-হেটরেড প্রচারের দায়ে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত হলেন 'দেশের বাণী'-র সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী। গোপাল হালদার-এর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এই প্রথম রাজরোষের সম্মুখীন হলো।

এই সময়কার অন্য স্মরণীয় ঘটনা হলো—তিনি এম. এন. রায়-এর 'ভ্যানগার্ড' বা 'এ্যাডভান্স গার্ড' পত্রিকা থেকে মার্কস এবং লেনিন-এর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়ে এবং পূর্বপরিচিত রবীন্দ্রনাথের 'ভারতপন্থা' আর বিবেকানন্দ-র 'শূদ্ররাজের' ভবিষ্যৎবাণী মিলিয়ে মিশিয়ে এবং লিবারেল হিন্দু-ন্যাশনালিজমের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিজের মতো করে সোশ্যালিজমের একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলেন। সেই অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাই ব্যক্ত হতে থাকে গোপাল হালদার-এর লেখায় 'দেশের বাণী'তে এবং বন্ধু সজনীকান্ত দাস-এর তাগিদে রচিত 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ওয়েল ফেয়ার'-এর পৃষ্ঠায়। 'ওয়েল ফেয়ার' পত্রিকায় ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'Hopes of the Indian Socialism' শীর্ষক প্রবন্ধে গোপাল হালদার লেখেন : "That the world today is not only moving towards democracy, but towards a socialistic democracy." ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন :

"Still greater was the effect of the phenomenal rise of the Soviet Republic in Russia—Russia whom we felt to be our kin in thoughts ideas and above all in sufferings…"

গোপাল হালদার-এর চিন্তা-চৈতন্যে এই পর্বান্তর শুরু হয় ১৯২২ সালে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় পর। কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা গোপাল হালদার-এর মতো বিপ্লবী তরুণদের মনে সঞ্চারিত হতে থাকে ১৯১৭ সালে রুশ দেশে সংঘটিত অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে। বিশের দশকের প্রারম্ভে এ-দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'রুশ-বিপ্লব,' 'সমাজতন্ত্র,' 'কার্ল মার্কস' ও 'লেনিন'-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ করে জিজ্ঞাসু তরুণ বিপ্লবীদের একাংশ প্রভাবিত হতে থাকেন। গোপাল হালদার ছিলেন এঁদেরই অন্যতম। তিনি নিজেই বলেছেন, "অহিংস সত্যাগ্রহ ও অহিংস সংগ্রাম ব্যতীত তৃতীয় একটা ভাবনাও কিশোর ও যুবকদের মধ্যে আসছিল—কিন্তু তখনো তা রূপ ধরতে পারে নি। সে-ভাবনার উদ্ভব ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবে।"

যাহোক, ১৯২৬ সালে নোয়াখালিতে বিরাজিত সামাজিক—রাজনৈতিক পরিবেশ নানা কারণে এমন ঘুলিয়ে উঠল যে, গোপাল হালদার-এর মতো মুক্তমতি মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব মনে হলো। কলকাতার বৃহত্তর পরিবেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির আড্ডার মধ্যে তিনি কিছুটা মুক্তির আনন্দ ও মনের স্বস্তি ফিরে পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পুনর্বার কলকাতায় চলে এলেন তিনি।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর এবার তাঁর জীবনে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। গোপাল হালদার-এর দাদা অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার তাঁকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে যান ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়িতে। অবশ্য এর আগেই অন্য একদিন সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেছিল 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী-র গৃহে। গোপাল হালদার তখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হবেন বলে মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 'একশটা দিকে যার ঝোঁক কিসে সে গবেষণা করবে'—তা নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছাতে পারছিলেন না। সুনীতিকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় তিনি বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়েই সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ করবেন।

অতঃপর ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় অগ্রসর

হয়ে গোপাল হালদার-এর সমাজ-সচেতন অনুসন্ধিৎসু মন সহজেই বুঝতে পারে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা ও জীবিকার প্রাথমিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন হয় যেসব শব্দ তার মধ্যেই তো নিহিত থাকে ভাষার মূল বনিয়াদ। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিককে এই বনিয়াদী সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই পৌঁছাতে হবে লোকশব্দ, লোককাহিনী এবং লোকজীবনের গভীরতম খনিগর্ভে। এই অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান সমাজতন্ত্রের দর্শনে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উৎসমুখে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি না। যাঁরা গোপাল হালদার-এর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'সংস্কৃতির রূপান্তর' মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, ঐ গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় গোপাল হালদার তাঁর লেখার ত্রুটি—বিচ্যুতিকে অস্বীকার করেন নি; কিন্তু 'একজন মার্কসবাদীর তাতে খুব একটা ভয় নেই'—এই কথার সমর্থনে বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হলডেন—এর একটি উক্তির উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেছিলেন, 'A Marxist must not be too afraid of making mistakes.'

সেই বিশ্ববিশ্রুত জীববিজ্ঞানী হলডেন যখন ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে কলকাতায় অবস্থান করছেন তখন পঞ্চাশের দশকের শেষ অথবা ষাটের দশকের প্রারম্ভে কলকাতার কলেজ স্ট্রীটস্থ ওয়াই. এম. সি. এ হলে তাঁর একটি একক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আমাদের বন্ধু এবং বিজ্ঞানী হলডেন-এর একান্ত সচিব ড. অসিত ভট্টাচার্য-র আমন্ত্রণে আমি সেই বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেদিন জে. বি. এস. হলডেন-এর ঐ অবিস্মরণীয় বক্তৃতা যখন চলছে, তখন শুনলাম, জীববিজ্ঞানের রহস্য সন্ধানের জন্য তিনি কীভাবে মন্থন করেছিলেন প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস এবং মূল গ্রীক ভাষা শিখে অতীতের সমাজজীবন এবং সমাজ-বিধৃত নর-নারীর আচার-আচরণ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত জানার জন্য পাঠ করেছিলেন গ্রীক ভাষায় রচিত ধ্রুপদী সাহিত্যগ্রন্থগুলি। আমার কাছে ছিল এ-এক নতুন আবিষ্কার। একজন বিশ্বসেরা জীববিজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার সত্য আবিষ্কারের জন্য খুঁজে ফিরছেন প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস এবং ক্লাসিক্যাল গ্রীক-সাহিত্য। আর জানলাম, ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় নিরত গোপাল হালদার ভাষার বনিয়াদী সমস্যার সমাধানের জন্য কেমনভাবে পৌঁছে গেলেন সমাজতন্ত্রের দর্শনে—হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের দিকে। তাই পরিণত বয়সে পৌঁছে গোপাল হালদার তাঁর গুরু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর ঋণ

সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে লিখেছেন, 'গবেষণার গুরু ছাড়াও তিনি আমার অনেক বিষয়ে শিক্ষাগুরু। অনেক জিজ্ঞাসার উদ্বোধক।'…'যিনি জেনে না-জেনে আমাকে এই কমিউনিজমের পথে এগিয়ে দিয়েছেন তিনি শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ নন। আমার গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও।'

১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সালের জুলাই মাস, গোপাল হালদার-এর বন্দীজীবন শুরু হওয়ার 'প্রাক্-মুহূর্ত' পর্যন্ত, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তিনি শুধু মূল্যবান গবেষণাপত্রই রচনা করেন নি, বন্ধু সজনীকান্ত-র সহযোগিতায় 'প্রবাসী'-কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ও অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ওয়েল ফেয়ার' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন তেমনি 'প্রবাসী'সহ 'ভারতবর্ষ,' 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন বেশ কয়েকটি ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং কবিতাও। এই সঙ্গে 'প্রবাসী' অফিসে 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্যের আসরে তিনি 'প্রত্যহ প্রায় অষ্টপ্রহরব্যাপী আড্ডা'-য় মিলিত হয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস নাগ, নীরদ সি. চৌধুরী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সুধীজনের আলাপ-আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে শাণিত করে তুলেছিলেন তাঁর বহুমুখী মানবিকীবিদ্যা সংগ্রহের আগ্রহকে। এতসব কাজ করার পরেও কিন্তু গোপাল হালদার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গেও রেখেছিলেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এর মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি ক্ষীণদেহী গোপাল হালদার-এর অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং প্রতিভার দীপ্তি।

ফলত, আমরা মাত্র ছয় বছর সময়সীমার মধ্যে গবেষক গোপাল হালদার-এর কাছ থেকে পেলাম 'A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect of South Eastern Bengal' (১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রকাশিত), 'Gopichand Legend' (সুনীতিকুমারের পরামর্শে এই নিবন্ধটি ১৯৩০ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সম্মেলনে পঠিত), 'Vidyapati and His Language' (১৯৩১ সালে বরোদায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সম্মেলনে পঠিত), 'A Skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengal' (১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রকাশিত, লেখক তখন রাজবন্দী) শীর্ষক চারটি উচ্চমানের গবেষণাপত্র। এছাড়া কারারুদ্ধ হওয়ার আগে গোপাল হালদার শুরু করেছিলেন 'A Comparative Grammar of East

Bengali Dialects' নামে অন্য একটি বৃহত্তর গবেষণার কাজ। কিন্তু সেটি সমাপ্ত হওয়ার আগেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নিক্ষেপ করে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। এই নিষ্ঠাবান গবেষক-শিষ্যের উপর গুরু সুনীতিকুমারের ছিল গভীর আস্থা। তাই গোপাল হালদার যখন জেলে রাজবন্দী তখন তাঁর গবেষণার গুরু সুনীতিকুমার জেলের মধ্যে তাঁকে বইপত্র পাঠিয়ে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে নির্দেশ জানিয়ে, এমনকি প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে বন্দী এই গবেষক-ছাত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করে তাঁর গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করতে যেমন উৎসাহ জুগিয়েছেন তেমনি সাহায্যও করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত ভাষাচার্যের একটি চিঠিতে। সুনীতিকুমার ১৯৩৬ সালে সেই চিঠিতে গোপাল হালদারকে লিখেছিলেন, "আরও বেশী আনন্দের কথা সুকুমার, আপনি ও মনোমোহন ঘোষ আপনাদের অনেকে চেনে, আপনাদের গবেষণার আদর করে। বের্লিনে ভাগনার, পারিসে ব্লক, লণ্ডনে টার্নার—উঁহারা প্রশংসার সহিত সুকুমার ও আপনার গবেষণার উল্লেখ করিয়াছেন।···আপনি মুক্তি পাইয়া আবার পূর্ণ উৎসাহে কাজে নামিবেন, আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবেন, আমরা এই আশায়ই আছি।—শ্রীপঞ্চমী ১৩৪২।"

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের পরামর্শে ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় জেলের মধ্যে বন্দী অবস্থায় গোপাল হালদার শেষোক্ত গবেষণার কাজটিও সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ কারাবাসের পর গোপাল হালদার মুক্তজীবনে ফিরে এলেও, খুবই দুঃখের কথা, তাঁর 'A Comparative Grammar of Bengali Dialects' সুদীর্ঘ কাল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সুনীতিকুমার এই গ্রন্থের ভূমিকাটি নিজেই লিখবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু গবেষণাপত্রটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো তখন আচার্য সুনীতিকুমার আর আমাদের মধ্যে নেই। গ্রন্থ-প্রকাশকালে গোপাল হালদার-এর মন তাই ছিল বেদনার্ত। সুনীতিকুমারের কলমের স্পর্শ থেকে তাঁর ঐ গ্রন্থখানি বঞ্চিত হওয়ায় গোপাল হালদার আমৃত্যু পোষণ করেছেন মর্মযন্ত্রণা আর সুগভীর আপসোস।

বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোপাল হালদার-এর সুমহান অন্যান্য অবদানের কথা বাদ দিলেও প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষাতত্ত্ব ও লৌকিক উপখ্যানের চর্চায়, কিংবা বলা যায় একটা জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিকড় অনুসন্ধানের জন্য, আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার গহন গভীরে প্রবেশ করে মানুষের প্রাণধারণের প্রাথমিক

উপকরণ ও চাহিদা মেটাতে যেসব শব্দের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশিত হয়, তার ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য অনুপুঙ্খভাবে খুঁজে বের করা এবং তা সমাজ-সচেতন মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা, এও তো এক রেনেসাঁস-পুরুষের কাজ। তিরিশ আর চল্লিশের দশকে বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাঁরা অন্য এক রেনেসাঁস-এর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিলেন, গোপাল হালদার নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান নায়ক। এবং আমার ধারণা, গোপাল হালদার-এর অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আর ভাষাতত্ত্বের গবেষণাই হলো তার সূচনাপর্ব।

যৌবনের রাজটীকা ললাটে ধারণ করে গোপাল হালদার কারান্তরালে চলে যান ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে। ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ছাড়া প্রাক্-বন্দীজীবনে তাঁর আর একটি মহৎ কীর্তি স্মরণযোগ্য।

'প্রবাসী'-কার্যালয়ে 'শনিবারের চিঠি'-র আসরকে কেন্দ্র করে শনিমণ্ডলীর আড্ডা তখন জমজমাট। সাহিত্যের সেই উত্তেজনাকর আবহাওয়ায় "মোহিতলালের holy rage, নীরদচন্দ্রের বিদগ্ধ ব্যঙ্গ, সজনীকান্তের তীক্ষ্ম সাবলীল রঙ্গ তখন 'অতি আধুনিক সাহিত্যে'র বিরুদ্ধে উপচে পড়ছে।" এই নৈতিযজ্ঞের মধ্যেই নীরদচন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছিলেন, 'বিভূতিবাবুর (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) বইখানা ভালো হয়েছে। 'বিচিত্রা' তা প্রকাশ করবে বলেছে।'—কথাগুলি লিখেছেন গোপাল হালদার বিভূতিভূষণ-এর 'পথের পাঁচালী'-প্রসঙ্গে। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশকালে গোপাল হালদার বিভূতিবাবুর সেই উপন্যাস পাঠ করে 'বিমুগ্ধ' হতেন এবং বুঝতেন, 'নতুন কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে।'

তারপর 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য যখন চেষ্টা চলছে তখন নীরদচন্দ্র চৌধুরী একদিন জানালেন 'পথের পাঁচালী'-র একজন ভালো প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না। গোপাল হালদার সেই সময় বন্ধু সজনীকান্তের সঙ্গে 'রঞ্জন প্রকাশালয়' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। আসল উদ্যোগী সজনীকান্ত হলেও পুঁজি সংগ্রহের দায়-দায়িত্ব কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন গোপাল হালদার। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কথা শুনে তাঁরা দুজনেই বিনা দ্বিধায় বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। গোপাল হালদার তাঁর বাবার কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে এই প্রকাশনায় লগ্নী করেন এবং পরিশোধ করেন লেখককে দেয় রয়্যালটি বা দক্ষিণা। আর, সজনীকান্ত নিয়োজিত করেন তাঁর 'উদ্যোগ ও পরিশ্রম।' গোপাল হালদার জানিয়েছেন, "আমাদের সেদিনকার

সেই সামান্য মূলধন যে আমরা 'পথের পাঁচালী'-তে ব্যয় করেছিলাম, তার কারণ ও-গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে আমরা দুজনেই নিঃসন্দেহ ছিলাম।"

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে গোপাল হালদার যেমন লিখেছিলেন এসব কথা, তেমনি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কূলে'-র দ্বিতীয় খণ্ডেও তিনি স্মরণ করেছেন এই অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা। সজনীকান্ত দাসও 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের এই কথা বলেছেন ১৩৫৭ সালের ১৯ কার্তিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এবং তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে। এমনিভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদকে চিনে নিতে ভুল করেন নি গোপাল হালদার। তাঁর সুগভীর সাহিত্যবোধ 'শনিমণ্ডলী'-র আরও কয়েকজন বিদগ্ধ সদস্যের মতো 'নতুন কিছুর আবির্ভাব'কে স্বাগত ও স্বীকৃতি জানিয়েছে। গোপাল হালদার-এর এই মনীষার দীপ্তি পরবর্তীকালের অন্য এক রেনেসাঁস-এর সূচনায় আরও বর্ণময় ঔজ্জ্বল্যে প্রতিফলিত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, 'পথের পাঁচালী'-কে চলচ্চিত্রায়িত করে পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রকে মর্যাদার আসনে পৌঁছে দিয়েছেন অথচ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান নি তখন যে-কয়টি পত্র-পত্রিকা সত্যজিৎ রায়-এর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি তার মধ্যে গোপাল হালদর-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা অন্যতম। আর, কলকাতার কিছু তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী চিন্তার বাহক ছাত্র-ছাত্রীরা যৌথভাবে ১৯৫৬ সালে সিনেট হলে ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের জন্য যখন পরিচালক সত্যজিৎ রায়-কে গণ-সম্বর্ধনা জানালেন তখন সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন 'পথের পাঁচালী'-র সেই অন্যতম প্রথম প্রকাশক এবং প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক গোপাল হালদার।

আমি পূর্বেই বলেছি, ১৯৩২ সালে গোপাল হালদার কারারুদ্ধ। বন্দী অবস্থায় তাঁর আরব্ধ গবেষণার কাজটি শেষ করার কথাও বলা হয়েছে। এই জেল-জীবনেই ঘটে গোপাল হালদার-এর জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী মতবাদ থেকে মার্কসীয় মতাদর্শে উত্তরণ। ১৯২১-২২ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর যে-অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল, যা ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তৎসঞ্জাত হতাশায় পীড়িত বাঙলার বিপ্লববাদী যুবসমাজকে শৃঙ্খলমুক্তির যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনসহ ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে কুমিল্লায়, কলকাতার

সিনেট হলে, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে, দার্জিলিং-এর লেবং-এ এবং মেদিনীপুরে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের উপর সশস্ত্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে একক বীরত্ব এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নির্বাপিত হলো. তার প্রতিক্রিয়ায় বাঙলার বিভিন্ন কারাগারে, বক্সা আর দেউলীর বন্দীশিবিরে এবং আন্দামানে নির্বাসিত অসংখ্য বিপ্লববাদী বন্দীর মতো গোপাল হালদারকেও নিপীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে ১৯১৭ সালে রুশদেশে সংঘটিত প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য অনুপ্রাণিত করল। আর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্যক উপলব্ধি এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুশীলন ও চর্চাও যে অপরিহার্য, সে কথা বুঝে নিতে গোপাল হালদার-এর মতো সচেতন এবং পরিশীলিত মানুষের পক্ষে খুব একটা সময় লাগেনি। প্রেসিডেন্সি জেলে তৎকালে কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রেজ্জাক খাঁ ও ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই ঘটেছে বিপ্লবী ধারার প্রকৃত পরিণতি। এই সময় তাঁর অন্য এক সহবন্দী এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রূপে সুখ্যাত রেবতী বর্মণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও তিনি পেয়েছেন অনেক জিজ্ঞাসার সদুত্তর। বিশেষ করে জেলের মধ্যে গোপাল হালদার 'সংস্কৃতির রূপান্তর' নামক তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ক্লাসিক্যাল গ্রন্থটির খসড়া প্রস্তুত করার সময় বাঙালি সমাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট 'বাঙলার কালচার' অধ্যায়টি রচনার সময় তাঁর 'জ্ঞাননিষ্ঠ বন্ধু কমরেড রেবতী বর্মণের সঙ্গে' আলোচনা করার কথা সানন্দে স্বীকার করেছেন, পরবর্তীকালে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের 'ভূমিকা'-য়।

গোপাল হালদার ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালের প্রথমার্ধে তাঁর আবাল্য লালিত ও বর্ধিত 'প্রবাসী'-র হাওয়ায় এবং রাবীন্দ্রিক ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট মন নিয়ে যৌবনকালে 'প্রবাসী'-অফিসে যখন নিজেই কর্মসূত্রে জড়িত এবং সাহিত্যের উত্তেজনাকর আড্ডায় সময় কাটাচ্ছেন তখন মুসোলিনীর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ এবং ফ্যাসিস্ত-নায়ক তাঁকে কীভাবে বিভ্রান্ত করেন, অনুমান করি, সেটাও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু ঐ সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতে তাঁর পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'-র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত কবির চিঠিতে ফ্যাসিজম-বিরোধিতার বার্তা প্রচারিত হলে অশোকবাবু ফ্যাসিস্ট-তোষণ এবং রবীন্দ্রনাথকে

হেয় করার জন্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকা দুটিকে যেভাবে ব্যবহার করেন, গোপাল হালদার-এর তা নিশ্চয় বিলক্ষণ জানা ছিল। আর, নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার প্রতিই ছিল তাঁর আন্তরিক সমর্থন। এরপর ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া পরিভ্রমণে গেলেন এবং তাঁর সেই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিবরণ 'রাশিয়ার চিঠি' নামে ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'-র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে থাকল গোপাল হালদার তখন আরও অসংখ্য বাঙালী বিপ্লবী যুবক এবং তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মতোই নতুন জিজ্ঞাসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। "···আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"—রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য উক্তির সত্য সন্ধানে তাই কারাগারকেই গোপাল হালদার এবং তাঁর সহবন্দী অনেক বন্ধুই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। রুশ দেশের প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেরণায় তাঁরা অনেকেই মার্কসীয় তত্ত্বের গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং পারস্পারিক নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লববাদী চিন্তা-ভাবনা বর্জন করে নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথ রূপে মার্কসীয় মতাদর্শই গ্রহণ করলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক বিপ্লববাদী যুবক, 'একদা' উপন্যাসের অমিত, 'ইতিহাসের মহাসত্যকে' জানার জন্য সংশয়ক্ষুব্ধ মন নিয়ে যেভাবে অস্থির হয়ে উঠেছিল মাত্র একদিনের ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে নানা স্তরে বিন্যস্ত সেই আত্মান্বেষণ, জীবন-সত্য এবং মানব-সত্যের স্বরূপ সন্ধানের কাহিনী নতুন শৈল্পিক রীতিতে গোপাল হালদার বিধৃত করেছেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'একদা'-য়। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী অবস্থায় মাত্র সাত দিনের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন এই উপন্যাস।

আমি 'একদা' উপন্যাসের গঠনরীতি বা শৈল্পিক তাৎপর্য নিয়ে কিংবা অমিত-এর জীবনের অন্য দুটি দিন নিয়ে ১৯৪১ সালে রচিত দ্বিতীয় পর্ব—'অন্যদিন' অথবা ১৯৪৯ সালে রচিত তৃতীয় পর্ব—'আর একদিন' এবং পরবর্তীকালে এই তিন পর্বকে একত্র করে 'ত্রিদিবা' নামে যে-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার গুণাগুণ নিয়ে এই নিবন্ধে কোনো আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু একটি প্রায়-জানা তথ্যকে পুনর্বার স্মরণ করছি একটু অন্যভাবে।

বাংলা কথাসাহিত্যের বোদ্ধা পাঠক এবং সমালোচকেরা জানেন, গোপাল হালদার-এর 'একদা' উপন্যাসটি প্রথম রচিত 'চেতনাপ্রবাহমূলক' উপন্যাস রূপে

খ্যাত। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, যেহেতু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত এবং গোপাল হালদার-এর 'একদা'-র প্রকাশকাল ১৯৩৯, সেইহেতু এই রীতির প্রথম পথপ্রদর্শক ধূর্জটি প্রসাদ-ই। প্রকাশের কাল ধরলে ধূর্জটিবাবুর স্থানই এক্ষেত্রে প্রথম কিন্তু রচনার কাল-বিচারে গোপাল হালদারকে কি প্রথম স্থান থেকে বিচ্যুত করা যায়?

আর একটি তথ্য জেনেও আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত। গোপাল হালদার-এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে এবং তাঁর সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে গোপালদার জীবন ও সাহিত্যসাধনা নিয়ে যিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং করে চলেছেন, এই সংখ্যা 'পরিচয়'-এরও যিনি আমন্ত্রিত সম্পাদক, আমাদের সেই অনুজপ্রতিম বন্ধু অমিয় ধর আমাকে জানিয়েছেন. তিনি নাকি একদা গোপালদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ইয়োরোপীয় উপন্যাস-সাহিত্যে 'স্ট্রীম অফ কনশাসনেস'-এর প্রবক্তা রূপে খ্যাত জেমস জয়েস, প্রুস্ত বা ভার্জিনিয়া উলফ-এর কোনো উপন্যাস গোপাল হালদার 'একদা' উপন্যাস রচনার পূর্বে পড়েছিলেন কি-না। গোপালদার উত্তর ছিল নাকি নেতিবাচক। গোপাল হালদারকে যতটুকু জেনেছি তাতে তাঁর উক্তিকে অবিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এখানেই আমার বিস্ময়। কোনো ইয়োরোপীয় উপন্যাসের 'মডেল' সামনে না রেখে গোপাল হালদার 'একদা' উপন্যাসে 'চেতনাপ্রবাহের' রূপরীতি নিজস্ব প্রতিভায় উদ্ভাবন করে যেভাবে বৈপ্লবিক জীবন-জিজ্ঞাসার সংশয়ক্ষুব্ধ মানবিক লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙলার প্রগতি-সাহিত্য তথা সমগ্র কথাসাহিত্যেরও তা চিরকালীন সম্পদ। প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে 'একদা' সম্পর্কে তাই দ্বিধাহীনভাবে লিখেছিলেন, "'একদা' (১৯৩৯) শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।···উপন্যাসটির দার্শনিক মননশীলতাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নহে। ইহার সহিত মানব-হৃদয়ের চঞ্চল ঘাত-প্রতিঘাত যুক্ত হইয়া ইহাকে উপন্যাসোচিত গুণে সমৃদ্ধ করিয়াছে।···বৈপ্লবিক মনোভাবের বিশ্লেষণে ও ইহার অসহনীয় অন্তর্জ্বালা ফুটাইয়া তোলার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা এই জাতীয় উপন্যাসের শীর্ষ-স্থানীয়।"

গোপাল হালদার তাঁর বন্দীজীবনে 'বাঙালী মধ্যবিত্তের উত্থাপন-পতনের' কাহিনী নিয়ে বহুব্যাপ্ত কাল-পরিসরে লিখেছিলেন 'ভদ্রাসন' নামে এক সুবৃহৎ সাতখণ্ডের উপন্যাস। [দ্র. সংস্কৃতির রূপান্তর', ১৩৫১ সালের মাঘ মাসে

প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা,' পৃ. ৭] এই উপন্যাসের খণ্ডগুলি অনেক পরে আগু-পিছু নানা সময়ে ৭ খণ্ডে নয়, 'ভূমিকা,' 'নবগঙ্গা,' 'জোয়ারের বেলা,' 'ভাঙন,' 'স্রোতের দীপ' ও 'উজানগঙ্গা'—এই ৬ খণ্ডে বা পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। মননশীল কথাশিল্পীর সুবিস্তৃত পঠন-পাঠন এবং ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষর এই উপন্যাসমালায় বিধৃত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বাঙালীর ভৌমিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে ইংরেজ আমলের 'কলোনীয়াল' শাসন-শোষণের' কালপর্ব পেরিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তের নবজাগরণ, মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙ্গন এবং শেষ পর্যন্ত সেই মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ স্বার্থের নোঙর ছিঁড়ে সমুদ্রসন্ধানী অভিযাত্রায় এসে শেষ হয়েছে এই মহাউপখ্যান।

যোগ্য সমালোচকেরা এই উপন্যাসমালার আঙ্গিকগত দিক অথবা প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করবেন এবং তার সাফল্য-অসাফল্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হবেন। আমি এই উপন্যাসের ছয়টি পর্বে মধ্যবিত্তজীবনের প্রকাশ ও পরিণতির বিষয়বস্তুগত যে-বিপুল ঐশ্বর্য লক্ষ্য করেছি এবং তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জটিলতাকে তুলে ধরার জন্য গোপাল হালদার-এর ইতিহাস-চেতনা ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠ মনের যে-পরিচয় পেয়েছি তাতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় উপন্যাস সৃষ্টি এক বিরল ঘটনা। এ ক্ষেত্রেও গোপাল হালদার-এর পথিকৃতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এরপর গোপাল হালদার ১৯৩৮ সালে কারাগার থেকে মুক্তজীবনে ফিরে এসে ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করে নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যখন জড়িত তার দু-বছর পরে ১৯৪৩ সালে সারা বাঙলা জুড়ে নেমে এলো ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ এক দুর্ভিক্ষের অশনি-সংকেত। বাংলা তেরশো পঞ্চাশ সালে এই সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটে বলে এটা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত বা কুখ্যাত। আমাদের মনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-নীতি এই মহামন্বন্তরের পশ্চাৎপট রচনা করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে বিদেশী সাম্রাজবাদের প্রশয়পুষ্ট আমলাতন্ত্রের চরম ও নির্মম ঔদাসীন্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ শস্যের ভাণ্ডার চলে যায় অসৎ সরকারী এজেন্ট, চোরাকারবারি এবং মজুত-দারদের হাতে। যুদ্ধের কল্যাণে ব্লাকআউট কবলিত শহর আর শহরতলীর অলিতে-গলিতে একশ্রেণীর মূল্যবোধ বিবর্জিত মানুষ নেমে পড়ে নারীদেহের নগ্ন ব্যবসায়। মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তরের ফলে সংকট যত ঘনীভূত হয়, এই পিশাচের

দল ততই স্ফীত হয়ে ওঠে। গ্রামবাঙলা উজাড় করে ক্ষুধার্ত আর নিরন্ন মানুষ একমুঠো ভাত, একটু ফ্যানের আশায় হাজারে হাজারে ছুটে আসে শহরে। তারা ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত বাসি-পচা খাদ্য নিয়ে শেয়াল-কুকুরের মতো কামড়া-কামড়ি করে। মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকে ফুটপাতে। এই অসহনীয় দৃশ্য গোপাল হালদার প্রত্যক্ষ করেছেন, শিউরে উঠেছেন। তাঁর সংবেদনশীল শিল্পী মন ভেবেছে—'এর একটা পরিষ্কার চিত্র রাখা দরকার।' কিন্তু কি ভাবে? শত শত পৃষ্ঠার বই লিখেও তো তা শেষ করা যাবে না, এই কথাই গোপাল হালদার বলেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে তাঁর সেই সাক্ষাৎকারটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সংস্কৃতি ও সমাজ' নামে একটি গবেষণামূলক পত্রিকায়।

যাহোক, পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙলার সমাজ-জীবনে বিরাট ভাঙন সৃষ্টি করেছিল। দীর্ঘকালের লালিত মূল্যবোধকেও দিয়েছিল তছনছ করে। এক কথায় বলা যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙলার সমাজ-সংসারে ও ব্যক্তিজীবনে পতনের এক বিশাল হাঁ-মুখ উন্মোচন করে দিয়েছিল। সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রোত্তর যুগের কয়েকজন প্রধান কথাসাহিত্যিকসহ আরও দু-একজন সাহিত্যিক নীরব থাকতে পারেন নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'অশনি-সংকেত,' তারাশঙ্করের কলম থেকে বেরিয়েছিল 'মন্বন্তর' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'চিন্তামণি' উপন্যাসও ছিল মূলত এই মন্বন্তরেরই ফসল।

এই সময় কলকাতায় আসেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক কমরেড পি সি. যোশী। গোপাল হালদার পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "যোশী এসে বললেন, তোমরা এই মন্বন্তরের কালকে সাহিত্যে Expression দিচ্ছ না কেন? বললাম—কিভাবে দেবো? এ কি দিয়ে শেষ করা যায়?···কিন্তু যোশী বললেন, বড় একটা কিছু কর।" [দ্র. 'প্রসঙ্গ ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'সংস্কৃতি ও সমাজ', ১৯৮৩, পৃ. ৯১]

গোপালদার স্বভাবধর্ম অনুসারে এই বড় কিছু করার তাগিদেই ভাবলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে ছবি এঁকেছেন তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে অন্যান্য সব লেখা থেকেও তো অনেক বেশি সত্য। তেমন একটা কিছু লিখে যেতে পারা দুঃসাধ্য। কিন্তু মডেল আকারে যদি তিনি এই সময়টা ও ঘটনাকে উত্থাপন করে যান, তাহলে পরবর্তীকালে এ দেশে যদি কোনো বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তা অবলম্বন করে, সেই তথ্য সংগ্রহ করে হয়তো

কোনো নতুন 'আনন্দমঠ' লিখতে পারবেন। এই ধারণা থেকে গোপাল হালদার নভেলের দিকে আকৃষ্ট হন। [দ্র. পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার]

এর ফলে করালগ্রাসী সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরকে ভিত্তি করেই গোপাল হালদার রচনা করলেন—'পঞ্চাশের পথ'. 'ঊনপঞ্চাশী' ও 'তেরশ পঞ্চাশ'—মন্বন্তরের ট্রিলজি, ঘটনার ঘনঘটায় আকীর্ণ অবিকৃত এক ভাষাচিত্র'। সাধারণ উপন্যাস থেকে এই 'ডকুমেণ্টারি' উপন্যাসের পার্থক্য নির্দেশ করে গোপাল হালদার 'ভূমিকাপত্রে' নিজেই বলেছেন, "ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব কেমন করে উদ্ঘাটিত হয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন টাইপের মানুষ সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কি বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং বিভিন্ন মানুষের মত ও মন এই ঘটনাবর্তে কেমন করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে এই আমার লক্ষ্য।" ফলে, এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে অসংখ্য চরিত্র উপস্থিত কিন্তু কোনো এক বা একাধিক কোনো নায়ক-নায়িকা নেই. ব্যক্তি-চরিত্রের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণও নেই। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-এর এপ্রিল—এই সময়পর্বই উপন্যাস-ত্রয়ীর নায়ক। সুতরাং এই উপন্যাস কতখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা জানি না. শুধু বলতে পারি—প্রখ্যাত মার্কসবাদী পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট সমালোচক ও সাংবাদিক, প্রয়াত সরোজ আচার্য. একদা এই ট্রিলজি সম্পর্কে ভিকি বাউম-এর উল্লেখ করে বলেছিলেন. রসসাহিত্যের চাইতে নভেলের মধ্য দিয়ে এরকম রেকর্ড রাখা তাঁর কাছে বেশি মূল্যবান মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে. ডকুমেণ্টারি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে গোপাল হালদারই পথিকৃৎ, একথা অস্বীকার করা যায় না। এরপর আর কোনো উপন্যাস না লিখলেও 'ত্রিদিবা,' 'ভদ্রাসন' আর 'মন্বন্তর' উপন্যাসমালার মধ্য দিয়ে গোপাল হালদার শুধু বাংলা প্রগতি-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নি, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যের দিগন্তকেও প্রসারিত করে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই নিবন্ধটি যথেষ্ট দীর্ঘতর হয়েছে. ফলে বুঝতে পারছি এখনি এর রাশ টানা প্রয়োজন। কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোপাল হালদার-এর বিপুল অবদানকে সম্যক উপলব্ধির জন্য এবং তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ও কর্মকাণ্ডের অন্তত কয়েকটি প্রায়-বিস্মৃত অথচ উল্লেখযোগ্য দিক তুলে না ধরেও তো এই নিবন্ধ শেষ করা যায় না। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারি এবার আমি সেই চেষ্টাই করছি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, দীর্ঘ কারাবাসের ফলে অধিকাংশ বন্দীর মনের সরসতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, পারিবারিক জীবন ও বাইরের বহুবর্ণ

বৈচিত্র্যময় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায়-নিঃসঙ্গ কারাজীবনের একঘেঁয়ে যান্ত্রিক জীবনযাত্রা মনকে করে তোলে ক্লান্ত-বিষণ্ণ। এমন কি জেলের মধ্যে একটি কমনীয় মুখ দর্শন করাও তো বিরলতম ঘটনা।

এইসব কারণে মেজাজের ভারসাম্য টাল খায়। অনেকে আশ্রয় নেন কৃত্রিমতার আড়ালে, মুখোশের অন্তরালে থাকে অনেক বন্দীরই আসল মুখ। কেউ কেউ অবশ্যই ব্যতিক্রমী। গোপাল হালদার ছিলেন সম্ভবত সেই ব্যতিক্রমী বন্দীদেরই অন্যতম। না হলে, তাঁর মনের মধুচক্রে কীভাবে তিনি অত রস কোথা থেকে সঞ্চয় করে রাখলেন? কোন রসে মজে প্রেসিডেন্সি আর বক্সা-বন্দীশিবিরে বসে ভাষা-তত্ত্বের গবেষণা, সমাজ-বিবর্তনের ধারা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পর্যালোচনা করে 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর খসড়া, আর বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্মতাকে তীক্ষ্ণধার ও পরিশীলিত করে কৌতুক রসে জারিত 'বাজেলেখা'-র রসনিবন্ধগুলি রচনা করতে পারলেন?

'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থের ঐতিহাসিক তাৎপয সম্পর্কে দু-একটি কথা পরে হয়তো বলতে হবে, কিন্তু যে-রসনিবন্ধ রচনার কাজ নীরস জেলজীবনে শুরু করেছিলেন, মুক্ত জীবনেও গোপাল হালদার সেই রসধারা অক্ষুন্ন রেখে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর 'আড্ডা' ও 'বনচাড়ালের কড়চা' শীর্ষক গ্রন্থ দুটি। এক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। দুঃখের কথা, গোপাল হালদার-এর পরে বাংলা রসসাহিত্যের এই বিশুদ্ধ কৌতুকের ধারা এখন বোধহয় বিলুপ্ত-প্রায়। কবে এর পুনরুজ্জীবন ঘটবে, কে জানে! পরশুরাম, মুজতবা আলি আর গোপাল হালদার ছাড়া সাহিত্যরসের এই ভিয়ান আর কে চালাতে পেরেছেন এমন সার্থক-ভাবে? গোপালদা একজন তরুণ গবেষকের জিজ্ঞাসার উত্তরে একদা বলেছিলেন, "হাসতে হাসতে কান্না বা কাঁদতে কাঁদতে হাসা—এই হলো··বিশুদ্ধ humour, এর মধ্যে শুধুমাত্র লঘুতা দেখা ঠিক নয়। সর্বোপরি মনে রাখতে হয়, 'I am a man and I am interested in everything human.'।" আমার ধারণা, যা-কিছু মানবিক তার প্রতি আগ্রহ যেমন গোপালদাকে নানা শুভকাজে প্রবৃত্ত করিয়েছে, তেমনি এই রসরচনাগুলির সৃষ্টির মূলেও রয়েছে তাঁর সেই একই ঔৎসুক্য।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। পোগাল হালদার যখন ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দী তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতে এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যা না জানলে তার অভিঘাতে গোপালদার মানস-গঠনের

প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। সুতরাং তার প্রতি অতি সংক্ষেপে ও চকিত দৃষ্টিতে আমাদের একবার তাকানো প্রয়োজন।

বন্দীজীবনের এক বছরের মধ্যেই গোপাল হালদার জানলেন, ইতালির ফ্যাসিস্ট-নায়ক মুসোলিমীর দোসর অন্য এক ফ্যাসিস্ট-নায়ক, নাৎসীবাদের প্রবক্তা, হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করেছেন। তাঁর নির্দেশে ১৯৩৩ সালের ১০ মে বার্লিনের রাজপথে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বের প্রায় সকল মনীষীর—শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-বিজ্ঞানীর সঞ্চিত জ্ঞানের ফসল—সব ধরনের গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব। ১৯২৯ সালে ঐতিহাসিক মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলায় বাঙলার সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করার পর যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি' গঠনের মাধ্যমে সেই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য তৎপর হলেন আবদুল হালিম, রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জির মতো তৎকালীন কিছু তরুণ নেতা। আর, ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্দী মুক্ত হয়ে এসে গঠন করলেন কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলে ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠায় আতঙ্কিত ব্রিটিশ শাসক ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার শাখা-সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। এই আদেশ মান্য করেই বাঙলার তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার কমিউনিস্ট পার্টির 'কলকাতা কমিটি'সহ ১৩টি গণসংগঠনকে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। [দ্র. Home / Poll / 1935 / F 24 / 15]

অন্যদিকে, ১৯৩৫ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম অধিবেশনে গৃহীত হয় ডিমিট্রভ-এর 'যুক্তফ্রন্ট'-তত্ত্ব, আর সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দত্ত-ব্রাডলি থিসিস্ অনুযায়ী শুরু হয় ভারতে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণফ্রন্ট' গঠনের কাজ।

সমগ্র ইয়োরোপ ঐ সময় হিটলার ও মুসোলিনীর উদগ্র সাম্রাজ্যলালসা আর যুদ্ধ-প্রস্তুতির ফলে যখন ভীত-সন্ত্রস্ত তখন ফ্যাসিজমের এই দানবিক ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রোলাঁ, গোর্কি এবং অ্যাঁরি বারব্যুস সারা বিশ্বের বিবেকবান প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকে আহ্বান জানালেন

প্রতিরোধ-আন্দোলনে সামিল হতে। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হলো শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আঁদ্রে জিদ, ঈ. এম. ফস্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হ্যাক্সলি থেকে শুরু করে মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্রাচি প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষীরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবপ্রেমিক সব শিল্পী-সাহিত্যিককে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। ইয়োরোপ-প্রবাসী ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি রূপে খ্যাতিমান সাহিত্যিক মুলক্‌রাজ আনন্দ যোগ দিয়েছিলেন এই বিশ্ব-সম্মেলনে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩২-৩৫ সালে একদা লণ্ডন-প্রবাসী মুলক্‌রাজ আনন্দ, সজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ প্রমুখ একদল প্রতিভাবান ভারতীয় ছাত্র মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে এসে প্রগতিসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। এঁরা অনুপ্রাণিত হন রোলাঁ, গোর্কি, বারবুস, ফস্টার, জিদ, স্ট্রাচি প্রমুখ মনস্বীদের ফ্যাদিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আহ্বানে এবং হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বার্ট রীড, মন্টেগু শ্ল্যাটার, পামি দত্ত প্রভৃতি ব্রিটিশ লেখক-বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনায়।

পূর্বোক্ত তরুণ ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষান্তে দেশে ফিরে এসে স্বদেশের মাটিতে তাঁদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় মুন্সী প্রেমচন্দ-র সভাপতিত্বে কংগ্রেস-মন্ডপেই ১০ এপ্রিল গঠিত হলো 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সজ্জাদ জহীর। এই সম্মেলনে বাঙলার প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হীরেনবাবু পরবর্তীকালে 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে ঐ সম্মেলনে যোগদানকারী বাঙলার অন্য দু-জন প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁদের নাম জানান নি। ফলে, তাঁদের পরিচয় আমার কাছে আজও অজ্ঞাত।

কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশন-মন্ডপে মূলত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হয় আরও দুটি গণসংগঠন। একটি—স্বামী সহজানন্দ-র সভাপতিত্ব গঠিত 'নিখিল ভারত কিষাণ সভা,' অন্যটি—মহম্মদ আলি জিন্না-র সভাপতিত্বে গঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'। এই তিনটি সংগঠনই পরবর্তী সময়ে বাঙলা

তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ও গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নানা ভাঙা-গড়ার মধ্যেও সংগঠন তিনটি আজও সক্রিয়।

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের পর ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার এলবার্ট হলের (বর্তমান কফি হাউস) কমিটি রুমে গোর্কির মৃত্যুতে একটি শোকসভার আয়োজন করেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই শোকসভা থেকেই ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে গঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'।

সমসাময়িক কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটে আর এক ভয়ংকর বিপর্যয়কারী ঘটনা। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই স্পেনের বৈধ রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কো সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। মুসোলিনী-হিটলার-এর মদত-পুষ্ট ফ্রাঙ্কোর বোমা বর্ষণে, কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হতে থাকে স্পেনের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি। এই ফ্যাসিস্ত বর্বরতাকে প্রতিহত করার জন্য ১৯৩৬ সালের ২০ নভেম্বর মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিশ্ববাসীর কাছে এক আকুল আবেদন জানান। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয় রোলাঁর সেই আবেদন। এই আবেদন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ঐ বছরের মার্চ মাসেই গড়ে ওঠে 'লীগ এগেন্স্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়্যার'-এর সর্বভারতীয় কমিটি। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর পদ গ্রহণে সম্মত হন কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। কার্যকরী সভাপতি (চেয়ারম্যান) হন অধ্যাপক কে. টি. শাহ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমিটির সদস্য হয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে ভারতের সব কয়টি প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের জন্য নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৫টি প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে, মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় দুটি প্রদেশে। বাকি চারটি প্রদেশে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও মুসলিম লীগ অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। বাঙালায় ফজলুল হক-এর কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস কোয়ালিশনে

যেতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে, ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে গঠন করেন প্রাদেশিক সরকার।

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালের শেষ দিক থেকে বাঙলার বিভিন্ন জেলে ও বন্দীনিবাসে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীরা মুক্তি পেতে শুরু করেছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীরা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল বন্দীই ১৯৩৭ সালের মধ্যে কারামুক্ত হন। গোপাল হালদারও মুক্তজীবনে ফিরে আসেন ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু ১৯৩৮ সালের বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন অন্তরীণাবদ্ধ।

জেলের মধ্যে গোপাল হালদার আত্মানুসন্ধান ও গভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী মতাদর্শ গ্রহণ করলেও জেলে বা বন্দীনিবাসে সংগঠিত কোনো 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন'–এ যোগ দেন নি। কারারুদ্ধ অবস্থায় পূর্ব–কথিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, গোপল হালদার-এর মতো সচেতন ও সংবেদনশীল মানুষের মনে নিঃসন্দেহে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তবু, জেলের বাইরে এসেও প্রায় আড়াই বছর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদও গ্রহণ করেন নি। এর একটা কারণ বোধহয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের বন্ধনকে তিনি ছিন্ন করতে চাননি, অন্য কারণ সম্ভবত কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপকেও তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। ফলে আমরা দেখলাম, ১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এবং সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হলেন।

এই সময়, ১৯৩৮–এর ডিসেম্বরে, কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যোগ দিতে এসেছিলেন বহু খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। কলকাতার প্রায় সকল অগ্রগণ্য শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবীও এই সম্মেলনে সক্রিয়ভাবেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও একটি বাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমি দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করে প্রগতি-লেখক আন্দোলনের যেসব তথ্য-দলিল ও লিখিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছি, তার কোথাও এই সম্মেলনে গোপালদার উপস্থিতির কোনো প্রমাণ খুঁজে পাইনি। একথা সত্যি—গোপাল হালদার-এর কোনো গ্রন্থই তখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু একথাও তো সত্যি ১৯২১ সাল থেকে তাঁর বেশ কিছু

গল্প-কবিতা ও নিবন্ধ বাঙলার কয়েকটি প্রধান সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কারামুক্তির কিছুদিন পরেই তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর আমন্ত্রণে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৪০ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত একটানা প্রায় দু-বছর মাসিক ৫০ টাকা দক্ষিণার বিনিময়ে 'মডার্ন রিভিয়্যু' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'Foreign Affairs' এবং 'বহির্জগত' ও 'দেশবিদেশের কথা' বিভাগে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও রাজনীতি নিয়ে প্রতি মাসে বিচার-বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ লিখেছেন। এহেন একজন লেখক-ব্যক্তিত্ব প্রগতি লেখক সম্মেলনে কেন অনুপস্থিত ছিলেন তার রহস্য আমার অজানা। একমাত্র শ্রদ্ধেয় হীরেন মুখার্জি মশায় সম্ভবত এই রহস্যের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারবেন।

যাহোক, সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে কাজ করার সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত কৃষক সভার সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমশ কৃষক-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে এদেশের কৃষকশ্রেণীই বোধহয় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক নিপীড়িত। সুতরাং নোয়াখালির গোপাল হালদার-এর আবাল্য পরিচিত কৃষকদের শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে সামিল হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও পুনর্বার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতায় তাঁর পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে, ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে রাজনৈতিক সংগঠনটি গঠন করেন। গোপাল হালদারও সুভাষচন্দ্রের সহকারী হিসাবে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত হন। বাঙলার ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে যে-ফ্লাউড কমিশন গঠন করে তার কাছে কৃষকসভার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করার উদ্দেশ্যে কৃষকসভার নেতৃবৃন্দ তথ্যদলিল প্রস্তুত করতে থাকেন। গোপালদা ছিলেন সেই স্মারকলিপি রচনার অন্যতম প্রধান রূপকার। ১৯৮০ সালের ১৩ মে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত গোপালদাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য আয়োজিত এক সভায় কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর অসাধারণ মনীষার নানা প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলেছিলেন, "কৃষক আন্দোলনের খুঁটিনাটি, ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট কি করে তৈরি করা যায়, তার জন্য সমস্ত খুঁজে পেতে [দেখেছিলেন]। সেই মশলা তৈরি করা খুব কম কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলনা, যা গোপালদা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে সম্পাদন করেছিলেন।"

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, গোপাল হালদার তাঁর নানা লেখালিখি এবং পত্রিকা সম্পাদনার বহুবিধ কাজের মধ্যেও ১৯৩৯ সালের মে মাসে মালদহ জেলার নঘরিয়াতে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং প্রচার-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ বছর গয়ায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষকসভার চতুর্থ সম্মেলনে কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, আবদুল্লাহ রসুল, মনসুর হবিবুল্লাহ, বিমলপ্রতিভা দেবী প্রমুখের সঙ্গে গোপাল হালদারও বাঙলার প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে আখ্যা দিয়ে 'না এক পাই—না এক ভাই' নীতি অবলম্বন করে। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি নেমে আসে কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত নেতা ও কর্মীদের উপর। এই দমন-পীড়নের হাত থেকে রেহাই পাননি কৃষকসভার নেতা মজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, গোপাল হালদার-এর মতো নেতারাও, একথা লিখেছেন আবদুল্লাহ রসুল তাঁর 'কৃষকসভার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে। [দ্র. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১১৪]

এই পরিপ্রেক্ষিতে আধা-বেআইনী অবস্থার মধ্যে ১৯৪০ সালের জুন মাসে যশোহর জেলার পাঁজিয়াতে কৃষকসভার যে-চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনে প্রায় আত্মগোপন করেই অন্যান্য নেতাদের মতো গোপাল হালদারও যোগ দেন এবং তিনি পুনর্বার প্রচার-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার নলিতাবাড়িতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ প্রাদেশিক সম্মেলনে গোপাল হালদার উদ্বোধন করেন শহীদ 'সোমেন চন্দ প্রদর্শনী'। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে অনুষ্ঠিত সপ্তম এবং ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষকসভার অষ্টম সম্মেলনে পর পর দুবছর তিনি সভাপতিপরিষদের অন্যতম সদস্যরূপে সভাও পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে গোপাল হালদার শেষ পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামে সাফল্য অর্জনের জন্য যে-জাগ্রত জনশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন. সেই 'জন—আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্ররূপে প্রথম থেকেই নেমেছিলেন কৃষকের মধ্যে কাজে'। একটানা সাতবছর তিনি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন কৃষকসভার সঙ্গে। অথচ মার্কসীয় মতাদর্শ গ্রহণ করে জেল থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথমে যোগ দেন নি। 'কালান্তর' পত্রিকার ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় গোপাল হালদার এক সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন, "পার্টি'তে যোগ দিচ্ছি

না, যদিও ভালো করেই জানি কৃষকসভা কমিউনিস্ট-পরিচালিত। কাজের মধ্যে দিয়েই দেখিনা কী সম্পর্ক দাঁড়ায়।”

অবশেষে কাজের মধ্য দিয়ে যাচাই করেই গোপাল হালদার বুঝেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর কাছে 'সার্বিক মুক্তির বহমান ঝর্না।' সুতরাং গোপাল হালদার-এর মতো 'প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি' [কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর উক্তি] ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।

এর মধ্যেই গোপাল হালদার- এর জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। তাঁর কারাজীবনে রচিত প্রথম উপন্যাস 'একদা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। বাঙলার শিক্ষিত পাঠকসমাজের একাংশের কাছে সেই উপন্যাস সমাদৃতও হয়েছে। এই উপন্যাসের সমালোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত সংস্কৃতি-বিষয়ক 'বামপন্থী মাসিক পত্রিকা'রূপেঘোষিত 'অগ্রণী'র প্রথম বর্ষের একাদশ সংখ্যায় [নভেম্বর, ১৯৩৯]। আর, যেহেতু সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের উপর গোপাল হালদার-এর ছিল গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা, সেইহেতু তিনি 'ফরওয়ার্ড-ব্লক' পত্রিকার সম্পাদনার কাজসহ সুভাষচন্দ্র-র রাজনৈতিক কাজেরও সহযোগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র এই সময় তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজের মিথ্যাচারের প্রতীক কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন সূচনা করার কথা ঘোষণা করেন। আন্দোলনের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হয় ১৯৪০-এর ৩ জুলাই। কিন্তু আন্দোলন শুরু করার আগের দিন, ২ জুলাই, সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন। অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে প্রেসিডেন্সি জেলে সুভাষচন্দ্র ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু করেন অনশন। তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায় ১৯৪০ সালের ৬ ডিসেম্বর আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে স্বগৃহেই অন্তরীণ করে রাখে। এই অন্তরীণ থাকা কালেই, ৪০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগে, ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি শেষরাতে পুলিশের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সুভাষচন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হলেন এক অজানার পথে।

সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী গোপাল হালদারও এই অন্তর্ধানের আভাস-ইঙ্গিত সম্ভবত পেয়েছিলেন বসু-গৃহে তাঁর সঙ্গে একদা গোপন আলাপ-আলোচনায়

মিলিত হয়ে। যতদূর মনে পড়ছে, গোপাল হালদার এমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত তাঁর স্মৃতিচারণমূলক এক রচনায়।

যাহোক, ১৯৪০ সালের কোনো এক সময় আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর মালিক সুরেশচন্দ্র মজুমদার-এর আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র-র সম্মতি নিয়েই গোপাল-হালদার সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন ঐ সংবাদপত্র-গোষ্ঠী পরিচালিত ইংরেজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায়। এখানেই তিনি প্রায় দুই বছর তাঁর জীবনের 'প্রথম সাধ', অর্থাৎ সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করেছিলেন। 'হিন্দুস্থান স্টান্ড্যার্ড'-এ তাঁর রচিত অনেক উচ্চমানের সম্পাদকীয় নিবন্ধের কথা পরবর্তীকালে শুনেছি, গোপালদার গুণমুগ্ধ বেশ কিছু সহযোদ্ধার মুখে।

পূর্বেই বলেছি, বাঙলার কৃষক-আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার সময় গোপাল হালদার গ্রহণ করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনী। তবু, 'কর্ম ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' অর্জনের কাজে গোপাল হালদার কখনো বিচলিত হননি। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর উপর যে-দায়িত্ব যতটুকু ন্যস্ত করেছে, গোপাল হালদার তা সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন। এর জ্বলন্ত প্রমাণ পরবর্তীকালের ঘটনাবলী এবং গোপাল হালদার-এর কর্মতৎপরতা।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের ২২ জুন ফ্যাসিস্ট-দস্যু হিটলার-এর নাৎসীবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ হানে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর। নানা কারণে, বিশেষ করে মার্কসীয় মৌল আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে আজ সেই সোভিয়েত-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ঘটলেও, তখন কিন্তু নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃজনের জন্য সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বিশ্বের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ।

হিটলার-এর ফ্যাসিস্ত বাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা এবং এই দুর্দিনে সোভিয়েতের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য এগিয়ে এলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, রাধারমণ মিত্র, জ্যোতি বসু প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা। ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই সমগ্র দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে 'সোভিয়েট-দিবস' উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানানো হয়। সেই উপলক্ষে কলকাতার টাউন

হলে সাংবাদিকপ্রবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল জনসভা থেকে গঠিত হয় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' বা 'Friends of Soviet Union' নামে সংগঠনটি। এই সমিতি গঠনের প্রাক্কালে বাঙলার ৭৪ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ বিপন্ন সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিটি 'মানবকল্যাণে সোভিয়েটের অবদান / নাৎসী সামরিক অভিযানে পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা / সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বাংলার মনীষীবৃন্দের সহানুভূতি' —এই শিরোনামে ১৯৪১ সালের ২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী রূপে বড় হরফে মুদ্রিত ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর নাম। স্বাক্ষরকারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোপাল হালদার। ঐ বিবৃতিটি যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিনই—অর্থাৎ ২০ জুলাই, দেখা যাচ্ছে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে গোপাল হালদার-এর অন্য একটি বিবৃতি। নিখিল ভারত কিষাণ সভার অস্থায়ী সম্পাদক রূপে তিনি লণ্ডনস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কির কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে জানাচ্ছেন ঃ "আগামী কল্য কিষাণ সভার উদ্যোগে পাঁচ লক্ষ কৃষক 'সোভিয়েট দিবস' পালন করিবে। ডঃ স্যার পি. সি. রায় প্রমুখ বহু লেখক ও বিদ্বান ব্যক্তি এবং দশ বারো জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এতৎসম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবে। [দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ জুলাই, ১৯৪১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' ১৯৪১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ করে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এস. কে. আচার্য (স্নেহাংশুকান্ত আচার্য) সম্পাদিত 'The Land of the Soviets' নামে ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন গোপাল হালদার। সেই প্রবন্ধের নাম ঃ 'The Soviet State'। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন—জ্যোতি বসু, স্টেলা ব্রাউন, অনিলা বোনার্জি, এস উপাধ্যায়, এস. কে. আচার্য, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মণিকুন্তলা সেন ও হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সহ আরো দুজন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন—'Friends of the Soviet Union-এর পক্ষে 'পুঁথিঘর'-এর এস. উপাধ্যায় নামে প্রখ্যাত প্রগতিশীল হিন্দী-সাংবাদিক।

ঐ সেপ্টেম্বর মাসেই (ভাদ্র, ১৩৪৮) 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত হয় গোপাল হালদার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সুকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সোভিয়েট দেশ' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ-সংকলন। ইংরেজি ও বাংলা সংকলন গ্রন্থ দুটিই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে এবং খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু দুটি সংকলন-গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী পর্যালোচনা করে অনায়াসে বলা যায়, গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সোভিয়েট দেশ' গ্রন্থখানি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে শুধু বাংলা ভাষায় নয়, সম্ভবত সমগ্র ভারতীয় ভাষার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত অনবদ্য একটি প্রবন্ধ-সংকলন। ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ইতিহাস, জাতি-উপজাতি নিয়ে মহাজাতি গঠন, শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্পদ, নারী ও শিশুর প্রতি কর্তব্য পালন, শিল্প-সাহিত্য, ফৌজীব্যবস্থা, পররাষ্ট্র নীতি এবং সোভিয়েট নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এমন বহুব্যাপ্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনা এবং রচনাশৈলীর এমন গুণগত মান ছিল সত্যিই অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র এই সংকলনটি সম্পাদনা করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই যুগের সোভিয়েত-সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক সম্পদ। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন সুবোধ চৌধুরী, যিনি ১৯৩৯ সালে নভেম্বর মাসে 'অগ্রণী' পত্রিকার একাদশ সংখ্যায় গোপাল হালদার-এর প্রথম গ্রন্থ তথা কালজয়ী উপন্যাস 'একদার'-ও ছিলেন প্রথম সমালোচক।

এই সময় ১৯৪১ সালের ২২ আগস্ট প্রকাশিত হয় বিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকা। এই পত্রিকা ছিল প্রথমাবধি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার বাহক। 'অরণি' পত্রিকায় গোপাল হালদার 'নীপারের বাঁধ' শীর্ষক কবিতাসহ লিখেছিলেন নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

এছাড়া 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' এবং ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিস্ট-সমর্থক একটি রাজনৈতিক দলের গুন্ডাদের হাতে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হওয়ার পরে ২৮ মার্চ গঠিত 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' কর্তৃক ১৬ খানি পুস্তিকা প্রকাশের কথা আমরা বিজন রায় ছদ্মনামে লেখা অধ্যাপক সুশোভন সরকার-এর 'জাপানী যুদ্ধের আসল রূপ' শীর্ষক পুস্তিকার চতুর্থ কভারে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পেরেছি। দেখছি, ঐ পুস্তিকামালার মধ্যে আছে গোপাল হালদার-রচিত 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস,' 'সোভিয়েট যুদ্ধ

ও ভারতবর্ষ" এবং 'সোভিয়েট কী লড়াই ঔর হামারা কর্ত্তব্য' শীর্ষক তিনটি পুস্তিকা। বিজন রায় ছদ্মনামে সুশোভনবাবুর ঐ পুস্তিকাটির প্রকাশ কাল জুলাই, ১৯৪২। আর, প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে যেহেতু তারকা-চিহ্ন দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে গোপাল হালদার রচিত পুস্তিকা তিনটি নিঃশেষিত, সেইহেতু আমরা অনুমান করতে পারি, উক্ত পুস্তিকাগুলি ১৯৪১ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের আগেই রচনা করেছিলেন গোপাল হালদার। পুস্তিকাগুলি দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় বুঝা যায়, তৎকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমত গঠনে ঐ পুস্তিকাগুলির ভূমিকাও ছিল কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

এত সব কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত থেকেও পোগাল হালদার বাঙলার পাঠকদের হাতে তুলে দিলেন তাঁর জীবনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল—'সংস্কৃতির রূপান্তর'। গোপাল হালদার তাঁর গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বলেছিলেন, "এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার সহিত সাধারণ বাঙালী পাঠকের সামান্য পরিচয় সাধন।" 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে।

আমি দীর্ঘকাল প্রগতি-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে লক্ষ্য করেছি, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মার্কসীয় তথা বস্তুবাদী দৃষ্টিতে গোপাল হালদার-এর সমকালে বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন মাত্র। এমন কি, ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হওয়ার পর বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ-র প্রথম অবদান রূপে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'Towards Progressive Literature' এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থ দুটিতে অনেক গণ্যমান্য লেখকের রচনা সংকলিত হলেও একমাত্র ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ধূর্জটিপ্রসাদের লেখার মধ্যেই অস্পষ্ট হলেও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রগতি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি সামান্য কথাই লিপিবদ্ধ আছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে গোপাল হালদার-এর 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-ই সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালী পাঠকদের কাছে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবসমাজের ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতিও কীভাবে খাত বদল করে বা রূপান্তরিত হয় তার একটা প্রণালীবদ্ধ চিত্র তুলে ধরে। শুধু সেই যুগে কেন, আজকের দিনেও এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। এই অর্বাচীনও সুদূর মফঃস্বল শহরে বসে আরও দু-

একজন সহযাত্রীসহ ১৯৪৪-৪৫ সালে 'সংস্কৃতির রূপান্তর' পাঠ করে 'সংস্কৃতির অর্থ কি ?' তা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছিল। পরে জেনেছি, বাঙলার আরও অসংখ্য সাংস্কৃতিক কর্মীকে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থই বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংস্কৃতি-বিচারে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে।

গোপাল হালদার এখানেই থামেন নি। তিনি নিরলসভাবে লিখেছেন বাঙালীর বাস্তব ও মানস-সংস্কৃতির অতীত আর বর্তমানের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে, আবার তুলে ধরেছেন ভাবী সংস্কৃতির সম্ভাবনার রূপরেখাও। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থে এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলিত আছে। এই গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে এমন একটি নিবন্ধ, যা তিনি ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে লিখেছিলেন 'কমিউনিস্ট কর্মীদের উদ্দেশ্যে।' তাঁর সেই 'কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব' শীর্ষক নিবন্ধটি আজও প্রতিটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীর অবশ্য পাঠ্য বলে আমি মনে করি। এই সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি তাঁর রচিত 'বাঙালী সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ,' 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি,' দুই খণ্ডে রচিত 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' এবং ইংরেজী আর রুশ সাহিত্যের রূপরেখা নামে গ্রন্থগুলি। প্রতিটি গ্রন্থেই আছে এমন কিছু নতুন দিক, এমন কিছু নতুন বিচার-বিশ্লেষণ, যা আমাদের ভাবায় এবং মনের দিগন্তকেও করে প্রসারিত।

চল্লিশের দশকে মার্কসীয় মতাদর্শে পরিপুষ্ট যে-তিনটি প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে অন্য এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সমগ্র বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রতিটির পুরোভাগেই ছিলেন গোপাল হালদার। এর একটি হলো—পূর্বে আলোচিত এবং সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ,' অন্য দুটি হলো—সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৪২ সালে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং ১৯৪৩ সালে সংগঠিত 'গণনাট্য সংঘ'। এর প্রত্যেকটির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন গোপাল হালদার।

সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের পর বাঙলার বিচলিত ও মর্মাহত ২৩ জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন [দ্র. আনন্দবাজার, ২৩ মার্চ, ১৯৪২]। কিন্তু তার আগেই, সোমেন-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পরে, ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ-র পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসরে পক্ষে সুধীন্দ্র প্রামাণিক, লেবার পার্টির পক্ষে নন্দলাল বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে অরুণ ভট্টাচার্য এবং

নিখিল ভারত কিষাণ সভার পক্ষে গোপাল হালদারও একটি বিবৃতি প্রচার করেন। [দ্র আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ মার্চ, ১৯৪২]

অনুরূপভাবে দেখতে পাচ্ছি, ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনিস্টিটিউট হলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখকদের একটি সম্মেলন (কনভেনশন বলাই সঙ্গত) অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি 'Anti Fascist Writers' Conference' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য়। সেই সম্মেলনের সম্ভাব্য বক্তাদের নামের মধ্যে গোপাল হালদার-এর নামসহ ছিল শ্রীযুক্তঅতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্র মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, সুরেন্দ্র গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রথমনাথ বিশী, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সরোজ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, নীহার রায়, বিষ্ণু দে ও নীলিমা দেবীর নাম। [দ্র. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮ মার্চ, ১৯৪২] এই সম্মেলন বা কনভেনশন থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্তকে সভাপতি ও বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আহ্বায়ক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

পরের দিন, অর্থাৎ ২৯ মার্চ (১৯৪২) পূর্বোক্ত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলনের একটি প্রতিবেদন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' য় প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনে আছে, 'অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার' প্রমুখ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও ছাত্রসম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ হইয়া একযোগে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করিতে আহ্বান জানান।' পূর্বোক্ত সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের মধ্যেও ছিলেন গোপাল হালদার। [দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ মার্চ, ১৯৪২]

সংগঠনের কাজে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে গোপাল হালদার সুদূর বাখরগঞ্জেও (অধুনা বাংলা দেশের বরিশাল জেলা) গিয়েছেন। বরিশাল টাউন হলে ১৯৪২ সালের ১০-১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে গোপাল হালদার সভাপতিত্ব করেন। সোমেন চন্দ-র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবি ও লেখকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালের 'অরণি' পত্রিকার ১৭ এপ্রিল সংখ্যায়।

শহীদ সোমেন চন্দ-র স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য গোপাল হালদার এককভাবে যে-দায়িত্ব পালন করেছেন তাও অতুলনীয়। সোমেন-এর মৃত্যুর পর

প্রকাশিত তাঁর গল্পসংকলন 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থখানির একটি দীর্ঘ আর অনবদ্য পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন তিনি ১৯৪৩ সালের ৫ মার্চ 'অরণি' পত্রিকায়। 'সংকেত' নামে লিখিত এই নিবন্ধটিই বাংলার প্রগতিশীল পাঠকদের কাছে সোমেন-এর সাহিত্য-প্রতিভাকে সর্বপ্রথম উন্মোচিত করে। ১৯৪৩ সালে ১ আগস্ট ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-র পক্ষে US— People's Symposium' নামে গোপাল হালদার সম্পাদিত একটি সংকলনে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত সোমেন চন্দ-র বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর'-এর অশোক মিত্র (আই. সি. এস)-কৃত ইংরেজি অনুবাদটি 'Mice' নামে প্রকাশিত হয়। আর, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত সোমেন চন্দ-র দ্বিতীয় গল্প-সংকলন 'বনস্পতি'-র ভূমিকাটি লেখেন স্বয়ং গোপাল হালদার।

নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-র মাধ্যমে অতঃপর শুরু হয় নতুনতর এক সংস্কৃতিকে সমগ্র বাঙলা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ। শিল্প-সাহিত্য-নাটক-নৃত্যকলায় গণজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে থাকে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় সংঘের প্রথম সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন দু-একজন ছাড়া বাঙলার প্রায় সব কবি-সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবী। সম্মেলন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি ও কবি বিষ্ণু দে আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে নতুন যে-কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয় তারও সদস্য ছিলেন গোপাল হালদার। সেই ক্রম-বিস্তৃত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ১৯৪৪ সালের ১৫–১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় সংঘ-র দ্বিতীয় সম্মেলন। প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সভাপতিত্বে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন দেববর্মণ, অতুল বসু, আবুল মনসুর আহম্মদ এবং গোপাল হালদারকে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমন্ডলী। ১৯৪৪ সালের ২৬ জানুয়ারি 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই সম্মেলনে অন্যান্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক-দের সঙ্গে গোপাল হালদারও বক্তৃতা করেন।

ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছিল প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘ। বাঙলার নাট্যকলায় শিশির ভাদুড়ীর যুগের অবসান ঘটে এই গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে। এই সংঘে তখন যোগ দিয়েছেন প্রতিভাধর নট-নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক এবং নবযুগ সৃষ্টিকারী রূপে অভিহিত মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, চারু ঘোষ, সুধী প্রধান, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ স্বনামধন্য

অভিনেতা ও অভিনেত্রী আর সংগঠক। এই গণনাট্য সংঘই বাঙলার সংস্কৃতিতে অন্য এক রেনেসাঁস-এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং 'মার্কসবাদী রিনাসেন্স'-এর অন্যতম প্রবক্তা গোপাল হালদার কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন? না, গোপাল হালদার নিজে নাটকের লোক না হওয়া সত্ত্বেও 'গণনাট্য সংঘ' থেকে দূরে সরে ছিলেন না। 'বহুরূপী' পত্রিকায় 'নবান্ন স্মারক সংখ্যায়' গোপাল হালদার লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বা অভিনয়কলার বিকাশের ধারায় পর্বান্তর ঘটিয়েছিল 'নবান্ন', দর্শক হিসাবেও তা অনুভব করেছি। সে এক যুগাবর্তন।" "···নবান্নের মহলার সেসব দিনগুলির কথা আমার কাছে তাই স্মরণীয় হয়ে আছে। কেমন করে একদল মানুষ একটা আদর্শের টানে একত্র হয়, শিল্পের মধ্য দিয়ে একপ্রাণতা লাভ করে,—'নবান্নে'র উদ্যোগ, আয়োজন, মহলা ও অভিনয় আমার চোখে তার একটা অক্ষয় প্রমাণ।" "···নবান্নের' যুগাবর্তনের নায়ক কে? সে এক মহাশিল্পী, মহাপ্রযোজক—এক প্রাণময় জীবনাদর্শ। [দ্র· বহুরূপী, নবান্ন স্মারক সংখ্যা —১, অক্টোবর, ১৯৬৯, সম্পাদনা ; চিত্তরঞ্জন ঘোষ]।

আমরা জানি, গোপাল হালদার 'নবান্ন' নাটকের শুধুমাত্র দর্শক ছিলেন না। মার্কসীয় জীবনাদর্শের প্রাণময়তা তাঁকেও টেনে এনে দাঁড় করিয়েছিল অভিনয়-মঞ্চে। গোপাল হালদার নিজেই এক বৃদ্ধ ভিখারীর ভূমিকায় 'নবান্ন' নাটকে খালি গায়ে অভিনয় করেছিলেন। আমি যেন এখনও শুনতে পাচ্ছি তাঁর সেই কন্ঠস্বর—'ওরে তোরা ফিরে যা, ফিরে যা—।'

১৯৪৪ সালে, 'নবান্ন' অভিনয়ের বছরেই, গোপাল হালদার প্রগতি-সংস্কৃতির প্রধান মুখপত্র 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৪৪-১৯৪৮ সাল এবং ১৯৫২-৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি দু-দফায় একটানা এই গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন। এই সময়কালে বাংলা সংস্কৃতির এমন কোনো দিক নেই, যা উঠে আসে নি গোপালদার অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সমালোচনায় 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায়। মাঝখানে যে-তিন বছর 'পরিচয়' সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর বিরতি তা ইচ্ছাকৃত নয়।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'অতিবামপন্থী হঠকারিত'ার যে লাইন গৃহীত হয় তার ফলে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গোপাল হালদারও নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারে পুনর্বার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে তিনি মুক্তি পেলেও সেই সময় 'পরিচয়' পত্রিকাও হয়েছে

দমন–পীড়নের শিকার। এরপর সেই 'অতিবামপন্থী হঠকারী নীতি' অনুসরণ করে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন অন্যতম প্রধান নেতা ভবানী সেন-এর বিধ্বংসী রচনা—'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'। সেই প্রবন্ধে ভবানীবাবু রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যকে বর্জন করার কথা ঘোষণা করেন। গোপাল হালদার এই বক্তব্যকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু পার্টির সেই ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগত আলোচনায় তাঁর ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও দীর্ঘদিন লিখিতভাবে কিছু জানান নি তিনি। আর, অতিবাম-পন্থী পার্টি নীতি অনুসরণ করার সময় পার্টি-শৃঙ্খলার সাঁড়াশীচাপের মধ্যে তা করাও সহজসাধ্য ছিল না। কিছুদিন তাঁকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও সহ্য করতে হয়। কিন্তু ১৯৫০ সালে ২৮ জানুয়ারি বি. টি. রণদিভের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত 'অতি-বামপন্থী মতান্ধ হঠকারী' নীতির সমালোচনা 'কমিনফর্ম'-এর মুখপত্র 'লাস্টিং-পীস'—এ প্রকাশিত হলে এখানেও শুরু হয় আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। এই সময় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা ও কর্মীরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের প্রতি বিষোদ্গার শুরু করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গোপালদা কোনো গোষ্ঠী বা উপদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজের অবস্থানে অবিচল থেকে বহু সহকর্মীর সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন কিংবা প্রগতি লেখক সংঘ-র ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিসে প্রকাশ্য সাহিত্যবৈঠকে উপস্থিত থেকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অভিমত।

এই সময়কালে, ১৯৫০ সালের মে মাসে (বৈশাখ, ১৩৫৭), প্রকাশিত হয় অনিল সিংহ-র সম্পাদনায় 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকা। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ সালে, 'সংস্কৃতি সাময়িকী' বিভাগে 'পঁচিশে বৈশাখ' শিরোনামে গোপাল হালদার সর্বপ্রথম নাম না করেই ভবানী সেন-এর শিল্প-সাহিত্য বিচারে উগ্র বামপন্থী মতান্ধতাকে আক্রমণ করে লিখিতভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

এরপর আরও চার দশক গোপাল হালদার প্রগতি-সংস্কৃতির পরিচর্যায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৯ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার 'গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা'-য় কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গোপালদার অনুজপ্রতিম এবং দীর্ঘকালের সহযোদ্ধা ও সংগঠক অনিল কাঞ্জিলাল লিখেছিলেন,

"...প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক, পরে অনন্য নায়ক।" এই উক্তি শতকরা একশো ভাগই সত্যি। তবু গোপাল হালদার তাঁর শেষজীবনে এসে লিখেছেন, তাঁর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী অন্যান্য সহ-যোদ্ধাদের প্রচেষ্টায় বাঙলার সংস্কৃতিতে 'মার্কসবাদী রিনাসেন্স'-এর যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা নানা বিপর্যয়ে, বিশেষ করে রণদিভে-পর্বের হঠকারিতায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

এতদসত্ত্বেও প্রগতি-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক, 'মার্কসবাদী রিনাসেন্স'-এর অন্যতম প্রধান পুরুষ জীবনের প্রান্তে এসে স্বপ্ন দেখেছেন, 'ঐ জাগরণ-এর প্রতিশ্রুতি' 'নতুন কালে, নতুন ভাবে, নতুন কর্মে, নতুন ভাবনায় গড়ে উঠুক।' কে বা কারা নেবে সেই কঠিন দায়িত্ব, আমার অন্তত তা জানা নেই।

সহায়ক গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

১. গোপাল হালদার রচিত 'রূপনারানের কূলে' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'সংস্কৃতির রূপান্তর,' 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' এবং 'ত্রিদিবা,' 'ভদ্রাসন,' 'মন্বন্তর' নামে অভিহিত সমগ্র উপন্যাস আর 'বাজেলেখা'সহ প্রবন্ধে উল্লেখিত তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ।

২. 'আত্মস্মৃতি,' সজনীকান্ত দাস। ৩. 'ফরওয়ার্ড ব্লকের ৫০ বছরের সংগ্রাম', চিত্ত বসু সম্পাদিত। ৪. 'কৃষকসভার ইতিহাস,' আবদুল্লাহ রসুল।

৫. 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,' সরোজ মুখোপাধ্যায়।

৬. 'প্রসঙ্গ ঃ গোপাল হালদার,' শঙ্কর সরকার ও সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

৭. 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা,' সুস্নাত দাশ।

৮. 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিত।

৯. 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা,' ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত।

১০ পত্র-পত্রিকা ঃ প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু, শনিবারের চিঠি, আনন্দবাজার পত্রিকা, কালান্তর, অরণি, জনযুদ্ধ, 'বহুরূপী, সংস্কৃতি ও সমাজ, সীমান্ত এবং 'পরিচয়'-এর বিভিন্ন সংখ্যা।

গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত

বাসব সরকার

শতাব্দীর প্রায় সমান বয়সী গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত নানা পর্ব ও পর্বান্তরের সমাহার। কিন্তু চিন্তা ও চেতনাসূত্রে সেখানে একটা ধারাবাহিকতা ও উত্তরণও চোখে পড়ে। তাঁর রাজনৈতিক মতের পর্বান্তর ও ধারাবাহিকতাকে একদিক থেকে বিচার করলে বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনীতি চেতনায় যুগ-সচেতনার প্রতিফলন বলে মনে হতে পারে। এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে সেটাই বিবেচ্য।

‘স্বদেশী যুগের বেনামা বন্দর নোয়াখালির’ এক শিক্ষিত, স্বচ্ছল, পেশাজীবী ও দেশভাবনায় উদ্বুদ্ধ পরিবার থেকে জন্মসূত্রেই গোপাল হালদার পেয়েছিলেন উনিশ শতকীয় ‘রেনেসাঁস’ধর্মী মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ আর দেশ-চেতনার সহজ উত্তরাধিকার। পরবর্তী জীবনের অসংখ্য টানাপোড়েন আর ঝড়ঝঞ্ঝায় এই উত্তয়াধিকার হারিয়ে যায় নি। চেতনা ও বিচারে স্বাতন্ত্র্য এবং মতের ভিন্নতার জন্যে তিনি জীবনে অনেক সময় অনেক কিছু মানতে চান নি, যেমন গান্ধীযুগে অসহযোগের রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ কিম্বা ১৯৪৯ সালের কমিউনিস্ট পার্টির ‘রণদিভে পর্বে’র রাজনীতিতে’ জাতীয় আন্দোলনের নানা মূল্যায়ন অথবা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তৎকালীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের নানা ব্যাখ্যা। ১৯৪২-৪৪ কালপর্বেও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না। কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য ও তা রূপায়ণের পথ ও পদ্ধতি

সম্পর্কে সহমর্মিতার জন্যে নিজের মত পার্থক্য পার্টির মধ্যে যথাস্থানে এবং ঘনিষ্ঠ মহলে প্রকাশ করা ছাড়া প্রকাশ্যে সে কথা জানিয়ে মত পার্থক্যকে ইস্যু করে তোলেন নি।

আত্মজৈবনিক রচনা "রূপনারানের কূলে" ১ম ও ২য় খন্ডের পাতায় পাতায় গোপাল হালদারের যে রাজনৈতিক মত প্রকাশ পেয়েছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার বিশেষ কোন হেরফের ঘটেনি। এটা কেবল 'স্রোতের অনুকূলে' থাকার মানসিকতা থেকে জন্মায় নি। এরমধ্যে গভীর একটা প্রত্যয় কাজ করেছিল। নিজের ও সমকালের কথা বলতে গিয়ে তিনি যেমন বারেবার বলেছেন 'মানুষ পলিটিক্স ছাড়া বাঁচে না' তেমনই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন তাঁর পলিটিক্সের খুঁটি 'মানবিকতায়' বাঁধা। নিজের রাজনৈতিক মতের গড়নে ও বিকাশে যাঁদের অবদান সর্বাধিক সেখানে নাম করেছেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের, যাঁদের পাশাপাশি এসেছেন মার্ক্স ও লেনিন। দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা স্বীকার করতে গোপাল হালদার কখনো কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকে বাঙালির রাজনৈতিক মনীষার সদর্থক বিকাশে, গোত্র নির্ণয়ে এই সব নামগুলি এসে পড়বেই; গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত তাই একদিক থেকে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের র‍্যাডিকাল চৈতন্যের parameter বলে চিহ্নিত করা যায়, যার মধ্যেই তার দেশ ও কালচেতনা বিধৃত।

'রূপনারানের কূলে' প্রথম খন্ডেই গোপাল হালদার বলেছেন বাংলাদেশে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক ছিল 'স্বদেশী ও স্বাদেশিকতার যুগ', আর তৃতীয় দশকের পরিচয় 'স্বরাজ সাধনায়'। স্বদেশী যুগেই বাংলায় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে দেশে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা। স্বদেশী থেকে স্বরাজ সাধনায় বাঙালির উত্তরণ পর্বে বাংলার জাতীয় বিপ্লবী নানা গোষ্ঠীর পক্ষে গান্ধীর অসহযোগের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। গান্ধীর গণরাজনীতিকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি, যদিও গান্ধীর অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও চরখার রাজনীতিতে তাঁদের কোন আস্থা ছিল না। সহিংস আন্দোলন তখনকার মতো মুলতুবী রেখেই পরীক্ষামূলকভাবে তাঁরা অসহযোগে সামিল হয়েছিলেন। গোপাল হালদার এই ধরণেরই একটি গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক মতের গড়নে এই দুই পর্বের প্রভাব একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

॥ এক ॥

স্বদেশী যুগের আলোড়নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ গোপাল হালদারের ছিল না। সেটা তাঁর শৈশবের কাল। কিন্তু বালক বয়সের একটা ছোট্ট ঘটনা তাঁর অবচেতনে যে দাগ কেটে যায় পরিণত বয়সে তিনি তার উল্লেখ করেছেন। পুলিশের হাতে ধরা না দিতে দৃঢ় সংকল্প প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার কথা সুদূরে নোয়াখালি শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনেও শ্রদ্ধার আলোড়ন তুলেছিল। উকিল পিতার বৈঠকখানায় পিতৃবন্ধুদের সেই আলোচনা তিনি দৈবাৎ শুনেছিলেন শুধু সেই ঘরে উপস্থিতির জন্য। দেশ ও দেশপ্রেম কি বস্তু বোঝার বয়স তখন তাঁর ছিল না। কিন্তু তারই জন্যে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে যে একটা কিছু আছে, সেটাই তাঁর মনে থেকে যায়। তার কিছু দিন পরেই ইস্কুলে শিক্ষক মশায়ের তাড়না, ছেলেরা সুস্থির না হলে 'ভারত উদ্ধার' কি করে হবে, বালক গোপালকে আরেক বার নাড়া দেয়। এই দুটি কিংবা এই ধরণের আরো কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর প্রজন্মের আরো অনেকেরই নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু অবচেতনে সেই অভিজ্ঞতার আত্তীকরণ আর বাড়ীর পরিবেশ, তাঁকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। নিজের মতো করেই তিনি ভাবতে চেষ্টা করেন জীবনে কেবল নিজস্ব তাগিদ ও স্বার্থপূরণ নয়, তা ছাড়াও অন্য কিছু করার মতো কাজ অবশ্যই আছে। অন্যতর চেতনার এই বুদ্‌বুদগুলি গোপাল হালদারের জীবনে কৈশোর থেকেই একটা নিটোল রূপ নিতে থাকে।

ইস্কুলের ছাত্রজীবনে নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজেকে বলেছেন 'বিবেকানন্দী ছাত্র'। এই পরিচয়ে একই সঙ্গে প্রকাশ পায় স্বদেশীর চেতনাগত উত্তরাধিকার হিসেবে জাতীয় বিপ্লবী ধারার সঙ্গে একত্মতা আর বিবেকানন্দের কর্ম–যোগের প্রতি আকর্ষণ। বিবেকানন্দী ভাষ্যে কর্মযোগে মানুষকে আত্ম-সর্বস্বতার গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর সামাজিক জীবনধারায় সামিল হওয়ার ডাক ছিল। এক কথায় দেশব্রতী হওয়া ছিল তার স্বাভাবিক পরিণতি। সেই পরিণতির প্রাথমিক ধাপ হিসেবে কৈশোরের সেই দিনগুলিতেই তিনি সদস্য হলেন বিপ্লবী 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর। পরিচয় হলো দেশ সেবার তখনকার হাতিয়ার পিস্তল, কার্তুজের সঙ্গে। রাজনীতির অন্যপথ হয় তখন বন্ধ্যা বলে মনে হয়েছিল, নয় তো তাদের কোন আবেদন ছিল না তাঁর কাছে।

বস্তুতঃ গোপাল হালদারের কৈশোরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বহু মানুষের কাছেই body of Vivekananda রূপে প্রতিভাত হতো। মিশনের সন্ন্যাসীরা

সেবাব্রতের মাধ্যমে কর্মযোগের যে ধারা তুলে ধরেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশ সেবার পাঠ বহু কিশোর ও যুবক গ্রহণ করেছিলেন। আর দেশ মানে যে দেশের মানুষ সেই বোধ তখন দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। বিদেশী শাসকরা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কার্যাবলী মোটেই সুনজরে দেখতো না। ফলে দেশ চেতনা এই মঠ ও মিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে তখন তার সার্থকতা খুঁজে পাবে, এই বিশ্বাস বহু মানুষকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফলে মুখ্যতঃ দেশ এবং গৌণতঃ দেশের মানুষ, এই দুটি বিষয় স্বদেশীর অবদান হিসাবে বিবেকানন্দের প্রভাবের মধ্য দিয়েই যুবমানসে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

এই পর্বেই তরুণ গোপাল হালদারের রাজনৈতিক চেতনায় একটা নতুন মাত্রা যোগ করে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'। সবুজপত্রের 'মটো' হিসাবে ঘোষিত 'ওম্ প্রাণায় স্বাহা' কথাগুলির ব্যঞ্জনায় জীবনের যে জয়গান ছিল গোপাল হালদারের মতো মুক্তা বুদ্ধির তরুণ ও যুবকদের কাছে তার আবেদন ছিল অপরিসীম। সবুজপত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ এই আবেদনকে বহুগুণ শক্তিশালী করে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছাড়াও বিশেষ একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য তখন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে সমকক্ষতার এই স্বীকৃতিতে মানুষ বোঝে ইংরাজদের পক্ষে জাতিগত ভাবে ভারতকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। নোবেল পুরস্কার এই দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সরাসরি প্রভাবিত না করলেও তার দেশ চেতনায় এমন একটা মাত্রা যোগ করে, যা অন্য কোন ভাবে সম্ভব ছিল না। আর বাঙালি কবির প্রতি মুক্তবুদ্ধি বাঙালি সমাজের দুর্বলতা যে আরো বেশি হবে সেটা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ফলে রবীন্দ্র-যোগে সবুজপত্রের 'প্রাণায় স্বাহা' প্রায় একটা উজ্জীবনী মন্ত্রশক্তির ভূমিকা নেয়, যার কথা গোপাল হালদার আগাগোড়া উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ধূর্জটিপ্রসাদ প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলতে কেবল বাংলা সাহিত্যের কথা বলেছিলেন। গোপাল হালদার ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে একমত হয়েও একটি সংযোজন করেছিলেন, সেটি বাংলার আর বাঙালির স্বাধীনতা আন্দেলন—তার স্বরাজ সাধনা। গোপাল হালদার এই ধারণাকে আগাগোড়া ধ্রুবজ্ঞান করে এসেছেন 'সাহিত্য সাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম মূলতঃ একই সত্যের দু পিঠ।" গোপাল হালদারের রাজনীতিচেতনা ও সংস্কৃতি

মনস্কতা কেন এক সূত্রে গ্রথিত ছিল, এই বক্তব্যে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংযোগে প্রাণের যে স্ফুরণ ঘটা সম্ভব, সেটাই রাজনীতির গণভিত্তি গড়ে তোলে। জীবনে জীবন যোগ করার যে আহ্বান স্বরাজ সাধনায় অমোঘ হয়ে উঠেছিল তার স্থায়ী বনিয়াদ গঠনের কাজে রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা মিলিত রূপ থাকা দরকার, সেই চেতনা রবীন্দ্র-যোগেই গোপাল হালদার লাভ করেছিলেন শেষ কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে। জীবন সায়াহ্নেও সেই ধারণা অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৮০ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি রাজনীতি মনস্কতার কারণ ব্যাখ্যায় বলেছিলেন 'বিবেকানন্দে বোধন আর রবীন্দ্রনাথে শোধনও ঘটেছিল বলেই দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের মধ্যে এক সহজ সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিল (গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা, পরিচয়, ১৯৮০ দ্রষ্টব্য)। গোপাল হালদারের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জগৎকে এই সূত্রেই যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

॥ দুই ॥

'রূপনারানের কূলে' দ্বিতীয় খণ্ডের একেবারে সূচনায় ১৯১৬ সালে বিপ্লবী দলে ঢোকার কাহিনী বর্ণনায় গোপাল হালদার বলেছেন বিবেকানন্দ তাকে বোধন এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে শোধন করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও মতের একেবারে সুরুতে এই বোধন ও শোধনের ধারণা প্রকাশ করে গোপাল হালদার বলতে চেয়েছিলেন, স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের সুতীব্র আকাঙ্খা যেখানে মানুষকে মুক্তি ব্রতে সামিল করে, সেই ব্রত উদ্‌যাপনে গণমুখিনতা আসতে বাধ্য। 'স্বরাজ' ধারণার পিছনে গণপ্রত্যাশার যে দিকটি প্রথম থেকেই প্রাধান্য পায় বিশের দশক জুড়ে তার নানা অভিব্যক্তি সচেতন মানুষকে অনিবার্য ভাবেই সমাজতন্ত্রমুখীন করে তোলে।

সবুজ পত্রের পাতায় সবুজের ডাক শোনানোর সূত্রেই প্রমথ চৌধুরী গান্ধীর নানা মত ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুদ্ধি দীপ্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেও মূল কথাটি স্বীকার করেছিলেন, 'স্বরাজ শব্দটা দেশের প্রাণ থেকেই উদ্ভূত।' তাই দেখতে দেখতে স্বরাজ কথাটা স্বভাষায় পরিণত হয়। মানুষের আশা আকাঙ্খার বাণীরূপ এই 'স্বরাজ' কথাটির আবেদন যে ভাবে সব মানুষকে নাড়া দিতে থাকে তাতে গান্ধী থেকে চিত্তরঞ্জন সব নেতাই 'স্বরাজ ফর্ দি মাসেস,' 'স্বরাজ ফর্ অল', 'স্বরাজ ফর্ দি নাইনটি ফাইভ' পারসেণ্ট 'বলতে সুরু করেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকেই যায় এই স্বরাজ গরিবের স্বরাজ হবে তো?

গোপাল হালদার লিখেছেন, বিবেকানন্দ শূদ্রের যুগনেতৃত্বে যে ডাক দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে' এসে দাঁড়ানোর যে তাগিদ সৃষ্টি করেছিল, সে সবই গোপাল হালদারের মতো যুবকদের তখন স্বরাজ সাধনায় সমর্পিত প্রাণ করে তোলে। বস্তুতঃ 'আমাদের কালচারের ও ঐতিহ্যের মধ্যে' আগামীর জন্য যে আয়োজন ছিল, স্বরাজের গণ আন্দোলন সেটাকেই সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে এনে হাজির করে। বলশেভিজমের যে সব টুকরো খবর পত্র পত্রিকায় ছাপা হতো তাতে 'বোল্‌শি'রা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিলোপ করছে, মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে জার-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পরাধীন জাতিদের তাই স্বাধীনতা দিয়েছে' এমন সব অভাবনীয় ব্যাপারের কথা পড়ে অতি নিরীহ মানুষও তখন বলতে,সুরু করে আমরাও তাহলে বলশেভিক হয়ে যাবো। শূদ্র নেতৃত্ব, সবহারাদের রাজ, 'নাস্তিক্যবাদীদের আবির্ভাবের অনিবার্যতা' বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মতো পরম আস্তিক্যবাদীদের মুখে শুনে বাংলার যুব-মানস স্বরাজ সাধানাকে যে ভিন্ন চোখে দেখবে সেটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাই গান্ধীর প্রতিশ্রুত 'এক বছরে স্বরাজ' লাভের আন্দোলনে দেশজুড়ে ঢল নামে। তার পরের অভিজ্ঞতা সকলেরই জানা।

গান্ধীর রাশ টেনে ধরা গণ আন্দোলন যখন অহিংসার নিষ্ক্রিয়তায় শেষ হয়ে গেল, তখনই গোপাল হালদারের মতো তরুণদের প্রশ্ন জাগে, যে স্বরাজ এলো না, সেই এক বছরে স্বরাজ এলেই কি গরিবের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতো? গান্ধীর বক্তব্যে তো কোথাও খাজনা বন্ধ, ঋণে সুদ বন্ধ, নো ট্যাক্সের কথা নেই, বরং বলা হচ্ছে মালিকরা হলো ট্রাস্টি—'অপোগণ্ডদের রক্ষক, পালক, মা-বাপ।' 'স্বরাজের অর্থ দেশের লোকের শাসন। বিদেশীর হাত থেকে দেশের ধনী-গুণী-মানী লোকেরাই দেশের সকল লোককে রক্ষা করবে।' স্বরাজ সাধনার মধ্যে অলিখিত ফাঁক ও ফাঁকি, গান্ধীর অত বেশি মাত্রায় ধর্ম ও চিত্তশুদ্ধির তত্ত্ব আসলে আত্ম প্রবঞ্চনা ও জাতীয় প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রই তৈরী করে, যার ফলে 'ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাই ১৯৪৭ এর জাতীয় বিগ্রহের খড় বেরিয়ে পড়তে থাকে।'

গোপাল হালদার একথা বলেছেন গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখেই। তাঁর মতে গান্ধী এদেশে স্বরাজ আন্দোলন সুরু করার মধ্যে যে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন সেটা যতোটা তাঁর ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল কালের। তাই অহিংসার সপক্ষে যে সাফল্য তিনি অর্জন করেন, সেটা 'স্বদেশে নয়, মানুষের সভ্যতার ধারায়'। আর স্বরাজ সাধনায় যেখানে তাঁর পরাজয় ঘটেছে, তা মুখ্যতঃ

ঘটেছে তাঁর শিষ্যদের হাতে। কংগ্রেস নেতৃত্বের ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কীর্তিকলাপ তার যথেষ্ট প্রমাণ। 'একজন জুডাসের স্থলে গান্ধীজীর ভাগ্যে জুটেছে একপাল কংগ্রেসী শিষ্য'। স্বরাজ আন্দোলনের দিনে গান্ধীর অনুগামী না হয়েও গোপাল হালদাররা ছিলেন গান্ধীর অনুরক্ত। একথা ঠিক নিরস্ত্র দেশের পক্ষে নিরস্ত্র সংগ্রামই সম্ভব। মানুষের যে হাত ভাঙতে চায়, তার চরম শরণ বন্দুক। শাসকদের হাতে বন্দুক তাই শক্তির উৎস, স্বার্থরক্ষার ভিত্তি। কিন্তু মানুষের যে হস্ত গড়তে চায় স্বরাজ সাধনায় দেশগঠন, তার পরম হাতিয়ার কাস্তে হাতুড়ি, অর্থাৎ পরিশ্রম। সঙ্গে দরকার ল্যাবরেটরীর টেস্টটিউব, ডাক্তারের স্ক্যালপেল অর্থাৎ বিজ্ঞান। গান্ধীর সে জিনিসে বিশ্বাস ছিল না। তাই যেখানে জনশক্তির বোধন ঘটতে পারতো, চরখা আর অহিংসা দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দ্য বিকাশ ঘটতে দেননি। সেই জনশক্তির যথার্থ বিকাশ করলে সেটাই স্থির করতে পারতো, কতোটা তার অস্ত্র চাই, আর কতোটা অস্ত্র ছাড়াই চলবে। এই জনশক্তিতে গান্ধীর ভয় ছিল।

॥ তিন ॥

তাই অসহযোগের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ সাধনায় গান্ধীর পথ ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৩০ সালে লাহোর কংগ্রেসে যখন 'পূর্ণ স্বাধীনতা' লক্ষ্যরূপে গৃহীত হলো, শুধু স্বাধীনতায় যখন দেশের মন টানা গেল না, তখন বোঝা গেল 'স্বরাজ কথাটাও ধার খুইয়েছে দশ বৎসরে।' দেশের তারুণ্য তখন বুঝিবা শুনেছিল কালের মন্দিরা বাজে ডাইনে বামে। 'ডাইনে সর্বাঙ্গীন মুক্তি, বামে সর্বজনীন মুক্তি'। এই সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন মুক্তির স্বপ্নই ধীরে ধীরে রূপ নেয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে ও কর্মসূচিতে। গোপাল হালদার বলেছেন বিশের দশকে সমাজতন্ত্রের যে ধারণা প্রাথমিক ভাবে এদেশে পৌঁছায় তাতে মার্কস ও লেনিনের নামের ছাপ থাকলেও, সেখানে আলোর চেয়ে ধোঁয়া ছিল বেশি। তবু তখনই এটাও বোঝা যায় সমাজতন্ত্র ছাড়া দেশের গতি নেই। কলোনিয়াল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, সেই ভাবনাটাই হাস্যকর। 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকায় 'হোপস্ ফর ইণ্ডিয়ান সোস্যালইজ্‌ম্' নিবন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন সেই ১৯২৬ সালে, সমাজতন্ত্রের পথই দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ। বলা বাহুল্য সেটা মার্ক্সীয় সমাজ-

তন্ত্র বা অন্য কিছু হবে কিনা বলার মতো তত্ত্ব ও তথ্য অন্তত তখন গোপাল হালদারের হাতে ছিল না। সোভিয়েত ব্যবস্থার সাফল্য আর পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির সোভিয়েত বিরোধিতার মধ্যে এটুকু বোঝা গিয়েছিল, সেদেশে একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্ব চলেছে।

গোপাল হালদার লিখেছেন 'আমাদের যৌবন শুধু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নময় কাল নয়, গান্ধীযুগেরও সংগ্রাম-ভরা কাল।' অথচ এ দু'টিকে মেলাতে পারা যায় নি। গান্ধীর রাজনীতিতে সেই মিলনের সম্ভবনা যুবসমাজ দেখতে পায় নি বলেই, তার মন-ও চোখ চলে যায় সমাজতন্ত্রের দিকে। শুধু সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞানের ভিত্তিতেই তখন গোপাল হালদারদের মতো যুবকরা অনুভব করেন 'স্বাধীনতা জিনিসটা যদি ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষকের জিনিস না হয়, তাহলে সে স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ থাকবে না।' তখনকার পূর্ব বাংলার বিশেষতঃ নোয়াখালির মতো এলাকার বাস্তব পরিস্থিতিতে কৃষকদের রাজ বলতে যা বোঝাতো তা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান চাষী-কৃষকের শোষিত জীবনের অবসান। সমাজে তারাই ছিল 'হ্যাভ্ নট্স।' রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিমুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার তাগিদ কিন্তু বেশির ভাগ রাজনৈতিক মানুষ অনুভব করে নি। তাই মুসলমানদের সঙ্গত ক্ষোভটাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপ দেওয়া যাদের প্রয়োজন তারা সে দিকেই তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই ১৯২৬-২৭ সালেই নোয়াখালিতে আসন্ন পাকিস্তানের পদধ্বনি শোনা যায়। গোপাল হালদার যে কিছুদিনের মধ্যেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সম্ভবনা যথাসাধ্য আটকাতে সচেষ্ট হবেন তার আভাস বোধহয় এই পর্বেই পাওয়া যায়।

গোপাল হালদারের মতে পূর্ব বাংলায় মুসলমান সমাজে শিক্ষিতের ও মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই বঙ্কিম ও রাজনারায়ণের চিন্তাসূত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু অনুষঙ্গ প্রকট হয়ে ওঠে তাদের চোখে। 'যদি ভারতীয় “কম্পোজিট কালচারের” উপর কোন “কম্পোজিট জাতীয়তাবাদ” এর পলিটিক্স প্রথম থেকে দেশে গড়ে উঠত তা হলে হয়তো তৃতীয় পক্ষের ভেদনীতির খেলাতে এত সুবিধা হত না।' কিন্তু যা হচ্ছিল তার পরিণাম কি হতে পারে, হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষই সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। ভারতে 'বিচিত্রের মধ্যে একের' সাধনায় অপূর্ণতা থেকে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ মুসলমানদের আপন করে ফেলতে পারে নি। বিচিত্রের মধ্যে একের সাধনা সফল করতে হলে দরকার এক

বিশেষ পদ্ধতির, যার মূল বৈশিষ্ট্য হবে 'সমদৃষ্টি ও সমপ্রাণতা।' কথাগুলি প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বে যেমন সত্য ছিল, আমাদের সমকালেও তেমনই সমান সত্য।

এদেশে 'মেজরিটি-মাইনারিটি ভাবনাটাই আসলে ভুল।' দরকার এখানে জাতির দিক থেকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ করে দেখতে হবে 'পরিশ্রমী দরিদ্র কৃষক, মজুরশ্রেণীর দিক থেকে।' কিন্তু শিক্ষিত মানুষের মাথায় মার্ক্স-লেনিনের অস্পষ্ট ধারণা কিংবা যান্ত্রিক ধারণার কট্টর অনুষঙ্গ আর বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের নাম করে হিন্দু ন্যাশনালিজমের কিছু জগাখিচুড়ি, যাতে হিন্দুত্বও সমর্থন করা যায় আবার সোস্যালিজম তথা শূদ্ররাজও সমর্থিত হতে পারে। এই ব্যাধি জাতীয় আন্দোলন থেকে আমাদের সমকাল পর্যন্ত প্রতিকারহীন ভাবেই চলে আসছে। এজন্যেই বোধহয় 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা এ দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি।'

॥ চার ॥

সমাজতন্ত্রের দিকে গোপাল হালদারের মন বিশের দশকের গোড়া থেকেই গণরাজনীতি ও বলশেভিক বিপ্লবের স্বল্পতম তথ্যের কল্যাণেই আকৃষ্ট হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি আর পুঁজিবাদী দুনিয়ার চক্র ও চক্রান্ত সেই আকর্ষণ জোরালো করে তোলে। স্বরাজ সাধনা এক সংকট থেকে আরেক সংকটের দিকে যতোই অগ্রসর হতে থাকে, ততোই স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংরাজ-বিরোধিতার সীমিত চেতনা থেকে বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রূপান্তবিত হতে থাকে। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের যৌথ অবদান এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু আরেক জন যিনি না জেনে, না বুঝে, নিজের সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও গোপাল হালদারকে অমোঘ ভাবে সেই দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম শেখান শব্দ চয়নে গোড়া থেকেই দেখা দরকার প্রাণ ধারণে যা চাই সেই সব বুনিয়াদী শব্দই হলো ভাষার প্রাচীনতম শব্দ। এই সব বস্তুমূল শব্দ basic material, আইডিয়েশনাল কথা গৌণ, তা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে আসে পরে। গোপাল হালদার উপলব্ধি করেন 'জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন জীবিকা। জীবিকার সঙ্গে জীবন সংগ্রাম।' তিনি অনিবার্য ভাবে চলে এলেন 'হিস্টোরিকাল মেটিরিয়ালিজমের' দিকে।

দেশ, সমাজ ও দুনিয়ার চিন্তাও এই সূত্রে নতুন মোড় নিতে থাকে। এর

মধ্যেই সেই উপলব্ধি ঘটেছে যে স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায় না। দেশের সব মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাই জাতীয় স্বাধীনতা কেবল নয়, ব্যক্তির প্রকৃত মুক্তির পথ খোঁজা দরকার। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সেই পথ দেখায়। জীবিকা ও জীবন সংগ্রামের সূত্রে সমাজ বিকাশের ধারা, সমকালীন ভারতের সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, এক কথায় পলিটিক্সের নানা দিক তাঁর চোখে নতুন মূল্যায়ন দাবি করতে থাকে। তাদের পোষাকী আর আটপৌরে চেহারার মধ্যে কোনটা কৃত্রিম আর কোনটা অকৃত্রিম সেই প্রশ্নও ওঠে। যেমন দেখা যায় করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে ফেরার পর গোপাল হালদার 'নওজোয়ানের রাষ্ট্রচিন্তা (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৮) প্রবন্ধে লিখছেন কংগ্রেস সংগঠন গান্ধী-আরউইন চুক্তির মর্মবস্তুতে অসুখী বোধ করলেও ইংরাজদের সঙ্গে রফার প্রস্তাব মেনে নেয়। কারণ রফার প্রস্তাব বাপুজীর আশিষ পুষ্ট। অথচ লাহোর জেলে বন্দী ভগত সিং ও শুকদেব প্রমুখ ফাঁসির আসামীরা দাবি করছেন দেশকে পরিচালনা করতে হবে সংগ্রামের পথে। বিপ্লবী শক্তি রফা করে বিপ্লবের স্বার্থে। কারণ এগিয়ে পিছিয়ে চলার বাধ্যবাধকতা তাকে স্বীকার করতে হয়। কংগ্রেস রফার পথ নিয়েছে বিপ্লব না করার জন্যে। মতের এই মৌলিক ভেদ করাচী কংগ্রেসেই যুবশক্তির সঙ্গে প্রবীণ নেতৃত্বের মানসিক দূরত্ব সপ্রমাণ করে।

গোপাল হালদারদের মতো তরুণ কর্মীদের চিন্তার একটা বিশেষ দিক এই সূত্রে উল্লেখ করা দরকার। এর আগে জাতীয় আন্দোলন অসহযোগের সময়ে এবং পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাওয়াকে চরম প্রাপ্তি বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং বৃটিশ শাসনের সার্বিক বিরোধিতা' জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতায় উজ্জীবিত করা, চেতনার এই স্তরে পৌছায় নি। জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, দেশের মুক্তির ধারণাকে মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্ম করে তোলার মতো মানসিকতাও গড়ে ওঠেনি। তিরিশের দশক থেকে সুরু হয় তার নবচেতনার উন্মেষের কাল।

এই পর্বেই গোপাল হালদারের 'যৌবন পেল রাজটীকা' ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩২-এর প্রত্যুষে। মনে যখন প্রত্যাশা ছিল যৌবনের 'জয়টীকা' লাভের, তখন রাজটীকা লাভ করায় সেই প্রত্যাশা তখনকার মতো শেষ হলো। রূপ রস প্রাণ, শব্দ গন্ধ গান, এসবের একান্ত প্রত্যাশী গোপাল হালদার জীবনকে স্বদেশীদাদাদের মতো

'রঙছুট' করার কথা ভাবেন নি। কিন্তু জীবনরসিক ছিলেন বলেই সমাজের নাইনটি পারসেন্টের জীবন প্রাণরসের উৎস হয়ে ওঠার সুযোগ পায় কিনা, তাঁর সেদিকেও নজর চলে যায় স্বাভাবিক ভাবে। তাই রাজটীকা তাঁকে সময় করে দেয় নিজেকে এই নতুন চেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে, আর সমকাল ও সমাজকে তারই আলোয় বিশ্লেষণ করতে। তাঁর সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'একদা' উপন্যাস যা এই বন্দিশালায় রচিত, যেখানে গোপাল হালদার নানা প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁকেই খুঁজে পাওয়া যাবে তার মূল চরিত্র 'অমিত'র মধ্যে, যার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, দেশপ্রেম আর সুতীব্র জীবনাসক্তির সূত্রে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা রয়েছে ছত্রে ছত্রে। এই বন্দিশালায় তাঁর 'বাজেলেখা' পর্যায়ের অন্যতম রচনা 'সাহিত্যের স্বরাজ' কিম্বা 'কোদালি ও কলম' (দ্রষ্টব্য 'স্বপ্ন ও সত্য' যা 'বাজেলেখা'র নতুন সংস্করণ রূপে প্রকাশিত) একই সাক্ষ্য দেয়। সেখানে নানাভাবে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন সাহিত্যের স্বরাজ, সাহিত্যিকের সার্থকতা 'মানুষের চাপা পড়া সৃষ্টিশক্তিকে মুক্ত করায়, নব্বই জনের স্বাধীনতার মূল অর্থ—দশ জনের দৌরাত্ম্য থেকে সকলকার সৃষ্টিশক্তির মুক্তিলাভ।' জাতীয় বিপ্লবী ও কংগ্রেসকর্মী গোপাল হালদার ছয় বছরের বিচারাধীন বন্দিদশা কাটিয়ে ১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরুলেন মনের দিক থেকে কমিউনিস্ট হয়ে।

॥ পাঁচ ॥

'একদা'র অমিত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো সেই সময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিব্রতে দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিকে আর গণমুক্তির জন্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে, তার সঙ্গে, ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। মনে কমিউনিস্টদের হয়ে কমিউনিস্টদের নানা ফ্রন্টে নানা কাজে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়েও, যেমন কিষান সভায়, গোপাল হালদার অমিত'র সাধনাকেই বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলেন। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার সভাপতিত্বের সমর্থনে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির যে মিলিত মোর্চা গড়ে উঠেছিল, সেটাই ছিল তখন গোপাল হালদারের কাঙ্খিত পথ। সুভাষচন্দ্রের কর্মযোগী রূপের তিনি ছিলেন প্রকৃত অনুরাগী। মত ও পথের ঐক্য তাই তাঁকে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী করে তোলে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার অনেক প্রমাণ রয়েছে সমসাময়িক ইতিহাসে। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের জন্যই

হয় স্বল্প স্থায়ী। ১৯৪১ সালে গোপাল হালদারযখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন তখন তাঁর চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন, ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

গোপাল হালদারের কমিউনিস্ট হওয়া ঘটেছে এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব রাজনীতিতে, আন্তর্জাতিকতায় সোভিয়েতের ভূমিকা তুলনাহীন। জাতীয় জীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন এমন সব মানুষ যাঁরা দেশপ্রেম ও গণ-মুক্তির সংগ্রামে পরীক্ষিত সৈনিক। তবু চোখ আর মন দুটোই খোলা রেখে তিনি এসেছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। তাঁর মতো মননশীল, বহু উত্থান পতন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রায় ৪০ বছর বয়স্ক একজন মানুষ, যিনি sense of belonging ছেড়ে মার্ক্সবাদে committed মানুষ হিসেবেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নিয়েছেন, যাঁর মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মন সব কিছু যাচাই করতে চেয়েছে এবং চাইবে তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছায় দলীয় শৃঙ্খলার কঠোরতা মেনে নেওয়া, কোন প্রত্যাশা না রেখেই—সংগ্রামের পথ, দুঃখের পথ বরণ করার মধ্যে যে একটা গভীর প্রত্যয় কাজ করেছিল, সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। আর সেই প্রত্যয় ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েতে গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল।

বিবেকানন্দের দেশহিতৈষিণা, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ এ দেশের যে প্রজন্মের মানুষকে সমাজ ও রাজনীতি মনস্ক করে, গোপাল হালদার ছিলেন তাদেরই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মার্কস ও লেনিনের চর্চা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে বস্তুনিষ্ঠ ও অনুসন্ধিৎসু করে। বৌদ্ধ দর্শনের discontinuous continuity'র কথাও তিনি বলেছেন নানা স্থানে, যার থেকে দ্বান্দ্বিকতার চেতনাও তাঁর মনে বিশিষ্টরূপ নেয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের শাশ্বত উপাদান এবং মার্ক্সবাদের বিশ্ববীক্ষা তাঁর মনকে চিরজিজ্ঞাসু, আশাবাদী, গতানুগতিকতা বিরোধী করে তোলে, যেখানে পরিবর্তনীয়তা তিনি মেনে নিয়েছেন জীবনের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে। সেই পরিবর্তন কেবল শ্রেণী সমাজে নয়, শ্রেণীহীন সমাজেও আসতে পারে মানব প্রকৃতির বিশেষ নিয়মে। 'রূপনারানের কূলে' তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন যা চলমান জীবনের রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর মতের বোধহয় সবচেয়ে সঠিক ধারণা দিতে পারে ঃ "যে মহান আদর্শই কর্মে রূপান্তরিত করতে যাওয়া যায়, কার্যক্ষেত্রের আবর্তে পাক খেতে খেতে সে আদর্শের বিশুদ্ধতা আর থাকে না। বেঁকেচুরে সে মানুষের সমাজে মানুষের

মতো হয়েই কতকটা সার্থক। …আর তাই কি দেখি না পঞ্চাশ বছরেই গান্ধীজীর আদর্শের ইতিহাসে, কিম্বা মার্ক্স-লেনিনের আদর্শের বিবর্তনে?…মানুষের ইতিহাস মানুষের এই স্বরাজ সাধনারই ইতিহাস—অবশ্য একটানা জয়ের কাহিনীতে নয়, বরং পরাজয়ে পরাজয়ে একটু একটু করে জয়ের সাক্ষী।" (২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২)

গোপাল হালদার যখন একথাগুলি লেখেন সেই ১৯৭৮ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন, সোভিয়েতের পতন অভাবনীয় ছিল। কিন্তু তবু তাঁর মনে কোথায় যেন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়েছিল, যেটা তাঁর রাজনৈতিক মতের সবচেয়ে সজীব উপাদান। তিনি তখনই বলতে পেরেছিলেন বিশ শতকের শোষণহীন সমাজের সাধনা একুশ শতকে জাতিকে শোষণ করার জাতীয় উদ্যোগের নিশ্চয়ই অবসান ঘটাবে। "কিন্তু তাই বলে কি তখন চোর থাকবে না, ফাঁকিবাজ থাকবে না? আর থাকবে না ক্ষমতা লিপ্সু, 'নিউ ক্লাশ,' শাসক-চক্র, অথবা 'এস্ট্যাবলিশমেন্টের' যান্ত্রিকতা? কারণ মানুষ তখনো মানুষই থাকবে—তার সংগঠনে আয়োজন ও অপূর্ণতা থাকবে। কারণ পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় তার তপস্যা; তার অর্থ অপূর্ণতা থেকে অপূর্ণতায়ও তার বারে বারে পতন।…ইতিহাসে শুভবুদ্ধির পরাজয় বার বার হবে, সব পরাজয়ই তবু সাময়িক। মানুষ loses battles to win the war কিন্তু wins no peace permanently." (ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩)। গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মতের চরিত্র লক্ষণ এই বক্তব্যেই প্রকট।

স্মৃতিচারণ

১

প্রয়াত গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ১৯৩০-৩২ সাল থেকে। তখন আমরা সবাই কংগ্রেস আন্দোলনের সূত্রে কাছাকাছি এসেছিলাম। পরে দেখেছি এবং জেনেওছি যোগাযোগের আরো সূত্র ছিল। গোপালদা কিশোর বয়সেই "যুগান্তর" গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। সেই যোগাযোগ ঘটে তার নিজের জেলা নোয়াখালিতে এদিকে আমরাও অনেকে বর্ধমানে কিশোর বয়সেই "যুগান্তর" গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। আসলে সেই সব দিনগুলো ছিল এমনই যে কারো পক্ষে দেশের ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না। সেই দেশের ডাকই বহু মানুষকে প্রথম যৌবনেই কাছাকাছি আনে। সেই সম্পর্ক অনেকের সঙ্গে থেকে যায়। আমাদের মধ্যেও তাই হয়েছিল। তাছাড়া ৪০ এর দশকের শুরুতে গোপালদা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেলে আমরা হয়ে পড়ি একই দলের লোক—কমরেড। পরে নানা ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে গেলেও গোপালদার সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয় নি।

যতোদূরে মনে পড়ে গোপালদা ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গিয়েছিলেন। আমার যাওয়া হয়নি নানা কারণে। আমার ঘনিষ্ট বন্ধু সরোজ (প্রয়াত কমরেড সরোজ মুখার্জি) করাচী গিয়েছিল। গোপালদার সঙ্গে সরোজের ঘনিষ্ঠতা হয়; আমরা তখন বেশ কাছাকাছি এসে পড়ি। তবে সেই ঘনিষ্ঠতায় অচিরে ছেদ পড়ে। ১৯৩২ সালে আমরা একে একে গ্রেপ্তার হই। সকলকে একই সময় ধরা হয়নি। কারণগুলো হুবহু এক ছিল না। তবে দেশের ডাকে কাজ

করার মধ্যে যে সার্বিক ঐক্য ছিল তখন তরুণদের মধ্যে সেটা আমাদেরও ছিল। বছর ছয় জেলে কাটাবার পর আমরা ছাড়া পেলাম ১৯৩৮ সালে, কিছুটা আগে পরে। বোধহয় আমি গোপালদার কিছু পরে ছাড়া পাই। মনের দিক থেকে আমরা তখন অনেক কাছাকাছি এসে গেছি, কাজের দিক থেকে তো বটেই।

"যুগান্তর" গোষ্ঠীর আরো কিছু মানুষের কথা মনে পড়ছে, যাঁদের সঙ্গে গোপালদা ও আমাদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ; তেমন দু'জন মানুষ হলেন বিমল প্রতিভা দেবী ও তাঁর স্বামী চারু ব্যন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা ছিলেন হুগলী জেলার লোক। নানা ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। কৃষক আন্দোলন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন পর্যন্ত সব রকমের আন্দোলনেই তাঁরা খুব সক্রিয় ছিলেন। বিমল প্রতিভা দেবী সম্ভবতঃ ৩১-৩২ সালে যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মি হিসেবে সরকারের নজরে পড়েন। তাঁকে ডেটিনিউ করে রাখা হয় বার্নপুরের কাছে ডিহিকা বলে একটা জায়গায়। গোপালদা সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ।

যতোদূর মনে পড়ে গোপালদার সঙ্গে যুগান্তর গোষ্ঠীর লোকজনদের ১৯৩৮-৪০ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তবে তখন তিনি কৃষক সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। ১৯৩৯ সাল থেকেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বাড়তে থাকে। আবার তিনি তখন সুভাষচন্দ্র বসুর কাছের লোক হয়ে পড়েন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়ে যখন "ফরোয়ার্ড ব্লক" প্রতিষ্ঠা করেন আর সেই নামেই একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন তথম গোপালদা তার সহযোগী সম্পাদক হন। ওই কাগজে তখনকার বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাই লিখেছেন। কৃষক নেতা প্রয়াত কমরেড আবদুল্লা রসুলও সেখানে লিখতেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে গোপালদার যোগ সেই সূত্রে বেড়ে গিয়েছিল। AIKS-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে তখন থেকেই তিনি যোগ দিতে থাকেন।

৪০ এর দশকের গোড়ায় যখন AIKS এর সম্পাদক হিসাবে কমরেড রসুল কর্মভার গ্রহণ করেন, তখন তার আফিস হয়েছিল ২৪৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট। রসুল সাহেব গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর গোপালদা কিছুকাল AIKS এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কিষাণ সভার কাজে গোপালদার আন্তরিক উদ্যোগ তখন নানাভাবে দেখা গেছে। তবে আমার সঙ্গে তাঁর নিত্যকার যোগাযোগের তখন আর কোন্ উপায় ছিল না। ১৯৩৯-৪৯ সাল এই দশ বছর আমায় পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। জেলায় আমরা

তখন আসানসোল—বার্ণপুর—কুলটি অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে আর অন্য এলাকায় কৃষক সভার কাজ কর্ম প্রসারে সচেষ্ট হয়েছি। পার্টির বরাবরের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ গড়ে তোলা। তার জন্যে কখনো পার্টি কখনো ট্রেড ইউনিয়ন কিম্বা কিষাণ সভার উদ্যোগে নানা আলোচনা চক্র সাংস্কৃতিক সম্মেলন হতো। সেখানে গোপালদা বহুবার গেছেন আলোচনায় অংশ নিতে। যুদ্ধের সময় আমাদের বক্তব্য বলাও ছিল তাঁর অনেক কাজের একটা।

তবে আমার কর্মক্ষেত্র মূলতঃ বর্ধমান জেলা আর গোপালদার কাজের জায়গা কলকাতা, প্রথমে সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি, তারপর পরিচয়ের সম্পাদনা ও পার্টির দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র সঙ্গে তাঁর যোগ থাকায় দেখাশোনা কমে আসে। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আমি বর্ধমান শহর থেকে নির্বাচিত হলে আমার কাজের জায়গা কিছুটা কলকাতা হয়ে পড়ে। তখন যোগাযোগ বাড়ে। তারপর তো গোপালদা নিজেই বিধান পরিষদে পার্টির প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন। তখন আইন সভায় নানা বিষয়ে কাজের মধ্যে আমাদের সংযোগ ঘনিষ্ট হয়। ইদানীং তাঁর অসুস্থতা ও আমার কাজের ধরন বদলে যাওয়ায় যোগাযোগ আরো কমে গেছিল। পার্টি ভাগ হওয়া সত্ত্বেও কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন আগের মতো থেকেই যায় গোপালদা ছিলেন সেই ধরণের মানুষ।

গোপালদার উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'একদা' আমায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। তাঁর মন্বন্তর সিরিজের উপন্যাসগুলি পার্টির তখনকার সেক্রেটারী পি সি যোশীর প্রেরণায় লেখা। সেগুলো ভিন্ন জাতের লেখা। ডকুমেণ্টারী উপন্যাস নামে যাদের চিহ্নিত করা হয়, ওগুলো সেই ধরণের রচনা। তবে "একদা" যেমন ভালো লেগেছিল, এগুলো সম্পর্কে তা বলতে পারছি না।

মানুষ হিসেবে গোপাল হালদার অনন্য। অমন একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সব ধরণের লোকের সঙ্গে সহজে, স্বচ্ছন্দ্যে মিশতে পারতেন। গ্রামের কৃষক থেকে কলকারখানার শ্রমিক, শহরের মধ্যবিত্ত সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন এমনভাবে যাতে বোঝা যেত না তিনি তাদের কাছের মানুষ নন। একটা সহজ আন্তরিকতা তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় বারবার লক্ষ্য করেছি। আমার তো মনে হয়, আমাদের আরেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে এখানে গোপালদার খুব মিল ছিল। সুপরিণত বয়সেই তিনি গতায়ু

হয়েছেন। কিন্তু কোন কোন মানুষের চলে যাওয়ার যে শূন্যতা, সেটা আর অন্য কোন ভাবে পূরণ করা যায় না। সেরকম মানুষই আর নেই।

—বিনয় চৌধুরী

১৭. ৬. ৯৪

২

এই প্রবন্ধে আমি প্রয়াত মার্কসবাদী চিন্তাবিদ গোপাল হালদারের মূল্যায়ন করছি না। কারণ যে কেবল যোগ্যতার অভাব তাই নয়–আমার শরীর এমনি অশক্ত হয়েছে যে নিজের লাইব্রেরীর বই ও পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধানের ক্ষমতা নেই। অথচ এই বোধ করি প্রকৃষ্ট সুযোগ যেখানে আমি তাঁর কাছে আমার ঋণ সামান্য পরিমাণে শোধ করার চেষ্টা করতে পারি।

আমরা দু'জনেই 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সদস্য হিসাবে ত্রিশ দশকে দীর্ঘদিন জেলে ছিলাম এবং ১৯৩৬–৩৮ জেলের বাইরে এসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগ করি। গোপাল হালদার যাকে আমি এরপর থেকে গোপালদা বলে উল্লেখ করবো তিনি কিছু দিন দেরী করেছিলেন। তিনি ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন) সুরপতি চক্রবর্তী, বিনয় ঘোষ প্রভৃতিকে নিয়ে 'নব পর্যায় ভারত' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করতে থাকেন।

এই কাগজের পূজা সংখ্যা যা ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল–যাতে ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে আমার একটি রচনা ছাপা হয়। এটা লিখতে বলেছিলেন অতীনদা-যাঁর সঙ্গে ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। 'ভারতের' এই সংখ্যাটি গোপালদা–সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এবং 'শনিবারের চিঠি'র ডাক সাইটে' সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের হাতে দেন। সজনীবাবু মাঝে মাঝে অন্য পত্রিকার সাময়িক সম্পাদকের কাজ করতেন। একই সময় নিউ থিয়েটার্স সিনেমার মালিক প্রয়াত বি. এন. সরকার 'অলকা' নামে একটি পত্রিকা বার করতেন। সজনীবাবু এই পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় সেই বছরের পূজা সংখ্যাগুলির উল্লেখযোগ্য রচনা–এই শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকারের পরেই আমার পূর্বোক্ত রচনার কিছু অংশ ছাপিয়ে দিলেন সজনীবাবু। আমি সাহিত্য বিষয়ক আমার প্রথম রচনার এইরূপ উল্লেখের

ফলে দ্রুত বহু পাঠকের কাছে পরিচিত হলাম। পরবর্তী জীবনে সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কাজ করার ব্যাপারে ডঃ অতীন বসুর সঙ্গে গোপালদার ভূমিকা আমি সব সময়ে স্মরণ করে এসেছি।

সেই যুগে শুরু থেকেই আমাদের অনেক ধরণের কাজ করতে হোত। কলকাতায় যারা থাকি তারা সারা সপ্তাহে শ্রমিকদের,—ট্রাম, বাস, বিড়ি প্রভৃতি শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়ে রাজনৈতিক ক্লাস নিতাম। কিন্তু শনি-রবিবারে নিকটস্থ জেলার গ্রামগুলিতে কৃষকদের কাছে যেতে হ'ত। ফলে কৃষক আন্দোলন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হোত। তার ফলে কৃষক সমস্যা নিয়ে পড়াশুনা করতে হোত। বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত কৃষক সমস্যা বিষক প্রবন্ধগুলি আমার পড়া ছিল। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু বিলাত থেকে India To Day by R. P. Dutt লুকিয়ে নিয়ে এসে আমাকে দিলেন। সেই বইয়ের কৃষি বিষয়ক চ্যাপটার গুলির সঙ্গে তৎকালীন কৃষক সভার কাগজ-পত্র বিশেষ করে ফ্লাউড কমিশনের কাছে প্রদত্ত রিপোর্টগুলি নিয়ে 'কৃষি ভারতের নগ্ন রূপ শীর্ষক বই প্রকাশ করলাম। এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন—গোপালদা। গোপালদা জানতেন কি করে বইটি আমি দাঁড় করিয়েছি। এই বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় (১৯৪০) এবং কয়েক বছরের মধ্যে ৩টি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। বামফ্রণ্টের মন্ত্রী প্রয়াত সুধীন কুমার আমাকে দেখলেই বলতেন যে ঐ বইটি পড়ে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী-একটি সভায় আমার পরিচয় করান ঐ বইটি তাঁর জীবনে কি গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা উল্লেখ করে। রজনী পাম দত্তের নাম তো তখন প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি, বৃটিশ সি কাষ্টমস্ আইনের ভয়ে। কিন্তু গোপালদার ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছাড়া বাইরের পাঠকদের যে আকৃষ্ট করেছিল-একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার-আগে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রগতি-লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন কলকাতায় হয়। এখানে সাহিত্যিক হিসাবে গোপালদা উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর তরুণ বন্ধু বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, সুবোধ চৌধুরী (পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন) প্রভৃতির সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম। এখানে সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং সমর সেনের প্রবন্ধ নিয়ে আমরা বেশ উত্তপ্ত হই এবং 'অগ্রণী' কাগজে সরোজ দত্ত ও সুবোধ চৌধুরী (গোপালদার উপন্যাস 'একদা' সমালোচনা প্রসঙ্গে) তীব্র আক্রমণাত্মক

প্রবন্ধ লেখেন। বিনয় ঘোষ—এই সময় দুটি বই লিখে এই মতাদর্শগত বিরোধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার বিবেচনায়—বাংলা শিল্প-সাহিত্যে মার্কসবাদী ধ্যান ধারণা প্রয়োগের ব্যাপারে এই রচনাগুলি মতাদর্শ গত সংগ্রামের সূচনা করে। সুধীন দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সঙ্গে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যোগাযোগ রাখতেন এবং আমরা তরুণরা গোপালদার সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখতাম। কিন্তু 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণার আগে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বজায় রাখার জন্য আমরা তরুণরা ছাড়াও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও রাধারমণ মিত্রকে নিয়ে বৈঠক করেছি কখনো সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায়, কখনো গোপালদার বাসাতে আবার কখনো সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও রাধারমণ মিত্রের মেসের ঘরে। তখনো চিন্মোহন সেহনবীশ 'Youth Cultural Institute ছেড়ে আসেন নি। তিনি অনেকদিন ধরে কংগ্রেস নেতা নলিনী সরকারের লাইব্রেরীতে চাকুরী কবতেন। তাই হীরেণ বাবুর নির্দেশ মত সাহিত্যিকদের সভাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার ভার আমার উপর ছিল। এই সকল সভাতে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা তরুণরা তুলনামূলক ভাবে গোপালদা'র অনেক কাছে আসতে পেরেছিলাম। এই যুগে সুবোধ ঘোষ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

'জনযুদ্ধ' নীতি গ্রহণ ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ হতে সুবোধ ঘোষের প্রস্তাব এবং তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন নিয়ে যে সব ব্যাপার ঘটেছিল—তার বিবরণ আমি আমার 'সংস্কৃতির প্রগতি' বইয়ে দিয়েছি। উৎসাহী পাঠকরা লক্ষ্য করবেন গোপালদা সম্পর্কে তারাশংকরের বিরুদ্ধ মনেভাবের কথ্য সেখানে বলেছি। 'পরিচয়' পত্রিকা পার্টির হাতে এলে আমার ২টি উল্লেখযোগ রচনার পিছনে ছিল গোপালদার উৎসাহ। প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্রমে 'পত্রিকা প্রসঙ্গ'—অনেকগুলি পূজা সংখ্যার উপন্যাসও গল্প নিয়ে আলোচনা এবং 'প্রেমচন্দজীর দান'-বাংলা ভাষায় প্রেমচন্দ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনা যা ইতি পূর্বে কেউ করেন নি। আমি সে যুগে নিয়মিত হিন্দি সাহিত্য পড়তাম এবং ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহার সাহায্য পেতাম কিন্তু আসল উৎসাহদাতা গোপালদা ছিলেন।

এই সময়কার একটি ঘটনা না বলে পারছি না। মন্বন্তর নিয়ে যে তিনখানি বই গোপালদা লিখেছেন—তার পিছনে আমার ক্রমাগত তাগাদাই কেবল নয়—তিনি আমাকে তাঁর পাণ্ডুলিপির খাতা পড়তে দিতেন এবং আমি নিজের বিবেচনামত

তার অংশবিশেষ কেটে দিতাম। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি আমাকে কিছু বলেন নি। বরং বইটি ছাপা হলে তার একটি কপি আমাকে দেওয়ার সময় লিখে দিলেন "এ পাপের প্রধান পাপীকে দিলাম।" দুঃখের বিষয় এই কপিটি হারিয়ে গেছে। প্রথম যুদ্ধের পরে সেই সম্পর্কে মার্কিন লেখক Upton Sinclaire যে ধরনের দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছিলেন—তার কথা মনে করে আমি গোপালদার কাছে আবদার করেছিলাম—তার ফল হ'ল তিনখণ্ডে সমাপ্ত বই।

সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় গোপালদা, বিনয় ঘোষ ও শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় কাজ করতেন। আমি নিশ্চিত জানি, যে সম্পাদকীয়র জন্য সুভাষচন্দ্রের জেল হয়েছিল সেটি গোপালদার রচনা। গোপালদা সম্পাদকীয় দপ্তরে থাকায় উক্ত কাগজে প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে কয়েকটি সংখ্যাতে আমার লেখা ছিল। বলতে গেলে আমার ইংরাজীতে প্রবন্ধ লেখার শুরু এখান থেকে। কম্যুনিস্ট পার্টিতে গোপালদা প্রধানত কৃষকসেলের মধ্যে থেকে কাজ করতেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক শিল্পীসংঘ তৈরী হওয়ার পর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যে পাঁচটি সেল তৈরী হয়েছিল তার 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পর্কিত সেলে গোপালদাকে আনা হয়েছিল। লেখকসংঘের জন্য চিন্মোহন সেহানবীশ, শিল্পকলার জন্য মনি রায়, সোভিয়েত সুহৃৎসংঘের জন্য হীরেন মুখার্জী এবং ইপ্টার জন্য আমি এই ক'জনে মিলে কালচারাল ফ্রন্টে পার্টিগত পরিকাঠামো তৈরি করি। আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে কদাচিৎ কোন বিভেদ হতো। তবে হীরেনবাবুর সঙ্গে বুদ্ধদেব, সুধীন দত্ত প্রভৃতির যে সম্পর্ক এবং হীরেনবাবু কর্তৃক The land of the Soviets এবং Us প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশনায় তরুণদলকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্মরণে না রাখায় কিছু কিছু উত্তাপ সৃষ্টি হতো। কিন্তু গোপালদার সহানুভূতিতে আমাদের মনের ময়লা ধুয়ে যেত। 'নবান্ন' নাটকে গোপালদা একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমি আমার "নবান্ন ঃ প্রযোজনা ও প্রভাব" বইয়ে বিস্তৃভাবে লিখেছি বলে এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করলাম না। তবে বর্তমানকালের পাঠকের জন্য এটা জানানো দরকার যে এই নাটকের সাফল্যের জন্য প্রথমে বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের মধ্যে এবং পরে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ পায়। তার সবিশেষ বর্ণণা আমার পূর্বোক্ত বইয়ে দিয়েছি। আমার Marxist Cultural Movement in India–র প্রথম খণ্ডে কয়েকটি দলিল ও প্রকাশ করেছি।

কিন্তু 'নবান্ন' নাটকাভিনয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'বহুরূপী' পত্রিকার তেত্রিশনম্বর সংখ্যায় 'নবান্নের নায়ক কে'—এই শিরোনামায় বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র ও আমার নাম উল্লেখ করে গোপালদা লেখেন, "সুধীপ্রধান আমার পুরানো রাজনৈতিক বন্ধু। এমন পরিশ্রমী ও সংগঠন দক্ষ শিল্পোদ্যোগী শিল্পী বোধ হয় বাংলাদেশে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। এখনো আছেন কি না জানি না। সকলকেই তিনিই বোধহয় জড়ো করেছিলেন বেশী···

১৯৪৬ সালে কলকাতার সেই নৃশংস দাঙ্গার যুগে সেদিন কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সম্পাদক শচীনমিত্র নাখোদা মসজিদের কাছে দাঙ্গাকারীদের দ্বারা ছুরিকাহত হয়ে মারা যান তার আগের দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, প্রগতি লেখক শিল্পীসংঘ, ভারতীয় গণনাট্যসংঘ, বেঙ্গল আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশন ও কংগ্রেস সাহিত্যসংঘকে এক মোর্চায় এনে দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন করা যায় কি না। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আগামীকাল জানাব। রাত্রিতে তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানীসেনকে এই প্রস্তাব বলতেই তিনি আমাকে বললেন, এতো গান্ধীজীর প্রস্তাব অবিলম্বে এ গ্রহণ করুন। গান্ধীজী তখন বেলেঘাটায় আছেন। শচীন মিত্রের স্মরণসভায় কংগ্রেসীরা আমাকে বলবার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি সেখানে শচীনমিত্রের প্রস্তাবটি উত্থাপন করি এবং আমাদের দিক থেকে প্রস্তাবটি সমর্থন জানাই। পরে সজনীকান্ত দাস তাঁর মোহনলাল রোস্থিত বাসায় গোপালদা নিয়ে এবং একটি মুসলীম সাহিত্যিক নিয়ে যেতে আমন্ত্রণ করে। গোপালদার সঙ্গে আমি শওকত ওসমানকে নিয়ে গিয়েছিলাম। শওকত ওসমান তাঁর আত্মজীবনীতে তা লিখেছেন। শওকত ওসমান এখন বাংলাদেশের নামী লেখক। সে যুগে কোন মুসলমান শ্যামবাজারে যেতে সাহস করতেন না। কিন্তু শওকত আমার উপর ভরসা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরোডের কাছে এসে আমাদের গাড়ীতে ওঠেন।

এই চেষ্টার ফলে পূর্বোক্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি সাহায্যে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ২৩ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের, (বর্তমানে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট) বাড়ী থেকে হিন্দু-মুসলীম শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ শোভাযাত্রা বার হ'য়—এবং কয়েকটি জনসভা হয়—যার একটির সভাপতি হয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস। আজকে শুনলে অনেকে বিস্মিত হবেন যে ব্যাপারটি কবি বিষ্ণুদের ভাল লাগেনি—তেমনি তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়েরও না। তাঁদের অভিযোগ ছিল সজনীকান্ত দাসের মত প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের

নিয়ে মাতামাতি করা কি ঠিক। পার্টির সভায় বিষ্ণু দে বলেছিলেন "সুধীবাবু আর্টিস্ট এসোসিয়েশনে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য এইসব করছেন।"

গোপালদা তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললেন, সুধীবাবু Simpleton বা naive নন—তিনি যা করেছেন তা পার্টির নির্দেশ মেনেই করেছেন।" এ ইতিহাস ৪৬ নং ধর্মতলা বইয়ে নেই।

এতক্ষণ যা বললাম তা প্রায়ই লিখিত প্রমাণ। কিন্তু অলিখিত দুটি ঘটনার কথা না বললে—আমার ঋণ শোধ হবে না। ১৯৪৮-৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অতি বাম সংকীর্ণতার যুগে গোপালদা তার রচনার জন্য সংস্কারবাদী বলে নিন্দিত হয়েছিলেন এবং আমি কি করে জেল থেকে ছাড়া পেলাম—এই সন্দেহে পার্টি থেকে সাসপেন্ডেড হয়েছিলাম। পরে ধরণী গোস্বামীর তদন্তে সন্দেহ নিরসন হলে পার্টি-সদস্যপদ ফিরে পাই। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় তখন সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় থাকতেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বামপন্থী সংকীর্ণতার নিন্দা করেও আমাকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করলে হয়ত আমিও সাসপেনডেড হবো।' এরপর আমি গোপালদার সঙ্গে দেখা করলাম তাঁর বাসায় নয় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নীচে। তিনি অত্যন্ত শোকের সঙ্গে বললেন, 'সুধী, আমি সাহিত্য লেখা ছেড়ে দিয়েছি। খালি কৃষকসভার নোটিশ লিখি আর চিঠির জবাব দিই। অথচ সাহিত্য বিষয়ে না লিখলে আমার রেশনের পয়সা জোটে না। কিন্তু আমার সাহিত্যিক প্রবন্ধ নাকি সংস্কারবাদী। আমি বললাম, গোপালদা, রাজনৈতিক ভুল যদি হয় প্রতিবাদ তো করতে হবে।' জবাবে তিনি বললেন, পার্টিকার্ডের সম্মানে তা করতে পারছি না। আমি তখন বললাম, "গোপালদা, আমার আপনার পার্টিকার্ডের থেকেও ভারতের ভবিষ্যৎ, শোষিত, বঞ্চিত জনসাধারণের ভবিষ্যৎ অনেক বড়। কমিউনিস্টরা যদি ভুল করে তাহলে সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়।"

আমার ধারণা গোপালদা ও নীরেনদার মানসিক অবস্থা দেখে বোধকরি আমি পার্টি সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার থেকে অনেক বড় পণ্ডিত অথচ নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি কেন ভীত হবেন?

কিন্তু পরবর্তীযুগে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়িনি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরে পরস্পরের বিরুদ্ধে গালাগালি ও কুৎসাপ্রচার বেশ কিছুদিন চলেছিল। একদিকে এস. এ. ডাঙ্গে ও অপরদিকে মুজফফর আহমেদ

গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় গোপালদা তাঁর রূপানারাণের কূলে বইটিতে মুজফ্ফর আহমদ সম্পর্কে অবিস্মরণীয় এক প্রশস্তি রচনা করেন। বইটি তিনি যেদিন কমরেড মুজফ্ফর আহমেদকে দিতে যান আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। মুজফ্ফর আহ্মদ আমাকে সেই অংশটি পড়তে বলেন। তারপর আমি তখনো চাকরী করি বলে তখনো আমার একটা মোটরকার ছিল। গোপালদাকে পৌঁছে দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার পার্টি আপনার এই বই লেখার জন্য নিন্দা করেনি? দৃপ্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, করলেই বা। কে পরোয়া করছে।" আমার তক্ষুণি সেই মনুমেন্টে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি মনে পড়ল। শান্তি পেলাম। গোপালদা যখন থেকে পাটনাতে অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলেন তখন থেকেই আমার সঙ্গে তাঁর সংযোগ কমে যায়। আমিও ১৯৭৬ সাল থেকে গোপালদার মতোই হাঁপের রোগে আক্রান্ত হই দু-একবার চিঠিতে এ রোগ সম্পর্কে তাঁর উপদেশ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে শেষ আলাপ করি বোধহয় চার বছর আগে, তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে। আমি বলেছিলাম, গোপালদা ১৯৪৫ সালে মুজফ্ফর আহমদ আমাকে দিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। যখন চারিদিকে আর্মিতে বিদ্রোহ শুরু হয়, সেসময় যদি আমরা অর্থাৎ ভারতের কম্যুনিস্টরা কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে ভারতীয় সৈন্য ও জনসাধারণকে দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতাম এবং, তাতে পরাজিত হতাম, যেমন বলশেভিকরা রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে হয়েছিল তাহলে অন্ততঃ দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হতো। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীবাদী নেতৃত্বর মুখোস একেবারে খুলে যেত এবং দেশদ্রোহী, এই নিন্দা আমাদের শুনতে হতো না ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছি বলে। গোপালদা আমার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। আমার সঙ্গে সেই তাঁর শেষ কথা। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে গোপালদার মত লোক আমি অল্পই পেয়েছি–যাঁদের জীবনযাপনের ও মতামতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করছি।

—সুধী প্রধান

৩

গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার পরিচয় তিরিশের দশকের শেষ থেকে। তখন তিনি বিবেকানন্দ রোডে মানিকতলার মোড়ের কাছাকাছি থাকতেন। আমি তখন কৃষক সভার কাজের সঙ্গে রীতিমতো যুক্ত। জেলা থেকে কৃষক সভার কর্মী বা সেকাজে কেউ কলকাতায় এসে কাকাবাবুর (মজফ্ফর আহম্দ) সঙ্গে

যোগাযোগ করলে, তিনি তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কৃষকসভার কাজে আগ্রহী অনেকেরই তখন সেটা জানা ছিল। গোপাল হালদারও সেটা জানতেন। মনে হয় ১৯৩০-৩২ থেকেই নোয়াখালির কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে গোপাল হালদারের সঙ্গে যোগ ছিল। নোয়াখালির কর্মীরা কলকাতায় এলে তিনি তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে থাকেন। যতোদূর মনে পড়ে পরিচয়ের সূচনা হয়ে ছিল এভাবেই।

তবে গোড়ার কথারও একটা সুর থাকে। সেই দিক থেকে বলতে পারি আমরা দু'জনেই পরস্পরের সম্পর্কে জানতাম। গোপালদা 'প্রবাসী,' 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি সেকালের সুখ্যাত সাময়িক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রেই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বর্ধমান জেলায় আমাদের পারিবারিক ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। সেই জানাটা আমাকে তাঁর কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে আমিও তাঁকে জানতাম একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ,প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ হিসেবে। ফলে পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার আরেকটা কারণও ছিল। গোপাল হালদারের ছোট বোন লক্ষ্মী হালদার ডাক্তার ছিলেন। ধর্মতলা স্ট্রীটের যে বাড়িতে তিনি ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করতেন, আমরা তার কাছাকাছি থাকতাম। পরে একই বাড়িতে থাকতাম পাশাপাশি ফ্ল্যাটে। সেখানে ওঁদের দাদা রঙীন হালদার পাটনা থেকে কলকাতায় এলে উঠতেন। তখন তাঁর কলকাতায় আসাও ছিল ঘনঘন। জীবনে আমি বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু রঙীনদার মতো এমন সর্ব অর্থে অনন্য মানুষ খুব কমই দেখেছি। রঙীনদা'র সঙ্গে গোপালদা'রও সম্পর্ক ছিল এতো নিবিড় যে; একজনের পরিচিত ও বন্ধুগোষ্ঠী খুব সহজেই অন্যজনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। পরের একটা কথা, আগেই বলে নিই। গোপালদা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরে যখন বোনের বাড়িতে এসে উঠতেন মাঝে মাঝে তখন কাকাবাবু (কমরেড মজফ্‌ফর আহমদ) ও আমরা সবাই ওখানে থাকতাম। তখন তো আমরা প্রায় একই পরিবারের লোক হয়ে গিয়েছিলাম।

নোয়াখালি প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও মনে পড়ছে। গোপালদার শ্রদ্ধেয়জনদের মধ্যে ছিলেন নোয়াখালির প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী ক্ষিতীশ চৌধুরী। কৃষক আন্দোলনে তিনিও যোগ দিতেন তিরিশের দশকে। জেলের বাইরে থাকলে তিনি

এই আন্দোলনই করতেন। গোপালদা'র সূত্রেই তিনিও পার্টির কাছাকাছি এসেছিলেন।

যতোদূর মনে পড়ে কৃষকসভার কর্মী হিসেবেই গোপালদা সারা ভারত কিষাণ সভার গয়া অধিবেশনে যোগ দেন। কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন বিমল প্রতিভা দেবী। বিমল প্রতিভা তার আগেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। গোপালদা'র সঙ্গে এবার কৃষক আন্দোলনেও তাঁর সংযোগ ঘটে।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধলে বেআইনী পার্টির অনেক নেতাকেই জেলে আটক করা হয়। তখনকার গোপন পার্টি সেন্টার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকেই প্রাদেশিক কৃষক সভার চার্জ দেয়। সারা ভারত কৃষক সভার অন্যতম নেতা ও পরে সম্পাদক হন কমরেড আবদুল্লা রসুল। কিন্তু তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। তখন প্রগতি লেখক, F S U প্রভৃতিতে অনেক কমরেড ছিলেন। পার্টি ঠিক করে গোপাল হালদার কৃষক সভার দায়িত্ব নেবেন। এটা ঘটে সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালের শেষে। গোপালদা'কে এই দায়িত্ব দেওয়ার দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ কৃষক আন্দোলন তখন বাংলার চেয়ে বিহারেই বেশি জোরালো ছিল। রঙীনদা'র সূত্রে গোপালদা প্রায়ই পাটনা যেতেন এবং সেখানকার বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পার্টি আন্দোলনের স্বার্থে সেটা কাজে লাগাতে চায়। আর দ্বিতীয় কারণ হলো তখন গোপালদার বেশ পরিচিত intellectual image, পার্টি সেটাও কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করে।

কৃষক সভার সূত্রেই গোপালদা ও আমি সংগঠনের অনেক অধিবেশনে ভারতের নানা জায়গায় গেছি। যেমন নাগপুরে, পাকাল'া'য় এবং অন্যত্র। এই প্রদেশের সম্মেলনগুলিতে তো প্রায় সর্বত্র আমরা একসঙ্গে গেছি। তখন দেখতাম কৃষক সমস্যা নিয়ে তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করেন। তার প্রচারের বহু দলিল তাঁরই রচনা। পার্টি তখন 'জনযুদ্ধের' লাইন নিয়েছে। তখনও কোন মতাদর্শগত বিরোধ ঘটেনি তাঁর সঙ্গে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার সেই চরম দুঃখ ও সর্বনাশের দিনে গোপালদা যখন মন্বন্তর সিরিজের উপন্যাসগুলি রচনা করেন, তখন কৃষক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন ডকুমেন্টারী উপন্যাস রচনায় সাহায্য করেছিল।

কৃষক আন্দোলন ও FSU থেকে গোপালদা পার্টির নির্দেশে 'পরিচয়' পত্রিকার দায়িত্বে আসেন। তখন থেকেই কর্মক্ষেত্রে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ি।

তবে একটা কথা বলা দরকার এখানে। আমি লিখিয়ে লোক নই। কিন্তু 'পরিচয়' সম্পাদক রূপে গোপালদা আমাকে দিয়েও, 'পরিচয়ে' লিখিয়ে নিয়েছেন। তখন প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' বই হিসেবে বেরিয়েছে। তাঁর কথাতেই আমি পরিচয় 'পত্রিকায়' এই বইটির একটা সমালোচনা লিখেছিলাম। বোধহয় পরিচয় পত্রিকায় সেটাই আমার প্রথম ও শেষ লেখা। তাই এতোদিন পরেও কথাটা মনে আছে।

পার্টির রণদিভে পর্বেও আমরা প্রায় একই সময়ে জেলে যাই। তারপর নানা পর্ব পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে ১৯৫৩ সালে যখন ফিরলাম স্বাভাবিক পার্টি কাজকর্মে তখন গোপালদা'র সঙ্গে যোগাযোগ আরো কমে আসে। ফলে তাঁর কাজের সম্পর্কে কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারো অনেক পরে পার্টি ভাগ হয়। তখন কিন্তু ঘটনাচক্রে আমরা আবার কাছাকাছি বাস করতে সুরু করেছি। পার্টি ভাগ হলেও, রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্য দেখা দিলেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। আইনগত কোন ব্যাপার হলেই তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন। সেটা আমার বাড়িতে কিম্বা তাঁর বাড়িতে হতো।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি গোপালদা'র সব রচনা আমি পড়িনি, আর যা পড়েছি তার সব কিছু কথা আমি বা আমার দাদা মেনে নিতে পারিনি। তাঁর বহু পঠিত গ্রন্থ "সংস্কৃতির রূপান্তর" এই পর্যায়েই পড়ে। রেনেসাঁস ও হিন্দু জাগরণ ইত্যাদি নিয়ে সেখানে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা একমত নই।

মানুষ হিসেবে গোপালদা ছিলেন আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। কোন বিষয়ে মত পার্থক্যকে বড়ো করে দেখতেন না। সব বিষয়ে সকলের কথা শোনার ব্যাপারে তাঁর মানসিক ঔদার্য ছিল। পার্টি জীবনে এটা একটা মহৎ গুণ। নিজের মত অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়, তাদের সঙ্গে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক করা তার স্বভাবসুলভ ছিল। আসলে নিজে 'আড্ডা'র মানুষ ছিলেন বলেই কথা বলা ও শোনায় কোন ক্লান্তি ছিল না। আমার সঙ্গে তাঁর যে স্নেহের সম্পর্ক ছিল সেটা জীবনের বাকি কটা দিনেও ভোলা যাবে না।

মনসুর হবিবুল্লাহ

১৯. ৬. ৯৪

পরিশিষ্ট—১

বিশ শতকের ঘটনাক্রম ও গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী

[জন্ম ঃ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২] [মৃত্যু ঃ ৪ অক্টোবর ১৯৯৩]

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ অমিয় ধর

[সাহিত্যের মধ্যে লেখকের মানসভুবনের কথাই মূলত ব্যক্ত হয়, তবে এই মানসভুবন গঠনে লেখকের ব্যক্তিজীবন ও নির্দিষ্ট দেশ ও কালের পটভূমি সক্রিয় উপাদান হিসাবে কাজ করে। কলাকৈবল্যবাদীদের বাদ দিলে মহৎ শিল্পী মাত্রই সমাজ সচেতন। সমাজ বিকাশের ধারার সঙ্গে তাঁর সৃজন-ক্রিয়ার সম্পর্ক কোন না কোন ভাবে থেকেই যায়। শিল্পায়ন ক্রিয়াটি কখনই সমাজ-নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়, বরং বহুলাংশেই সমাজধর্মজাত। সামাজিক মানুষ ও তার বৈষয়িক ও আত্মিক জগতের সমস্ত রকম মানবিক ক্রিয়াকর্মই শিল্প সাহিত্যের এলাকাভুক্ত।

'কবিজীবনী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচারে লেখকের অন্তর্জীবনের মুখ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেও লিখেছেন, এমন অনেক কবি আছেন, "তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব, নিবিড়তর হইয়া উঠে।" গোপাল হালদার এই শ্রেণীরই লেখক—তাঁর সাহিত্যকর্মে তাঁর জীবন জড়িয়ে আছে। তাই গোপাল হালদারের সাহিত্য-সাধনার স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর দেশ-কালের পটভূমির পরিচয় গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন।

গোপাল হালদারের মতে "সাহিত্য লেখকের স্বীকারোক্তি।" 'রূপনারানের

কূলে'র মধ্যে নানা প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেছেন, "তবু শুধু আমাকে নিয়েই আমি নই। দেশ ও কাল নিয়েই আমি। ···ইতিহাসে যে-কালান্তর আরম্ভ হয়েছিল, তা প্রতিদিনই দুর্বারিতর হয়। দেশে স্বাধীনতার উন্মাদনা···সাধ্য কি ভুলে থাকব সেই যুগআবর্তন ?"— (রূপনারানের কূলে—২য় খণ্ড-পৃ. ২-৩)।

গোপাল হালদার যুগ-আবর্তনের কথা কখন ভুলে থাকেন নি ; বরং তাতে লগ্ন হয়ে আন্দোলিত হয়েছেন এবং সাহিত্যে তাকেই প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমার পক্ষে আরও একটা কথা আছে। প্রথম থেকেই সাহিত্য আমার কাছে স্বাধীনতার প্রেরণার বড়ো পরিপোষক। তাতে যেমন স্বপ্নে মেতেছি, তেমনি অনুভব করেছি পরাধীনতার গ্লানি। ···সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—মূলত একই সত্যের দু'পিঠ।"—(রূ. কূলে, ১ম খণ্ড-পৃ. ৯২-৯৩)। গোপাল হালদারের আত্মজীবনী, তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাস পাঠ করলে যে-কোন পাঠকই লক্ষ্য করবেন,—গোপাল হালদার তাঁর দেশ ও কালের সমাজ-সংস্কৃতির বস্তুবাদী বিশ্লেষক, তার রূপান্তরের আদর্শনিষ্ঠ কারিগর এবং সমকালীন ইতিহাসের মননশীল কথাকার। তাঁর ব্যক্তিজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও লেখকজীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত।]

১৯০০ খ্রীস্টাব্দ বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে (১৮৯৯-১৯০০) ছোটনাগপুরের মুন্ডা অভ্যুত্থান। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ, সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা।

১৯০১ খ্রীঃ ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় কংগ্রেস-সম্মেলন। এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঙলা মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র আত্মপ্রকাশ। বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

* ১৯০২ খ্রীঃ ১১ ফেব্রুয়ারি (বাং ২৮ শে মাঘ, ১৩০৮) ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদগাঁও পৈতৃক ভদ্রাসনে গোপালচন্দ্র হালদার জন্মগ্রহণ করেন। হালদারগোষ্ঠী ভরদ্বাজ গোত্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, মুখুটি গাঁই, তবে "আটপুরুষ ধরে ফারসি পদবিতে চিহ্নিত 'হালদার'।"—(রূপনারানের কূলে, ২য় খণ্ড / পৃ ১৯৮)। পিতা—সীতাকান্ত হালদার। মাতা—বিধুমুখী দেবী। পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। বড়দি লাবণ্য, ছোট তিন বোন—সুবর্ণ (জ্যোৎস্না), বিদ্যুৎ ও সরস্বতী। ছোট দুই ভাই—গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ।

১৯০২ খ্রীঃ জাপানী শিল্পী ডঃ কাকুজো ওকাকুরা ভারতে আসেন। স্বামী

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ডঃ ওকাকুরার পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে অখণ্ড এশিয়ার ('Asia is one') মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়। জানুয়ারি ১৯০২, ওকাকুরার আমন্ত্রণে স্বামীজীর বুদ্ধগয়া ভ্রমণ। ২৪ মার্চ, কলকাতায় ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে গুপ্তবিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন এই গুপ্ত সমিতির অন্যতম প্রাণশক্তি। ৪ জুলাই, ১৯০২, স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন।

১৯০৩খ্রীঃ ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১০) ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

১৯০৪ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য লর্ড কার্জন-এর পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন। সখারাম গণেশ দেউস্কর-এর 'দেশের কথা' গ্রন্থটির প্রকাশ। ২২ জুলাই, কলকাতার মিনার্ভা মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ। ১৪ ডিসেম্বর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ।

১৯০৫ খ্রীঃ ১৯ জুলাই কার্জনের 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা। ৭ আগস্ট টাউন হলের সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্রিটিশপণ্য বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ। ১৬ অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হয়। এর প্রতিবাদে কলকাতায় 'অরন্ধন' পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', গান গেয়ে হাতে হাতে 'রাখীবন্ধন'। বিকেলে ফেডারেশন হলের সভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ঘোষণা পাঠ।

১৯০৫ রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশ। ৪ নভেম্বর কলকাতায় ছাত্রদের উদ্যোগে 'এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। ৮ নভেম্বর রংপুরে প্রথম 'ন্যাশনাল স্কুল' স্থাপন।

১৯০৬ খ্রীঃ ১৪-১৫ এপ্রিল অশ্বিনীকুমার দত্তের উদ্যোগে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন, সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। সেই সঙ্গে সেখানে সাহিত্যসম্মেলন আহূত হয়—সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুলিশী বর্বরতায় উভয় সম্মেলনই পন্ড হয়।

বরিশালে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে বাঙলার বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' ২২ এপ্রিল সম্পাদকীয়তে লেখে,—"দেশের ৩০ কোটি মানুষ যদি তাদের ৬০ কোটি হাত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় তুলে ধরে, তবেই বন্ধ হবে এ অত্যাচার। একমাত্র শক্তি দিয়েই শক্তির প্রকাশকে স্তব্ধ করা সম্ভব।"

১৯০৬-এ 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠা,—অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ।

ঢাকায় পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের ছত্রছায়ায় 'সারাভারত মুসলিম লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা। 'বন্দেমাতরম' দৈনিকপত্রের আত্মপ্রকাশ। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন—সভাপতি দাদাভাই নৌরজী। 'স্বায়ত্ত শাসন বা স্বরাজ'-ই কংগ্রেসের লক্ষ্য এ-কথা ঘোষণা করে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে আপসের চেষ্টা।

পূর্বভারতীয় রেল, সরকারী ছাপাখানা, পৌরসভা ও বৃটিশ মালিকাধীন বস্ত্রকলে শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘট। ২৭ জুলাই ১৯০৬, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দপ্তরে 'রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়ন'-এর প্রতিষ্ঠা।

১৯০৭ খ্রীঃ ১৯০৫-এর প্রথম রুশ বিপ্লবের কথা বিপ্লবীদের বে-আইনী ইস্তাহার 'সোনার বাঙলা'-য় প্রকাশিত। বিপ্লবী দলের মুখপত্র 'যুগান্তর'-এ রাজদ্রোহের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বছর কারাদণ্ড। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে আদালত অবমাননার দায়ে চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের ৬ মাস কারাবাস।

চরমপন্থী ও নরমপন্থী বিবাদে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রথম ভাঙন। লালা লাজপৎ রাই ও অজিত সিং-এর নেতৃত্বে সেচকর ও খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে পাঞ্জাবে কৃষক বিক্ষোভ। লাজপৎ রাই ও অজিত সিংকে গ্রেফতার করে মান্দালয় জেলে প্রেরণ।

১৯০৭ খ্রীঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'মডার্ণ রিভিউ'-এর আত্মপ্রকাশ।

১৯০৮ খ্রীঃ প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। প্রমাণাভাবে অরবিন্দের মুক্তি। বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বীপান্তর।

'কেসরী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামের আত্মদানের প্রশস্তি। রাজদ্রোহের অপরাধে 'কেসরী' সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের ৬ বছর কারাদণ্ড। তিলককে মান্দালয় জেলে প্রেরণ। প্রতিবাদে বোম্বাই শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি।

* ১৯০৮ খ্রীঃ "স্বদেশী যুগের প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে স্পষ্ট তা এই—এখন জানি তা ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিলের ঠিক পরেকার কথা, বয়স যখন আমার ছয় বছর। বাবার বৈঠকখানায় বসেছিলেন সেদিনের পদস্থ একদল ভদ্রলোক, অনেকেই তাঁরা সরকারি চাকুরে··আমার কানে গেল—মনেও গেঁথে রইল—সেখানকার একটি আলোচনাঃ "রেলস্টেশনে আত্মহত্যা করেছে—ধরা দেবে

না।"…আমার স্বদেশী-চেতনার জন্ম বৈঠকখানার সেই ১৯০৮-এর মে মাসের ওই টুকরো-টুকরো কথার আলোচনায়।…তবু মনে পড়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে বেসরকারি স্কুলের ছাত্র আমার অগ্রজরা স্কুলে গিয়েছিলেন, খালি পায়ে, চাদর গায়ে। মনে পড়ে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সপ্রশংস আলোচনা বাড়িতে, বাজারে, পথে-ঘাটে সর্বত্র।"—(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ ৮৫)।

গোপাল হালদার এসময় বাড়ির লাগোয়া 'বঙ্গবিদ্যালয়ে'র ছাত্র।

* ১৯০৯ খ্রীঃ ভাইসরয় মিণ্টো ও ভারতের রাষ্ট্রসচিব মর্লি নতুন ভারতীয় পরিষদবিধি প্রবর্তন করেন—এটি মর্লি-মিণ্টো সংস্কার নামে খ্যাত। গোপাল হালদার নোয়াখালির আর. কে. জুবিলী স্কুলে ভর্তি হন।

১৯১০ খ্রীঃ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র দমনের জন্য নয়া প্রেস আইন। এই আইন বলে সরকার এলাহাবাদের উর্দু সাপ্তাহিক 'স্বরাজ্য' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়! রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় (ভাদ্র, ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন, ১৩১৬ পর্যন্ত) এবং (মাঘ, ১৩১৬) জানুয়ারি ১৯১০-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

* ১৯১১ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর। রাজা পঞ্চম জর্জের ভারত পরিদর্শন, দিল্লীর দরবারে ভারত সম্রাট হিসাবে তাঁর অভিষেক। মোহনবাগানের শীল্ড জয়।

"মোহনবাগান শীল্ড পেল। সেই উৎসাহ পূর্ব-বাঙলার ওই ছোটো শহরেও ছড়িয়ে পড়ল।…আপাতত ১৯১১-এর মোহনবাগানের জয়ে ফুটবল থেকেও যে স্বদেশির ফুলকি ফুটে বেরুল বাড়ির কে তা বুঝবে? আরও কতখান থেকে যে তা বেরুচ্ছে, তাই বা কে জানে?…'প্রবাসী'র পাতা থেকে এক অবোধ কিশোর একটুও না বুঝলেও কী বুঝত, আর কী আগ্রহে পড়ত রামলাল সরকারের ১৯১১-এর চীনা বিপ্লবের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত?…দায়ী কেউ নয়—তখন অগ্নিযুগ, আগুনের আঁচ তার বাতাসে।"—

—(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ ৯৪-৯৫)।

১৯১২ খ্রীঃ দিল্লীতে বিপ্লবীদের নিক্ষিপ্ত বোমায় লর্ড হার্ডিঞ্জ মারাত্মকভাবে আহত। কংগ্রেস কর্তৃক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য ঘোষণা।

১৯১৩ খ্রীঃ হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় মাস্টার আমীর চাঁদ, আবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস—এই চার বিপ্লবীর ফাঁসি। আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের 'হিন্দুস্তান গদর পার্টি" গঠন।

* ১৯১৩ খ্রীঃ ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি (Song offerings) কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ। "রবীন্দ্রনাথ সদ্য তখন পুরস্কারটা পেয়েছেন।···সাহিত্যের স্বীকৃতিতে সমগ্র জাতির প্রতিষ্ঠা, এই কথাটা বিশেষভাবে মনে গেঁথে রইল এই সূত্রে।"—(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ. ১৩৬)।

"···১৯১৩-১৯১৪-তে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' হাতে পাবার পরে রবীন্দ্রনাথই হলেন প্রধান জিজ্ঞাস্য। তখন আমাদের জীবনে লাগল রবীন্দ্রযোগ। সাহস হল দুর্জয়। ঘরের বাঁধানো 'প্রবাসী'র দিকে দৃষ্টি গেল বিশেষ করে—কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রধান বাহন 'প্রবাসী', বাড়িতেই তা সুরক্ষিত। 'গোরা'ই সর্বাগ্রে পড়লাম। ভয়ে-ভয়ে, ধীরে-ধীরে। ঘটনা অপেক্ষা ভাবনা যেখানে প্রধান এমন উপন্যাসের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়।"—(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ. ১৪২)।

'ভারতবর্ষ" (আষাঢ়, ১৩২০) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

১৯১৪ খ্রীঃ ৪ আগস্ট প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা। জেল-মেয়াদ শেষে তিলকের মুক্তিলাভ।

কলকাতায় ডালহাউসি স্কোয়ারে 'রডা কোম্পানি'র আমদানি করা ৫০টি মাউজার পিস্তল ও প্রচুর গুলি ২৬ আগস্ট বিপ্লবীদের হস্তগত হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর 'কোমাগোটামারু' নামে এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করে একদল ভারতীয় কানাডা থেকে কলকাতার বজবজে এসে পৌঁছায়। এরা গদর পার্টির লোক এই সন্দেহে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে সংঘর্ষে পুলিশসহ ২০জন নিহত হয়।

* ১৯১৪ খ্রীঃ "বাঙলা দেশে যাকে অগ্নিযুগ বলে তার অগ্নিমন্ত্র কেউ যদি জাগিয়ে থাকেন তবে সে বিবেকানন্দ।"··· "সেই বারো বৎসর বয়সে বাঙলা লেখার মধ্য দিয়েই প্রথম পেলাম বিবেকানন্দের স্পর্শ—আগুনের পরশমণি"। —(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ. ৯৬-৯৭)।

১৯১৫ খ্রীঃ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভারতীয় ফৌজের মধ্যে এক মহা-বিদ্রোহ সংঘটনের পরিকল্পনা (১৯ ফেব্রুয়ারি) করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার

ফলে তা বানচাল হয়। ১২ মে, ১৯১৫ রাসবিহারী ছদ্মবেশে জাপানে পাড়ি দেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সেনা বিদ্রোহ। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫, বাঘা যতীনের নেতৃত্বে উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে বুড়িবালামের তীরে পরিখা যুদ্ধ। বার্লিনে ভারত-স্বাধীনতা কমিটি গঠন। কাবুলে নির্বাসিত অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের ‘নাইটহুড’ প্রাপ্তি।

* ১৯১৬ খ্রীঃ ‘নিখিল ভারত হোমরুল লীগ’ গঠন। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে সন্ধিচুক্তি। তিলকের নেতৃত্বে ‘হোমরুল’ বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের বিস্তার।

বিপ্লবীদের পরামর্শদাতা সন্দেহে ভারতরক্ষা আইনে কংগ্রেস নেতা সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে গ্রেফতার। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের গ্রন্থরূপে প্রকাশ।

১৯১৬ খ্রীঃ ১৯১৬ সালে ১৪ বছর বয়সে গোপাল হালদার ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত হন।

“স্বদেশীর দলে ঢুকলাম—না হল দীক্ষা, না বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান। ···দলটা ছিল বরিশালের শঙ্কর মঠের সঙ্গে সংযুক্ত। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তার প্রতিষ্ঠাতা—এখন ‘সরস্বতী প্রেস,’ ‘সরস্বতী লাইব্রেরি’, তাঁরই নামাঙ্কিত।’ —(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ ১০৫)।

“আমার কাজ বিপ্লবী সাহিত্য নিয়ে। বইপত্র রাখা। পড়ার ঘরে প্যাকিং বাক্সের আলমারিতে দু-ভাই-এর পড়ার বই থাকত। সেখানে পাঠ্য বই-এর পিছনে ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতিও লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম।···‘দেশের কথা’, ম্যাৎসিনি গ্যারিবলদীর জীবনী, সিরাজদ্দৌলা···গেরিলা যুদ্ধের নানা বই, অরবিন্দের পত্র, পরে ‘প্রবর্তক’—এমনি সব নানা বই সেখানে থাকত স্বচ্ছন্দে। সে-সব বই-পত্র যাতায়াত করত নানা লোকের কাছে—শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও।···সেই তালাহীন আলমারির বই-এর পিছনে নির্বিবাদে যে-সব জিনিস স্থান পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি মশা’র পিস্তল···রডা কোম্পানিরই চোরাই মাল। কত পথ ডিঙিয়ে এসে আমার আলমারিতে পৌঁছেছে, এবং কতখানে বারে-বারে দু-এক মাসের মতো ঘুরে এসে আবার সেখানেই বিশ্রাম করেছে। যতদিন কলেজের শিক্ষার ডাকে আমি নোয়াখালি ত্যাগ না করেছি ততদিন তা ছিল আমারই জিম্মায়।” (রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ ১০৭)।

১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও জারের পতন। ভারতের হোমরুল

কমিটি কর্তৃক 'রাশিয়ার উদাহরণ' নামক পুস্তিকা প্রকাশ। ২৪ মার্চ, এলাহাবাদের 'অভ্যুদয়' পত্রিকা লিখল, "উদ্দীপক, প্রাণদাত্রী জাতীয়তাবাদের কাছে যে পৃথিবীর সকল বাধাই তুচ্ছ, রাশিয়ার বিপ্লব থেকে আমার তা বুঝতে পারি।" ১৯১৭-র নভেম্বরে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব এবং লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

বিহারের চম্পারনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

* ১৯১৭ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ—'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ('প্রবাসী,' ভাদ্র- ১৩২৪-এ প্রকাশিত) এবং 'ছোটো ও বড়ো' (প্রবাসী,' অগ্রহায়ণ ১৩২৪-এ প্রকাশিত)'।

'রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা ইঙ্গিত তখন মনে জাগতে লাগল। বিবেকানন্দের প্রেরণার আগুনে শুধু না জ্বলে তাতে প্রদীপ জ্বালানোর মতো সুযোগ রচিত করে দিতে চাইল কবির বাণী। 'প্রবাসী'র পাতা থেকে 'ছোটো ও বড়ো' আর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এসে সেই পুরনো অনুবলুপ্ত বোধকেই আরও জীইয়ে তুলল— । 'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে।' আর বিদেশীরা মঙ্গল ঘট ভাঙবে কি? 'মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা / সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে'— তারটা উঁচুতে হোক নিচুতে হোক, আরেক গ্রামে বাঁধা হচ্ছিল। যখন বাজবার দিন আবার এল, নন্ কো-অপারেশনের শেষ বেলায়—তার আগেই ঘটেছিল রুশ-বিপ্লব, তখন সন্দেহ রইল না, কানাগলিতে পথ নেই।"—(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ ১১১)।

১৯১৮ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান। মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা। জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন। মধ্যপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া' নামে স্বতন্ত্র সংগঠন। জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য রাওলাট কমিটির প্রস্তাব। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গুজরাটে কৃষকদের খাজনাবন্ধের আন্দোলন, তাঁর অন্যতম সহযোগী ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। আমেদাবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে মিল-শ্রমিকদের আন্দোলন।

* ১৯১৮-তে গোপাল হালদার আর, কে, জুবিলি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে আই. এ, ক্লাসে ভর্তি হন। ওগিলভি হোস্টেলের আবাসিক। "এই পর্যন্ত এল ১৯১৮ সালে—দাদার (রঙীন হালদার) সঙ্গে যাত্রা নোয়াখালি থেকে কলকাতায় —কলেজে পড়ব। কৈশোর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি যৌবনে।"—(রূপনারানের কূলে —১ম খণ্ড-পৃ ১৪৭)।

হোস্টেলের সহবাসী বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সাহিত্য মজলিস গঠন ও হোস্টেল পত্রিকা সম্পাদনা।

"গোপাল হালদার, পরিমল রায় (এক নং ও দুই নং), বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত সরকার, গিরিধর চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র ঘোষ···প্রভৃতি সহবাসী বন্ধুজন তাঁহাদের সাহিত্য-মজলিসে স্থান দিয়া পথভ্রষ্টকে আবার পথের সন্ধান দিলেন।" —(আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস—পৃ ৬৬)।

"বন্ধুবর গোপাল হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় হাতের লেখা আগিলভি হোস্টেল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন চলিয়াছিল।"— (ঐ পৃ ৭০)

১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কার। ১৮ মার্চ, 'রাওলাট আইন' প্রবর্তন। 'রাওলাট' আইনে'র বিরুদ্ধে গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের ডাক ও ৬ এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে নারী পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে প্রায় এক হাজার নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়, বহু মানুষ আহত হয়। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'নাইট উপাধি' ত্যাগ (জুন ১৯১৯)।

খিলাফৎ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে গান্ধীজীর নির্বাচন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা।

* ১৯১৯ খ্রীঃ "১৯১৯ থেকে আমার সঙ্গে সত্যেন্দ্রদা'র সাক্ষাৎ পরিচয়।"— (রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড-পৃ, ১৬১)।

নোয়াখালির মানুষ কংগ্রেস নেতা সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে গোপাল হালদার কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করেন। 'সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'স্বদেশী' পরিচয়টা যখন আমার কাছে পৌঁছয় তখন প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। অনতিপরেই সত্যেন্দ্রচন্দ্র গ্রেফতার হয়ে অন্তরীণ হলেন। তার আগে তিনি আমাকে দেখেননি, নাম জানতেন কিনা তাও জানি না। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন বন্দীরা ছাড়া পান; আমরা তার আগেই কলেজে।···মুক্তি পেয়ে ফিরে এলে হ'ল সাক্ষাৎ-পরিচয়। কলকাতায় ওকালতিতে বসেছেন—আমরাও কলকাতায় পড়ি।'—(রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড পৃ, ১৫৬-৫৮)।

"দেখলাম মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট বা সুপারিশ বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই এসেছিল রাউলাট রিপোর্ট। আর তার অনুসরণে এসেছিল রাউলাট এ্যাক্ট (মার্চ ১৯১৯)।··দমননীতির নতুন অস্ত্র। এই আইন উপলক্ষ করেই ঘটে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধের পর্বান্তর।"

১৯২০ খ্রীঃ মে মাসে সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ. আই টি. ইউ, সি.) প্রতিষ্ঠা। লালা লাজপত রায় সংগঠনের প্রথম সভাপতি। ১ আগস্ট বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা। ৪-৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। মতপার্থক্য সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীজীর অসহযোগ কর্মসূচী মেনে নিয়ে সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, "শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজের আর অপেক্ষা করার সময় নেই।"

ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগের কর্মসূচী আর অহিংসনীতি কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গৃহীত।

১৯২০-তে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আমেদের উদ্যোগে 'নবযুগ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

* ১৯২০ খ্রীঃ গোপাল হালদার প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, স্কটিশ চার্চ কলেজেই ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হন।

"১৯২০-এর পরে ভারতের গ্রামে-শহরে একটা ধ্বনি উঠল 'স্বরাজ-সাধন কী জয়।' কোন্ এক লগ্নে যে ভারতীয় জাতীয় চেতনা হঠাৎ ঐ কথাটায় নিজের রূপ আবিষ্কার করল, তা বলা শক্ত।···আমাদের কৈশোর 'স্বদেশী'র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল; যৌবন 'স্বরাজ-সাধনে' পায় কর্মযোগের পাঠ—তাই কলেজের পাঠ হয়েছিল অবান্তর।"—(রূপনারানের কূলে—১ খণ্ড-পৃ. ৮১)।

১৯২১ খ্রীঃ মে মাসে চা-বাগান মজুরদের ধর্মঘট। যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদ-রায়বেরিলী-সুলতানপুরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এবং বাঙলায় স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতি। আগস্ট মাসে কেরলায় মোপলা বিদ্রোহ। মূলতই মালয়ালাম বংশোদ্ভূত মুসলিম প্রজারা হিন্দু-ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসন ও সামন্তশোষণ বিরোধী হলেও ধর্মীয় আবেগের জন্য সাম্প্রদায়িক একটা বৈশিষ্ট্যও তার ছিল। পাঞ্জাবে আকালী আন্দালন—গুরুদ্বারের মোহন্তদের বিরুদ্ধে সাধারণ শিখ-কৃষক প্রজাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

১৭ নভেম্বরে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে প্রতিবাদমূলক শ্রমিক ধর্মঘট। ডিসেম্বর ১৯২১-এ কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন

অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ! এই অধিবেশনে হসরৎ মোহানি ও স্বামী কুমারানন্দ কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন।

* ১৯২১ খ্রীঃ "গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি একবছরে স্বরাজ··আবেগে-উৎসাহে সেই এক বৎসর চিত্তরঞ্জন দাশ দেশ মাতিয়ে বেড়ালেন। সে এক বৎসর কী এক বৎসর আমাদের যৌবনের, আজ তা বোঝানো অসম্ভব। দেশবন্ধুর অগ্নিবার্তা সংগ্রাম-আহ্বান। আরম্ভ হল আইন অমান্য, দলে-দলে সত্যাগ্রহ।

—(রূপনারানের কূলে—২ খণ্ড-পৃ ৮৮-৯০)।

ফেব্রুয়ারি ১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে গোপাল হালদার অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখলেন "বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন" (সবুজ পত্র / মাঘ, ১৩২৭)।

* ১৯২২ খ্রীঃ "এমনিতর ঝড়ের মুখেই আসছিল আমাদের বি এ পরীক্ষা (এপ্রিল ১৯২২)।···একি পরীক্ষার সময় ? মুখ দেখাব কি করে—এমন বৎসরে স্বরাজের থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি ? ঠিক করলাম—পরীক্ষার দক্ষিণা দাখিল করি, তা হলে আগামী বছর দিতে পারব পরীক্ষা—১৯২৩-এ। একটা বছর আমার জীবনে—এই ১৯২২—থাক স্বরাজের জন্য উৎসর্গ করা। চলে গেলাম নোয়াখালি। কংগ্রেসের নেতারা শহরে আমাকেই রাখলেন অফিস চালনার সহায়ক করে। জেলে যাওয়ার লোক তাঁদের অনেক আছে, আমাকে না হলেও চলবে, সেই সত্যেনদার কথা। সংগঠন গঠনের লোক বেশি দরকার !"—(রূপনারানের কূলে—২ খণ্ড-পৃ ৯১)।

"হঠাৎ উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় হিংসার আবির্ভাব হল। এমন এক-আধটা ঘটনা ঘটা বিপুল দেশের বিশাল আন্দোলনে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু গান্ধীজী চান অসম্ভবকেই সম্ভব করতে—কায়মনোবাক্যে সামগ্রিক অহিংসা। গুজরাতের বর্দৌলি সত্যাগ্রহের জন্য যখন প্রস্তুত, তিনিই সেখানে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি বাতিল করলেন। জানালেন, দেশ অহিংসায় দীক্ষিত হয় নি। স্বাধীনতার পরীক্ষার সমস্ত উদ্দীপনার উপরে জলভার ঢেলে দিয়ে তিনি সকলকে বিমূঢ় করে দিলেন। আমি অবশ্য মূঢ় নই। এসে বসে গেলাম পরীক্ষা দিতে। তখনো বি. এ. পরীক্ষার এক মাস সময় আছে।"

—(রূপনারানের কূলে—২ খণ্ড-পৃ ৯৬-৯৭)।

গোপাল হালদার ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন।

১৯২২ খ্রীঃ ১ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী ভাইস্‌রয় রিডিংয়ের কাছে চরমপত্র পাঠিয়ে ঘোষণা করেন, আন্দোলনকারীদের উপর নির্যাতন বন্ধ না হলে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কর-বন্ধ আন্দোলন করা হবে।

৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরি-চৌরায় পুলিশের গুলিচালনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষকজনতার থানা আক্রমণ এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাইশজন পুলিশ কর্মচারীর মৃত্যু।

আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হওয়ায় গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হয়ে বর্দোলি থেকে 'অসহযোগ আন্দোলন' স্থগিত ঘোষণা করলেন।

সরকার বিরোধী প্রচারের অপরাধে ১০ মার্চ গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার হন। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠেছিল, মাঝ পথে আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা। মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভার তৎপরতা বৃদ্ধি। ডিসেম্বর ১৯২২ গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু আইন সভায় প্রবেশ করে সরকারী নীতির বিরোধিতার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস পরিবর্তনপন্থী (Pro-Changer) ও পরিবর্তন-বিরোধী (No-Changer)—দু-দলে ভাগ হয়ে যায়। কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ পার্টি (পরবর্তীকালে নাম হয় স্বরাজ্য দল) গঠন ; চিত্তরঞ্জন দাশ—সভাপতি, মতিলাল নেহেরু অন্যতম সম্পাদক।

নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' (১২ ৮· ১৯২২)—সাপ্তাহিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এই পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হয়। সরকার পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুল কারারুদ্ধ হন (২৩.১১.১৯২২—১৬.১.১৯২৩ পর্যন্ত)।

১৯২৩ খ্রীঃ দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। এক আপসসূত্র অনুযায়ী স্বরাজ্য দলের কর্মীরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমোদন লাভ করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে বাঙলায় 'স্বরাজ্য দলে'র সঙ্গে মুসলিম নেতাদের চুক্তি—'বেঙ্গল প্যাক্ট'।

* ১৯২৩ খ্রীঃ "আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে যা অনিবার্য তা ঘটল—এখানে সেখানে কংগ্রেস রাজনীতির ঘোঁট ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। নন-কো-অপারেশন

কার্যক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ; চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু প্রভৃতি বিচক্ষণ নেতারা চাইলেন আইন সভায় গিয়ে সংগ্রাম চালাতে। বছর খানেক বাদে মহম্মদ আলী শেষ অবধি দিল্লী কংগ্রেসে একটা আপোস সূত্র গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস আইনসভায় যাবে না, কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা যদি চায় যাক। এই অনুমোদনটুকু যথেষ্ট হল, নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি জেঁকে উঠল। ছ-সাত বৎসর স্বরাজ্য পার্টি জাতীয় রাজনীতির মুখপত্র, অবশ্য জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় মতবাদ ততক্ষণে ঘায়েল সাম্প্রদায়িকতাবাদের হাতে।

আমরা বন্ধুরা তখন অনেকে দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে গেছলাম। স্বদেশী দাদারা চিত্তরঞ্জনের প্রধান কর্মী। আমি কলকাতায় এম. এ. পড়ি—দাদাদের ভক্তিহীন সঙ্গী। সেই আমার প্রথম কংগ্রেস ডেলিগেট হওয়া।”

—(রূপনারানের কূলে—২ খণ্ড-পৃ ৯৭)।

১৯২৪ খ্রীঃ কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। অক্টোবরে প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন। এই অর্ডিন্যান্স বলে সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ নেতারা কারারুদ্ধ। বোম্বাইতে বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘাতে বিচলিত গান্ধীজী চিত্তশুদ্ধির জন্য একুশ দিন (সেপ্টেম্বর ১৯২৪) উপবাস ব্রত পালন করেন।

১৯২৪ খ্রীঃ গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেন।

* ১৯২৫ খ্রী ১৬ জুন দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু। ৯ই আগস্ট কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা। ডিসেম্বরে কানপুরে কমিউনিস্ট সম্মেলন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। 'লাঙল' (২৫. ১২. ১৯২৫) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা—'অন্তত ষোলবার' বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কবি নজরুল ইসলামের উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে 'লেবার স্বরাজ পার্টি গঠন।'

* ১৯২৫ খ্রী ঃ গোপাল হালদার আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ট্যাগোর-ল' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। বি, সি, এস্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে বাতিল হন। “Here I may be permitted an aside to relate a story. We both sat for a competitive examination for the executive service where both of us were

successful but both were medically examined and rejected.” —(Gopal Halder—a friend with a difference—R. N. Bose)।

“সরকারী চাকরিতে আমার আগ্রহ ছিল না। তবু পরীক্ষা দিয়েছিলাম—বোধ হয় ১৯২৫ সালে।··· পাসের পরে নিয়োগের পূর্বে পাস-করাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সে-বার কড়াকড়ি হ'ল। বাড়ির কড়ি খরচা করে গিয়েছিলাম ওই স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য দার্জিলিঙে··· অনেকের মতো আমিও ফেল করলাম··· দেহের ওজন ভারী নয়··· ।”—(রূপনারানের কূলে—২ খণ্ড-পৃ ১৭৪)।

“তা হলে ওকালতিই গতি। সনদ নিই।·· বছর দেড়েক নোয়াখালি ছিলাম, তখন আমার সাধারণ পেশা ওকালতি—নেশা কি, কিছুই জানি না। নাটক, সাহিত্য সভা, সে তো বৎসরে দু-চারদিন হয়। বরং সময় কাটানো যায় কংগ্রেসের রাজনীতিতে। তাতে অরুচি ছিল না। অবশ্য বর্দোলির পর এসেছিল অবসাদ। স্বরাজ্য পার্টির পলিটিক্‌স্‌ও চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে দেউলে হয়ে যাচ্ছে! আমার কাজ ছিল বন্ধুগোষ্ঠীতে আড্ডা, লাইব্রেরিতে পড়া, স্থানীয় সাপ্তাহিক ‘দেশের বাণী’তে যদিচ্ছা কলম চালনা, আর কলকাতার ইংরেজি-বাঙলা কাগজে কখনো বা গল্প-প্রবন্ধ লেখা—অর্থাৎ সেই সাংবাদিকতা, নামমাত্র দক্ষিণায়।”—(রূ. কূলে ২য়—পৃ ১৭৫)।

সরকারী নথীপত্রে, বিলেতের কর্তাদের কাছে পাঠানো গোপন রিপোর্টে ‘দেশের বাণী’ ‘মস্কোর সাহায্যপুষ্ট’ ‘কমিউনিস্টদের কাগজ’। আসলে এটি কংগ্রেসের স্বরাজ্যদলের অনুগামীদের কাগজ।

‘দেশের বাণী’র “সংবাদ সংকলনে একটু নতুনত্ব ছিল। স্থানীয় সংবাদের পাশে আন্তর্জাতিক সংবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শঠতার তথ্য সংকলন; এটুকু বোধ হয় আমার কাজ। কখনো থাকত এম এন. রায়ের ‘ভ্যানগার্ড’ বা ‘এ্যাডভান্স গার্ড’ থেকে এক-আধটুকু উক্তির পুনরুক্তি, ‘লাল জুজু’ নিয়ে সরকারকে পরিহাস, কখনো কানপুরে দণ্ডিত মুজফ্‌ফর আহমদের আলমোড়ায় পীড়ার কথা। এসবে হয়তো সে পত্রে সমাজতন্ত্রী ছায়া এক-আধটুকু পড়া সম্ভব। কিন্তু ‘দেশের বাণী’ কংগ্রেস-কর্তাদের কাগজ, তাঁরা মালিক, তাঁরা চালক—কমিউনিজম তাঁরা জানতেনও না, চাইতেনও না। অর্থাভাবে ক্রমেই কাগজটা বিপন্ন হয়। সত্যেনবাবু (সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ‘দেশের বাণী’র সম্পাদক, কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের নেতা,) তখন মান্দালয়ে রাজবন্দী। মাথা ব্যথা ক্ষিতীশ চৌধুরীর—শেষে যেমন করে হোক কংগ্রেসী কর্তাদের সাহায্যে ‘দেশের বাণী’ প্রেস স্থাপিত হ'ল···দেশের

বাণীর' ছাপার অসুবিধা ঘুচল। ···আমিই বা কী? ক্ষিতীশদার সঙ্গে হাত লাগাই। কলম চালাই—মাত্র চার আনার কংগ্রেসম্যান। কী জানতাম আমি কমিউনিজমের? জানতাম শুধু এই—সোভিয়েট রাষ্ট্রটার কথা। স্বাধীনতা জিনিসটা যদি ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষকের জিনিস না হয়, তা হলে সে স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ থাকবে না। 'দেশের বাণী'র লেখায় এরূপ তত্ত্বের ঝোঁক দেখা গেলেও তা সামান্য।"—(রু কুলে ২য় খণ্ড-পৃ ১৭৬-৭৭)।

১৯২৬ খ্রীঃ দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি। কলকাতায় জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রা। 'বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল' গঠন। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন। সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান। কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' ও 'ছাত্রদলের গান'। 'গণবাণী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'র প্রথম প্রকাশ। গ্রন্থটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে। ১৯৩৯ সালে জনাব ফজলুল হকের মন্ত্রিত্ব কালে 'পথের দাবী' রাজরোষ মুক্ত হয় এবং তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (মে, ১৯৩৯)।

* ১৯২৬ খ্রীঃ "মুসলমানরা তখন কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। নোয়াখালি জেলায় তারও একটা বিশিষ্টরূপ দেখা দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই—কারণ, দাঙ্গার জন্য দু-পক্ষ চাই। হিন্দুরা এ জেলায় অতি সংখ্যাল্প।···হিন্দুরা 'হ্যাভস্', মুসলমানরা তাদের তুলনায় 'হ্যাভনটস্'। এই আর্থিক-সামাজিক হীনতাবোধ স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে শোষণ-সচেতনতায় পরিণত হত। কিন্তু ক্ষোভটাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে রূপ দেওয়া যাদের প্রয়োজন তারা তার সে দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ···গ্রামে আঘাত দেখা গেল গরীব ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর। তাদের মেয়েরা আরও বেশি অসহায়। সেখানে গ্রামে হিন্দুদের দেবস্থান ও দেবতারাও হিন্দু মেয়েদের মত অসহায়।··· মাস কয় ধরে এখানে-ওখানে এরূপ উৎপাত-উপদ্রব ঘটছে, ক্রমশই তা বাড়ছে।···বিশেষ উত্তাপ নিয়েই 'দেশের বাণী'তে লিখে দিলাম কলম দুয়ের একটা সম্পাদকীয় লেখা—সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে; আর মুসলমান নেতাদেরও তাঁদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে কসুর করলাম না···কাঁচা মনের কাঁচা ভাবালুতা। কিন্তু লেখাটার ধার ও তেজ ছিল। ক'মাস পরেই সিডিশনের ও ক্লাশ-হেটরেড প্রচারের দায়ে গ্রেফতার ও

অভিযুক্ত হলেন সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী (* সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মান্দালয় জেলে থাকায়, ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী তখন সম্পাদক), আরম্ভ হ'ল মামলা।··· সিডি়শনের মামলা—খেলো কথা নয়। মফঃস্বলের কাগজের বিরুদ্ধে সেই প্রথম। এ মামলা চালাতে স্বয়ং শরৎ বোস এসেছিলেন একবার স্থানীয় এস ডি. ও-র কোর্টে।"—(রু কুলে-২য় খণ্ড-পৃ ১৭৭-৭৮)।

মার্চ ১৯২৬ কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ারে' গোপাল হালদারের 'Hopes of the Indian Socialism' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ কমিটির অন্যতম সদস্য।

নোয়াখালি সাম্প্রদায়িক "বিষের ধোয়ায়" আচ্ছন্ন। গোপাল হালদারের "মনের মধ্যে আত্মক্ষয়ী অশান্তি।"···"একমাত্র সান্ত্বনা ছিল দু'জন মানুষ—কংগ্রের সেক্রেটারী ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, আর তাঁর সহকর্মী সেরাজ।" "মনের এই অশান্তিতেই নোয়াখালি ছাড়ি। সাম্প্রদায়িকতার আঁধি ও ওখানকার ব্যাধি, —শেষ পর্যন্ত যা দেশ-বিভাগের ব্যাধিতে পরিণত—হল তার আশঙ্কা নোয়াখালিতে তখনি আমার দম বন্ধ করে এনেছিল। অন্ততঃ বাইরের বৃহৎ জীবনে আমার মনের বায়ু পরিবর্তন প্রয়োজন। কলকাতায় সে অবকাশ আমার মিলবে; আর শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আড্ডার আসরে আমারও প্রবৃত্তি। আমি সেখানেই ফেরারী হলাম।"—(রু. কুলে-২য় খণ্ড পৃ ১৮৬-৮৭)।

কলকাতায় আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে 'ইস্ট বেঙ্গল ডায়ালেক্‌টস্' নিয়ে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা-কর্ম শুরু। "ও-ডি-বি-এল প্রকাশিত হলে (১৯২৬) সংবাদপত্রে তার অজস্র প্রশংসা পাঠ করে মনে হ'ল, বাঙলা ভাষায় বোধ হয় কিছু করবার মতো গবেষণার যুগের সূচনা হ'ল··তৎপূর্বে 'সবুজপত্রের' প্রবন্ধ পাঠে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করবো ভেবেছিলাম—মনে মনে বাঙলা ভাষাতত্ত্বে কিছু করবার জল্পনা-কল্পনা ছিল।··দাদা (রঙীন হালদার) ও আমি সুকিয়াস্ রো'র বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথাটা পাড়লাম—বাঙলা ভাষায় গবেষণা করতে চাই—করবার আরও কিছু থাকলে। সুনীতিবাবু বললেন—'করবার তো কত জিনিস। এখনো তার কতটুকু হয়েছে?' বেশ কিছু উৎসাহ দিয়েই কথা বললেন।··ডায়েলেক্‌ট্-এ (উপভাষায়) হাত দিলাম। লোক-শব্দ সংকলনও চলবে। প্রথম নিই নোয়াখালির উপভাষা।"—(রু. কুলে ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯২-২০২)।

১৯২৭ খ্রী সোভিয়েট বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উৎসব। রাশিয়ায় ভারতের

শ্রমিক-কৃষক পার্টির প্রতিনিধি, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকেরা আমন্ত্রিত। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও আমন্ত্রিত ছিলেন।

খড়্গপুরে ও লিলুয়ায় শ্রমিক ধর্মঘট। ডিসেম্বর ১৯২৭, কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা। প্রস্তাবটি জওহরলাল নেহরু উত্থাপন করেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামীরা তা সমর্থন করেন।

* ১৯২৭ খ্রীঃ "দু-একটা গল্প-প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে', 'প্রবাসী'তে আগে বেরিয়েছে—কে তা পড়েছে ? এক আধটি লেখা 'সবুজ পত্রে'ও বেরিয়েছে···এক সময়ে আমি চুপ করে গেছলাম—না লিখে কি থাকতে পারি না ? নোয়াখালিতে বসে সজনীর ('শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস) তাগিদেই তবু বাঙলা লেখা ছাড়িনি, ইংরেজি লেখাও লিখেছি।"—(রূপনারানের কূলে—২য় খণ্ড-পৃঃ ২২০)।

বন্ধু সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ওয়েল ফেয়ারে' সহ-সম্পাদকের চাকরি লাভ

"আমি সম্পাদকীয় কর্মে নিযুক্ত হলাম—কাগজটাকে করলেন সাপ্তাহিক। আমিও যে খুব উৎসাহিত বোধ করেছিলাম তা নয়। তবে প্রবাসীর লেখাতে আমি আবাল্যপুষ্ট, ও-প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে তাই আগ্রহ ছিল! লোভও ছিল—প্রবাসীর ছত্রছায়ায় শনিচক্রের সাহিত্য আসরে! 'প্রবাসী' তো নিশ্চয়ই, 'মডার্ণ রিভিউ'র এলাকাও দুষ্প্রবেশ্য নয়। তখনো 'প্রবাসী'তে লেখা ছিল বাঙালি লেখকের গর্ব! মডার্ণ রিভিউতে লেখা বেরুলে তো মনে করতে পারতেন দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিকট তার জন্য দ্বার এখন উন্মুক্ত হচ্ছে!"—(রূপনারানের কূলে—২য়-পৃঃ ২৬২-৬৩)।

'শনিবারের চিঠি'তে ১৯২৭ সালে 'শ্রী মহাকাশ্যপ' ছদ্মনামে গোপাল হালদারের 'শেষ মহাসঙ্গীত' রচনাটি প্রকাশিত হয়।

"শ্রী গোপাল হালদার শনিবারের চিঠির মন্ডল-ভুক্ত হইলেন···তিনি আমার পূর্বতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু (অগিল্‌ভি হস্টেলের) হিসাবেই শুধু নয়, একেবারে নিজগুণে অর্থাৎ ইংরেজি লেখার জোরে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ওয়েল ফেয়ারে'র সহিত যুক্ত হইলেন। পরে 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ'-এও প্রবেশ করেছিলেন।

দীর্ঘকাল, প্রায় কুড়ি বছর 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।"—(আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস। পৃ. ২০৬–৭)।

১৯২৮ খ্রীঃ সারাদেশে 'সাইমন কমিশন' বিরোধী মিছিল ও হরতাল। লাহোরে পুলিসের আক্রমণে আহত হলেন লালা লাজপৎ রায়। ১৭ নভেম্বর, আহত লাজপৎ রায়ের মৃত্যু! এর প্রতিশোধ হিসাবে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব কর্তৃক লাহোরের রাজপথে অত্যাচারী পুলিস অফিসার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা।

খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে বদৌলি সত্যাগ্রহ। বোম্বাইতে সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। কলকাতার এলবার্ট হলে 'নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টি সম্মেলন। পার্কসার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশন। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাতে কংগ্রেস সম্মেলনে (৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৮) তিরিশ হাজার শ্রমিকের দৃপ্ত মিছিল।

মতিলাল নেহরু-প্রণীত ভারতের সংবিধান প্রকাশ। 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান সোশ্যালিস্ট অ্যাসসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা। 'নিখিল ভারত স্বাধীনতা লীগের' অধিবেশন।

* **১৯২৮ খ্রীঃ** গোপাল হালদার পার্কসার্কাস ময়দানে কংগ্রেস সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

"১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতার পার্কসার্কাসে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল···একদিন মধ্যরাত্রে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখিয়া সাময়িকভাবে কিঞ্চিত উত্তপ্ত মগজ লইয়া বাসে পার্কসার্কাস হইতে ফিরিতে ছিলাম, সঙ্গে বন্ধুবর গোপাল হালদার।"

—(আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস। পৃ. ২৬৩–৬৪)

১৯২৯ খ্রীঃ ২০ ম্যার্চ, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা (মার্চ ১৯২৯ থেকে আগস্ট ১৯৩৩ পর্যন্ত)।

৮ এপ্রিল, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপ এবং 'হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির' নামে ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া।

গ্রেফতারের পর দুই বিপ্লবী ৬ জুন, আদালতে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "বিপ্লব মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।··· শ্রমিক

শ্রেণীই বর্তমান সমাজের প্রধান পরিপোষক।···আমরা সানন্দ হৃদয়ে বিপ্লবের আগমন প্রতীক্ষা করছি। 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'।"

জুলাই-আগস্ট, চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। ১৩ সেপ্টেম্বর ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুবরণ। ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।

* ১৯২৯ খ্রীঃ ফেণী কলেজে অধ্যাপনা (১৯২৯-৩০)। "রাজনীতির নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে প্রথম গিয়েছিলাম বাবার নির্দেশে (প্রায় আদেশে) ফেণী কলেজে অধ্যাপনায় (১৯২৯, জুলাই)। তারপর সুনীতিবাবুর ও দাদার সঙ্গে ১৯২৯-এ বিজয়ার পরে গেছলাম দক্ষিণ ভারত (তামিল দেশ) প্রদক্ষিণে—সে এক গভীর অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা।"

—(রূপনারানের কূলে—২য়। পৃ. ২০৭)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯২৯)! "আমরা দু'জনায় বিনা দ্বিধায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশে সংকল্প করি—আমি দিই লেখককে দেয় রয়ালটি বা দক্ষিনা, সজনী দেয় তার উদ্যোগ ও পরিশ্রম।"

—(রূপনারানের কূলে—২য় খণ্ড / পৃ. ২৪৫)।

১৯৩০ খ্রীঃ ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন। মার্চ মাসের 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' গান্ধীজীর এগারো দফা দাবি প্রকাশ। ১২ মার্চ লবণ আইন-অমান্য আন্দোলনের সূচনা। ৬ এপ্রিল ডাণ্ডিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ।

১৮ এপ্রিল, মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহ! ২০ এপ্রিল, সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফর খানের নেতৃত্বে পেশোয়ারে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের অহিংস গণ আন্দোলন। পেশোয়ারের পথে-পথে ক্ষিপ্ত জনগণের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ। ঠাকুরচন্দ্র সিং গাড়োয়ালির নির্দেশে গাড়োয়ালি ফৌজ গুলি চালাতে অসম্মত হয়। ৫-৬ মে, মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে শ্রমিক অভ্যুত্থান। 'যুদ্ধপরিষদ' গঠন করে শোলাপুরের গণবিদ্রোহ পরিচালনা করে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি! মে-জুন, ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জে কৃষক-বিক্ষোভ! ৮ ডিসেম্বর বিনয়-বাদল-দিনেশের রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভিযান এবং ইন্‌স্পেক্‌টর জেনারেল অব প্রিজন, সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণে যান। এই

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পত্রাকারে প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৭—বৈশাখ ১৩৩৮)।

* ১৯৩০ খ্রীঃ "১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রথম তারিখ—এখন সেদিন 'প্রজাতন্ত্র দিবসে'র দিনে পরিণত। ভালোই হয়েছে। কিন্তু সেই প্রথম সংকল্প গ্রহণের দিনটা অবিস্মরণীয়।··ইতিহাস গড়ার ডাক আসছে যে ভারতবর্ষে। সে ডাকটা সত্যই এল লবণ সত্যাগ্রহ নামে।"—(রূপনারানের কূলে—২য় খণ্ড-পৃ ৩২৫-২৬)।

"একে একে এসে যেতে লাগল একটার পর একটা বিদ্যুৎময় ঘটনা—পেশোয়ারের সৈনিক বিদ্রোহ, শোলাপুরের শ্রমিক সংগ্রাম, আর বাঙলায় ডালহৌসি স্কোয়ার, ঢাকা, মেদিনীপুর—কোন্‌খানে নয়? বোঝা গেল চট্টগ্রামের সেই অভ্যুত্থান বাঙালির জাতীয় জীবনে ত্রিশের আরেকটা দুয়ার খুলে দিচ্ছে—বিশেষ করে বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে। এল দুর্জয়তম সাহসের ও আত্মত্যাগের দিন। বিশেষ করে বাঙালি মেয়েরা এগিয়ে এল, আর যে দৃষ্টান্ত তাঁরা সৃষ্টি করলে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কি তার তুলনা বেশি আছে?··আমি নেতা নই, মধ্যম-নেতাও নই, সংগঠক নই, কর্মী নই; দুঃসাহসী থাক সাহসীও নই, কোনো কর্মকাণ্ডে বা কাজে অংশীদার নই।··তবে এই বিপ্লবীদের ভালোবাসা পেয়েছি এবং ভালোবাসা দিয়েছিও তাদের। বিশেষ বা অবিশেষ তাঁদের আর তাঁদের বিষয়ে আমার কথা বোঝাতে চেয়েছি 'একদা'র উৎসর্গে: 'প্রাণের উন্মাদনা যাদের কর্মের উন্মত্ততায় নিঃশেষ হইয়াছে—পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা যাহাদের জীবনকে নিষ্প্রভ করে নাই।"

—(রূপনারানের কূলে—২য় খণ্ড-পৃ ৩৩২-৩৪)!

"Three revolutionaries got into the building and killed the Inspector-general of prisons in Bengal Colonel N. F. Simpson—I was very much distressed by this murder because only few days before this incident I had spoken to him over the telephone about a political prisoner·· It was my friend Gopal Halder who involved me in this. He had established a mixed relationship with an egregious and absurd political woman of Bengal' named Bimal Prativa Devi···Now she was in prison and had become very ill as usual. Gopal Babu on hearing it got frightened and asked Mr. Satyen Mitra whom he knew very well to speak to Colonel Simpson to consider her case.'—(Thy Hand, Great anarch'—Nirad C Chaudhuri-page 300-301)।

গোপাল হালদার ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

"কয়েক মাস পরে কলেজ থেকে দু-বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাই (১৯৩০-এর জুন) সুনীতিবাবুর রিসার্চ এ্যাসিস্টেণ্ট রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে গবেষণাকর্মের সর্বক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ১৯৩০ সাল। পলিটিকসের চাপাপড়া নেশা একেবারে দ্বিগুণ হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল আগুনের দিকে।"

(রূ. কূলে—২য় খণ্ড-পৃ ২০৭)

"বলতে বাধ্য এ কর্মে যা তিনি আশা করেছিলেন আমি তখন তা পূরণ করতে পারিনি। সে ত্রুটি সম্পূর্ণই আমার, আমার আবাল্য প্রকৃতির। ত্রিশের সেই দিনগুলিতে একদিকে দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলন অন্যদিকে স্বাধীনতা-কামী বিপ্লবী আন্দোলনের যে জোয়ার নেমে আসে আমার সাধ্য ছিল না তার থেকে দূরে থাকি,—গবেষণা-কর্মই তাই পিছনে পড়ে রইল। সুনীতিবাবু তাতে দুঃখিত হলেও আমাকে নিবৃত্ত করতে চান নি।—('বন্দীর বন্ধু'—গোপাল হালদার-পরিচয়-আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭)।

নোয়াখালির গোপাল হালদার কলকাতার নাগরিক, ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা। 'সে-বার জুলাই মাসে ফেণী ছেড়ে চলে এসেছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার্থী হিসাবে মাসে পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি নিয়ে। তারপরে আর ফেণীতে ফেরা ও কলেজের কাজ করা সম্ভব হয় নি।···অবশ্য আরেকটা কথাও বলা দরকার—বাবা নোয়াখালিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, সকলের পরামর্শ মতো কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে নোয়াখালির পাট তুলে দিয়ে বাবা-মাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হল। প্রথম বছর খানেক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের মানিকতলার বাড়িতে একটা অংশ ভাড়া নিয়ে আমরা ছিলাম।"—(রূ. কূলে—২য় খণ্ড-পৃ ৩৩৪)।

১৯৩১ খ্রীঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদের এলফ্রেড পার্কে পুলিসের সঙ্গে গুলি বিনিময় কালে মৃত্যু বরণ করেন। ৫ মার্চ গান্ধী

আরউইন চুক্তি। করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন ; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ।

২৩ মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির মঞ্চে আত্মদান। ৮ এপ্রিল মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ পেডি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত।

২৯ আগস্ট গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধীজীর বিলাত যাত্রা এবং ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩১ ব্যর্থ ও হতাশা হয়ে গোলটেবিল বৈঠক থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী জেলে পুলিশী হত্যাকাণ্ড। হিজলী জেলের হত্যাকাণ্ডে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ। ২৬ সেপ্টেম্বর অসুস্থ দেহে মনুমেন্টের পাদদেশে লক্ষাধিক লোকের জনসভায় ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লায় স্কুলের দুই ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স্‌কে গুলি করে হত্যা করেন।

১৯৩১ খ্রীঃ "শেষে গান্ধী আরউইন প্যাক্ট হ'ল। ব্যক্তিগতভাবে বুঝলাম—এবারও 'বাতি জ্বলল না' ; বরং আগুন জ্বলবার আগেই নেবানো হচ্ছে। বিদেশ থেকে সুভাষচন্দ্র ও বীঠলভাই প্যাটেল তাই আপত্তি করেন। ··· জেলের কংগ্রেসম্যানরা মুক্তি পেল। কিন্তু বিপ্লবীরা জেলে আর বন্দীশালায় রুদ্ধ রইল—তাদের হয়ে গান্ধীজী কথা বলেন না।···কংগ্রেস অধিবেশন বসবে করাচীতে। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব, এই তিন বিপ্লবীর ফাঁসি সন্নিকট। ···ভগৎ সিংদের কাজও গান্ধীজীর অহিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী তাই ; গান্ধীজী সর্বান্তকরণে তাঁদের বাঁচাতে চাইতেও পারেন না, আর উত্তর ভারতের মতের চাপে তাঁদের প্রাণদণ্ডে একবারে নীরবে উদাসীনও থাকতে পারেন নি। করাচী কংগ্রেসের প্রায় পূর্বক্ষণে যথানির্দিষ্ট দিনে তিন জনার ফাঁসি হয়ে গেল। উত্তর ভারতের, বিশেষ করে, পাঞ্জাবের 'নওজোয়ান'রা···বাঙলার যুববিপ্লবীদের মতোই বিক্ষুব্ধ হল। বাঙলাদেশ থেকে ট্রেন বোঝাই খাঁটি কংগ্রেসী, বিপ্লবী কংগ্রেসী, বিদ্রোহী দাদারা···যাঁরা তখনো বাইরে ছিলেন করাচী যান···আমার মতো লোকও তাঁদের মধ্যে ছিল—সত্যই দেশে ঘুরে দেখা যাক দেশের কী অবস্থা—কংগ্রেসী জন-সংগ্রামের শক্তি কোথায়, উত্তর ভারতের বিপ্লবীবাদী নওজোয়ানদেরও মতি কী, কতটা তা সম্মিলিত জন-আন্দোলনের দিকে। অবশ্য কিছুই পরিষ্কার বোঝা সম্ভব হয় নি।··· করাচী প্রোগ্রাম-এ অনেক বড়-বড় কথা ছিল যা নতুন, কিন্তু তা, কার্যতঃ করার মতো কংগ্রেসের সাধ্য ছিল না, তা করতে কর্তাদের ইচ্ছাও

ছিল না। ওদিকে বোঝা গেল, কংগ্রেস মন্ত্রীদের কাজকর্মে গান্ধীজী খুশী নন, কিন্তু আবার সংগ্রামে নামতেও উদগ্রীব নন। সে তুলনায় গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্টের সুবিধা ব্রিটিশ শাসকরাই নিতে পারবে—কংগ্রেস যখন দ্বিধাগ্রস্ত।··· রাউণ্ড টেবলে হতাশ হয়ে গান্ধীজীকে যখন দেশে ফিরতে হ'ল তখন আন্দোলনের ভাঙা হাটে জেলে যাওয়া ছাড়া তাঁর ও কংগ্রেস নেতাদের আর কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। সরকার তাঁদের জেলে পুরলেন।"······"কলকাতায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রধান এক চ্যালার সঙ্গে আলাপ হ'ল,—আর কলকাতায় তাদের ছোট গোষ্ঠীর বন্ধুদের সঙ্গে তাই কথাবার্তা হ'ত। ···আমাকে তাঁরা ধরলেন—আমিও ছাড়াতে চাই নি। রায়ের সেসব লেখাতে আমাদের কাঁচা ধারণার পাকা রূপ যেন দেখতাম। না আছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সুলভ জেহাদ, না সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা ; আছে সম্মিলিত জন-সংগ্রাম তত্ত্ব। যথাসম্ভব সকল সংগ্রামীদের মিলিয়ে—একটা প্রোগ্রাম। তখনো সম্পূর্ণ তা বুঝি নি।"··· "চরম একটা ঘটনা হিজলীর বন্দিনিবাসে অকারণে কর্তৃপক্ষের গুলিচালনা ও তিনজন বন্দি-হত্যা"···"মনুমেন্টের তলাকার সভায় হিজলীর বন্দীহত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। সভার বহু পিছনে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের আড়ালে ছিলাম, ভাষণ শুনতে।"—(রূ কূলে—২য় খণ্ড-পৃ, ৩৪৫-৩৫০)।

২৮ সেপ্টেম্বর, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গী হয়ে গোপাল হালদারের রবীন্দ্রদর্শন। "দোতলার নিজের কক্ষ থেকে সুনীতিবাবুকে নিয়ে কবি এসে বসলেন 'বিচিত্রা'র বাম দিকের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। পিছনে চলতে চলতে দেখি এখন ঈষৎ অবনত সেই দীর্ঘ দেহ। সুনীতিবাবু আমাকে দেখিয়ে আরও একটু বিশেষ পরিচয় দিলেন—তাঁর কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষক মাত্র নই, রাজনৈতিক যে-সব সমস্যার কবির কিছু জানার প্রয়োজন, তাও কিছু আমার জানা থাকতে পারে।······হিজলির বন্দি-হত্যার পরে। তাদের অন্তরবেদনা আমাকে স্পর্শ করেছিল, তা নিবেদন করেছিলাম শান্ত কণ্ঠে হলেও আন্তরিকতা দিয়ে।"···"দৃঢ় চিত্তে কবি বললেন।—তোমাদের আন্তরিক যন্ত্রণা বুঝলাম। কিন্তু দ্যাখো, ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখলে হবে না। আমাদের দেশে এ এক অসামান্য সমস্যা —বিরাট বড় প্রশ্ন, সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ সমস্যার সঙ্গে তা জড়িত। এবং সমস্ত পৃথিবীর গ্রহণ-যোগ্য সমাধানের মতো করেই তার সমাধানও আমাদের দেশে আমাদের করতে হবে। এমন ছোট করে তার উত্তর হয় না—বড় সমস্যার

বড় করেই উত্তর দিতে হবে।”···“‘বিচিত্রা’ গৃহের সেই স্মৃতি কি ‘প্রশ্নে’র মধ্যে প্রতিধ্বনিত? ‘তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ।’ (রূপ কূলে—২য় খণ্ড-পৃ, ৩৫০-৫৩)।

১৯৩২ খ্রীঃ ৪ জানুয়ারি কংগ্রেস ও সমর্থক সমস্ত সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হল এবং ঐদিনই গান্ধীজীসহ বহু নেতা গ্রেপ্তার হলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বীণা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন।

নেতৃবৃন্দ কারাগারে বন্দী।··তবুও দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের বিস্তৃতি। ১৯৩২ সালের প্রথম চার মাসে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৮০,০০০ হাজার।

* ১৯৩২ খ্রীঃ ২৮ মার্চ কলকাতায় গোপাল হালদারের বাবার মৃত্যু হয়।

২৪ এপ্রিল ৪ নং ভবনাথ সেন স্ট্রীটের (শ্যামবাজারের পিছনে) বাড়ি থেকে গোপাল হালদার গ্রেপ্তার হন এবং রাজবন্দী হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরিত হন।

“এপ্রিলের প্রত্যূষে (২৪ এপ্রিল, ১৯৩২) পরোয়ানা নিয়ে এসে গেল পুলিশ, —আমার যৌবন পেল রাজটীকা।”—(রূপ কূলে—২য় খন্ড-পৃ, ৩৫৫)।

* ১৯৩২-এর এপ্রিল থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়ারি ঃ ছয় বছর বন্দীজীবন। প্রেসিডেন্সি জেল, বাক্সা বন্দী শিবির এবং কিছুদিন গৃহবন্দী, কিছুদিন রাজসাহী অঞ্চলে অন্তরীণ!

“এই কারাবাস প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্টে করা হয়। বেশির ভাগ কাটে প্রেসিডেন্সি জেলে, তারপর বাক্সা বন্দীশালার আলিপুর ডুয়ার্সে। পুনরপি প্রেসিডেন্সি জেলে এবং কিছুদিন কাটে রাজসাহী অঞ্চলে নজরবন্দী হিসেবেও।” —(পাক্ষিক বসুমতী / ১. ৯. ১৯৯২)।

“১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমার জন্য জেলখানার দুয়ার খুলল—আমি আটক বন্দী হয়ে এলাম গৃহে।··· সীমিত আমার যাতায়াত বটতলা থানার মধ্যে সীমিত আমার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—আমার পরিচয়ের সীমায় ফাঁক ছিল দুটি—তৎকালীন আইন-পরিষদের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি··আমার সাক্ষাতের দ্বিতীয় সুযোগ ছিল আমার গবেষণাগুরু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর গৃহে।” —(পাক্ষিক বসুমতী-১৬. ২. ১৯৯৩)।

জেলজীবনে গোপাল হালদার অধ্যয়ন, গবেষণা, সাহিত্যসৃষ্টি এবং মার্কসীয় মতাদর্শের চর্চায় মনপ্রাণ সঁপে দেন।

১৯৩৬, অসুস্থ অবস্থায় প্রেসিডেন্সি জেলে রচনা করেন বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'একদা'। "গ্রন্থখানা লেখা হয়েছিল রোগশয্যায় প্রেসিডেন্সি জেলে, ১৯৩৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।"—('একদা' ১ম সংস্করণ, লেখকের নিবেদন, ১৯৩৯)।

জেলে বসেই বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রকাশ ও পরিণতির সাগা (saga) 'ভদ্রাসন'-এর পর্বগুলো রচনা করেন। "১৯৩৪ সালে আমি যখন বিনা বিচারে বন্দী তখন আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে—বাঙালী মধ্যবিত্ত (ভদ্রলোক) শ্রেণীর পতন অভ্যুদয়ের কাহিনী লেখা যায় না? ···'ভদ্রাসনের' একটি পর্ব (স্বদেশী যুগ) ছাড়া প্রায় সবটার খসড়া আমি ১৯৩৪-৩৭-এর মধ্যে সমাপ্ত করি।"—('নতুন সাহিত্য'-চতুর্থবর্ষ, ১৩৬০)।

'বাজে লেখার' অধিকাংশ স্বগত-নিবন্ধ প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্‌সা বন্দী-শিবিরে বসে লেখা। "শুরু হয়েছিল তা ১৯৩৩-এ বক্‌সা পাহাড়ে, আর চলল তা ১৯৩৫-এ আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলেও।"—('স্বপ্ন ও মৃত্যু'-এর সূচীপত্র)।

১৯৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়' প্রকাশিত হয়। এই বই পাঠ করে রাজনৈতিক বন্দীরা "বিশেষ আহত হয়েছিল।" "বাঙালি বিপ্লবপন্থীদের (১৯০৫ থেকে ১৯৩৫) আদর্শ, মত ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে 'চার অধ্যায়'-এর তত্ত্বগত, পদ্ধতিগত ও কাহিনীগত প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই।"—(পাক্ষিক বসুমতী / ১৬. ১. ১৯৯৩)।

গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহানুকূল্যে গবেষণা নিবন্ধ ইস্টবেঙ্গল ডায়ালেক্‌ট্‌সের কাজ শেষ করেন প্রেসিডেন্সি জেলে। "অধ্যাপক সুনীতিকুমার তাঁর ছাত্র বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠায় তৎকালীন সরকারী চাকরি সত্ত্বেও বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে গবেষণা কাজে সহায়তা দিতে যেতেন। এটি আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় সম্মান ও প্রাপ্তি।"—(পাক্ষিক বসুমতী ১. ৯. ১৯৯২)।

"অন্তত দু-তিন বছর ধরে চলেছে মার্কস্‌বাদী বই পড়া, আলোচনা—এই চর্যাচর্য-অনিশ্চয়ের বিচার। পড়ার আগ্রহ ও বিপ্লবের অগ্নি তাদের জিজ্ঞাসু সহকারীদের ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে কমিউনিজমের দিকে। মানসিক-আধ্যাত্মিক সংগ্রামে জর্জরিত করেছে চিরদিনের ভারতের আদর্শপুষ্ট রাজবন্দী

সত্যান্বেষীদের। তর্ক বেড়েছে, আলোচনা বেড়েছে; পরস্পরের মতান্তর হয়েছে—মান-অভিমান বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। বন্দী শালার রক্তাক্ত বিপ্লব জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে এভাবে আরম্ভ হয় কমিউনিজম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এ যেন ধর্ম থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ অথবা জন্মের মধ্যে জন্মান্তরের উদ্বোধন।”··· “ইতিমধ্যে হিটলার অভ্যুদয়ে বিষম লাঞ্ছিত ও উদ্বিগ্ন-বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন ডিমিট্রভের প্রস্তাব গ্রহণ করে—প্রগতিকামী শক্তিদের চাই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মিলিত প্রতিরোধ—United Front. ভারতের কমিউনিস্ট বন্দীরাও এই নীতি গ্রহণ করল সবল আগ্রহে।” —(রূপনারানের কূলে—৩য় খণ্ড (পাক্ষিক বসুমতী—১. ১. ১৯৯৩)।

১৯৩৩ খ্রীঃ ভালো খাদ্য, আলোর ব্যবস্থা ও বইপত্র পড়ার সুযোগ—এই দাবিতে আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের অনশন ধর্মঘট। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী অনশন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন। ৪৬ দিন অনশনের পর বন্দীরা তাঁদের দাবি আদায়ের সমর্থ হন, তবে এই অনশনে তিনজন মৃত্যুবরণ করেন। দেশে বন্দী-মুক্তির তুমুল আন্দোলন হয়।

১৯৩৪ খ্রীঃ এপ্রিল-মে, গান্ধীজীর গণআন্দোলন প্রত্যাহার ও তাঁর একক আইন অমান্যের ঘোষণা। কংগ্রেস সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। জুলাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বে-আইনী ঘোষণা।

অক্টোবরে ‘অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির’ প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৫ খ্রীঃ নতুন ভারত-শাসন আইন পাস। জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভের ফ্যাসি-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব গৃহীত। ১৯৩৫-এর মে দিবসে আন্দামান জেলের একত্রিশ জন বন্দী একটি কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠন করেন।

১৯৩৬ খ্রীঃ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে রজনীপাম দত্ত ও ব্র্যাডলের যুক্ত Thesis অনুসৃত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি। এপ্রিল-মে, লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন। কংগ্রেস-সভাপতি পদে দু-বছরের জন্য জহরলাল নেহরুর নির্বাচন। ঐ অধিবেশনের সময়ে (১৯৩৬) লক্ষ্মৌতে স্বামী সহজানন্দের সভাপতিত্বে ‘নিখিল ভারত কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্মৌতে মহম্মদ আলি জিন্নার সভাপতিত্বে ‘নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন’-এর প্রতিষ্ঠা।

১০ এপ্রিলে লক্ষ্মৌতে মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ’-এর প্রতিষ্ঠা।

জুলাই ১৯৩৬, জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে 'নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা। সংঘের সম্মানিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কার্যকরী সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে জওহরলাল তাঁর ভাষণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মঞ্চে শ্রমিক-কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

১৯৩৭ খ্রীঃ রোমাঁ রল্যাঁ ও আঁরি বারবুসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতে 'ফ্যাসিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ সংঘের সভাপতি, আর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সাধারণ সম্পাদক।

জুলাই ১৯৩৭, নয়া সংবিধান অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস সাফল্য লাভ করে এবং বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। শুধু বাঙলা ও পাঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। বাঙলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা।

২৫ জুলাই, আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের আমরণ অনশন। বন্দীমুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতা–টাউন হলে বিরাট জনসভা। লিখিত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'রাজনৈতিক বন্দীরা দাবি করিয়াছে তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবি ন্যায্য এবং সামান্য।' আন্দোলনের চাপে আন্দামান বন্দীদের দেশের জেলে ফিরিয়ে আনা হয়।

কংগ্রেস সম্মেলনে ফ্যাসিবাদ–বিরোধী নীতি গ্রহণ। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ। কংগ্রেসের প্রস্তাবে জাপানের নিন্দা এবং চীনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে দেশবাসীকে জাপানী পণ্য বয়কটের আহ্বান। ২৬ ফেব্রুয়ারি—১০মে, ১৯৩৭ বাঙলার চটকল শ্রমিকদের ৭৪ দিন ব্যাপী বৃহত্তম ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের প্রতি রবীন্দ্রনাথও সমর্থন জানান।

*১৯৩৭ খ্রীঃ “১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে ‘গৃহবন্দী’ রূপে মুক্তির আদেশ পেয়ে এলাম স্বগৃহে! অন্তরীণ। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গতিবিধি, নজরবন্দী। তবু আশা ও স্বপ্নে উৎফুল্ল।···রাজবন্দীরা অনেকেই মুক্তিলাভ করে ১৯৩৬-এর শেষে দিকে ও ১৯৩৭-এর প্রথমার্ধে।”—(রূ, কূলে-৩য় খণ্ড-পাক্ষিক বসুমতী ১৬. ২. ৯৩)।

“এর মধ্যে রাজনৈতিক জগতে বহু আবর্তন-বিবর্তন ঘটেছে। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ, জাতীয়মুক্তি সংগ্রাম, জাতীয় কংগ্রেসের জাগরণ এবং যে কারণেই হোক,

সমাগত সমাজবাদ-সাম্যবাদের আগমন ঘোষণা জেলে বসেই লক্ষ্য করা গেছে।"—(সময় সীমায় ; পাক্ষিক বসুমতী ১. ৯. ৯২)।

"সবে জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছি, কিন্তু নজরবন্দী। কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে জেলে বসে যত আশাই পোষণ করি, তাতে প্রবেশের সুযোগ পাই না। আকাশে-বাতাসে যে ধূম্রজাল দেখেছিলাম, সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বিষম কুয়াশা রচিত হয়ে উঠছে, তাতে কর্মক্ষেত্র কে বা কোথায়, তার সীমানাও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিনা। এরূপ পৃথিবীর কথা তো জেলে বসে ভাবতেও পারিনি। স্বদেশের যে রূপ আমাদের মানসপটে তখন ফুটে উঠত, আজকের বাঙলাদেশে, ভারতবর্ষে তো তার সন্ধান পাচ্ছি না।"—(রূ, কূ-৩য় খণ্ড পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ ২ ৯৩)।

১৯৩৮ খ্রীঃ হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলকাতায় বন্দীমুক্তির দাবিতে ছাত্র-মিছিল! কমিউনিস্ট পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর আত্মপ্রকাশ। ভারত থেকে চীন দেশে ডঃ অটলের নেতৃত্বে 'মেডিক্যাল মিশন' প্রেরণ। মিশনের প্রধান দুই সদস্য—ডাঃ কোটনিস, ডাঃ বিজয় বসু। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন' গঠন ; এই কমিশনের সভাপতি জওহরলাল নেহরু।

২-৩ ডিসেম্বর হুগলী জেলার বড়ায় প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে সংগঠন সম্পাদক হন—অনন্ত মুখার্জী ও বিমলপ্রতিভা দেবী।

* ১৯৩৮ খ্রীঃ "১৯৩৮ থেকে আমার সময় কাটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের সাথে। তাঁর ভ্রাতৃগৃহে নীরদচন্দ্র চৌধুরীও কাজ করতেন। আমিও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' (ইংরেজি সাপ্তাহিক) সম্পর্কিত সকল কাজ করতাম। নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগ, কংগ্রেস থেকে তাঁর অপসারণ প্রভৃতি এগুলি আমার জীবনের অঙ্গ হিসাবে দেখেছি।"—(সময় সীমায়, ১. ৯. ৯২)।

জেলের মধ্যেই গোপাল হালদার মার্কসবাদ ও বিপ্লবী গণসংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন ; কিন্তু 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে' যোগ দেন নি। জেল থেকে বেরিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দেন নি। কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন কৃষক-সভা। "জন-আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র রূপে প্রথম থেকেই নেমেছিলাম কৃষকের মধ্যে কাজে।"—(রূ. কূলে-৩য়, খণ্ড অপ্রকাশিত)। "পার্টিতে যোগ দিচ্ছিনা যদিও ভাল করেই জানি কৃষক-সভা কমিউনিস্ট পরিচালিত। কাজের মধ্যে দিয়েই দেখিনা কী সম্পর্ক দাঁড়ায়।"—(গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'কালান্তর' বিশেষ সংখ্যা ১৯৬৭)।

"নোয়াখালিতে আমাদের এরূপ কৃষকসভা গড়ারই কথা ছিল যা কৃষকদের কাজই করবে, কিন্তু স্বাধীনতারও সহায়ক হবে। কুমিল্লার কামিনীবাবু (কামিনী দত্ত) আমাদের বরাবরের সুহৃদ-সহায়ক··দু-দশখানে কৃষকসভা গড়াও হল। প্রাদেশিক ও ভারতীয় কৃষকসভার শাখা হিসাবেই তাদের অস্তিত্ব।" —(রূ কূলে, —৩য় খণ্ড-অপ্রকাশিত)।

মে ১৯৩৮, কুমিল্লায় (বাঙলাদেশ) 'নিখিল ভারত কিষাণ সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। "The growing strength of the AIKS was reflected in it third session held at Comilla (Bengal) in May 1938···"

"অবরোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার আগেই এখানে তিনি (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন—'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ'-র পাতায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি (Foreign Affairs) বিষয়ে পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণায় মাসিক ইংরেজি ও বাঙলায় একটি করে প্রবন্ধ লেখার ভার পেয়ে আমি উৎসাহিত হয়েছিলাম···।"

—(রূ কূলে-৩য় খণ্ড-অপ্রকাশিত)।

১৯৩৯ খ্রীঃ কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশন। সম্মিলিত বামপন্থী শক্তির সমর্থনে দক্ষিণপন্থিদের প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র এপ্রিল ১৯৩৯-এ সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মে মাসে কংগ্রেসের মধ্যেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন।

এপ্রিল ১৯৩৯ গয়ায় 'নিখিল ভারত কিষাণ সভা'র অধিবেশন। সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের নিয়ে 'বামপন্থী সংহতি কমিটি' গঠন। ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। ১৪ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণা। অক্টোবরে বোম্বাই-এ ৯০ হাজার শ্রমিকের একদিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগ।

* ১৯৩৯ খ্রীঃ গোপাল হালদার সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী হিসাবে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যোগ দেন।

"প্রথম সর্বভারতীয় জনসমাবেশ হিসাবে আমরা সাগ্রহে দেখি গয়ায় নিখিল

ভারত কৃষক সম্মেলন। বিরাট অধিবেশন···।” —(রু. কুলে-তৃয় খণ্ড অপ্রকাশিত)।

এই কৃষক সম্মেলনে বাঙলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, আবদুল্লা রসুল, গোপাল হালদার, বিমলপ্রতিভা দেবী, মনসুর হবিবুল্লা প্রমুখ।

২০–২১ মে, ১৯৩৯ গোপাল হালদার প্রাদেশিক কৃষক সভার তৃতীয় সম্মেলনে (মালদহ, ন-ঘরিয়া) প্রচার বিভাগের সম্পাদক হন।

১৫ ৮.১৯৩৯ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করে ইস্তাহার প্রচার করা হয়। “প্রচার কর্তা—বিমলপ্রতিভা দেবী, সম্পাদিকা, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি সাব-কমিটি, বি, পি, সি, সি।” —(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—সরোজ মুখোপাধ্যায় / পৃ ১৪৪)।

সেপ্টেম্বর (আশ্বিন) ১৯৩৯ গোপাল হালদার ‘একদা’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। “এই যুগেই প্রগতির সপক্ষে বলিষ্ঠ নির্ভীক লেখনী ধারণ করেন সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ···পরে যোগ দেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপাল হালদার, ‘পরিচয়’ পত্রিকার হিরণ সান্যাল প্রমুখ লেখক। এঁদের লেখাগুলি মূলতঃ প্রকাশিত হয় ‘অগ্রণী’ পত্রিকায়। —(ঐ-সরোজ মুখোপাধ্যায় / পৃ. ১৯২)।

১৯৪০ খ্রীঃ মার্চে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। মার্চে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে বাঙলার প্রতিনিধিদের সম্মেলন বর্জন।

সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক ও সারা ভারত কিষাণ সভার যুক্ত উদ্যোগে রামগড়েই ‘সমঝোতা বিরোধী’ সম্মেলন আহ্বান করেন। জুন মাসে নাগপুর সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান। জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হন। অসুস্থতার জন্য তিনি ডিসেম্বরে মুক্ত হন এবং গৃহে অন্তরীণ থাকেন।

২৬.১০.১৯৪০ সুভাষচন্দ্র বসুর ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকায় ‘Follow Nagpur’ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় (এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির লেখক সম্ভবত গোপাল হালদার)।

“The security deposit of Rs. 2000 has been forfeited by the Governor in connection with its editorial article entitled —Follow Nagpur".

—(30. 11. 1940, Forward Bloc, vol-2. No 17) ।

অক্টোবর ১৯৪০-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে ২০ হাজার সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীর কারাবরণ।

সুভাষচন্দ্র বসু '১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে···'হিসাব-নিকাশের দিন' (Day of Reckoning) শীর্ষক একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন। মহম্মদ আলি পার্কে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাও দেন। ইহার ফলে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে স্বগৃহে বন্দী করেন।" —(ভারতকোষ, ৫ম খণ্ডে)।

* ১৯৪০ খ্রীঃ '১৯৩৯-৪০, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির (বি পি সি সি) অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন গোপাল হালদার। 'বাঙালাদেশের মহারথীরা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে···আমি ছিলাম সেই সময়ে সুভাষচন্দ্র চালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি···আমরা কংগ্রেস ছাড়লাম।"

—(রু. কুলে—৩য় খণ্ড-অপ্রকাশিত)।

" 'ফরওয়ার্ড ব্লক'—আমার সাংবাদিকতার তৃতীয় পর্ব। কিন্তু পরে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' বন্ধ হল—সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের পরে—আর সে সময় আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই।" ···"তৃতীয় একজন সম্পাদক ও দেশের অগ্রগণ্য নেতা আমার 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ লেখার (Day of Reckoning) জন্য রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার হন। নিশ্চয় সেই সূত্রে তাঁকে কারা রুদ্ধ করে দেশে তাঁর কর্মযজ্ঞ খর্ব করা হত, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই জামিনে থাকাকালীন পলায়ন করে সরকারের উদ্দেশ্য পন্ড করেন।" —(রু, কুলে-৩য় খন্ড-অপ্রকাশিত)।

৮-৯ জুন ১৯৪০, গোপাল হালদার প্রাদেশিক কৃষক সভার চতুর্থ সম্মেলনেও (যশোহর, পাঁজিয়া) প্রচার বিভাগের সম্পাদক হন।

মার্চ, ১৯৪০ পাটনায় 'নিখিল ভারত কিষাণ সভার' পঞ্চম অধিবেশন হয়।

অনেক সময় পরিচালক কাউন্সিলে (এক বছর সম্পাদক পদেও নিযুক্ত ছিলাম) থাকাতে প্রাদেশিক দপ্তরে আমার কাজে অকাজে উপস্থিতি ছিল নিশ্চিত। অবশ্য নিখিল ভারত কৃষক সভাতেও আমি পরিচালক কাউন্সিলে ছিলাম পাঁচ-সাত বছর —একবার সাময়িকভাবে তার সম্পাদক পদেও কয়েকমাস।"

—(রু, কুলে, ৩য় খণ্ড-অপ্রকাশিত)।

“১৯৩৯-৪০ সারাভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন স্বামী সহজানন্দ। গ্রেপ্তার হবার সময় যুগ্ম-সম্পাদক ইন্দুলাল যাজ্ঞিককে তাঁর পদে মনোনীত করেন। আরো পরে কমরেড যাজ্ঞিক গ্রেপ্তার হলে অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক আবদুল্লাহ রসুলকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করেন। ···তিনি প্রকাশ্য ভাবে অফিসে গিয়ে কাজ করতে পারেন না। তবে কমরেড গোপাল হালদার, প্রমথ ভৌমিক প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে প্রাদেশিক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ চালাতে থাকেন।”

—(কৃষক সভার ইতিহাস—আ, রসুল / পৃ, ১১৮)।

১৯৪১ খ্রীঃ “সতেরোই জানুয়ারি ১৯৪১ রাত প্রায় দেড়টার সময় এলগিন রোডের বাড়ি থেকে··সুভাষের যাত্রা শুরু হল—স্বাধীনতার জন্য। এলগিন রোডের বাড়ি ঐদিন চেপে রাখল খবরটা। ছাব্বিশে জানুয়ারী খবরটা রাষ্ট্রকরা হল—সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুভাষ নিরুদ্দেশ।”—(উদ্যতখড়্গ সুভাষ—৩য়—পৃ, ৩১)। আফগানিস্তান ও রাশিয়ার ভিতর দিয়ে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র ২৮ মার্চ ১৯৪১, জার্মানির বার্লিনে পৌছান।

মে ১৯৪১, রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সংকট’ (১লা বৈশাখ ১৩৪৮) নামক প্রবন্ধ-প্রকাশ।

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ; ফলে যুদ্ধের চরিত্র দ্রুত বদলে যায়। ১৯৪১-এর জুন মাসে কলকাতায় ‘সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি’ (Friends of Soviet Union—F. S. U) গঠিত হয় এবং জুলাই মাসে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে টাউন হলে বিরাট জনসভা হয়।

মৃত্যুশয্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার বিজয় কামনা করে বলেন, “রাশিয়ার খবর বলো। বললুম, একটু ভাল মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্বল হয়ে উঠল ঃ ‘হবে না? ওদেররই তো হবে। পারবে, ওরাই পারবে।’

—(কবিকথা ঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ১৩50)।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে।

৭ই ডিসেম্বর জাপানের হঠাৎ পার্ল হবার আক্রমণ। “১৯৪১ সাল শেষ হবার আগেই এ যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিল।” জার্মানি, ইটালী ও জাপানের ফ্যাসীবাদী শক্তির (অক্ষশক্তি) সঙ্গে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ (মিত্র শক্তি) বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় জনশক্তির সংগ্রাম শুরু হয়।

ডিসেম্বর ১৯৪১ বার্দোলিতে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির এক প্রস্তাবে জানাল, "মাতৃভূমি রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের তুলনাহীন বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করছে এবং তাদের মুক্তকণ্ঠে অভিবাদন জানাচ্ছে।"

* ১৯৪১ খ্রীঃ "সুভাষবাবু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারত থেকে অন্তর্হিত হন। তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলেও গোপনে গোপনে ছিল গণবিপ্লবের আশায় সক্রিয়। আমি তখন সেই কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম যোগ দিলাম।"—(রূ কূলে—৩য় খণ্ড-প্রকাশিত)।

"১৯৪১ সালে ১লা জানুয়ারি, একেবারে নতুন বছরের শুরুতে পার্টির কাছে সদস্যের আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। ভবানীবাবুকে (কমরেড ভবানী সেন) সেই সঙ্গে একথাও শুনিয়ে রাখলাম, দেখবেন নিজেকে নিয়েও যেমন হাসতে চাইব, তেমনি নিজের পার্টিকে নিয়েও। হাসি ঠাট্টা কিন্তু আমি ছাড়তে পারব না। ভবানীবাবুও তাতে হেসেই সায় দিয়েছিলেন।"—(কালান্তর, বিশেষ সংখ্যা—১৯৬৬)।

"গোপালদা সম্বন্ধে আমার ধারণা হল যে তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক।··শিক্ষিত মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিতে আসলেন তাতে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি আমার মতে, একটা দুর্মূল্য জিনিস লাভ করল।"—('তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক'—সোমনাথ লাহিড়ী—'সীমান্ত'—১৯৮০)।

তখনও অবশ্য হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে নি (২২ জুন ১৯৪১)।··'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' আমি কাজে লাগি যুদ্ধের প্রথমার্ধের চূড়ায়। ···আমি যখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর সম্পাদনে সহকারী তখন প্রবীণ সাংবাদিক হেমচন্দ্র নাগ মহাশয় তাঁর প্রধান সম্পাদক।··সম্পাদকের অন্যতম প্রধান সহকারী আমি।"—(রূ, কূলে—৩য় খণ্ড-অপ্রকাশিত)।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে গোপাল হালদার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে দুটি সম্পাদকীয় রচনা করেন—'The poet is no more' (Thursday, August 7, 1941) ও 'It was his city' (August 8, 1941)।

১৯৪১ সালের অক্টোবরে গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রকাশিত হয়। "যা বাঙলা ভাষায় এখনো মার্কসীয় সাহিত্যের একখানি অনন্য ক্লাসিক। ১৯৪০-৫০-এর দশকে বহু তরুণ বই পড়ে মার্কসীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে।" —('স্বনামা পুরুষো ধন্য'—অনিলকুমার কাঞ্জিলাল-পরিচয় ১৯৮০)।

১৯৪১ সালের অক্টোবরে মার্কসীয় বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় সত্যেন্দ্রনাথ

মজুমদারের সম্পাদনায় 'অরণি' প্রকাশিত হয়। গোপাল হালদার 'অরণি' পত্রিকার অন্যতম লেখক।

'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গোপাল হালদার তার অন্যতম সংগঠক। তিনি 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র পত্রিকা 'সোভিয়েত দেশ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪১-এ প্রকাশিত ঐ পত্রিকার আর একজন সম্পাদক—সুনীল মিত্র।

সুধী প্রধানের লেখা 'কৃষি-ভারতের নগ্নরূপ' (২০. ৯ ১৯৪১) পুস্তিকার ভূমিকায় গোপাল হালদার তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন 'নিখিল ভারত কিষান সভা'—২৫৯-ডি, বৌবাজার স্ট্রীট, কলকাতা। নিখিল ভারত কিষান সভার অনেক নেতাই তখন কারান্তরালে এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লা রসুলও আত্মগোপন করে আছেন। কার্যত গোপাল হালদারই তখন সম্পাদক হিসাবে 'নিখিল ভারত কিষাণ সভা' পরিচালনা করেছেন (১৯৪০-৪১)।

৫ ১২. ১৯৪১-এর 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়—২৩. ১১. ১৯৪১. হুগলী টাউন হলে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সভায় "সোভিয়েত সুহৃদবর্গের নিখিল ভারত কমিটির বিশিষ্ট কর্মী ও উদ্যোক্তা শ্রীযুত গোপাল হালদার মহাশয় প্রধান বক্তা ছিলেন।"

২৬ ১২ ১৯৪১-এর 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়—গোপাল হালদার সুরমা উপত্যকা ও শিলং সোভিয়েত-সুহৃদ সমিতির প্রথম সম্মেলনের সভাপতি। সভাপতির অভিভাষণে গোপাল হালদার 'সোভিয়েত যুদ্ধের প্রথম পর্ব'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্থির প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন—"এই যুদ্ধ শেষ হবে পৃথিবী ব্যাপী ফ্যাসিস্তদের চরম পরাজয়ে—আর তা সম্পূর্ণ হবে তেমনই পৃথিবী ব্যাপী গণশক্তির উদ্বোধনে, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসে।"

১৯৪২ খ্রীঃ সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বযুদ্ধকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী 'জনযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। "১৯৪২-সালের সম্ভবত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পাটনায় সারা ভারত ছাত্র-সম্মেলনে (সভাপতি ছিলেন ইফ্‌তিখার উদ্দীন) জনযুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হল, দেশ জানল কম্যুনিস্ট পার্টি নীতি বদলাচ্ছে। পাটনা ফেরৎ কমিউনিস্টরা বুকপকেটে 'জনযুদ্ধ'-এর আহ্বান লাগিয়ে ঘুরতে লাগল ; প্রচণ্ড আলোচনার জোয়ার বইতে লাগল। —(তরী হতে তীর—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-পৃ. ৩৩৫)।

৭ মার্চে জাপানী সৈন্যদের হাতে রেঙ্গুন অধিকৃত। ৮ মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ নিহত হন। যুদ্ধ শেষে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন' মর্যাদা (Dominion status) দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে ১৯৪১-এর ২২ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ বিশেষ দূত হিসাবে ভারতে আসেন। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।

২৮ মার্চ, ১৯৪২ কলকাতায় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে বৃটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আইন সিদ্ধ করে। জুলাই মাসেই কমিউনিস্ট পার্টির ইংরেজি 'পিপল্‌স্‌' ওয়ার প্রকাশিত হয়।

১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় 'জনযুদ্ধের নীতি ও কার্যক্রম' অনুমোদিত হয়। কমঃ বঙ্কিম মুখার্জির সম্পাদনায় 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী 'ভারত-ছাড়ো' রণধ্বনি প্রথম উত্থাপন করেন। ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গভীর রাতে 'ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৯ আগস্ট সকালেই গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী হন। ৯ আগস্টের পর থেকে কয়েক মাস ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। স্কুল, কলেজ, কারখানায় ধর্মঘটের পাশাপাশি বিদ্রোহী জনতা থানা, পোস্ট অফিস, রেলস্টেশনে অগ্নিসংযোগ করে এবং টেলিগ্রাফ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে। উত্তর প্রদেশের বালিয়া, আজমগড়, মহারাষ্ট্রের সাতারা এবং বাঙলায় মেদিনীপুর জেলার ব্যাপক অঞ্চলে সাময়িক বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এই গণ অভ্যুত্থানে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করে।

কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে মিত্রশক্তির অন্যতম অংশীদার বৃটিশ-সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস সহ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের কাছে বৃটিশের মিত্র হিসাবে নিন্দিত হয় এবং ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাতে জনযুদ্ধের প্রচারক কমিউনিস্টরা আক্রান্ত হয়।

১৯৪২-এর নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতাদের

মুক্তির দাবিতে এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনে নামে।

* ১৯৪২ খ্রীঃ ২৩. ১. ১৯৪২-এর 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ—"সম্প্রতি (জানুয়ারি ১৯৪২) বহরমপুরে সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতির স্থানীয় শাখার সম্মেলনে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র তাঁহাদের বক্তৃতায় দ্বিতীয়-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রূপান্তর এবং জনযুদ্ধের পরিণতি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।"

১৩ ২. ১৯৪২-এর 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ "গত ১ ২. ১৯৪২ তারিখে বজবজ (২৪ পরগণা) স্টার গ্রাউন্ডে ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের এক বিরাট সভা হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, গোপাল হালদার, আব্দার রেজ্জাক খাঁ প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবর্গ বাঙলা গভর্নমেন্টের শ্রমমন্ত্রী ও লেবার কমিশনের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন।"

"নাগপুরে নি. ভা. কিষান কাউন্সিলের অধিবেশন হইতেছে। বাঙলা দেশ হইতে শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীগোপাল হালদার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।"—('অরণি'-১৩, ২. ১৯৪২)।

গত ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঊনবিংশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অধিবেশন উদ্বোধন করেন। "কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি (এম. এল এ), গোপাল হালদার· · মৃণাল কান্তি বসু· · ·শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়· · ·মিঃ ভি.ভি. গিরি (এম. এল. এ.) প্রভৃতি শ্রমিকনেতারা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।"—(অরনি'-১৩. ২. ১৯৪২)।

১৯৪১ সাল পর্যন্ত কমঃ বঙ্কিম মুখার্জি ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নে'র সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪১ সালে "পরে কিছুদিনের জন্য কমরেড গোপাল হালদার সাধারণ সম্পাদক হন।"—(সম্পাদকীয় রিপোর্ট—১৯৮৫-কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের ২০তম সম্মেলন)।

২৮ মার্চ ১৯৪২ কলকাতায় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' স্থাপিত হয়। "বলাই বাহুল্য যে, গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সাণ্যাল, অরুণ মিত্রের মতো ব্যক্তি সাগ্রহেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সঙ্ঘ স্থাপনে অগ্রসর হলেন।"—(তরী হতে তীর-হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পৃ, ৩৬৪)।

"এই সঙ্ঘের সংগঠন সমিতি শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত (সভাপতি), গোপাল

হালদার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম সম্পাদক) লয়ে গঠিত।”—(ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের-বিজ্ঞাপনী)

সুধী প্রধান লিখেছেন, “এই সময়টা ‘জনযুদ্ধ’ লাইন গ্রহণের প্রথম যুগ। রাম মূর্তির একটি লেখায় পড়েছি ‘জনযুদ্ধ’ লাইন প্রথমে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি. যোশীও গ্রহণ করতে রাজি হন নি। আমারও আপত্তি ছিল। তাছাড়া কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, মনিকুন্তলা সেন, গোপাল হালদার প্রমুখের আপত্তি ছিল কোনো কোনো বিষয়ে।”—(‘সংস্কৃতির অস্ত্ররূপ’—সুধী প্রধান-পৃ ৩১ ও ১১৫)। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমঃ সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁদের সংশয় দূর হয়।

১৯৪২ খ্রীঃ জুন মাসে রংপুর জেলার ডোমারে প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলন। ১৬ অক্টোবর সামুদ্রিক তুফানে মেদিনীপুরও ২৪ পরগণার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি। ২৫ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম, নোয়ালি, আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর ও যুদ্ধ ঘাঁটির উপর জাপানী—বোমা বর্ষণ। বন্যা—দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কৃষক সভার উদ্যোগে নির্দলীয় রিলিফ কমিটি গঠন। ডঃ নীরদ মুখার্জি মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় রিলিফের কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম জাপানী বোমা পড়ে। ঐ মাসেই আরো চারদিন কলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণ হয়। খিদিরপুর, উত্তর কলকাতা, ডালহাউসি ইত্যাদি অঞ্চলে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিছু লোক মারা যায়। আতঙ্কিত মানুষ কলকাতা ছেড়ে বাঙলার বাইরে চলে যেতে থাকে।

১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় ‘ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট’ হলে ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে’র প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি মণ্ডলীর সভাপতি—কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ১৯৪২ খ্রীঃ “সম্প্রতি (জানুয়ারি ১৯৪২) বহরমপুরে সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতির স্থানীয় শাখার এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার উপস্থিত ছিলেন। ‘শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র তাঁহাদের বক্তৃতায় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রূপান্তর এবং জনযুদ্ধে পরিণতি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখা করেন।”—(‘অরণি’—২৩. ১. ১৯৪২)।

“গত ১. ২. ১৯৪২ তারিখে বজ্‌বজ্ (২৪ পরগনা) স্টার গ্রাউণ্ডে ধর্মঘটী

চটকল শ্রমিকদের এক বিরাট সভা হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, আব্দার রেজ্জাক খাঁ প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবর্গ বাঙলা গভর্নমেন্টের শ্রমমন্ত্রী ও লেবার কমিশনের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন।”—(‘অরণি’—১৩. ২ ১৯৪)।২

“নাগপুরে নিখিল ভারত কিষান কাউন্সিলের অধিবেশন হইতেছে। বাঙলা দেশ হইতে শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীগোপাল হালদার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।”—(‘অরণি’—১৩. ২. ১৯৪২)।

“গত ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঊনবিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে। কমরেড বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় এম. এল. এ, গোপাল হালদার, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু,··চারু বন্দ্যোপাধ্যায়·· মিঃ ভি ভি. গিরি এম. এল. এ প্রভৃতি শ্রমিক নেতারা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন উদ্বোধন করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বক্তৃতা করেন।”—(অরণি—১৩. ২. ১৯৪২)।

“বিনয় পায় ‘হরিজন’ থেকে উদ্ধৃত মহাত্মাজীর লেখা যা এখন আর উদ্ধৃত করা চলবে না। বিনয় দেখছে কাগজে যেন বিক্ষোভের আবহাওয়া, উন্মত্ত ঝটিকায় তা শ্বাসিয়ে উঠছে, বিক্ষোভ এবার বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে। বোম্বাইতে ৭ আগস্ট হচ্ছে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন।··মহাত্মাগান্ধী গ্রেফ্‌তার, সমস্ত কংগ্রেস নেতারা ধৃত, কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত, বোম্বাই-এ দাঙ্গা ও আগুন··ভারতবর্ষের সকল মানুষের প্রাণ ঘোষণা করছে—‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’।”

—(পঞ্চাশের পথ—গোপাল হালদার-পৃ. ২৭১ ও ৩০৬)।

“হঠাৎ কাগজের বাধা ঠেলে খবর বেরিয়ে এল—ঝড়ে হাজার দশ লোক মরেছে মেদিনীপুরে।”

(ঊনপঞ্চাশী—গোপাল হালদার / পৃ. ১৬৮)।

“সরকারের অনুমতি না পেলে মেদিনীপুরে আমরা সাহায্য দিতেও যেতে পারব না। কারণ সে যে মেদিনীপুর। কিন্তু দুএক জন ডাক্তার আমাদের পাঠানো চাই।”

—(ঊনপঞ্চাশী—গোপাল হালদার / পৃ. ১৮৬)।

“শহরে বোমা পড়েছে কাল। আমি বললাম, সে তো পড়েছে কিন্তু পার্টি অফিসে পড়েনি। বললে, কোথায় পড়েছে। আমি বললাম··খিদিরপুরে।··· বোমা পড়েছে উত্তর কলকাতার একটা বাজারে আর কাছাকাছি কয়েকটা বাড়িতে।

কলকাতা ছেড়ে চলেছে সবাই। তার দরিদ্রতম শহরবাসীরা চলেছে কলকাতা ছেড়ে।···কথা বলবার অবকাশ নেই—শহর ছাড়তে হবে, দূরে যেতে হবে, প্রাণ বাঁচাতে হবে।”—(ঊনপঞ্চাশী—গোপাল হালদার / পৃ ২৪১-৪৩)।

“কমরেড গোপাল হালদারকে আর কারো সাহায্য নিয়ে ‘অধিক ফসল ফলান’, ‘কৃষক সভার সভ্য হও’ এবং ‘জাপ-বিরোধী নাটক লেখার ব্যবস্থা করতে হবে।”—(সুধী প্রধানের ‘সংস্কৃতির প্রগতি গ্রন্থে’ উদ্ধৃত আবদুল্লা রসুলের বক্তব্য পৃ, ২২৪)।

“১৯৪২-এর ৮ মার্চ তারিখে কমরেড সোমেন চন্দ পঞ্চম বাহিনীর আক্রমণে প্রাণ হারান।···সোমেনের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ফল হল ২৮ মার্চ তারিখে কলকাতার ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন। এরই থেকে জন্ম হল ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’র।”—(‘জনযুদ্ধ’ ২৮ ৪ ১৯৪৩)।

গোপাল হালদার ২৮ মার্চের সভার একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৪২ সালের ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’-এর প্রথম সম্মেলনেরও একজন সংগঠক ছিলেন।

“আগেও ওরা—ঐ লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ থেকে চাইত আমাকে, আমিও ওদের কাজে যোগদান করতাম। ওদের পক্ষ থেকে দায়িত্বের কোন কাজ দিলে করতাম। তা না হলে সভ্য হিসাবে অতটা করতাম না। এজন্য অনেক ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে কারো সঙ্গে।···কিন্তু পরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সদস্য ও কর্মী হলাম।”—(‘প্রসঙ্গ পঞ্চাশের মন্বন্তর’—গোপাল হালদার / ‘সংস্কৃতি ও সমাজ’—এপ্রিল ১৯৮৩)।

১৯৪৩ খ্রীঃ জানুয়ারিতে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন। কমরেড ভবানী সেন পার্টি সম্পাদক হন।

১০ ফেব্রুয়ারিতে কারারুদ্ধ গান্ধীজীর অনশন। গান্ধীজীর মুক্তির দাবিতে বাঙলাদেশ জুড়ে ছাত্র-আন্দোলন।

৮ ফেব্রুয়ারি, সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানি থেকে সাবমেরিনে জাপানের পথে যাত্রা করেন।

২৮ মার্চ, বাঙলার গভর্নর স্যার জন হারবাটের চাপে এ কে ফজলুল হকের প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার পদত্যাগ। ২৪ এপ্রিল, খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা।

২৩ মে, বোম্বাইতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস। পূরনচাঁদ

যোশী সম্পাদক হন। মে মাসে পার্টি কংগ্রেসের সময় বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন। ঐ সময়ই 'সারা ভারত গণনাট্য সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা।

বাঙলায় ১৯৪২-এর শেষ দিকেই খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আমন ওঠার পর ১৯৪৩-এর শরতেই অবস্থা শোচনীয় হয়। শুরু হয় তেরশ' পঞ্চাশের (১৩৫০) মন্বন্তর।

"আজকের মন্বন্তর সৃষ্টি করে মানুষ—ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, মজুতদার এবং তার সঙ্গে গভর্নমেন্ট'। মেদিনীপুরের বন্যা, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, ফসলহানি সব কারণকে শিখণ্ডির মতো সামনে দাঁড় করিয়ে পিছন থেকে মারণাস্ত্র ছুঁড়েছিল মানুষ।··মানুষের তৈরি সেই মন্বন্তরে মরেছিল ৩৫ লক্ষ গ্রামীণ কৃষক ও কারিগর।"—(পঞ্চাশের মন্বন্তর / গণহত্যার দলিল' / বারোমাস—শারদীয় ১৯৮১)।

১৩ মে, সুভাষচন্দ্র জাপানের টোকিওতে উপস্থিত। ১৯ জুন টোকিও রেডিও থেকে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে নেতাজীর স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প ঘোষণা।

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য কলকাতায় 'পীপল্‌স্‌ রিলিফ কমিটি' বা 'জনরক্ষা সমিতি' গঠন। এ সময়ই 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' স্থাপিত হয়। এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি'। ডাঃ বিজয় বসু, ডাঃ নীরদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমর নাগ (যুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ থেকে চলে আসেন) প্রমুখেরা এই কমিটির ডাক্তার হিসাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে কাজ করেন।

মে মাসে নাগপুরে 'এ-আই-টি-ইউ-সি'-র ২০তম সম্মেলন।

১৯৪৩-এর অক্টোবরে ওয়াভেল ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন। ২৩ অক্টোবর মধ্যরাত্রে সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ্‌হিন্দ সরকারের দপ্তর থেকে নেতাজী ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২৯ ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামানে পৌঁছান।

* ১৯৪৩ খ্রীঃ গোপাল হালদার এ সময় 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি পত্রিকায় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধ' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন। 'সোভিয়েট সুহৃদ্‌ সমিতি' ও 'কৃষক সভার' সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। বন্যাদুর্গত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত।

১০-১২ মে, ময়মনসিং জেলার নালিতা বাড়িতে প্রাদেশিক কৃষক সভার

ষষ্ঠ সম্মেলন হয়। "একটি পোস্টার প্রদর্শনী খোলা হয়, তার নাম হয় 'সোমেন চন্দ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গোপাল হালদার।" এই সম্মেলনে গোপাল হালদার প্রাদেশিক কৃষক সভার সহযোগী সম্পাদক নির্বাচিত হন। (কৃষক সভার ইতিহাস'—আবদুল্লাহ রসুল / পৃ. ১২৯)।

"উপর থেকে পার্টির নির্দেশ আসার আগে থেকেই আমরা রিলিফের কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। কারণ স্থানীয় ভাবেও আমরা বুঝতে পারছিলাম লোকগুলিকে বাঁচাতে হবে।"

—(প্রসঙ্গ ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর—গোপাল হালদার / 'সংস্কৃতি ও সমাজ'—এপ্রিল ১৯৮৩)

"ভাল করে জানতে পারবেন যে-মেয়েরা সেই সময় 'মহিলা আত্মরক্ষা' সমিতি'তে কাজ করেছে তাদের কাজ থেকে। মণিকুন্তলা বা রেণুর কাছ থেকে··· প্রথমদিককার কথা আমি জানি. সেটা আমিও বইতে লিখেছিলাম। তখন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়নি। যাদের নিজ অঞ্চল থেকে উৎখাত করা হয়েছিল তাদের 'কমপেনসেশন' পাইয়ে দেওয়া থেকে অন্যান্য কাজ গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেকে করেছে।"—(প্রসঙ্গ ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর—গোপাল হালদার)।

"লঙ্গরখানা পরিচালনার ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ সূত্রে অভিজ্ঞতা ছিল না, কারণ অন্যকাজে আমি অনেকটা ব্যস্ত ছিলাম। টাকা তোলা, সাহিত্য রচনা, প্রবন্ধ লেখা এই সব কাজ।"—(প্রসঙ্গ ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর)।

"দুর্ভিক্ষ এসে গেছে প্রায়। আর দেরী নেই—সবে পৌষ—এখনি ধান নেই, চাল নেই, দেশে তেল নেই, নুন নেই, দেশলাই নেই, কয়লা নেই, কাঠ নেই, কাপড় নেই, কাগজ নেই—নেই কিছু নেই—নেই, নেই, নেই··· কিছু নেই—কিছু নেই। দুর্দিন নয় দুর্ভিক্ষ—দুয়ারে দুর্ভিক্ষ।"

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শুনেছি, সেকালের লেখায় পড়েছি, বঙ্কিমও তার চিত্র দিয়েছেন। এমন দেশজোড়া মৃত্যুর মিছিল সেবারও কেউ দেখে নি। কি বলব একে? মন্বন্তর—মন্বন্তর।···'দুর্দিন' নয়, 'দুর্ভিক্ষ'-ও আর নয়, 'মন্বন্তর'। ('তেরশ' পঞ্চাশ —গোপাল হালদার / পৃ. ৪৭ ও ২৩৪)।

"আমি পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে সূচনা থেকে তার শেষ পর্যন্ত একটা বই লিখি। অনেক তথ্য আমার হাতে ছিল। অন্যদের কাছেও ছিল। কৃষক সভার সভ্য হিসাবে আমি মফস্বলে ঘুরেছি, দেখেছি এবং তা নিয়ে রিপোর্টও দাঁড়িয়েছে।··· এই সব থাকাতে আমার স্বভাবতই মনে হল যতটা পারি ডকুমেন্টারি

জিনিসকে গল্পের আকারে রাখব।”—(প্রসঙ্গঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর—গোপাল হালদার)।

১৯৪৩ সালে গোপাল হালদার ভয়ানক রকমের জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য চারমাস পাটনায় দাদা রঙীন হালদারের কাছে থাকেন। “এরপর যখন ফিরে গেলাম তখন পার্টি থেকে বলল—গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক সভা, ও সব আর করা হবে না।”—(গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)।

গোপাল হালদার সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতি প্রেরিত Good Will Mission-এর প্রতিনিধি হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য Passport-এর আবেদন করেন। গোপাল হালদারকে যাতে Passport না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করে The Dy. Commissioner of Police, Security Control Office, Calcutta—the 28th May, 1943, লেখেন, “A ‘Secret’ note about the applicant, prepared by the Special Branch, is attached here with in a ‘sealed’ cover. In view of the facts contained in the ‘note’, we are not in a position to recommend any passport to the applicant…” (File No. 388/43, Home (Pol) G. B, Confidential)।

১৯৪৪ খ্রীঃ রেঙ্গুনে অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন। ১৭ জানুয়ারি আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে এলেন। আজাদহিন্দ ফৌজ ভারত সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল এবং মে মাসে কহিমা দখল করে ভারতের মাটিতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন করে।

৬ মে ১৯৪৪, গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতাদের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ। ২৪ জুন, স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে ভারত সরকার ‘দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন’ গঠন করে। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হলেন—ডঃ ডি. আর. অ্যাকরয়েড, এস ভি, রামমূর্তি, খান বাহাদুর আফজল হুসেন, মণিলাল বি, নানাবতী এবং আর. এ. গোপালস্বামী।

জুন-জুলাই মাসে খাদ্য, রসদ ও উন্নত অস্ত্রাদির অভাবে আজাদহিন্দ ফৌজের বিপর্যয় ঘটে এবং তারা পিছু হঠতে শুরু করে! আগস্ট মাসে করাচীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। ২১-২৭ সেপ্টেম্বর, রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য গান্ধী-জিন্না পত্রালাপ।

* ১৯৪৪ খ্রীঃ ১৫-১৭ জানুয়ারি, কলকাতায় ‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক

ও শিল্পী সঙ্ঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের মূল-সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র। গোপাল হালদার সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২ মার্চ, দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে প্রাদেশিক কৃষকসভার সপ্তম অধিবেশন। "এবার সভাপতি-মণ্ডলী গঠিত হয় পাঁচজনের পরিবর্তে এই তিনজনকে নিয়েঃ আবদুল্লাহ রসুল, গোপাল হালদার ও মণি সিং।"—(কৃষকসভার ইতিহাস। পৃ ১৪৪)

মার্চ ১৯৪৪, শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ। গোপাল হালদার তার ভূমিকায় লেখেন, "মন্বন্তর শেষ হয়নি, মহামারী তার জের টেনে চলেছে; হয়ত দ্বিতীয় মহামন্বন্তরেরও আয়োজন হচ্ছে। তবু চোখের উপর আমরা যে শ্মশান দৃশ্য দেখছি তার কোনো আভাস কি বহন করবে না আমাদের কালের কোনো ইতিহাস?—বাঙলাদেশের মন্বন্তর তার শিল্পীদের মনে যে কত বড় আলোড়ন তুলেছে, মন্বন্তরের মধ্যে বসেও আমরা তা সবিস্ময়ে দেখেছি, আর স্বীকার করেছি—বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তাঁদের দায়িত্ব বিস্মৃত হননি। শিল্পের পক্ষেও এ এক শুভ লক্ষণ যে, শিল্পীরা তার আঘাতে সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, তাঁদের দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে।"

১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে অন্ধ্রের বেজওয়াড়া শহরে 'সারা ভারত কিষাণ' সভা'র সম্মেলন হয়। গোপাল হালদার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। "আমার স্পষ্ট মনে আছে বেজওয়াদায় তখন সারাভারত কিষাণ সভার সম্মেলন হচ্ছে। সেই সম্মেলনের শেষে 'ভুখা হ্যায় বাংগাল'-এ ঊষার নাচ প্রচণ্ড তোলপাড় জাগিয়েছিল। সেই রাতে বেজওয়াদার পাহাড়তলীতে লক্ষ-লক্ষ লোক এগিয়ে এল সাহায্য দিতে।—সেদিনকার রাতের সেই দৃশ্য আমি কখনও ভুলব না।"—(প্রসঙ্গঃ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'—গোপাল হালদার 'সংস্কৃতি ও সমাজ'; এপ্রিল—১৯৮৩)।

'দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের কাছে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা' যে স্মারকলিপি পেশ করে, সেটি রচনায় গোপাল হালদারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

"১৩৫১ সালের শ্রাবণ মাস (১৯৪৪ সনের জুলাই-আগস্ট নাগাদ) থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর ৪৬নং-এ উঠে আসে এবং প্রায় বছর তিনেক এইখান থেকেই প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে তখন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র মজুমদার।"—(৪৬নং একটি

সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে—চিন্মোহন সেহানবীশ। পৃ, ১৩)। গোপাল হালদার ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত পরিচয়ের সম্পাদক ছিলেন। তারপর ১৯৫২-৬৭ আবার পরিচয় সম্পাদনা করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন 'পরিচয়'-এর উপদেশকমণ্ডলীর সদস্য।

১ অক্টোবর ১৯৪৪ গোপাল হালদারের মন্বন্তর ট্রিলজির প্রথম পর্ব 'পঞ্চাশের পথ' প্রকাশিত হয়।

২৪ অক্টোবর, কলকাতায় শ্রীরঙ্গম-মঞ্চে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়।

"গোপাল হালদার বা মণিকুন্তলা সেনের মত মানুষ সচরাচর যাঁদের আমরা অন্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকাতেই দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরাও সেদিন 'নবান্নে'র অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ছোট দু'টি ভূমিকায়।"—(৪৬নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে। পৃ, ১৭)।

"আমাকে বিজন ডেকে বলল—আপনি এই 'রোল'টা করবেন? দেখিয়ে দিল। শম্ভু দেখালো। 'আই এগ্রিড'। আমিও অভিনয় করেছি। খালি গায়ে আমাকে অভিনয় করতে হতো। উদ্বাস্তু ভিখারী হিসাবে।"—(গোপাল হালদারের সাক্ষাৎকার—'সংস্কৃতি ও সমাজ'; এপ্রিল ১৯৮৩)।

"জীবননাট্যের ঐ মঞ্চে ছেঁড়া কানি পরা, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে এক কোণে বসা বৃদ্ধবেশী গোপাল হালদার সেই ভগ্নকণ্ঠের আকুল কান্না—'তোরা সব গ্রামে ফিরে যা'—এতো আর ভুলবার নয়।"—('সেদিনের কথা'—মণিকুন্তল সেন—পৃ, ১১৪)।

"ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'র উদ্যোগে ১০-১১ অক্টোবর প্রথম রাজনৈতিক—সাহিত্য সম্মেলন হয়। গোপাল হালদার অন্যতম বক্তা। 'বাঙলায় জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি কিভাবে জাতীয় সাহিত্য বাড়িয়া উঠিয়াছে গোপাল হালদার তাহা বর্ণনা করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের ওঠা পড়ার মধ্য দিয়া বাঙলা সাহিত্যেও স্তরভেদ আসিয়াছে। রাজনৈতিক সাহিত্য আজ বাঙলার জনগণকে পথের নির্দেশ দিতেছে। আজ তাই সাহিত্যিকরা সেই পথে আকৃষ্ট হইতেছে।"—('জনযুদ্ধ'—১৮. ১০. ১৯৪৪)।

১৯৪৫ খ্রীঃ ২১ জানুয়ারি, জাপানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মৃত্যু। এপ্রিলে ইউরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের পদত্যাগ। যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে লেবরপার্টির সাফল্য—অ্যাটলি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী।

মে মাসে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ভাইসরয় ওয়াভেলের প্রস্তাব। ২৫ জুন সিমলা বৈঠক। মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের ফলে সিমলা বৈঠক ব্যর্থ। মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিসাক্ষরে অসম্মত। সিমলা বৈঠকেই ভারত ভাগের ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র স্পষ্ট।

৮ মে ১৯৪৫, সোভিয়েট ইউনিয়নের লালফৌজের বার্লিন দখল। জাপানের আত্মসমর্পণের ক'দিন আগে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় পরমাণু-বোমা বর্ষণ। ১৫ আগস্ট, জাপানের আত্মসমর্পণ। ২২ আগস্ট, টোকিও রেডিওর ঘোষণা—ফরমোসাতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু। দিল্লীতে সামরিক ট্রাইবুনালে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী অফিসারদের বিচার। তাঁদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন। ২১ নভেম্বর, কলকাতায় ছাত্র-অভিযান। "সন্ধ্যা ৬ টায় গোরা সার্জেন্ট ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মিছিলের উপর, চলল গুলি। ধর্মতলা স্ট্রীটে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গরিব নওজোয়ান আবদুস সালাম। কিন্তু মিছিল ফিরে গেল না। ছত্রভঙ্গ হয়ে আবার জড়ো হল তারা। ছাত্রাবাস থেকে কলিকাতা দিয়ে ছাত্ররা এসে বসে পড়ল তাদের পাশে। বসলেন বস্তির গরিব আর অগ্রজ দেশসেবকরা—মহিলা নেত্রী বিমল প্রতিভা দেবী আর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী।"—(স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ—গৌতম চট্টোপাধ্যায়—পৃ. ৬৭-৬৮)।

আন্দোলনের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহনওয়াজ, সেগল ও ধীলন-এর কারাদণ্ড মকুব।

* ১৯৪৫ খ্রীঃ ১৩-১৪ মার্চ বর্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুরে প্রাদেশিক কৃষক সভার অষ্টম অধিবেশন। "সভাপতি পরিষদ গঠিত হয়েছিল এই তিন জন নির্বাচিত মেম্বারকে নিয়েঃ আবদুল হায়াত, গোপাল হালদার ও কৃষ্ণবিনোদ রায়।"—(কৃষকসভার ইতিহাস-পৃ. ১৫০)।

১৯৪৫ সালের মে মাসে ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনায় সারাভারত কিষান সভার নবম সম্মেলন হয়। গোপাল হালদার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 'কিষান ও শিল্পীর সম্মেলন' নামে এক প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, "সারাভারত কিষানসভার বার্ষিক সম্মেলন এবার বাঙলাদেশে নেত্রকোণায় হয়েছিল। বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলমান হাজং মেয়ে-পুরুষ কৃষকদের এই সমাবেশ দেখলে বুঝতে পারা যেত কৃষকসভা এই দুর্দশাগ্রস্ত প্রদেশের মানুষের মনে কি আলোড়ন

এনেছে।…সম্মেলনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, বাঙলার লোক-শিল্পের প্রদর্শনী। এটি সত্যই দর্শনীয় হয়েছিল।”—(‘সংস্কৃতির বিশ্বরূপ’—গোপাল হালদার-পৃ. ২৮৬)।

৩-৮ মার্চ ১৯৪৫ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে ‘ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে’র তৃতীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনেই সঙ্ঘের রূপান্তরিত নাম হয় ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’।

৯ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতায় ট্রাম-শ্রমিক ধর্মঘট। “তারপর যুদ্ধ থামিল। সঙ্গে সঙ্গে বাধিয়া গেল বড় হরতাল।—ট্রাম-শূন্য পথ, এস্‌প্লানেডের ফাঁকাকেন্দ্র যেন খাঁ-খাঁ করে। মরিচা পড়িতে শুরু করিল দেড় মাসে ট্রামের ঝক্‌ঝকে লাইনের উপর। তারপর বিজয়ী ট্রাম মজদুর বিজয় গৌরবে বাহির করে ট্রাম কলকাতার পথে। যুদ্ধান্তের বিপ্লবী দিনের উদ্বোধন করিয়া দিল যেন ট্রামের মজদুর।”—(গোপাল হালদার রচনা সমগ্র-১। পৃ. ৪৫৯)।

১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর, কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র ‘স্বাধীনতা’-র আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—সোমনাথ লাহিড়ী, অন্যতম সদস্য—গোপাল হালদার। প্রথম সংখ্যাতেই গোপাল হালদারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ খ্রীঃ ১১-১২ ফেব্রুরারি আজাদহিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তি দাবি করে কলকাতায় ছাত্র-ধর্মঘট। ১৮-২২ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই ও করাচী বন্দরে ভারতীয় নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ। নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই-এর ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট। কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি নৌ-সেনাদের আত্মসমর্পণ।

১৫ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি কর্তৃক ভারতকে ‘ডোমিনিয়ন স্টাটাস’ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। মার্চ মাসে ‘ক্যাবিনেট মিশন’-এর ভারতে আগমন। ‘ক্যাবিনেট মিশনে’র সঙ্গে কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের বৈঠক। এপ্রিলে আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের ৯৩০, লিগের ৪৯৭ এবং কমিউনিস্ট পার্টির ৭ জন নির্বাচিত হয়। বাঙলায় মুসলিম লিগ এককভাবে সরকার গঠন করে—মুখ্যমন্ত্রী সোরাবর্দী। এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনী পাম দত্ত কলকাতায় আসেন।

শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে ‘কাশ্মীর ছাড়ো’ আন্দোলন। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে সূর্যপাত গাঁয়ের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক

অভ্যুত্থান থেকেই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সূত্রপাত। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র-কৃষক-সংগ্রাম ১৯৫১ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

জুন মাসে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। সারা ভারত ব্যাপী 'ডাক্তার' ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯ জুলাই কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট।

১৬ আগস্ট ১৯৪৬, কলকাতায় মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক, ফলে শুরু হয় ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এরপর নোয়াখালি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

২৪ আগস্ট দিল্লীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, জওহরলাল নেহরু উপ-প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রাদেশিক কৃষক, সভার ডাকে বাঙলায় 'তেভাগা' আন্দোলন। এই আন্দোলন অবিভক্ত বাঙলার ১৩টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এটা ছিল ভাগচাষীদের (বর্গাদার ও আধিয়ার) উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দাবির সংগ্রাম।

৬ নভেম্বর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য মহাত্মাগান্ধীর নোয়াখালি যাত্রা।

* ১৯৪৬ খ্রীঃ "চট্টগ্রাম, ৬ জানুয়ারি, রামেশ্বর নগরে নিখিলবঙ্গ প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের দশম অধিবেশনে অধ্যাপক গোপাল হালদার বক্তৃতা করেন।"—('স্বাধীনতা' ; ৭. ১. ১৯৪৬)।

১৫ জন সদস্য নিয়ে 'রেড এড কমিটি'র ১৯৪৬ সালের কার্যকরী সমিতি গঠন। গোপাল হালদার তার অন্যতম সদস্য। ('স্বাধীনতা' / ২৩. ২. ১৯৪৬)।

"ধর্মতলার হত্যা, রশিদ আলি দিনের বিদ্রোহী অভিযান, উনত্রিশে জুলাই'র শ্রমিক মহোৎসব—'বাহাদুর ট্রামকা মজদুর। ছেচল্লিশের আগস্টের হিন্দু-মুসলমান হত্যায় আত্মহত্যা করিল না তাহারা।"—(গোপাল হালদার রচনা সমগ্র—১ / পৃ ৪৫৯)।

"অমনি ১৬ আগস্ট (১৯৪৬), ৩২শে শ্রাবণ (১৩৫৩), আমরা কলিকাতা শহরের বাঙালী সভ্যতার এক আত্মঘাতী অধ্যায় আরম্ভ হতে দেখলাম, অন্তত চারদিন ধরে দেখলাম ইতরতার অভিযান।"...

"কলিকাতা ও বোম্বাই'র গৃহযুদ্ধের পরে এল নোয়াখালি, এল বিহার। ভারতবর্ষের বিপ্লবী জাগরণ সে মন্ত্রী মিশনের চক্রান্তে ও নেতৃদলের নিষ্ফলতায় এক আত্মঘাতের উন্মাদনায় বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এ আশংকা আমরা ১৬

আগস্টের পরে প্রকাশ করেছিলাম।”—(‘সংস্কৃতির বিশ্বরূপ’—গোপাল হালদার / পৃ ৩২৩-২৫)।

১৬ আগস্টের দাঙ্গার সময় গোপাল হালদার কলকাতায় ছিলেন, অক্টোবরে নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন। অসুস্থ হওয়ায় নভেম্বর-ডিসেম্বর পাটনায় ছিলেন।

১৯৪৭ খ্রীঃ ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ভারত বিষয়ক নীতি-ঘোষণা—১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যাবে। এপ্রিল মাসে মাউণ্টব্যাটেন-এর ভারতে আগমন। ৩ জুলাই, ভারতকে দুটি ডোমিনিয়নে বিভাগের মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা প্রকাশ। এতে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলা হয়।

তেলেঙ্গানায় কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতি। ২২ অক্টোবর, পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীরে হানাদার প্রেরণ। ২৭ অক্টোবর ভারতীয় ছাত্রীবাহিনী হানাদারদের কবল থেকে শ্রীনগর মুক্ত করে। কাশ্মীরের মহারাজা কর্তৃক ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর দান। পাক-ভারত যুদ্ধ। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ‘আজাদ কাশ্মীর’ সরকার গঠন।

* ১৯৪৭ খ্রীঃ “মাউন্টব্যাটেন বিচক্ষণভাবে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ও স্বার্থ প্রকারান্তরে সিদ্ধ করলেন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ। জিন্নার অনমনীয় দাবি—পাকিস্তান, কংগ্রেসও মেনে না নিয়ে পারল না। ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুইভাগে মাউন্টব্যাটেন ভাগ করলেন—তাঁর চরমকীর্তি, আমাদেরও পরমকাম্য। একটু ভুল হ’ল, এ দেখলাম দুইভাগে নয়, অন্ততঃ দুশো ভাগে ভারতবর্ষ বিভাগের আয়োজন করেছিল—মহাত্মা গান্ধী তাঁর কংগ্রেস সহযোগীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় রইলেন, কংগ্রেসম্যানদের বিরুদ্ধেও গেলেন না, তবে দেশ বিভাগ এবং ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতাও তিনি মৌখিক অস্বীকার করলেন—বিভাগ কথাটি তাঁর নীতি বিরুদ্ধ। …তখন আমরা যারা ভারতবর্ষকে এক জেনেই অখণ্ড স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি, তারা কি সত্যই দেশ বিভাগের প্রতিবাদ করেছি?…বরং সমস্ত ভারতবর্ষ—পাকিস্তান ব্যাপী সেই ১৫ আগস্টের ক্ষমতা হস্তান্তরকে ‘প্রাক-স্বাধীনতা মনে করে আনন্দে উল্লাসে সে দিনটিকে পুণ্যোৎসবের দিন বলে মনে করেছি—এই বাস্তবে দেশ-বিভাগ আমরা অখণ্ড দেশের স্বাধীনতাবাদীরা অতি সহজেই মাথায় করে নিয়েছি।

“...সকাল আটটায় (১৬ আগস্ট) শ্যামবাজারে কমল বোসদের বাড়িতে নর্থ ক্যালকাটা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বলতে বলতে উচ্ছ্বাসে না হোক হৃদয়ের দ্বিধা নিয়ে তাই জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই এ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, তবু হয়তো স্বাধীনতার সূচনা। যতক্ষণ পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না—জনমুক্তি জীবনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। আজ শুধু প্রার্থনা করি, কিংবা আশা করি, এই সূচনাকে অভিপ্রেত শ্রী ও প্রাণময় ভালবাসায় আমরা পরিপূর্ণ করে তুলব।”—(রূপনারানের কূলে—৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি থেকে)।

“১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে বোম্বাইতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, একটি শাখায় (সমাজ ও শিক্ষা) সভাপতিত্ব করবার জন্য আমিও বোম্বাই গিয়েছিলাম।”—(রূপকূলে—৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি থেকে)।

১৯৪৮ খ্রীঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যায় ও উপমহাদেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। দেশান্তর যাত্রী হিন্দু ও শিখদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মান্ধ মুসলমানদের নিষ্ঠুরতম আক্রমণ, তার বদলা হিসাবে দিল্লী, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদের উপর বর্বর আক্রমণ। ৩০ জানুয়ারি, উগ্রহিন্দুত্ব-বাদী এক ঘাতকের গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু।

ফেব্রুয়ারি—মার্চ, কলকাতায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। কমিউনিষ্ট পার্টির রণ-নীতি বদল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপস করে, ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, তাই এ স্বাধীনতা মিথ্যা (ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়)। বি. টি. রণদিভের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের পথে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী শাসন উচ্ছেদের রণনীতি অবলম্বন করে। ২৬ মার্চ ১৯৪৮, কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়; বহুকর্মী ও নেতা কারারুদ্ধ হন। ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্য দখলের পর তেলেঙ্গানার সশস্ত্র-কৃষক আন্দোলন দমনে তৎপর হয়।

* ১৯৪৮ খ্রীঃ ২৬ মার্চ, কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত। “পুলিশ কমিউনিষ্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা’ অফিসে হানা দিয়া···তালা লাগাইয়া সীল করিয়া দেয়। ধৃতদের মধ্যে মুজফ্ফর আহমদ, জ্যোতি বসু এম-এল-এ, অম্বিকা চক্রবর্তী, আবদর রেজাক খান, গোপাল হালদার···মণি-

কুন্তলা সেন, গীতা মুখার্জি···পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী অন্যতম।”– (‘যুগান্তর’ / ২৭. ৩. ৪৮)।

“নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়া সবুট পদধ্বনি আগাইয়া আসিল।··· উন্মোচিত আবার রাইফেলের রাজত্ব ?

ঝুটা হইয়া গিয়াছে তবে ’৪৭-এর স্বাধীনতা-স্বপ্ন ?···আজ ১৯৪৮··· নমস্কার স্যার···সার্চ করতে হবে একবার···সার্চ ফর আর্মস এক্স্প্লোসিভস্··· একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে···আপনার এ ফ্লাটে আপনাদের কমিউনিষ্ট পার্টির সভা হত।···তাই ফ্লাটটা তালাবন্ধ ক’রে দিয়ে যাবার হুকুম আছে।” —(গোপাল হালদার রচনা সমগ্র—১ / পৃ ৩৪৭-৬৭)।

১৯৪৯–৫১ খ্রীঃ পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান। ১ জানুয়ারি ১৯৪৯, কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর। ১৯৪৯, চীনে কমউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবের সাফল্য এবং ‘নয়াগণতন্ত্রের’ প্রতিষ্ঠা।

১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি, নতুন ‘সংবিধান’ গ্রহণ ও ভারতকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠন। ডিসেম্বর ১৯৫০, সর্দার প্যাটেলের মৃত্যু। ১৯৫০ থেকেই কনিউনিষ্ট পার্টির অতিবাম রাজনীতি (১৯৪৮–৪৯-এর) বর্জনের সূচনা। ১৯৫১-এর অক্টোবরে কমিউনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রাজনীতি গ্রহণ। বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার! হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক দল ‘জনসঙ্ঘ’-এর প্রতিষ্ঠা। স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সূচনা (২৫ অক্টোবর ’৫১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ’৫২ পর্যন্ত)। ১৯৫১, তেলেঙ্গানের সশস্ত্র কৃষক-আন্দোলন প্রত্যাহার। ১৫ এপ্রিল ১৯৫১, সশস্ত্র কৃষক-আন্দোলনের বিকল্প হিসাবে সর্বোদয় নেতা বিনোবা ভাবের ‘ভূদান’ আন্দোলন প্রবর্তন।

* ১৯৪৯–৫১ খ্রীঃ ২২-২৪ এপ্রিল ’৪৯, কলকাতায় ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে’র চতুর্থ সম্মেলন। “গোপাল হালদার এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যকরী সভাপতিরূপে সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন।” —(মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক-১ / পৃ. ৮৪)।

১৯৪৯-এর জুন মাসে কারামুক্তির পর গোপাল হালদার পাটনা উইমেনস্ কলেজের অধ্যাপিকা অরুণা সিংহকে বিবাহ করেন। “১৯৪৯ থেকে কিছুকাল

কারাবাস করে, মুক্তিলাভ করে পাটনা যাই। পরে যিনি আমার, সহধর্মিণী হন; তাঁর সঙ্গে ১৯৪৬ সালে পাটনায় আমার ভ্রাতৃগৃহে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। ১৯৪৯-এর জটিল ঘূর্ণাবর্তের এক দুঃসময়ে রাজনীতির আবর্ত সংকটের ক্ষণে তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটে।” —('সময়সীমায়'—গোপাল হালদার, পাক্ষিক বসুমতী / ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২)।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত গোগাল হালদার নবপর্যায় 'পরিচয়'—এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' আর 'তেলেঙ্গানার পথই কমিউনিস্টদের পথ' বি. টি. রণদীভে যুগের (১৯৪৮-৫০) এই মতের অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা ভবানী সেন 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় স্পষ্ট অভিযোগ করেন, “আসল কথা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 'ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' বলতে গোপালদা বোঝেন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে রফা-করে চলা।”··· “মার্কস্‌বাদীরা রাজনীতিক্ষেত্রে যে জোশীবাদ বর্জন করেছেন, বাঙলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সেই জোশীবাদ এখনও মাথা জাগিয়ে আছে।··· 'পরিচয়-গোষ্ঠী' এখনও তাই অনুসরণ করছেন।”—('মার্কস্‌বাদী,' ৫ম সংকলন, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, 'বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'—'রবীন্দ্র গুপ্ত' ভাবানী সেনের ছদ্মনাম)। গোপাল হালদার 'পরিচয়'—এর সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত হন। 'মার্কস্‌বাদী'তে প্রকাশিত অভিযোগের কোন লিখিত জবাব গোপাল হালদার সে সময় দেন নি। “মানিকবাবু যা ভাবতেন তাই বলতেন। তবে তাতে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। তাঁর মত ছিল ঃ 'ভবানীবাবু যখন বলছেন তখন বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। গোপালদা মর্মাহত হয়ে নীরব রইলেন।” —(অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ-এর সাক্ষাৎকার, 'শিলাদিত্য' / মার্চ ১৯৮২)। তবে সাহিত্য বিচারে 'মার্কস্‌বাদী'র সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীকে গোপাল হালদার কখনো সমর্থনও করেননি। পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন,“ডক্‌ট্রিনেয়ারিজম (মতসর্বস্বতা) শিল্প—সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন দিনই মেনে নিতে পারিনি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব দিয়ে সব সাহিত্যেরই ব্যাখ্যা হয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে।”—('কালান্তর,' বিশেষ সংখ্যা / ১৯৬৬)।

“পরে ১৯৪৮-এর প্রারম্ভ থেকে যা ঘটল তার অনেক কর্মপদ্ধতি ও কর্মকাণ্ড ছিল আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক দুই বোধেরও বিনষ্টি সূচক। সংশয় বোধ করেছি বারবার। কার্যত বাধা দিই নি। সে মূঢ়তাকে বাধা দিতে না পারা, আমি মনে করি 'পরিচয়' সম্পাদক হিসাবে আমার

প্রথম .. ব্যর্থতা।"—('পরিচয়'-এর রূপান্তরের হেরফের—গোপাল হালদার, পরিচয়-১৯৮১)।

১৯৫২-৬৮ খ্রীঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২' স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। ১ এপ্রিল' ৫২, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা।

১৯৫৩, সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রধান জে. ভি. স্ট্যালিনের মৃত্যু।

১৯৫৪, ভারতে জমিদারি উচ্ছেদ আইনে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন। ১৯৫৪, ভারত ও চীনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 'পঞ্চশীল' নীতির ভিত্তিতে মৈত্রী চুক্তি। ১৯৫৫, সোভিয়েট দেশে জওহরলাল নেহরুর সফর। ১৯৫৫, কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনের প্রস্তাব। ১৯৫৬ ভারতের রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের আইন পাশ—১৪টি রাজ্য ও ৫টি কেন্দ্র শাসিত এলাকা গঠন।

১৯৫৬, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০শ কংগ্রেসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও গৃহযুদ্ধ ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। ১৯৫৬-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস। ১৯৫৭-এ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনসহ ১২টি সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতৃবৃন্দের বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে মস্কো ঘোষণা। এই ঘোষণার প্রতি ভারতসহ পৃথিবীর ৫২টি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন। ১৯৫৭, ভারতে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা।

১৯৫৭-এর এপ্রিলে কেরলায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা। ৪ অক্টোবর ১৯৫৭, সোভিয়েট দেশে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুৎনিক' প্রেরণ। ১৯৫৮-এর এপ্রিলে অমৃতসরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম বিশেষ কংগ্রেস। ১৯৫৯-এর জুলাই মাসে আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে কেরলের কমিউনিস্ট সরকার খারিজ ও রাষ্ট্রপতির শাসন জারি। ১৯৫৯, ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ। ১৯৬০ সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ভারতসহ পৃথিবীর ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স' পার্টির বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত মস্কো-দলিল গ্রহণ ॥ ১৯৬১-এর এপ্রিলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে ৮১ পার্টির মস্কো দলিল অনুমোদন। ১৯৬২ ভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। পার্লামেণ্টে কমিউনিস্ট পার্টির ২৯টি আসনসহ প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা। চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মতাদর্শগত

বিরোধ, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন। ২০ অক্টোবর, ১৯৬২ চীনের ভারত আক্রমণ। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে মতভেদ। ২৭ মে, জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু। ১৯৬৪, অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন ; ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন। বোম্বাইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস।

১৯৬৪-৬৬, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৬৫, পাক-ভারত যুদ্ধ। ৩-১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬, তাশখন্দে পাক-ভারত শান্তির ঘোষণা পত্র। ১৯৬৬, তাশখন্দে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু। ১৯৬৬ ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত। ১৯৬৭, লোকসভায় সরকারী ভাষাবিধি গ্রহণ। ১৯৬৭, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন, বেশ কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী ফ্রন্ট সরকার গঠন।

মে, ১৯৬৮, সি. পি. আই.-এর অষ্টম পার্টি কংগ্রেস। ১৯৬৮, 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' বা 'কৃষি-বিপ্লবে'র সূচনা।

* ১৯৫২-১৯৬৮ খ্রীঃ ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত গোপাল হালদার 'পরিচয়'-এর আবার সম্পাদক। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 'পরিচয়'-এর উপদেশকমণ্ডলীর সদস্য।

“১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিণ্ডিকেটের মেম্বার ছিলাম। আমি রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের কনস্টিটুয়েন্সি থেকে কয়েকবারই নির্বাচিত হই।”—('সময় সীমায়'—গোপাল হালদার, পাক্ষিক বসুমতী, ১৬. ৯. ১৯৯২)। গোপাল হালদার 'বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সিনেটে প্রস্তাব তোলেন। সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ; “অথচ বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে গোপাল হালদার প্রকাশ্যে গুরুর বিরোধিতা করেছিলেন।”—('চতুরঙ্গ'—৮. ১২. ১৯৯২)

১৯৫২, শ্রীযুক্ত হালদার গৌহাটি ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন।

১ জানুয়ারি, ১৯৫৫ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৭, গোপাল হালদার রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কনস্টিটুয়েন্সি থেকে সর্বোচ্চ ভোটে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে 'ক্ষুদিরাম বসু স্মারক বক্তৃতা' দেন।

"১৯৫৮ সালে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে আমি ডেলিগেট হয়ে গেলাম—আগস্ট মাসে।···এটি অনুষ্ঠিত হয় সুইডেনে স্টকহলমে। বইয়ে পড়া পোলার কান্ট্রি দেখার সৌভাগ্য হল সেই প্রথম। কিন্তু ফিরে আসার পরই আবারও একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। এবার যেতে হল আফ্রোএশীয় লেখক সম্মেলনে।···স্লাভিস্ত কনফারেন্স ও আফ্রোএশীয় রাইটার্স কনফারেন্স একত্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি মস্কোতে এবং দ্বিতীয়টি তাসখন্দে।···স্লাভিস্ত কনফারেন্স শেষ হলে আচার্য সুনীতিকুমার সহ আমিও নিমন্ত্রণ পাই মহাচীন দর্শনের।" —('সময় সীমায়' —গোপাল হালদার, পাক্ষিক বসুমতী / ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)।

"বর্তমান চীনের নেতৃত্বের সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা যায়—এমন সুযোগ্য নেতৃত্ব আজ পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত অধ্যাপকেরও অভাব নেই। আর সংখ্যায় ও গুণে চীনের জনগণের মত পরিশ্রমী ও শিল্প-নিপুণ শক্তিও পৃথিবীতে কম আছে। নেতৃত্বের ও জনগণের একাত্মতা কমিউনিজমই সম্ভব করে। আর তা সম্ভব হলে পৃথিবীতে অঘটন ঘটে—গণ-কমিউন্ তারই একটি সূচনা।"—('গণ-কমিউনের অতিথি'—গোপাল হালদার, 'ভারত-চীন,' কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৮৮০ শক / ১৯৫৮)।

১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'অরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে' গোপাল হালদার আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন।

৩-১২ নভেম্বর, ১৯৬১, পার্কসার্কাস ময়দানে 'শান্তিসংসদ' আয়োজিত 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব' উদ্‌যাপিত হয়। গোপাল হালদার ও মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন এই উৎসব কমিটির যুগ্মসম্পাদক। "দীর্ঘ দশ দিন ব্যাপী সমগ্র ভারতের ও কিছু কিছু আন্তর্জাতিক শিল্প-সংস্কৃতির প্রদর্শন যে আমরা সে সময় রবীন্দ্রনাথের নামে জনসাধারণ্যে উপস্থিত করতে পেরেছিলাম তাতে নিজেদের একটা সার্থকতা বোধ করেছি।"—('সময় সীমায়'—গো হা; পাক্ষিক বসুমতী / ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)।

১৯মে ১৯৬২, গোপাল হালদারের মার মৃত্যু হয়। "জ্যেষ্ঠপুত্রের করণীয় যা কিছু ক্রিয়া" তিনি সম্পন্ন করেন, এবং "শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয় হিন্দু-মিশনের গঙ্গাতীরস্থ বারান্দায়।" "এই সময়টা আমার ছিল পুনর্বার ইলেকশন···এবারও টপ ভোটে জিতে পরিষদের সদস্য হয়েছি।" "এসময়টা আমার কাজ খুব বেশি

থাকত। সাহিত্য রচনা ও জীবিকার জন্য কাজ ছাড়াও ছিল 'পরিচয়ের' সুষ্ঠু সম্পাদনার দায়িত্ব এবং সর্বোপরি ছিল বিধান পরিষদের সদস্যতা ও তজ্জনিত কাজ।"—(সময়সীমায়—গো. হা' পাক্ষিক বসুমতী / ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২)। ১৯৬২-এর জুলাই মাসে গোপাল হালদার মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬২, সোভিয়েট ইউনিয়নের কিয়েভে 'শেভচেংকো স্মারক বক্তৃতা' দেন। "১৬ জুলাই মস্কোতে কনফারেন্স আরম্ভ। জুনের শেষে আমি সব ব্যবস্থা করে দিল্লী থেকে প্লেনে গেলাম। মস্কোস্থ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে ব্যবস্থা করে গেলাম লেনিনগ্রাদে। অপূর্ব সুন্দর শহর।···আপাতত মস্কো আসার ব্যবস্থা করতে হবে। গোল বাধল সেইখানেই। ওখানে প্রতি জায়গায় যেতে ভিসা লাগে।···রেড টেপিজম সেখানে বড়ো ভয়ানক ভাবে বিদ্যমান ছিল।···এরই মধ্যে পিস কনফারেন্স থেকেই প্রয়োজনীয় টিকিট ও ভিসা এসে গেল।"—('সময় সীমায়'—গো. হা ; পাক্ষিক বসুমতী / ১৬ ৯. ১৯৯২)।

"(১৯৬২-১৯৬৩) রুশ দেশে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার স্ত্রী ছিলেন অধ্যাপিকা। তখন আমাকে প্রায় এক বৎসরেরও বেশি সময় সে শহরে কাটাতে হয়। আমার সৌভাগ্য হয় লেনিনগ্রাদের সুপ্রসিদ্ধ 'পুস্কিন্ ভবন'-এর 'রুশ সাহিত্য পরিষদ'-এর গ্রন্থশালায় নিয়মিত পড়াশুনার, রুষভাষার উচ্চতম গবেষক ও অধ্যাপক-মণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয়ের।"—(রুশসাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার / ভূমিকাংশ)।

"১৯৬৪ সালে গোপাল হালদার সস্ত্রীক জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, নেদারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণকালে চেকোস্লোভাকিয়ার 'প্রাহা' ও পূর্বজার্মানীর 'হুমবোল্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন। চেক্ অধ্যাপক দুষণ জহাভিতেল ও জার্মান পণ্ডিত ওয়ালটার রুবেনের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-অধ্যাপক-গবেষকগণ গোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা জানায়—এখানেও তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন।"—(গোপাল হালদার ঃ জীবন ও সাহিত্য—অমিয় ধর / পৃ. ২৬)

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সোভিয়েট-চীন বিরোধে গোপাল হালদার সোভিয়েট পার্টির মতকেই সমর্থন করেছিলেন। 'যুদ্ধ ও শান্তির' প্রশ্নে

(১৪ জুন. ১৯৬৩ চীনের চিঠি) বা চীনের ভারত-আক্রমণকে (২০ অক্টোবর ১৯৬২) সমর্থন করেননি। ১৯৬৪, পার্টি ভাঙ্গার কালে 'সি পি. আই'-তে ছিলেন এবং আমৃত্যু ঐ পার্টির অনুগামী ছিলেন।

"আণবিক যুগে অন্তত বিশ্ববিপ্লবের নামে 'আগে বিপ্লব পরে শান্তি' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়াইয়া থাকা চলে না—লেনিনের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন কোনো জাতির স্বাধীনতার চেষ্টাকেও শান্তির নামে গৌণ করা উচিত নয়—সে প্রশ্নও ওঠে না। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়াই কৌশল স্থির করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে. শান্তির সাধনাকেই বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বশান্তিই কি কম বড় বিশ্ববিপ্লব ?"—(সংস্কৃতির বিশ্বরূপ—গো. হা' পৃঃ ১৬)।

১৯৬৬ সালে চীনে 'সাংস্কৃতিক-বিপ্লবের' নামে বীটোফেন এবং শেক্‌সপীয়র বর্জিত হয়েছিলেন। গোপাল হালদার ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন, "বিপ্লবী সংস্কৃতি তাই মানবতার সাধনা—সর্বকালের মানুষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের দায়ভাগী হয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর ঐতিহ্যসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ। সেখানে পৌঁছতে গেলে সেক্‌সপীয়র-বীটোফেনকে বর্জনের প্রশ্নও ওঠে না। যদি ওঠে বুঝতে হবে দৃষ্টি কোথাও আবিল হয়েছে। দেখা যাবে সৃষ্টিও সেখানে ব্যাহত। আর তা সাংস্কৃতিক বিপ্লব নয়. সংস্কৃতির বিকৃতি।"—('সাংস্কৃতিক বিপ্লব, না বিপ্লবী সংস্কৃতি'—গো. হা. ; 'কালান্তর' / ১৮, ১০. ১৯৬৬)।

১৯৬৮ সালে গোপাল হালদার 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থের জন্য 'সোভিয়েটল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, উক্রাইন, জর্জিয়া, উজবেকিস্তান, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন।"—(গোপাল হালদার ঃ জীবন ও সাহিত্য / পৃ. ২৬)।

১৯৬৮ সালে শ্রেষ্ঠ গবেষকের স্বীকৃতি হিসাবে গোপাল হালদার লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী স্মৃতি স্বর্ণপদক'। ১৯৬৮ সালে তৃতীয়বারও রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কনস্টিটুয়েন্সি থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সব থেকে বেশি ভোটে নির্বাচিত হন। ভোটারদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদনে লেখেন, "You will kindly recall that I have been representing this constituency for the last ten years on behalf of the C. P. I and I request you to take into consideration my activities and experiene, in and out of the Legislature…"

(Gopal Haldar, H/19, C. I. T. Building, Cal-14 ; 17th April 1968)

১৯৬৯–১৯৮০ খ্রীঃ ১৯৬৯ সালে ১৪টি বেসরকারী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ।

১৯৬৯-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপতি পদে ভি. ভি. গিরির নির্বাচন ও কংগ্রেস দলে ভাঙন। ১৯৬৮–৬৯, 'সারাভারত কিষাণ সভায় ভাঙন। ১৯৬৯-এর মে মাসে 'নকশালপন্থী'রা সি. পি, আই (এম. এল) গঠন করে। ১৯৭০-এর মে মাসে 'এ. আই. টি, ইউ. সি' ভেঙে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (সি. আই. টি. ইউ) গঠন। ১৯৭১, লোকসভা নির্বাচন। ইন্দিরাগান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত। ৯ আগস্ট ১৯৭১, ভারত-সোভিয়েট শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাঙলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা। ৩–১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১, পাক-ভারত যুদ্ধ। ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় স্বাধীন 'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ৩ জুলাই, ১৯৭২, সিমলায় ভারত-পাকিস্তান চুক্তি।

১৯৭৪, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 'সার্বিক-বিপ্লব' আন্দোলনের সূচনা।

২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৫, 'সি. পি. আই'-এর দশম পার্টি কংগ্রেস। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫, আমেরিকান বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিফৌজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন দখল করে। ২৬ জুন, ১৯৭৫, ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫, বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল।

১৯৭৭-এর মার্চে ভারতে জরুরি অবস্থা রদ। সাধারণ নির্বাচন। ইন্দিরাগান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের পরাজয়। 'জনতা পার্টি' জোটের সাফল্য এবং মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত। ১৯৭৮, ইন্দিরাগান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসে ভাঙন।

১৯৭৯, 'জনতা পার্টি'তে ভাঙন। দেশাই সরকারের পতন। 'হিন্দু-জাগরণে'র নামে দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

১৯৮০, সাধারণ নির্বাচন। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন। হিন্দুত্ববাদীদের 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বি. জে. পি) গঠন।

* ১৯৬৯–১৯৮০ খ্রীঃ—গোপাল হালদার ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ-এর কোয়ালিশন সরকারের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য করে গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৯, পশ্চিমবঙ্গ

স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিয়নের বোর্ড অব এডমিনিস্ট্রেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯-৭৩, 'ভান্ডার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৭০, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত হালদার 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' দেন। ১৯৭১-৭২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' দেন।

১৯৭২-এর মে, শ্রীযুক্ত হালদার ইউনেস্কো আহূত সম্মেলনে 'ভারতে স্লাভিস্ত সাহিত্য পরিচয়' বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য পোল্যান্ডের ওয়ারশ যান। ১৯৭২, গোপাল হালদার স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকৃতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে তাম্রপত্র গ্রহণ করেন।

১৯৭৩-এর নভেম্বর জামশেদপুর বাঙালি সমিতির আমন্ত্রণে 'সিংভূম আঞ্চলিক ভাষা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

১৯৭৪-এর ২১-২৭ জানুয়ারি, বাঙলা দেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে 'বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকা' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত 'গোপাল হালদার জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি'র পক্ষ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, কলকাতার স্টুডেন্ট হলে গোপাল হালদারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯৭৬, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সতীনাথ ভাদুড়ী বক্তৃতা' দেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত সাহিত্য ও কলা শাখার 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালে গোপল হালদার 'শরৎ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন।

গোপাল হালদার—১৯৭৫-৭৮, একটানা চার বছর এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮, দু-বছর ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি।

১৯৭৮ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতায় নার্সিং হোমে ভর্তি হন। "প্রায় জীবনান্ত যখন ঘনিয়ে এসেছিল তখন সেদিন যাঁরা পাশে ছিলেন তাঁরা অরিস্মরণীয়। আমার বয়স তখন ৭৬ পার হয়েছে।"—('সময় সীমায়'-গো. হা পাক্ষিক বসুমতী / ১৬. ৯. ১৯৯২)। "চলার পথের শেষ চলা—পরিক্রমায় এসেছে প্রান্তসীমা, পা উঠেছে সীমান্তরের দিকে। 'মন বলে—আমি চলিলাম' জীবন থেকে জীবনান্তের অন্তহীনতায়।"—('মন বলে—আমি চলিলাম'—গোপাল হালদার ; 'পরিচয়' / শারদীয়া-১৯৭৮) I ১৯৭৯ সালে আবার গুরুতর পীড়িত হন।

৮ মে, ১৯৮০ সালে গোপাল হালদার তাঁর আত্মজীবনী 'রূপনারানের কূলে'

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। এই উপলক্ষ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে ১৩. ৫. ১৯৮০ তারিখে কলকাতায় ভারতসভা হলে সম্বর্ধিত করে। মার্চ ১৯৮০তে (১৪ ফাল্গুন ১৩৮৭) মেদিনীপুরের অধিবাসীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাম্রপত্র প্রদান করে।

১৯৮১–১৯৯৩ খ্রীঃ ১৯৮১, ভারতের শ্রী হরিকোটা থেকে মহাকাশে রোহিনী উপগ্রহ প্রেরণ। ১৯৮২, 'বি. জে. পি—বিশ্বহিন্দু পরিষদে'র 'একাত্মতা যজ্ঞ যাত্রা'। স্বাধীন খালিস্থানের দাবিতে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা। ১৯৮২, জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ' থেকে 'রামজন্মভূমি' উদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা। ১৯৮২-৮৩, দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

১৯৮৪, প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার মহাকাশ যাত্রা। স্বর্ণমন্দির থেকে খালিস্থানী সন্ত্রাসবাদীদের উচ্ছেদের জন্য 'ব্লুস্টার' সামরিক অভিযান। ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪, ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীর বাসভবনে দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীবগান্ধীর শপথ গ্রহণ। ১৯৮৫, রাম-জন্মভূমি উদ্ধারের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘাত। ১৯৮৬, সুভাষ ঘিসিং-এর নেতৃত্বে দার্জিলিং-এ গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ১৯৮৭, রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের 'সতী' হওয়া এবং 'সতী'-বিরোধী আইন পাস। আর ভেংকটরামন ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

১৯৮৫-৮৭, সোভিয়েট ইউনিয়নে 'পেরোস্ত্রইকা' (পুনর্গঠন) ও 'গ্লাসনস্ত' (খোলামেলা)-এর যুগ। ১৯৮৮, 'পেরোস্ত্রইকা-গ্লাসনস্ত'-এর প্রবক্তা সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রধান গোর্বাচেভের ক্ষমতাবৃদ্ধি। ১৯৮৮-এর জুন-জুলাই, আফগানিস্থান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার। ১৯৮৮-৮৯, গণবিদ্রোহে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান।

"একটা কথা বোধহয় বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—সোস্যালিজম অর্থ দ্বন্দ্বহীন অনড় অবস্থা নয়। সোস্যালিস্ট সিস্টেমে ছোট বড় স্ববিরোধ আছে—দ্বান্দ্বিক সংগ্রাম তাতেও অনিবার্য। তার ফলে গতিময়তা এবং স্তরের পর স্তরে সোস্যালিজমের পরিণতির দিকে অগ্রগতি। তাই সোস্যালিস্ট সিস্টেমের এই গলদ দেখে চমকানোর কিছু নেই—এই রূপ ওঠানামার (zigzag) মধ্য দিয়েই ইতিহাসের পথ।"—('পেরেস্ত্রইকা—দ্বিতীয় সোস্যালিস্ট বিপ্লব'—গোপাল হালদার, 'পরিচয়'—১৯৮৮)।

১৯৮৯-এর মে-জুন, মানবিক অধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের দাবিতে চীনের 'তিয়েন আনমান' স্কোয়ারে ছাত্র আন্দোলন দমনে সামরিক আইন জারি ও গুলিবর্ষণ।

১৯৮৮-৮৯, বোফর্স কামান কেনায় দুর্নীতির অভিযোগে রাজীবগান্ধী বিরোধী প্রচার। ১৯৮৯, ডিসেম্বর নবম লোকসভা নির্বাচন, কংগ্রেসের পরাজয়। 'রাষ্ট্রীয় মোর্চা'-নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী। 'মন্ডল কমিশন' বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ১৯৯০, রাষ্ট্রীয় মোর্চায় ভাঙন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর পদত্যাগ। ১৯৯১, দশম লোকসভা নির্বাচন। ১৯৯১-এর ২১ মে, মাদ্রাজের নিকটবর্তী নির্বাচনী সভায় বোমা-বিস্ফোরণে রাজীব গান্ধী নিহত। পি. ভি. নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

১৯৯১ (আগস্ট-ডিসেম্বর), গণবিদ্রোহে সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবলুপ্তি।

১৯৯২, শঙ্কর দয়াল শর্মা ভারতের রাষ্ট্রপতি। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর, উগ্র-হিন্দুত্ববাদী করসেবকদের হাতে 'বাবরি-মসজিদ' ধ্বংস। ১৯৯২-৯৩, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কাশ্মীরে পাকিস্তানের প্ররোচনায় ভারত-বিরোধী শক্তির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ।

* ১৯৮১-১৯৯৩ খ্রীঃ গোপাল হালদার ১৯৮১ সালে (১, ২, ৬, ৮ এপ্রিল) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে 'বাঙলা সংস্কৃতির রূপরেখা' শীর্ষক 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতা' দেন।

১৯৮১ থেকে গোপাল হালদার 'রূপনারানের কূলে তৃতীয় খন্ড রচনায় হাত দেন। বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে লিখতে অসুবিধা হত এবং হস্তাক্ষরও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। ১৯৮২-১৯৮৪, পরিচয়ের কয়েকটি সংখ্যায় 'রূপনারানের কূলে'র (৩য়) কিছুটা ছাপা হয়। 'পরিচয়ে' মুদ্রিত অংশটি লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে 'পাক্ষিক বসুমতী'তে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) পুনর্মুদ্রিত হয়। 'রূপনারানের কূলে'—তৃতীয় খন্ডটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি, কারণ পান্ডুলিপির পাঠোদ্ধারের অসুবিধা।

"লেখা শেষ হয়নি, দেখাও না, প্রবাহেরও ছেদ নেই। তবে, দৃষ্টি-সীমার অন্ত আছে, অন্তত আয়ুঃসীমাতে। তার অনেক পিছনে লেখা ধুঁকেধুঁকে চলছে। আপাতত বলতে পারি, 'রূপনারানের কূলে'র শেষাংশের এটি কথামুখ। সে-প্রবাহের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ছাপার লেখায় ইতিপূর্বে আবদ্ধ হয়েছে—বিংশ

শতকের প্রথম তিনটি দশক। প্রথমে কৈশোরক', দ্বিতীয়ে 'রাজটিকা'। ক্রমগণনায় এটি তৃতীয়, 'ঝড়ো যুগের না'।'—"('রূপনারানের কূলে'—গোপাল হালদার, 'পরিচয়' শারদীয় ১৯৮২)।

১৯৮৩-৮৪, গোপাল হালদার 'বিহার বাঙলা আকাডেমি'র উপাধ্যক্ষ মনোনীত হন।

৪ ও ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৪, গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'আধুনিক বাঙলা উপন্যাস' শীর্ষক 'কল্যাণী স্মৃতি' বক্তৃতা দেন।

১৯৮৫ সালের ১২ মে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গোপাল হালদারকে প্রথম 'সাম্মানিক ডি. লিট্' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৮৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন। ২৯. ৮. ১৯৮৬ তারিখের একটা চিঠি থেকে জানা যায় গোপাল হালদারের শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটছে। "কলম ধরতে পারি না, জানেন। এবার চক্ষুও ক্ষমতা হারাচ্ছে। স্মৃতির সঙ্গে বুদ্ধি ও ভাবনা-শক্তি স্তিমিত হচ্ছে, নির্বাপিত হবার পূর্বে পারলে আপনার কল্যাণেচ্ছাতে এখনো যতটা পারি, সহায়তা জোগাই।"—(গোপাল হালদার রচনাসমগ্র—১। পৃ. ৪৩০)।

'সাহিত্যতীর্থ'-এর পক্ষ থেকে পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের মল্লিক বাড়িতে ১৯৮৭ সালে গোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

২০ জানুয়ারি, ১৯৮৯ গোপাল হালদার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন।

৬-১২ মার্চ, ১৯৮৯ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সি. পি. আই.-এর চতুর্দশ কংগ্রেসে গোপাল হালদার বিশেষ আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৯০, গোপাল হালদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন। ৪ মার্চ, ১৯৯০, ইণ্ডো—জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতি গোপাল হালদারকে তাম্রপত্র প্রদান করে। ১৭. ১. ১৯৯১ তারিখে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাম্রপত্র প্রদান করে।

২৪ জুলাই, ১৯৯২, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা জানিয়ে 'হরেন্দ্রনাথ ঘোষ স্মৃতি পদক' প্রদান করে।

দেহ অচল-অশক্ত হয়ে পড়লেও নবতি উত্তর বয়সেও তাঁর জিজ্ঞাসু মনের সক্রিয়তা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। "দুটি চোখের এবং কানের শক্তি কমে গিয়েছিল। তিনি যে পড়তে পারছিলেন না, ইচ্ছামত লিখতে পারছিলেন না—এ ক্ষোভ তাঁর

শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁকে মথিত করেছে, যন্ত্রণার্ত করেছে।"—(জীবনালেখ্য ঃ গোপাল হালদার'—অরুণা হালদার, 'মানবমন' ১৯৯৪)। সহধর্মিণী অরুণা হালদারের সাহায্য নিয়ে (শ্রুতি লিখনের) তিনি পাক্ষিক বসুমতী'তে (১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২—১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) লিখেছেন 'সময় সীমায়'। তাঁর জিজ্ঞাসু মনের শেষ সাক্ষ্য মুদ্রিত রয়েছে "ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় ও রামমোহন লাইব্রেরি" রচনায় (রামমোহন লাইব্রেরি স্মারক গ্রন্থ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)।

গোপাল হালদার দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ৪ অক্টোবর, ১৯৯৩ (৩ অক্টোবর, রাত ১২টা ৩৫ মি.) কলকাতার এস. এস. কে. এম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১০. ১১. ৯৩ তারিখে বাঙলার বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কলকাতা 'শিশির মঞ্চ'-এর স্মরণ সভায় একটি প্রস্তাবে বলেন, 'ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে প্রগতি সংস্কৃতির পুরোধা, গণ-আন্দোলনের সংগঠক এবং বাঙলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃজনশীল এক রূপকার—গোপাল হালদারের স্মৃতির প্রতি অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সভা নিজেকে ধন্য করছে।"

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গোপাল হালদারকে মরণোত্তর সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি প্রদান করে।

গোপাল হালদার রচিত গ্রন্থ

উপন্যাস	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশক
* একদা	আশ্বিন, ১৩৪৬/১৯৩৯	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা
পঞ্চাশের পথ	অক্টোবর, ১৯৪৪	পুঁথিঘর, কলকাতা
তেরশ পঞ্চাশ	জানুয়ারি, ১৯৪৫	ঐ
ঊনপঞ্চাশী	জানুয়ারি, ১৯৪৬	ঐ
ভাঙন	জুন, ১৯৪৭	ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা
উজানগঙ্গা	১৯৫০	ঐ
অন্যদিন	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭/১৯৫০	বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা
স্রোতের দীপ	জুন ১৯৫০	ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা
আর একদিন	আশ্বিন, ১৩৫৮/১৯৫১	বেঙ্গল পাবলিশার্স

ভূমিকা	ভাদ্র, ১৩৫৯, ১৯৫২	ডি এম. লাইব্রেরি, কলকাতা
নবগঙ্গা	১৩৬০, সেপ্টেম্বর ১৯৫৩	ঐ
জোয়ারের বেলা	আশ্বিন, ১৩৬১/সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	ঐ
* ভাঙনী কূল	আষাঢ়, ১৩৭৩, ১৯৬৬	প্রকাশ ভবন, কলকাতা
* ত্রিদিবা	জানুয়ারি, ১৯৭৮	সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা

* গোপাল হালদার রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১২ খানা। 'ভাঙনী কূল' আলাদা উপন্যাস নয় ; 'ভাঙন'-এর রূপান্তরিত সংস্করণ। 'একদা'—"উপন্যাসটির একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন মার্টিন নামে একজন ইংরেজ সৈনিক। কলকাতায় যুদ্ধের সময় এসেছিলেন। শ্রী পরিমল চট্টোপাধ্যায়ের তর্জমার ভিত্তিতে তিনি ১৯৪৮ সালে এই অনুবাদটি পাঠান।" ('একটি সাক্ষাৎকার'—পরিচয়, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮)। 'One day' বা 'একদা'র ইংরেজি অনুবাদটি ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ; প্রকাশক—'পিপলস্ পাবলিশিং হাউস', দিল্লী।

" 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' এই তিনখানা তিন দিনের কাহিনী নিয়ে 'ত্রিদিবা'। কাহিনী তিনটি অসংলগ্ন নয়—যদিও প্রত্যেকটি অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ, গতিমান।"—(ত্রিদিবার ভূমিকা—গোপাল হালদার)।

ছোটগল্প

ধূলিকণা (গল্প সংকলন)	অক্টোবর, ১৯৪৮	প্রোগ্রেসিভ্ ফোরাম, কলকাতা

* বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে (প্রফুল্ল হালদার) প্রকাশিত বেশ কিছু ছোটগল্প গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি।

রম্যরচনা

বাজেলেখা	অক্টোবর, ১৯৪২	পুঁথিঘর, কলকাতা
* স্বপ্ন ও সত্য	জুলাই, ১৯৫১	এ. মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা
আড্ডা	জুন, ১৯৫৬	বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা
বনচাঁড়ালের কড়চা	সেপ্টেম্বর, ১৯৬০	ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা

'বাজেলেখা' নিবন্ধ সংকলনের 'বাজেলেখা' নামাঙ্কিত রচনাটি বর্জিত হয়ে এবং 'সোনার কাঠি', 'সাধনা ও সৌখিনতা' নামে দুটি রচনা সংযোজিত হয়ে নামান্তরিত নতুন সংস্করণ 'স্বপ্ন ও সত্য'।

বহু রম্যরচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি।

প্রবন্ধ

সংস্কৃতির রূপান্তর	অক্টোবর, ১৯৪১	পুঁথিঘর, কলকাতা
বাঙালী সংস্কৃতির রূপ	মে, ১৯৪৭	অগ্রণী, কলকাতা
এ যুগের যুদ্ধ	নভেম্বর, ১৯৪২	পুঁথিঘর, কলকাতা
বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ	১৯৫৬	ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স কলকাতা
বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি	আষাঢ় ১৩৬৩/১৯৫৬	ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা
ভারতের ভাষা	১৯৬৭	লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা
বাণিজ্য জিজ্ঞাসা	১৯৬৯	?
বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা	১৯৭২	গ্রন্থালয়, কলকাতা
সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা	জানুয়ারি, ১৯৭৮	অয়ন, কলকাতা
* শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ	ডিসেম্বর, ১৯৮৫	নবার্ক, কলকাতা
জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষা সমস্যা (পুস্তিকা)	১৯৮৫	নীহাররঞ্জন রায় জাতীয় সংহতি চর্চাকেন্দ্র, কলকাতা
* সংস্কৃতির বিশ্বরূপ	মে, ১৯৮৬	মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ	ডিসেম্বর, ১৯৮৬	জিজ্ঞাসা, কলকাতা
* প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যাসাগর	১৯৯১	অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

* লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে 'নির্বাচিত রচনার সংকলন হ'ল—'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'। 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থ তিনখানির পরিমার্জিত একত্রিত সংস্করণ হল—'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ'। এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন—ড. অরুণা হালদার, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য ও অমিয় ধর। গোপাল হালদার রচিত 'প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি অমিয় ধর কর্তৃক সম্পাদিত

ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি বিষয়ে গোপাল হালদার বাঙলা, ইংরেজি ও হিন্দীতে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। এসব রচনার খুব সামান্যই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনার সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করাও এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

গোপাল হালদারের জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও রচনাপঞ্জী রচনার কাজে ড. অরুণা হালদার, অমিয় ধর, সুব্রত রায়চৌধুরী, শৈলেশ বিশ্বাস, অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সচেষ্ট রয়েছেন।

সাহিত্যের ইতিহাস ও জীবন

বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড)	১৯৫৩	এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড)	১৯৫৮	ঐ
বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা	১৯৫৯	ঐ
ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা	ডিসেম্বর, ১৯৬১	নবারুণ, কলকাতা
রুশ সাহিত্যের রূপরেখা	১৯৬৬	এ. মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা
কাজী নজরুল ইসলাম (হিন্দী)	১৯৬২	ওয়ার্ধা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (হিন্দী)	১৯৬২	ঐ
Vidyasagar—A Reassessment	1972	P.P.H. New Delhi
Qazi Nazrul Islam	1974	Sahitya Akademi New Delhi
* কাজী নজরুল ইসলাম (হিন্দী)	১৯৭৭	সাহিত্য একাদেমি, নয়াদিল্লী

* ইংরেজি 'কাজী নজরুল ইসলাম' পুস্তকটির হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদক বিনোদ ভরদ্বাজ।

আত্মজীবনী

রূপনারানের কূলে (১ম খণ্ড)	১৯৬৯	মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা
* রূপনারানের কূলে (২য় খণ্ড)	১৯৭৮	পুথিপত্র, কলকাতা

* 'রূপনারানের কূলে' (২য় খণ্ড)—গ্রন্থটি ১৯৮০-তে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত।

'রূপনারানের কূলে'—৩য় খণ্ডের কিছুটা অংশ 'পরিচয়' ও 'পাক্ষিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ; এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

গবেষণা নিবন্ধ

* A Comparative Grammar of East Bengali Dialects	June, 1986	Puthipatra, Calcutta

* "The present work is based on the study, 'A comparative Grammar of East Bengali Dialects', Originally prepared by the author as Research Assistant of Professor Sunitikumar Chatterjee. the then Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics, Calcutta University, when the author was in prison without trial (1932-37)."—(Preface—Gopal Haldar).

সম্পাদিতগ্রন্থ ঃ

সোভিয়েট দেশ	১৯৪১	
* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিষবৃক্ষ'	১৯৫০	এ. মুখার্জি এণ্ড কোং কলকাতা
" 'সীতারাম'	ঐ	ঐ
সোনার বাঙলা-১ম খণ্ড (জল-মাটি-পাহাড়)	আগস্ট, ১৯৫৬	বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা
সোনার বাঙলা-২য় খণ্ড (জনসঙ্গম)	জুন, ১৯৫৭	ঐ
সোনার বাঙলা—৩য় খণ্ড (অতীত ইতিহাস)	১৯৫৭	ঐ
রবীন্দ্রনাথ	১৯৬১	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা

* দূরসূদূরে (গল্প সংকলন)	এপ্রিল, ১৯৬৬	শ্রীগোপাল প্রকাশনী, প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম লাইব্রেরি, কলকাতা
Revolutionary Art : A Symposium		প্রোগ্রেসিভ ফোরাম, কলকাতা
বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)	১৯৭২	সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা
বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	১৯৭৪	ঐ
দ্বিজেন্দ্র রচনাসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	অক্টোবর, ১৯৭৩ এপ্রিল, ১৯৭৫	ঐ
দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ	জুন, ১৯৭৩	ঐ
কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ	অক্টোবর, ১৯৭৪	ঐ
মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড)	(১) মার্চ, ১৯৭৪ (২) জুন, ১৯৭৪ (৩) জানুয়ারি, ১৯৭৫ (৪) মে, ১৯৭৫ (৫) জানুয়ারি, ১৯৭৬	ঐ

* 'বিষবৃক্ষ, ও 'সীতারাম'-গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে অধ্যাপিকা অরুণা হালদারের বক্তব্য, "তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শ্রীগোপাল হালদারের নামের পরিবর্তে তাঁর অগ্রজ অধ্যাপক রঙ্গীনচন্দ্র হালদারের নাম মুদ্রিত আছে। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত গ্রন্থ দুখানি শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় শ্রীমতী অরুণা হালদারের সহযোগিতায় সম্পাদনা করেন।"—(পরিচয়, ডিসেম্বর ১৯৭৪)।

'দূরসূদূরে'—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার ২০টি দেশের ২১টি গল্পের সংকলন।

গ্রন্থাবলী

* গোপাল হালদার রচনাসমগ্র / ১ জানুয়ারি, ১৯৭৯ এ. মুখার্জি এণ্ড কোং
কলকাতা

* গোপাল হালদার রচনসমগ্র / ২ জানুয়ারি ১৯৯৩ ঐ

* প্রথম খণ্ডে 'একদা-অন্যদিন-আর একদিন' অর্থাৎ 'ত্রিদিবা' গৃহীত হয়েছে। "রচনাসমগ্রের অন্তর্গত 'ত্রিদিবা' পূর্ববর্তী সংস্করণের নিছক পুনর্মুদ্রণ নয়; লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত 'প্রামাণ্য শেষ সংস্করণ'।"—(প্রকাশকের কথা)। প্রথম খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন—অমিয় ধর।

* দ্বিতীয় খণ্ডে 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' ১ম ও ২য় খন্ড গৃহীত হয়েছে। এ মুখার্জী এণ্ড কোং-এর ১৯৫৩ ও ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' ১ম ও ২য় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণমাত্র।

বি. দ্র.—উপরের তালিকায় গোপাল হালদার রচিত ও সম্পাদিত স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাদি গৃহীত হয় নি।

পরিশিষ্ট—২

গোপাল হালদারের রচনার পুনর্মুদ্রণ

নটরাজের নৈবেদ্য

(১)

নটরাজের নৈবেদ্য সাজাইবার দিন আসিয়াছে,—দেখিতেছি আপনারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন নটরাজের নিমন্ত্রণ আমাদের দেশে ছিল বক্তৃতা-মঞ্চে। সেখানে তাণ্ডব-নৃত্যও দেখিয়াছি, বাক্যের গম্ভীর নাদও শুনিয়াছি; শুধু সে নৃত্যে পাই নাই ছন্দের চিহ্ন, সে বাক্যে দেখি নাই রসের লেশ। তাই, চিরকালের মত নটরাজের নিমন্ত্রণ যদি বক্তৃতামঞ্চেই নিঃশেষিত হইত, তবে সাংবাদিকের যতই উদ্ব্যস্ততার কারণ থাকুক, রসিকজনের তাহাতে উৎকর্ণ হওয়ার কোনোই ওজুহাত থাকিত না। কেননা বক্তৃতামঞ্চের গুরুগর্জ্জন সাংবাদিকের কর্ণপটাহে আঘাত করিবেই, আর সে আঘাতকে তেমনি দারুণরূপে দেশের কর্ণে না পৌঁছাইয়া তিনি অন্ন-জল স্পর্শ করেন না; কিন্তু রঙ্গমঞ্চের মৃদু-গুঞ্জন পৌঁছাইতে পারে একমাত্র রসিকের প্রাণে। মাসের পর মাস এদেশের সাংবাদিক কখনো ইঙ্গ-রাজ, কখনো বা স্ব-রাজ, হালে কখনো হিন্দু-রাজ, কখনো বা মুস্‌লিম্‌-রাজ প্রভৃতি বহুবিধ 'রাজের' আচার-অনুষ্ঠান লইয়া এতটা চীৎকার করিয়াছেন যে, ভরসা হইতেছে মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো রূপছাত্র যদি নটরাজের নৈবেদ্য সাজাইতে অভিলাসী হন, তাহা হইলে রসিকজন পরিতৃপ্ত হইবেন, এবং প্রাকৃতজনও রুচি পরিবর্তনের সুযোগ পাইয়া পরিতুষ্ট হইবেন।

(২)

কবি, চিত্রকর বা কারুশিল্পী স্বাধীন ; রসাত্মক বাক্যরচনা, বা রূপভেদ প্রমাণ ইত্যাদি কবি বা শিল্পীর নিজের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু গায়ক এবং রূপদক্ষের (আজকাল যাহাদের আমরা বলি অ্যাক্টর, তর্জ্জমা করি অভিনেতা, তাহাদেরই প্রাচীন আখ্যা সম্ভবত ছিল রূপদক্ষ) আর্ট অনেক পারিপার্শ্বিক আয়োজনের অপেক্ষা রাখে। ভালো সঙ্গত না হইলে সুগায়কের গানও আজকাল জমিতে পারে না ; নাট্যকার সুরসিক, সূত্রধর সুকৌশলী না হইলে, রূপদক্ষের অভিনয়-কলাও স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। কবির কলম ও চিত্রকরের তুলিকা যাহা-কিছু লেখে বা যাহা-কিছু আঁকে, তাহাকে সুবিবেচনার সহায়ে বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলিবার মত অবসর কবির বা চিত্রকরের আছে। কিন্তু গায়ক বা অভিনেতার অসাবধানী মুহূর্ত্তের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিশুদ্ধ করিবার মতকোনো সুযোগই তাহাদের নাই ;—সে ত্রুটি সাধারণের কাছেও তাই মার্জ্জনীয় নয়। ইহা ছাড়া, বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে না হইলে কোনো কলাবিদের কণ্ঠেই ভারতী অধিষ্ঠিত হন না,—এ কথাটি রূপদক্ষের সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী খাটে। কারণ 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্' করিয়াও কবি বা শিল্পী ভাবী কালের অপেক্ষায় থাকিতে পারেন ; কিন্তু রূপদক্ষ ও গায়কের বেলা সে সান্ত্বনালাভেরও অবসর নাই। যে শ্রোতৃ-পুঞ্জ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উৎকর্ষ দাবী করেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে তাই দাবী মিটাইতে হইবে রূপদক্ষের সঙ্গে সহমর্ম্মিতা ও সমপ্রাণতা দেখাইয়া। রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ একই ছন্দে ছন্দিত না হইলে অভিনয়-কলায় ছন্দপতন অনিবার্য। নাট্য-সাহিত্যের প্রভাব, প্রয়োগ-শিল্পের মিতাচার, শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত-সংযোগ, এবং সর্ব্বোপরি কঠিন অভিনয়-কলার পারদর্শিতা,—এতগুলি আয়োজনের সুসমঞ্জস সমাবেশ না হইলে নাট্য-রস সার্থক হয় না বলিয়াই গুণীগণ এই রসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩)

সংস্কৃত যুগের নাটক বা মধ্যযুগের যাত্রা ও কথকতার প্রাণ থেকে আজকালকার অভিনয়-কলা উদ্ভূত হয় নাই। ইংরেজি সাহিত্যের সমুদ্রমন্থনে এই সুধা আমাদের পাওয়া। বাংলা নাট্য-কলা ও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে ধারা আজও বহমান, তাহার ইতিবৃত্ত বেলগাছিয়ার বাগানের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংলা নাট্যকলার ঐতিহাসিক অবশ্যই তাহার উৎস-মুখ আরো দূরে আবিষ্কার

করিয়াছেন ; কিন্তু সেখানেও আমরা,—সেই প্রথম অচেতন উন্মেষক্ষণেও,—পাশ্চাত্য নাট্য-কলার প্রেরণাকেই কার্যকরী দেখিতে পাই। আর, বেলগাছিয়ার বাগানে যাঁহারা বাংলা নাট্যকলার সচেতন প্রকাশকে সযতন অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা যে কালিদাস বা ভাসের শিষ্য নহেন, শেক্‌সপীয়রের ভক্ত, এ কথা আমরা বিলক্ষণ জানি। সেই দিন হইতে আমরা যে নাট্যকলাকে বরণ করিয়াছি, তাহার উপাদান বৈচিত্র্যময় মানবজীবন। এই নাট-কলার প্রাণ অ্যাক্‌শন্‌,—বাংলায় যাহাকে বলা চলে 'ঘটনা'। সংস্কৃত নাট্যকলার নিয়মপ্রণালীতে ঘটনার প্রাধান্য এতটা নাই ; বরং তাহার বজ্রকঠিন গঠন-বিধানের শাসনে ঘটনাংশ বর্জ্জিত করিতেই কলাবিদ্‌ বাধ্য হন। কিন্তু, হয় রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নাহয় আমাদের রুচি ইংরেজি নাট্যকলায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। কারণ ঘটনাহীন নাটকে আজ আমাদের আসর জমিতেছে না। প্রমাণ, হালে অভিনীত 'সীতা' নাটকখানাই ধরিতেছি ; —কারণ, লিপি-কুশলতায় ও অভিনয়-কুশলতায় বাংলার নাট্যরসিকদের এই নাটকখানাই বোধহয় আজকাল বেশী তৃপ্তি দিয়াছে। —দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে শম্বুক-বধে যাত্রার উদ্যোগের দৃশ্যাদিতে ঘটনাহীনত্বে অভিনয় 'ঢিলা' হইয়া আসে ; তৃতীয় অঙ্কে শম্বুকের বধ-দৃশ্যে তাহাকে ঝাঁকাইয়া জাগাইবার চেষ্টা হয় এবং সে চেষ্টা সার্থকও হয় (যদিও বধ-দৃশ্য সংস্কৃত নাট্য নির্মাণনিয়মে রঙ্গমঞ্চে বিগর্হিত) ; চতুর্থ অঙ্কে রাম ও লবের প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) আগে পর্যন্ত স্বর্ণসীতা নির্মাণের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঘটনার অভাবে একটা জড়তা নামিয়া আসিতে চাহে। এই নাটকখানার সহিত শেক্‌সপীয়রের যে-কোনো একখানা বিয়োগান্ত নটেকের তুলনা করিলেই দেখিতে পাই, ঘটনাস্রোতের স্বচ্ছন্দ ত্বরিত গতিতে দর্শক ও শ্রোতার মন আদ্যন্ত কিরূপ সচেতন থাকে। অপরপক্ষে, দুই একখানি সংস্কৃত নাটক (যথা 'মৃচ্ছকটিক') কতকাংশে বাদ দিলে, স্বয়ং কালিদাসের মহানাটক কয়খানি লইলেই দেখিব, এককালে উজ্জয়িনীর রাজসভায় 'নাটয়িতি'র যতই আনর হউক এ যুগে বাংলার রঙ্গমঞ্চে তাহা আর নাট্য-রসিকদের তেমন তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। এ' জন্য এ' যুগের রুচিকেই সর্বংশে দোষী করাও বোধহয় সমীচীন নয় ; কারণ কালিদাসের নাটকাবলীতে কবিত্ব-সুষমার প্রাচুর্য্য থাকিলেও জীবন-প্রগতির চিহ্ন নিতান্তই অল্প। কবিত্বের সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি হয় একমাত্র পাঠকের নিভৃত কক্ষে ; কিন্তু সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ গতির আনন্দে স্পন্দিত হইতে বাধ্য।

ঘটনা-সংস্থান আধুনিক নাটকের বস্তু হইয়া ওঠাতে ঘটনা-বাহুল্য আধুনিক

নাটকের আখ্যানকে অনেক সময় অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। গ্রীক নাট্য-শাস্ত্রে উল্লিখিত 'ঐক্য-ত্রয়' পরিত্যাগ করিবার পক্ষে সুযুক্তি যথেষ্ট আছে, এবং ইংরেজ নাট্যকার সে নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলাতেই ইংরেজের মন তাহার নাটকের মধ্য দিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া ও সুন্দর করিয়া বিকশিত করিতে পারিয়াছে; কিন্তু ঘটনা-বৈচিত্র্যের নামে 'ঘটনা-ঐক্যকে' বিসর্জ্জন দিয়া কোনো কোনো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী নাট্যকার ঘটনাবাহুল্যে আখ্যানভাগ সাজাইতে গিয়া মুখ্য ঘটনাকে যথোচিত প্রস্ফুটিত করিতে পারেন নাই; ফলে, নাটক শিথিল-গ্রন্থী ও লক্ষ্যহারা হইয়া পড়িয়াছে। ঘটনা-বৈচিত্র্য কোনো একটি মুখ্য ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই সংস্থান করিতে হইবে; বাংলার কোনো কোনো নাট্যকার এই তত্ত্বটির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেয় নাই। পাশ্চাত্য নাটকের পদ্ধতিকে যখন আমরা গ্রহণ করিয়াছি তখন পাশ্চাত্য নাটকের উৎসমূল গ্রীক নাটকের পদ্ধতিকেও একটু অনুশীলন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত হইবে।

(৪)

নাট্যকলার প্রথম প্রয়োজন,—নাট্য-সাহিত্য। অভিনয়োপযোগী নাটক রসকে উৎসারিত করিবে, যুগের রুচিকে তৃপ্ত করিবে, অথচ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগ-শিল্পকে বিস্মৃত হইবে না। বাংলা নাট্য-সাহিত্য লইয়া বেশী গৌরব করা চলে না; বেশী আশা করা চলে কিনা, তাহা বিবেচ্য। নাট্যকারের শিল্প নিরপেক্ষ নয়; —রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যদি যথেষ্ট সুরুচি-বিকাশের অবসর না থাকে, তবে নাট্যকারের নিকটেও রুচির বা রীতির উন্নতি প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া, পাশ্চাত্য পদ্ধতির নাট্য-কলার পক্ষপাতী হইলেও, এ কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত যে, পাশ্চাত্য পদ্ধতির নাট্য-সাহিত্য গড়িবার মত মনোবৃত্তি বাঙালীর আছে কি না। বাঙালী প্রধানত ভাব বিলাসী জাতি; তাই, তাহার জাতীয় মন স্ফূর্ত্তি পায় প্রায়ই লিরিক্-এ বা গীতিকবিতায়। আমাদের সংস্কৃত নাটকে এবং প্রাচীন যাত্রায় তাই সঙ্গীতের ও কবিত্বের বাহুল্য। কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে এরূপ কবিত্ব ও ভাববিলাস দুই-ই অসম্ভব! আমাদের কবিত্ব ঘটনা-স্রোতকে অবাধে বহিতে না দিয়া নাটকের গতিকে রুদ্ধ করে; আমাদের হৃদয়াবেগ নাট্যকারের নিরপেক্ষতা বা নির্লিপ্ততা নষ্ট করিয়া চরিত্র-চিত্রণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। বোধহয় এরূপ কবিত্ব ও হৃদয়াবেগের তাড়নাতেই, আমাদের দেশের পরিপূর্ণ প্রতিভা সাহিত্যের

অপরাপর ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে-কোনো মনীষার সমকক্ষ হইলেও, একমাত্র নাট্য-সাহিত্যে তাহাদের সমতুল্য হইতে পারে নাই। তথাপি আশা করা যাইতে পারে যে, যখন বাঙালী নাট্যরসিকের প্রাণ ঐরূপ নাটকের অভিনয়ে আনন্দিত হয়, তখন বাঙালী নাট্যকারের মনও ঐরূপ নাটক সৃষ্টি করবার মত শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিবে।

খুব সম্ভবত আমাদের জীবন-যাত্রাপ্রণালীও আমাদের নাট্যকলাকে বিকাশের উপযুক্ত পরিসর দেয় না। সমস্ত আর্টই, বিশেষতঃ নাটক,—জাতীয় জীবনের প্রাণ-স্পন্দনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে; সে জীবন যখন শতমুখী ধারায় নাচিয়া উঠে, তখনই সূচিত হয় নাট্য-কলার সম্পদের যুগ। এ কথা, এথেনীয় নাটক সম্বন্ধেও সত্য, এলিজাবেথীয় নাটক সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু জীবন যেখানে শুকাইয়া আসিয়াছে, নাট্যকলা সেখানে প্রাণরস পাইবে কোথায়? আমাদের আধুনিক বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রা তাই নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্যের দাবী মিটাইতে পারে না; ফলে, আমাদের নাট্যকার আমাদের অধুনাতন জীবনকে ছাড়িয়া দিয়া অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটের উপরে বিচিত্র ঘটনার সংস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে আমাদের একালের জীবনের যে দৃশ্যটি আমরা নানা আকারে প্রতিফলিত করিয়াছি, তাহা আমাদের স্বদেশ-প্রেম। খুব সম্ভব, এরূপে সি-আই-ডি'র চোখে ধূলি দিয়া রঙ্গমঞ্চকে বক্তৃতামঞ্চে পরিণত করিয়া আমরা আর্টের দিক দিয়া লাভবান্ হই নাই। মনে হইতেছে বাঙালী এরূপ স্বদেশী প্রচারের মোহ কাটাইয়া উঠিতেছে।

আমাদের জীবন-বিন্যাসের জন্য যে নাট্য-সাহিত্য সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে তাহার আর একটি প্রমাণ পাই আমাদের রঙ্গমঞ্চের দৈন্যে। ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়কে বাদ দিলে আধুনিক কালে কোনো নাট্যকার সুপরিচ্ছন্ন রঙ্গরস ফুটাইতে পারিয়াছে, কিনা সন্দেহ। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর মনে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের অভাব নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সব সময়ে স্বচ্ছ নয় বিশেষতঃ বাংলা রঙ্গমঞ্চের নটদের কৃপায় তাহা এমনি বিসদৃশ ও রূঢ় আকারে দেখা দেয় যে, অনেক সময়েই তাহা রুচিকর হয় না। যে শক্তিমান নাট্য প্রতিভা হাসি ও অশ্রুর সমাবেশে হাসির করুণ ও অশ্রুকে আরো ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারেন, বাঙালী তাহাদের অনুকরণে প্রায়ই অক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। অমার্জ্জিত রঙ্গ-চেষ্টা দ্বারা গুরু-গম্ভীর নাট্য-বস্তুকে বিশ্রামের অবসর দেওয়া অপেক্ষা বোধহয় গ্রীক্ নাট্যপদ্ধতি অনুযায়ী ঐরূপ নাটক হইতে রঙ্গকে একেবারে বর্জ্জন করাও অন্যায় হইবে

না। আপনাদের পরিচিত 'সীতা' নাটকখানার করুণ দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে একটিমাত্র অর্থহীন উৎকট ভাঁড়ামির দৃশ্য আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিলে কি বিশেষ ক্ষতি হইত? বরং ঐরূপ একটি নীচুদরের হাসির দৃশ্যের রেশটা পরবর্ত্তী দৃশ্যের করুণ ঘটনাবলীর মধ্যেও জাগিয়া থাকিয়া শ্রোতার চিত্তে সে করুণ রস সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীক-নাটকীয় 'রস-ঐক্য' ভাঙিতে পারে একমাত্র তেমনিতর প্রতিভা যে প্রতিভা হ্যামলেট্-এর সমাধি-খনক, ম্যাক্‌বেথ্-এর প্রতিহারীদ্বয়, বা লীয়রেয় 'বিদূষকের' মত রঙ্গ-চরিত্রের অবতারণায় নাটকের দুঃখবস্তুকে আরও নিবিড় ও নিগূঢ় করিয়া তুলিতে পারে। তেমনিতর প্রতিভা বাঙালীর মধ্যে সুলভ নয়। এদেশে একদিকে 'ফার্স' বা বিদ্রূপাত্মক তরল নাট্য ও 'অপেরা' বা গীতিবহুল নাটিকা, এবং অপরদিকে গম্ভীর মিলনান্তক নাটকের পাশ কাটাইয়া নিছক হাস্যরসকে আশ্রয় করিয়া যে একখানি সুপরিচ্ছিন্ন কমেডি রচিত হইয়াছে,—'চিরকুমার সভা,'—একমাত্র তাহার প্রতিভাবান্ কবিই কমেডির হাসিকে সকরুণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বাঙালীর স্বাভাবিক এতগুলি অন্তরা'র সত্ত্বেও, আমরা বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী-মন নাট্য-সাহিত্যেও যথোপযুক্তরূপে তাহার ঐশ্বর্য্য সম্ভারের প্রমাণ দিতে পারিবে; কারণ বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও বাংলার জনসাধারণ তাহার সাহিত্য-সমাজকে এই জন্য তাগিদ দিতে শুরু করিয়াছে।

(৫)

প্রয়োগ-শিল্প রূপদক্ষের দ্বিতীয় প্রয়োজন। নাট্যোক্ত ঘটনার উপযুক্ত আব্‌হাওয়া যদি রঙ্গমঞ্চে বিরাজ না করে,—দৃশ্যপটে, বেশ-বিন্যাসে, কুশীলবগণের আচরণে,—তবে সে অভিনয় প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতাদের হৃদয়ও অনেক সময় স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ নাটক 'দৃশ্যকাব্য,'—শ্রাব্যকাব্য নয়;—মানুষের মনকে নাটক প্রধানত দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই ছুঁইতে চাহে। তাই নাটকে অ্যাক্‌সন্ বা 'ঘটনার' প্রয়োজন; এবং ঠিক এই কারণেই প্রয়োগ-শিল্প,—অর্থাৎ যথোচিত দৃশ্যপট বেশভূষা, এবং কুশীলবগণের চলাফেরা আদব-কায়দা প্রভৃতির উপর নাট্যকলা অনেকটা নির্ভর করে। আধুনিক কালের ফুট্‌পাতের উপর দাঁড়াইয়া বাদ্‌শা আওরংজীব জাহানারার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, অথবা আধা-মুসলমানী পরিচ্ছদ পরিয়া শ্রীরামচন্দ্র বা কোনো পৌরাণিক রাজা জম্‌কালো মুসলমানী

কারুকার্যখচিত রাজসভায় মুনিদের সাদর আপ্যায়ন জানাইতেছেন,—এ দৃশ্য অনেক সহৃদয় দর্শকের সাধু-ইচ্ছাকেও আহত করে।

বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলার অভিনয়ে গাছের গুঁড়িসুদ্ধ বৃক্ষান্তরালস্থ দুষ্মন্তকে রঙ্গমঞ্চে হাজির করিলে, তাহাতে দর্শক-মণ্ডলীকে রস-বঞ্চিত ও অপমানিতই করা হইবে। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলি আজ আবার মনে করিবার সময় আসিয়াছে। একদিন এ বিষয়ে আমাদের রঙ্গমঞ্চে যেমন দৈন্য সর্ব্বব্যাপী ছিল, আজ মনে করিবার হেতু আছে যে, পার্শী থিয়েটারের চমকপ্রদ-দৃশ্য ও অর্থহীন ম্যাজিককে আদর্শ করিয়া, আমাদের রঙ্গাধ্যক্ষগণ কেহ কেহ তেমনি ঐশ্বর্য্যের বহরে ইতর সাধারণকে চমৎকৃত করিবার চেষ্টায় তৎপর হইয়াছেন। আবার এরূপও মনে হইতেছে যে, কোনো কোনো রঙ্গাধ্যক্ষ 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' নীতি অনুসরণ করিয়া, রঙ্গমঞ্চের পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্রব্যেও আবহাওয়াকে পরিস্ফুট করিয়া অভিনয়কলা থেকে সাধারণ দর্শকের মনকে প্রয়োগকলায় অতিরিক্ত মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ দুইই পরিত্যজ্য প্রয়োগ শিল্পের মিতব্যবহার সূত্রধারের লক্ষ্য হইবে ;—তিনি দেখিবেন যেন শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কল্পনাবৃত্তি ব্যাহত না হইয়া বা একেবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া যথোচিত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছুটি পায়।—দর্শকের কল্পনা-বৃত্তিকে জাগাইয়া তোলাই প্রয়োগ-শিল্পের উদ্দেশ্য।

(৬)

শেষ কথা এবং সার কথা,—রূপদক্ষের নিজ কলা-নৈপুণ্য। শুনিয়াছি, ভারতের নাট্যসূত্রে রূপদক্ষকে ছায়াতুল্য বলা হইয়াছে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের ছায়াকে বুকে প্রতিফলিত করিয়া কান্তিমান দেখায়, 'নাট্যসূত্রের মতে রূপদক্ষও তেমনি আখ্যানস্থ কুশীলবগণের স্বরূপ নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই কারণেই অলঙ্কারশাস্ত্র অভিনয়কে 'রূপক' বলিয়া সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'রূপারোপাত্তু রূপকম্' ; নটে রামাদি স্বরূপ আরোপিত হয়, তাই অভিনয় 'রূপক'। এই রূপকত্বের বিকাশ চারিপ্রকারের অনুকৃতি সাপেক্ষ, যেমন 'আঙ্গিক' (কর-নয়নাদি ভঙ্গিমার), 'বাচিক' (কথার), 'আহার্য্য' (-বেশ-বিন্যাসাদির), 'সাত্ত্বিক' (খেদাদি সাত্ত্বিক ভাবের)। এটি লক্ষ্য করিবার মত যে, প্রধানত রূপবলা বা হিস্‌ট্রিয়নিক্ আর্ট যে সব প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করে, এখানে মোটামুটি আলঙ্কারিক তাহার সন্ধান দিয়াছেন।

কিন্তু সকল কালের সকল অলংকারিক কলা-বিচারে বসিয়া যে কথাটি বিস্মৃত হন, সেটি এই প্রাচীন আলঙ্কারিকের দৃষ্টিও এড়াইয়া গিয়াছে। সে সত্যটি এই যে, রূপ অলঙ্কারসাপেক্ষ নয়, এমন কি সর্ব্বাংশে দেহ-কান্তির উপরও নির্ভর করে না। রূপদক্ষের নৈপুণ্য যতই নিখুঁত হউক না কেন, রূপদক্ষ যদি তাহার মধ্যে একটু 'প্রাণের পরশ' না দিতে পারেন, তবে তাহা বেখাপ্পা ঠেকিবেই। অপরপক্ষে আপনার ভূমিকার সহিত যে কলাবিদ প্রাণ মিশাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার অভিনয় প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতৃমন্ডলীর প্রাণকে সেই তাড়িৎস্পর্শে সচল করিয়া তুলিবে। সকল কলাবিদেরই নিজ নিজ কলায় যে 'দরদ' ঢালিতে হয়, এই কথাটা আজ শুনিতে শুনিতে আমাদের কানে এক-ঘেয়ে লাগিলেও ভুলিলে চলিবে না যে, 'দরদ'-হীন আর্ট যান্ত্রিক ওস্তাদীতে গিয়া ঠেকিতে বাধ্য।

দরদ ফুটাইতে হইলে অভিনেতার শুধু অভিনয়শক্তির প্রাচুর্য্য থাকিলেই চলে না; তাঁহার কিছু আইডিয়াও থাকা দরকার। অর্থাৎ রূপদক্ষের মন যেমন সুপরিসর হওয়া চাই, তাঁহার কল্পনা বৃত্তিও তেমনি ব্যাপক হওয়া চাই। এক কথায়, 'হাটুরে' লইয়া অভিনয় চলে না; এবং এই কথাটি বাংলাদেশের রঙ্গ-রসিকদেরও ও রঙ্গালয়ের পরিচালকদের মনে রাখা এখন কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি ফ্রান্স্ প্রভৃতি কোনো কোনো দেশে, যেখানে সরকার কয়েকটি রঙ্গালয় পরিচালনা করেন, সেখানে অভিনেতাদের আর্ট বিষয়ে শিক্ষার এবং উপদেশের বন্দোবস্ত আছে। সেইখানে রূপকলা আয়ত্ত করিলে পর, সরকারী রঙ্গালয়ে প্রবেশের অধিকার তাঁহাদের জন্মায়। আমাদের দেশে বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বে স্বদেশী নাট্যকলা গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা সন্দেহ। সরকারের সহকারিতা আমরা এ ক্ষেত্রে যাৎঞাও করি না। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সম্বন্ধে জন-সাধারণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, এবং অভিনেতৃগণ নিজেদের আচরণে ও কলাজ্ঞানে সেই পরিবর্ত্তনে সহায়তা না করিলে, সকল সময়ে সকলক্ষেত্রে আমাদের প্রার্থিত আদর্শানুরূপ রূপদক্ষ পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই, বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি সৌখীন নাট্য-পরিষদের স্থান রহিয়াছে; এবং এই কারণেই অনেকাংশে এ দেশের শহরে ও পাড়াগাঁয়ে এত অগণ্য 'সৌখীন থিয়েটার ও 'এমেচর অ্যাক্টরের' দর্শন মিলে। এই সব সৌখীন নাট্যপরিষদ নাট্যকলায় প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। তথাপি ইহারি মধ্যে এমন দুই একটি মণ্ডলী আছেন, যাঁহারা বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে নবযুগের সূচনা করিয়াছেন—যেমন, কলিকাতা 'য়ুনিভাসিটি ইনিস্টিটিয়ুট্।'

সাধারণ রঙ্গালয়ের মত ইঁহাদের লাভলোক্সানের খোঁজ লইতে হয় না ; তাই ইতর সাধারণের রুচিকে প্রাধান্য না দিয়া কেবলমাত্র আর্ট হিসাবে নাট্যকলার অনুশীলনে ইঁহারা যত্নবান হইবেন,—বাংলার নাট্যরসিকগণ ইঁহাদের নিকট এরূপ দাবী করিতে পারেন।

গুণবান্ অভিনেতার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার রূপবান্ হওয়াও প্রার্থনীয়, এ কথাটি ভুলিলেও চলিবে না। এই বিষয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ সজাগ হইয়াছেন, কিন্তু সৌখীন থিয়েটার কোম্পানিগুলি এখনো যত্নবান হন নাই। দৈহিক সৌন্দর্য অভিনেতার পক্ষে এক অপরূপ সম্পদ। পাশ্চাত্য দেশে এই সম্পদ যে কি দরে বিকায়, তাহা মাঝে মাঝে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমঝ্দাররা যাঁহাদের ঘোষিত করেন, চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষদের নিকট সে সব রূপসীদের কদর হইতেই আমরা জানিতে পারি। অবশ্য, ভূমিকার সহিত সঙ্গীত থাকিলে, যিনি রূপবান্ নন, তিনি কখনো কখনো আপনার রূপহীনত্বকেই সার্থক করিতে পারেন। ভুঁড়ি অভিনেতার পক্ষে বিঘ্ন হইলেও 'ফল্স্টাফের' ভূমিকা অভিনয়ে তাহা মানাইয়া যায় ; কিন্তু কোনো ভুঁড়িওয়ালা কিরূপ-'রোমিও' হইবে, তাহা আর না নির্দেশ করিলেও চলে।

সাধারণত শ্যামবর্ণের উপর আমরা প্রায়ই বিরূপ ; আমাদের আদর্শ অনেকটা সাহেবী কটা রং। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়িয়াছি যে, শ্যামরূপ আসলে শ্বেতরূপের চেয়ে উৎকৃষ্ট,—কারণ, শ্বেতবর্ণে আছে মরুভূমির ঊষরতার চিহ্ন, শ্যামবর্ণে আছে প্রাণময়ী শ্যামলা ভূমির প্রাণের ছাপ। কথাটা সর্বাংশে হয়ত কবির কবিত্ব নয় ; তথাপি এ কথা ঠিক যে, অনেক ঘনশ্যাম নটবরের দেহে অঙ্গরাগের সমস্ত অঘটন-ঘটন—পটীয়সী শক্তিও ব্যর্থ হইয়া যায়। রুচিবিকারের জন্যই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, রঙ্গমঞ্চে তাহাদিগকে 'সুন্দর' দেখিতে আমাদের দৃষ্টি অসমর্থ।

(৭)

বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে অজে আমূল পরিবর্তনের ঢেউ আসিয়াছে ; —নাচঘর আজ নাট্য-মন্দির হইতে সচেষ্ট। বাংলাদেশের সর্বত্র যে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহারই একটি কম্পন লাগিয়াছে আমাদের চির-ঘুমন্ত ভরতমুনির গায়ে। মনে হয় বৃদ্ধ ঋষির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

কিন্তু বাংলার নব রূপকলাকে সার্থক করিতে হইলে আরও দুইটি জিনিস

অদূরে ভবিষ্যতে চাই। প্রথমত,—নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি, যাহাতে রসকে আশ্রয় করিয়া ট্রাজেডি কমেডি প্রভৃতি রচিত হইবে; এবং নিতান্ত গতানুগতিক হাসি ও গানের স্বাদহীন খিচুড়ী পাকানো হইবে না; দ্বিতীয়ত, ভদ্র-সন্তানদের ন্যায় ভদ্র-মহিলাদেরও এই রূপ-কলার অনুশীলনে যোগদান। প্রথমোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; শেষোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথমেই বিরোধ ঘটিবে। কারণ এ দেশ পর্দ্দার দেশ। পর্দ্দা সম্পর্কে আপনাদের কারো কোন মোহ না থাকাই ভালো। বাংলা দেশের জীবন এই পর্দ্দার দৌলতে অনেক সৌন্দর্য ও মাধুর্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; কিন্তু এই পর্দার জবরদস্তি ঘুচাইয়া মহিলাগণ ভারতীকে বিদ্যামন্দিরে যেরূপ বরণ করিতেছেন, নাট্যমন্দিরেও সেরূপ বরণ না করিলে বাংলার নব রূপকলা পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হইবে না।

এই পরিবর্তনে আপত্তি হওয়ার আর একটি কারণ অবশ্যই যে, রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। কোনো কালের কোনো রঙ্গশালার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। আর আজকালকার কথা ছাড়িয়া দিলাম,—এ যুগের চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিবাহ-ভঙ্গ, বিবাহের চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি লীলাখেলার হিসাব রাখা, ঐ সব বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ সতর্ক তাঁহাদের পক্ষেও অসম্ভব। তথাপি বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে সুরুচির (সুনীতির না হউক) প্রসার বাঞ্ছনীয়। নাট্য-মন্দির এ বিষয়ে বিদ্যা মন্দিরের শীলতা ও ভদ্রতার অনুকরণ করিলে, মহিলাদের পক্ষে যোগদান অসম্ভব হইবে না। উপযুক্ত অধ্যক্ষের নেতৃত্বে মাঝে মাঝে মহিলারা এরূপ যোগদান করিয়াছেন।

নাচঘর নাট্যমন্দির হইতে চলিতেছে। সত্যসত্যই তাহার এ শুভ প্রয়াসে বাংলার সৌখিন নাট্য-পরিষদগুলি সহায়তা করিতে পারে। এইদিকে এরূপ কোনো কোনো নাট্য-সমাজ ইতিপূর্বেই উপযুক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; বাংলার অন্যান্য নাট্য-সমাজও তাহাদের অনুকরণে চেষ্টিত হউন।

সৌখীন নাট্য-পরিষদের আরো একটি কর্ত্তব্য আছে। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের মত নিতান্ত ঘটনা বৈচিত্র্যময় নাটক লইয়াই ব্যস্ত না থাকিয়া, নব নব পদ্ধতির নাটক অভিনয় করিয়া দেশের রুচি ও মত গঠনে তাঁহাদের অগ্রসর হইতে হইবে। 'মৃচ্ছকটিক', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক বাংলা ভাষায় অভিনয় করিলে অনেক রসিকচিত্তে আজকাল হয়ত উপভোগ্য হইবে। বিলাতী সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের মত প্রাচীন ও বিস্মৃত নাটকগুলিকে সঞ্জীবিত করিবার ভার

আমাদের দেশের এ সব সমিতিই গ্রহণ করিবেন; কারণ, সাধারণের উপেক্ষা অনাদরে তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনো কারণ নাই। গত যুগের নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলিকে একবার এ যুগে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। নাট্য-সাহিত্যে যে নব নব পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে, তাহাও যাচাই করিতে হইবে আপনাদের ন্যায় সৌখিন নাট্য-সমাজেরই। 'বাস্তব'—নাট্যের বাহ্য ঘটনার বাহুল্যকে উপেক্ষা করিয়া আধুনিক কালে নাট্য-সাহিত্য অন্তর্ম্মুখীন হইয়া উঠিতেছে;— কোথাও রহস্যনিবিড় কুয়াসার অস্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া তাহার কারবার, কোথাও বা মানব-অন্তরের অন্তর্লোকস্থ গোপন-চেতনার গতি ও ভঙ্গিমার রূপকে আভাস দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। এইরূপ বিদেশীয় নাট্যগুলিকে অনুবাদ করিয়া অভিনয় করা অসম্ভব হইলেও, স্বদেশীয় বিচিত্র সৃষ্টিগুলিকে রঙ্গমঞ্চে কতদূর সার্থক করা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'গৃহপ্রবেশ' তাহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের আবেদন লইয়া উপস্থিত হইলেও গৃহীত হইবে না। কারণ এরূপ নাটককে উপভোগ করিবার মত সৌন্দর্য্য-বোধ, শিক্ষা ও সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু সৌখীন নাট্য-সমাজের অভিনয়ে নির্বাচিত রসিক জনের কাছে হয়ত 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি সুকুমার নাট্য-সম্পদগুলি তৃপ্তিদায়কই হইবে,—'চিত্রাঙ্গদা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বাহ্যবস্তু-মূলক নাটকগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও।

কেবলমাত্র সাধারণ ও সচরাচরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ না করিয়া বাংলার সৌখীন রূপদক্ষগণ অফুরন্ত আনন্দ ও অপরিসীম দুঃসাহসে ভর করিয়া লুপ্ত-রেখা অতীত যুগের পথে অথবা চিহ্ন-হীন নব-নব পথে কলালক্ষ্মীর অভিসারে যাত্রা করিবেন, ইহাই আজকার সন্ধ্যায় আপনাদের নিকটে আমাদের নিবেদন।

সবুজপত্র ॥ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত। নোয়াখালি সবুজ সংঘের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।

সোফা ও খোঁপা

I sing the Sofa,
তার সনে জড়িত যে খোঁপা।
চিরদিন রহিবে স্মরণে
ধরণে গড়নে আর নড়নে-চড়নে।

তোমারে প্রণমি তাই কবি কাউপার !
(বহু কাউ করিয়াছি পার
হোটেলে টেবিলে
শূন্য ট্যাঁকে ফিরিয়াছি শোধ করি বিলে
তুলিয়া ঢেকুর, কিন্তু) তবু
ওহে মহাকবি ! কভু
ভাবিনি গাহিতে হবে সোফার গীতিকা,
কিংবা হবে কথিকা-বীথিকা
গদ্য কাব্যে (মিল নাহি জুটে),
কাটিয়া কাব্যের 'রুট'এ
রচিব অসম ছন্দে
যথা—'মেঘদূতী' শ্রীনরেন্দ্রে
রচিয়াছে বিষম সে কাব্য 'বসুধারা'—
তেমতি এ অভিনব সোফাই-ফোয়ারা।

তুমি এসো এসো বাণী ! আধুনিক বেশে,—
Medias resএ
যদিও হইবে সুরু সোফার এ গীতি,
—মহাকাব্য রীতি

আধুনিক হইলেও মানি ;
কিবা তাহে হানি ?
এসো এসো বাণী ।

দক্ষিণের মত্ত সমীরণ
করি আহরণ
পথের পুঞ্জিত রজঃ বালিগঞ্জে
ক্ষ্যাপাইয়া অন্ধে খঞ্জে
মায়াকুঞ্জে প্রবেশিয়া উড়াইছে ছলে
দুয়ারের চেলাঞ্চলে
ব্যারিষ্টার 'ভাসোর' ভবনে ।
মধুর পবনে
আধা উড়া সাদা পর্দ্দার
(খবর্দ্দার ! নহে পরদার)
চতুর স্পর্দ্ধার
এই ফাঁক টুকু বুঝে নবীন তরুণ
'মিটার করুণ'
হেরিল—সহস্রতম বার
হেরিয়াও যার
পায় নাই রূপের সীমানা—
তনু-দেহখানা
বিছাইয়া আধ অযতনে
(তার মানে, অতি সযতনে)
হেলাইয়া বাঁকা গ্রীবা, এলাইয়া বাহুখানি,
আ-স্কন্ধ বিমুক্ত পাণি,
'প'্যাস নে' শোভিত আঁখি
ডান-হাতে-খোলা-গ্রন্থে রাখি,
নাকের সম্মুখে ধরা
একবারও-নাহি-পড়া

'ফেভরিট' লেখা মাঝে নিমজ্জিতা
পুনর্ব্বার। অযত্ন-সজ্জিতা
তার আয়াসের গড়া সেই অযতন কেশে,
সুপুষ্ট খোঁপার কেশে,
উড়ু উড়ু চূর্ণ চুলে,
গ্রীবা মূলে
কি যেন নবীন স্বপ্ন প্রেরণা নবীন
মিটারের প্রাণ বীণ
ঝঙ্কারিয়া
ধনু সম তনু তার টঙ্কারিয়া,
আধা-উড়া পর্দার পারে
জ্যা-বিমুক্ত তীর সম তারে

উড়াইয়া আনিল ফেলিয়া, যেথা তার বিয়াত্রিস্‌—
—বর্ষ ত্রিশ
বসন্তের মণ দুই লতাখানি সম
ভারসহ মনোরম
সহকার অপেক্ষায়—'রহিয়াছে বসি'
আঁটিয়া জাঁকিয়া ধ্বসি'
ভাসো-ভবনের সেই পরিচিত সোফা—
মাথা-জোড়া খোঁপা
ভাসোর দুহিতা গোপা !

তারপর ? উর দেবী ! উর ইউরেনিয়া
এ যুগের, প্রাণ-উড়নিয়া
ছন্দ লয়ে এসো অয়ি ! ডিকেণ্টার সাহিত্যের নার্স
অয়ি বাণী ! ড্রয়িংরুম্‌ foreign waters
এই বাঙালের আগে
চিত্তে তায় দ্বিধা জাগে

কি কহিতে কিবা কহি,
আইস্‌ক্রীম কই 'দহি'
লজ্জা পাই লজ্জাতীত ইঙ্গ-বঙ্গ মাঝে
অথবা আপ-টু-ডেট্ সাহিত্য সমাজে
আধুনিকী উর্বোনিয়া !
কাজ নাই risk নিয়া,
সপ্তম সেই স্বর্গে ওড়া-দুরাশায়
কেন ডানা মেলি ? যে ভাষায়
কথা চলে তাহাদের মাঝে
জানি না যে,
জানিনা সে 'এটিকেট্' 'ইডিয়ম্' ।
তাই ভাবি, করি মীডিয়ম্
তোমাদের, চোস্ত
ড্রয়িংরুম্-বাণী যারা করেছ দোরস্ত,
রচি এই ভরসায়
তোমাদের গীতিকথা স্বকীয় ভাষায়
তোমাদের—ওহে সোফা !
ওগো খোঁপা !

শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৩

কবিতার রাত

কথা বলতে বলতে মাঝখানে আমি থেমে পড়লাম। —চাঁদ! লাল থালার মত চাঁদ! জানালার দিকে চোখ গিয়েছিল। গরাদবসানো যে জানালা ভাগ্যক্রমে ছিল আমার সামনে। তার মধ্য দিয়ে চোখ সহজভাবে গিয়েছিল,—কথাটা আর শেষ হল না।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—কি?

—চাঁদ।

এগিয়ে এসে বন্ধু পাশে বসলেন, বললেন,—

—পূর্ণিমা বুঝি, অঘ্রাণের পূর্ণিমা।

চাঁদ। থালার মতো চাঁদ পূর্ণিমার, গোল আর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ। ঠিক আমার চোখের সামনে, একেবারে চোখের বরাবর—সামনেকার ঘাসে ছাওয়া আঙ্গিনাটুকু পেরিয়ে, পুকুরের ওপারে, অশ্বত্থগাছটি যেখানে তার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছে সেখানে,—আমার চোখের বরাবর। উঁচুতে নয়, অশ্বত্থের গোড়াটা যেখান থেকে দ্বিধা হয়েছে—সেখানটায়; দুটো প্রকাণ্ড ডাল মাঝখানে রচনা করছে একটি ফাঁক। সুন্দর এই অবকাশটুকু, দুই শাখার মাঝখানে নিভৃতে একখণ্ড নীল আকাশ, গাছের ডাল যেন তাকে ঘিরে আপনার করে নিয়েছে। আর আর ঠিক তারই মধ্যখানে কখন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো তার রঙ লাল, আকার বিস্তৃত, সোনার থালার মত।

বেশিক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকা চলবে না। বেশিক্ষণ পাওয়াও যাবে না চাঁদকে দেখতে। প্রকাণ্ড আমার জানালা। আসলে এককালে তা দরোয়াজাই ছিল, যদিও গারদ-বসানো। কিন্তু একটু পরেই অশ্বত্থশাখার বাহুবন্ধন-মুক্ত হয়ে চাঁদ ওপরে উঠে পড়বে ; আর একটু ওপরে উঠতেই তাকে তখন ঢেকে দেবে অশ্বত্থের ঘনপাতা। সে পাতার ফাঁক দিয়ে অবশ্য অজস্রধারে জ্যোৎস্না ঝরে পড়বে গাছের তলায়। ওখানকার সেই লাল সুরকির ওপর আলো-ছায়ার বিচিত্র মোজেইক্ কাটা হবে। কিন্তু আমার ওখান থেকে তা বড় দূরে। মাঝে এই ঘাসে ভরা আঙিনা, তারপর ওই পুকুর, তারও-ওপারে সেই অশ্বত্থগাছ। আমি অশ্বত্থতলার কিছুই দেখতে পাব না। দেখব ঝাপ্‌সা কালির পোঁচের মতো তার তলাকার ছায়া, আর আকাশের পটে আঁকা তার সিল্যুএট্-করা পত্ররাজি। আমি কিছুই দেখতে পাব না। তখন চাঁদও আমার সামনে থেকে সারা রাতের মত হবে পত্রান্তরালে আচ্ছাদিত। বেশিক্ষণ এই সোনার থালার মতো গোল চাঁদ দেখা যাবে না। বেশিক্ষণ আমারও এই পঁচিশজনের সরকারী ঘরে এভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকা চলবে না।

তবু উঠতে ইচ্ছা করে না। একটু পরেই তো চাঁদ আড়ালে পড়ে যাবে। তবে ঘণ্টা দেড় বাদে আবার আমার চোখের সামনে চাঁদ আর একবার এসে দাঁড়াবে। এই জানালার সামনে আবার তার প্রকাশ হবে—অশ্বত্থ-শীর্ষের উপর দিয়ে দক্ষিণের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে। তখন অনেকক্ষণের মতো তার তের্‌ছা আলো এসে পড়বে আমার শয্যাপার্শ্বে, আমার আসনের ওপর। ক্রমে তা সরল-রেখায় সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তারপর তা আমার শিয়র থেকে নেমে জানালার তলায় আসবে। সেখান থেকেও পিছিয়ে দাঁড়াবে, একবারে ঘর ছেড়ে যাবে। বাইরে তাকিয়ে দেখব তখনো অজস্র জ্যোৎস্না, কিন্তু ব্যারাকের কোণের দোতলার কার্ণিসের চূড়ায়ও আর চাঁদের চিহ্ন নেই। আকাশভরা জ্যোৎস্না—তা বুঝতে পারব, আঙিনাভরা তার উছল জোয়ার দেখতে পাব, কিন্তু চাঁদ আর চোখে পড়বে না। আমার জানালার কাছ থেকে তখন সে বিদায় নিয়ে গেছে—এ রাত্রির মতো। এই পূর্ণিমার রাত্রির মতো সে বিদায় চূড়ান্ত।

লাল আর গোল, সোনার থালার মতো এখনো এই পূর্ণিমার চাঁদ। সবে সূর্যাস্তের সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। তাকে এমনিভাবে বেশিক্ষণ আর পাব না ; কিন্তু তবু তার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার সাহস হচ্ছে না। সরকারী ঘর, পঁচিশজনের মাঝে আমি একজন। আমি ধরা পড়ে যাব, আমার দিকেই

সবাই তখন তাকিয়ে থাকবে। আমার নিজেরও মনে হবে, আমি যেন অপরাধী, অশোভন ভাবে কি একটা জিনিস ভোগ করছিলাম। অশোভন ভাবে—দশের মধ্যে থেকে কোনো একটি রমণীর মুখপানে তাকিয়ে থাকা যেমন অশোভন, তেমনি এই জিনিস। অথচ তেমনি দুরন্ত ওর আকর্ষণ। আমি এদিকে-ওদিকে দেখছি—চোখে আমার সশঙ্ক দৃষ্টি, বুঝি কেউ ধরে ফেললে। আর তারই ফাঁকে এক একবার তাকাই ওই চাঁদের দিকে। বহু প্রতিবেশীকে ফাঁকি দিয়ে আর বহু প্রতিবেশিনীর তীব্র দৃষ্টি সহ্য করে যেমন দেখতে হয় কোনো সুন্দর মুখ, তেমনি তেমনি ভাবে আমি এক এক ঝলক দেখে নিচ্ছি এই পূর্ণিমার সদ্য-উদিত চাঁদকে। জানি একটু পরেই এ আড়ালে চলে যাবে—এখনই তো কতকটা উঠেছে ওপরে, পান্ডুর হয়েছে তার রঙ্; সংকুচিত হয়েছে আকার। তবু, অকুণ্ঠিতভাবে তা আমি দেখতে সাহস করছি না।

এ মোহ বড় রূপজ; খুব বেশি ইন্দ্রিয়গত। এই জ্যোৎস্না রাত্রির চারিদিকেই একটা লীলা আর লাস্যের আভাস; কেমন একটা কোমল ইঙ্গিত। ভালো সিল্কের কাপড়ের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে হাতের আঙুলের ডগায় ডগায় যেমন একটি ইন্দ্রিয়গত বোধ জাগে, এও তেমনি। সারা দেহ শিউরে ওঠে। নরম স্পর্শ—ভালো সিল্কের মত নরম, তরুণীর চুলের মত নরম। তেমনি এই জ্যোৎস্নার আভাও,—নবীন যৌবনরসের মতো, নতুন পাতার মতো, ফুলের পাঁপড়ির মতো। অনেক রহস্য তার পেছনে, অনেক অনাবিষ্কৃত অনুভূতি, অনেক উদ্বেল আনন্দ।

ধন্যবাদ এই জেলের জানালাকে—এমন রাতেও যখন জেলে থাকতেই হবে, থাকতে হবে এই ব্যারাকের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। তবুও শুনতে পাচ্ছি জ্যোৎস্নার গান! মানুষের চক্রান্ত মিথ্যা করে শুনতে পাই দেবতার ডাক। যেন কোন্ দূর-দূরান্তরের এক পৃথিবীছাড়া আকাশ-ঝরা ডাক আজ শোনা যাচ্ছে—

Come away, O human child!
To the waters and the wild,
With a fairy hand in hand.
For the world's more full of weeping than you can understand...
'To the waters and the wild,' 'To the waters and the wild'—

কোন্ সমুদ্র-সৈকতে, কোন্ অরণ্যের সভাতলে এই ডাক? কোন্ আকাশে,

কোন্ দিগন্তে? আমি খুঁজছি কোন্ মোহিনীকে, La Belle Dame Sans Merci? আমি উন্মাদ নাইট্-এরাণ্ট নই, আমি পাগ্‌লা মেহের আলী নই—এ যুগের নির্বিকার পাষাণের বন্দী, জেলখানার জীব—এমন ডাক আমার কানে পৌঁছুলে চলবে কেন?

আজকের রাতে আমার যে হঠাৎ কবিতা পড়তে সাধ হচ্ছে! মনে পড়ছে গান আর কবিতা। আজকের মতো রাতে আমার তাই মনে পড়ছে কীট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথ। গুঞ্জন করতে ইচ্ছে করছে ইয়েটস্ বা শেলি। আজ কবিতার রাত। দেখছি আর মনে হচ্ছে—আমারও যেন কবিতার দিন যায় নি। কবিতার দিন—কার মনে হবে আজ রাতে যে তা শেষ হয়েছে তার জীবনে? মনে হয়—আমারও তা যায় নি। যায় নি? ক্লাসে আমায় কবিতা ব্যাখ্যা করতে হয়,—শব্দের অর্থ বলে বোঝাতে হয় নাইটিঙ্গেল, আর ইণ্ডিয়ান্ সিরিনেড্। তারপরে আর আজ মনে করতে পারি কি—In such a night…? মনে করতে পারি কি—One word is too often profaned? তাই আর আজ কীট্‌স্—পঁচিশের পাঁচিল পেরোতে যে পারে নি জীবনে, আর পঁচিশের এ পারের কোনো ছেলে যাকে চেনে না—সে কীট্‌স্ আমার হাতে মানবে না। এমন রাতে কার হাতে না মানায় কীট্‌স্? এ রাতের রূপ চোখে দেখ্‌লে কে বলবে—না, 'কবিতার রাত' শেষ হয়েছে, রোমান্টিসিজমের যুগ আর নেই।

সত্যি, আজ কবিতার রাত। এমন রাতে কবিতা আর গানই ভালো মানায়। এমন রাতে কেউ গল্প লেখে না। গদ্য পড়েও না। পড়তে পারে গদ্য—সে কবিতার মত গদ্য; হয়তো তা 'ক্ষুধিত পাষাণ', হয়তো তেমনি আর কোনো গল্প, 'ডাক্তার' বা Green Mansions, অমনি কিছু উপন্যাস—'কপালকুণ্ডলা'র মতো যার প্রাণ মূলত কাব্য। মোট কথা—এ রাত কাব্যের রাত, গদ্যের নয়। উপন্যাস দিয়েও আজকের রাতকে বোঝা যায় না। এ রাতে ঘটনা নেই। আমরা জটিল চরিত্রের প্রকাশ আর বিকাশ দেখতে চাই না—পেতে চাই একটি বিশেষ নিগূঢ় অনুভূতিকে। সে অনুভূতি দিতে পারে কবিতা, দিতে পারে সঙ্গীত, দিতে পারে চিত্রও। এ সবেই আমাদের মন আজ কথা ক'য়ে উঠতে পারে—কবিতায় বা কাব্যধর্মী কোনো প্রকাশে, যাতে অন্তরাবেগ ভাষা পায়, ভাষা পায় অতি নিগূঢ় এই অনুভূতি—যার সঙ্গে চাঁদের পরিচয় কত অরণ্যে আর কত সমুদ্রে, কত গুহায় আর কত বনান্তে, কত আসঙ্গ-উৎসবের উদ্বেল আনন্দে আর কত মিলন-বাসনার বিস্মৃত উল্লাসে, কত নিয়মহীন উদ্দামতায় আর কত নিয়মবাঁধা উৎসবে, কত

পূর্ণিমা রাতের রাত-জাগায়, আর কত জ্যোৎস্না ভরা পান-সভায়,—কত বার এমন চাঁদের স্পর্শে স্পর্শে সেই আমাদের আদিম অনুভূতি বারে বারে ছাড়া পেয়েছে, বারে বারে হয়েছে নবীনতর, বারে বারে হয়েছে বিচিত্রতর। এই জেলখানার জানলার মধ্য দিয়ে চাঁদ তাকে যখন আবার ছুঁয়ে জাগিয়ে তুলল, সে আবার কথা খুঁজছে—সেই আদিম অনুভূতি—জৈবী প্রেরণাই—এ রাতেও আবার কথা খুঁজছে। কিন্তু কথা খুঁজছে সে ১৯৩৫-এর ভাষায়—নতুনতম, বিচিত্রতম তার দাবি। ফুরোবে কি করে তবে কবিতার দিন, রোমান্টিসিজমের যুগ? তা ফুরোয় নি। চিরন্তন সেই প্রাণাবেগ, সেই আদিম অনুভূতি—সেই রূপের মোহ, সেই ভালোবাসা, সেই রহস্যবিবশতা।

আজও মানুষ ভালোবাসছে। আর ভালোবাসলে সে চায়—তার গহন অনুভূতিকে বাণীরূপ দিতে। সত্য বটে, জানি আমরা সে ভালোবাসারও গোড়ার কথা। তা একটা জৈবী সংস্কার—একটা প্রাণপিপাসা। এ কথা আরও বেশি করে জানত আদিম মানুষ। আমার মধ্যে যে আরও বিচিত্র সেই জৈবী সংস্কারই যা হয়েছে আবার মানবসংস্কার; আমার যৌনবাসনা,—সেও যে আজ একই কালে জীববৃত্তি আর সংস্কৃতির যোগফল: 'sex relation=biology plus culture.' সে প্রাণবৃত্তিই আজ তাই বলে দেয়—"আজ তোমার ফুল চাই, গান চাই, চাই রূপ রস গন্ধ শব্দের আয়োজন।" 'Without Cherry Blossoms'-এ দিনের বাণী ফুটবে না—বৃথা হবে এমন রাত। মিলনের রাতে মস্কোতেও চেরি ফুল চাই—জ্যোৎস্না রাতে জেলেও চাই কবিতা। কবিতা ছাড়া বৃথা হবে জেলের এ রাতও।

রোমান্টিসিজমের দিন যায় নি—কবিতার রাত শেষ হয় নি। জীবনটা রোমান্টিক কিছু নয়—কিন্তু জীবনে রোমান্টিক রাত আছে। তা'ই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। বিষয়বস্তু দিয়েই তো কাব্য শেষ হয় না—পরী আর চাঁদ আর ফুল আর সূর্যাস্ত—এসবই কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। কবিতার বিষয়বস্তু এসবও হয়, চেস্টারটনের হাতে হয় গাধা, রস-এর সামনে হয় ম্যালেরিয়ার বীজাণু। কিন্তু আসল হল ওর ভাববস্তু আর কল্পনা; তা অভিজ্ঞতা-মাখা, অনুভূতি-রাঙা। বস্তুর থেকে বড় এ বাস্তব—অর্থাৎ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে বাস্তবের যেখানে সম্বন্ধ সক্রিয়—বস্তুকে আমি নতুন করে তুলছি, বস্তুও আমাকে নতুন করে তুলছে—একটা সক্রিয় সম্বন্ধ চলেছে। তাতে আদিম প্রেরণা নতুন প্যাটার্নে ফুটছে। জ্যোৎস্নাকে জেলের জানলায় বসে ১৯৩৫-এ আমি গ্রহণ করছি, জ্যোৎস্নাও

১৯৩৫-এর আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলের জানালার পথে নতুন করে তৈরি করছে। তার ভাষা চাই—কিন্তু সেই ভাষা আবার ১৯৩৫-এর মতো হওয়া চাই—১৯৩৫এর এমনি রাতের মতো। তাই কবিতা পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, মনে পড়ে কীট্‌স্ আর কোলরীজ ব্লেক্ আর ইয়েট্‌স্।

একেই আমরা বলি রোমান্টিক ভাব, এই কাব্যধর্মী মনোভাব। এ জন্যই খাঁটি রোমান্টিক রচনা গদ্যে সম্ভব নয়। এমন রাতে গদ্য পড়ার কথা আমারও মনে হয় নি যে আমি গদ্য-পড়া-মানুষ। হয়তো পড়তে পারি, কিন্তু আসলে তাও কাব্যধর্মী গদ্য—অর্থাৎ ছন্দে লেখা না হলেও কবিতাই। সব 'গদ্য' গদ্য নয়—সব কবিতাও তো কাব্যধর্মী নয়। কবিকঙ্কণের পদ্যে আছে উপন্যাসের উপযুক্ত চরিত্র-চিত্র,—বাংলায় লেখা প্রথম উপন্যাস বোধ হয় তা। পোপ্-ডারুইন-হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-কবিতায় আছে ছন্দে-ধরা বিদ্রূপ। কাব্য তাদের ধর্ম নয়। হোগার্থের ছবির মতো, চরিত্র ;—অনুভূতির ব্যঞ্জনা নয়,—চরিত্রের চিত্রালয়। অবশ্য হয়তো কাব্যরূপ থেকেও রসের চিত্ররূপ বেশি স্থায়ী হবে—সেক্‌স্‌পীয়র যেমন স্পেনসার কীট্‌সের ওপরে থাকবেনই। এজন্যই বঙ্কিমের উপন্যাসও থাকবে, টিকবে। তাতে তাঁর দরকার ছিল একটা পরিবেষ্টনীর, অতীতের অস্পষ্ট কাল তা'ই জুগিয়েছে মাত্র। আসলে আছে তাতে চরিত্র, আছে তাতে চিত্র, আছে মানুষ ; সেই বিস্ময়, আর কল্পনাতীত সত্য—মানুষ, মানুষ, মানুষ!

এ রাতে কিন্তু আমার সেই মানুষকেও চাই না। চাই আমাদের গহন অতলের মানুষকে—দেখতে, বুঝতে। সে তো 'বিচিত্র' মানুষ নয়, সে হল 'মূল' মানুষ—সামাজিক মানুষ নয়, সহজ মানুষ—যে মানুষ সবার উপরে সত্য, আর যার উপরে নাই। এ রাতে সে মানুষের অস্পষ্ট আভাস পাই নিজেদের মধ্যে, আর সে মানুষের পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থিত করে কবিতা। তাই এ রাত কবিতার রাত।

আর তাই এমনি রাত আমাদের পালানোরও রাত, ছলনারও রাত। জেলখানার ফাঁকে আমি চাঁদ দেখছি—আর জানছি জেলখানা কত মিথ্যা। এ জানার মধ্যে সত্য আছে ; কিন্তু আছে তেমনি একটা বড় মিথ্যা। জেলেও চাঁদ দেখছি আর ভাবছি জেল নেই—আছে চাঁদ, আছে জ্যোৎস্না—আছে কবিতার রাত। সত্যিই আছে চাঁদ, আর জ্যোৎস্না, আছে কবিতা,—কিন্তু আছে জেলখানাও। ব্যারাকে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিকের আলো। তাতে আলো যেমনি কম, রূঢ়তা তেমনি প্রচুর। কয়েদখানার ব্যারাকে জ্বলছে সারা রাত অমনি আলোহীন ইলেক্‌ট্রিকের

আলো। বাইরে টহল দিয়ে ফিরছে ভারী বুট পরা সান্ত্রী সিপাই। প্রহর হাঁকছে ক্ষণে ক্ষণে—জেলখানা ঠিক আছে। আর আঙিনায় জ্যোৎস্নাকে তাড়িয়ে দিয়ে জাগছে উঁচু প্রাচীর। জ্বলছে প্রাচীরে-প্রাঙ্গণে বিজলীর কড়া মশাল। কী রূঢ় এই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার, কী প্রতিশোধ পৃথিবীর ওপর! —সত্য এও, সত্য এই জেলখানা সমাজের চক্ষে, সত্য আমার জীবনে। আর তা থেকে আমি পালাতে চাই—আমি মুক্তি পেতে চাই। তাই আমি নিজেকে জানালার ফাঁকে ছড়িয়ে দিই আকাশেআকাশে যে আকাশও আমার কাছে টুকরো-করা ছড়িয়ে দিই প্রান্তরে দিগ্‌দিগন্তে, ছড়িয়ে দিই নাম-জানা আর নাম না জানা সমুদ্রের তীরে, পাহাড়ের গায়ে, নদীর বাঁকে—যা কিছু থেকে জেল আমাকে বঞ্চিত করছে তাই আমি চুরি করে এ ভাবে ভোগ করি। আমি জেলকে ফাঁকি দিই। পাহারা-সান্ত্রীকে ফাঁকি দিই, ফাঁকি দিই মানুষের শক্তিকে। আমি পড়ি কবিতা, আমি ফিরে যাই রোমান্সের 'সব পেয়েছির দেশে'—যাই 'Far Away and Long Ago'-র মহলে। সে দেশ আসলে আমারই মন-গড়া। স্থাপন করি তাকে কখনো আমারই মন-গড়া ইতিহাসের কোনো এক স্তরে, স্থাপন করি তাকে আবার কোন্ দূর-দূরান্তরের হেব্রাইডিজের তীরে, কোন্ সমুদ্রের ফেনার পারে নির্জন দ্বীপের বেলায়, তুষার-পারে হিমালয়ের বুকে, তিব্বতের মাঠে, মরুর অভ্যন্তরের খেজুর-ছায়ায়, বেদুইনের তাঁবুতে; দেখি গ্রীক দেবদেবীদের, হিন্দু অপ্সরা আর দেবকন্যাদের; দেখি পরী আর দেবদূতদের, দেখি আরব্য উপন্যাসের অসম্ভবের রাজ্য কিংবা কালিদাসের কাল। অসম্ভবের রাজ্যে আমি পালাই—এই অসহ্য বাস্তবের কয়েদখানা থেকে। অসম্ভবের রাজ্যই রোমান্স। সেটা 'সব পেয়েছির দেশ; কিন্তু তাই 'সব না পাওয়ার দেশ'ও। শুধুই বঞ্চনা, শুধুই ছলনা,—শুধুই আমার বৃথা পালানো। জেলখানা আমাকে বঞ্চিত করছে—সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন থেকে। আর তার শোধ তুলি আমি, জেলকে ভুলি স্বপ্নলোকে ডুবে গিয়ে, বঞ্চনা করে। অর্থাৎ জেলেরই বঞ্চনা মেনে নিই, মেনে নিই তার অস্বাভাবিকতা। জেল আমি সহ্য করে নিতে চাই ভুলে থেকে—আপনাকে ভুলিয়ে! কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায় বারে বারে এই ইলেক্‌ট্রিকের আঘাতে, সান্ত্রীর পদপীড়নে সিপাইয়ের প্রহর-ঘোষণায়। এ রাত্রেও ভেঙে যায় ভুল, ভুলে থাকবার উপায় নেই। আর দিনের উদয় হতেই বেজে উঠবে জেলের রূঢ়তা, তার হৃদয়হীনতা, তার মহলে রুটিনের রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতা। আমার পালাবার পথ নেই।

না, রোমান্সের এই ছলনার পথে আমার মুক্তি নেই—কারও মুক্তি নেই। আমিও পালিয়ে কোথাও যেতে পারি না—এই কঠিন শাসনব্যবস্থা আমার তাড়া করবে, ধরে আনবে, কয়েদখানা পুরবে। নইলেও আমি ঘুরব গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, শিকারের পশুর মতো—লাঞ্ছিত, ত্রস্ত, তাড়িত,—চোখে জাগবে ভয় আর অবিশ্বাস, প্রাণে ক্ষোভ আর ক্ষুধা আর দিন ও রাত হবে আমার পক্ষে এক অসম্ভব পিঞ্জর। পালানো সম্ভব নয়—বাস্তব থেকে পালানো সম্ভব নয়। রোমান্সের সাধ্য নেই সে রক্ষা করতে পারে—সে শুধু ছলনা, শুধু প্রবঞ্চনা,—অথাৎ শুধুই মানুষের প্রবঞ্চনাকে মেনে নেওয়া।

জেল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ—জেলকে ভুলে থাকা নয়—জেলকে ভাঙ্গা—বাস্তিল চূর্ণ করা। ওই একমাত্র পথ। তা অসম্ভব সাহসের পথ, উদ্যোগের পথ। সেও একটা অসম্ভবের সাধনা বটে—সেও একটা রোমান্সের স্বপ্ন বটে—কিন্তু সে বাঁচবার পথ, শুধু সে স্বপ্ন নয় ;—শুধু স্বপ্ন হলে সেও হবে মিথ্যার মোহ। এ স্বপ্ন পৃথিবীর সত্যকে সত্য করবার স্বপ্ন। এ স্বপ্নে আমরা জীবনকেই গ্রহণ করি জীবনকে নতুন করবার জন্যই গ্রহণ করি। ঘাত-প্রতিঘাতকে এড়িয়ে যেতে চাই না—তাকে জয় করবার শক্তি সঞ্চয় করি। জেলখানাকে ভুলে থাকতে চাই না—জেলখানাকে চূর্ণ করি। তাও অসম্ভবের স্বপ্ন—শেলির স্বপ্নের মতো, প্রোমিথিয়ুসের মুক্তি-স্বপ্নের মতো, ওয়েস্ট্‌ উইণ্ডের স্তবের মতো। এমনি রোমান্স পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর তাই বার বার মানুষের সৃষ্ট রোমাণ্টিক সাহিত্যে এমন সার্থক হয়েছে—সে এলিজাবেথের যুগেই হোক, কি ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগেই হোক্‌। এ রোমান্সও সত্য ;—জীবনবিমুখী তা নয়।- জীবনাগ্রহী; সত্যাগ্রহী এরূপ রোমান্স—যাতে পৃথিবী নতুন হয়—যা সৃষ্টির স্বপ্ন, আর তাই সৃষ্টির বাস্তব প্রেরণাও আবার।

কিন্তু তবু মিথ্যা নয় কবিতার রাতও—তাও সত্য। শুধু ফাঁকি নয় এই জেলের ফাঁক। এই সংকীর্ণ জেলখানার জীবন আমাদের সংকীর্ণ করছে, আমরা সংকীর্ণ হয়েই আছি। তবু তারও ফাঁকে ফাঁকে পাই আভাস—জীবনের মুক্ত আনন্দ-রূপের ; জেলের জানালার ফাঁকেও দেখি চাঁদ আর আকাশ। এ যুগের মানুষ হয়েও খুশি হই—অ্যালিসের সঙ্গে আশ্চর্যের দেশে ঘুরে, খুশি হই এখনো ওয়াল্‌টার ডিলা মেয়ারের ছেলে-ভুলোনা কবিতায়। ভালোবাসি—আর সেদিন চাই চেরি ফুল। চাঁদ ওঠে,—আর সেদিন চাই কবিতা। বিজ্ঞান চোখ খুলে দেয় বাস্তবের অন্তঃপুরে, আর দেখি কি পরমাশ্চর্য জগৎ। অব্যবস্থায়

মানুষকে করছে পীড়ন,—তবু সেই বিস্ময়-বোধ আমরা একেবারে খোয়াই নি। মানুষের ব্যবস্থা পারে না মানুষের প্রাণকে পরাস্ত করতে। আমরা স্বপ্ন দেখি—সে স্বপ্ন সত্যও হয়। আবার রোমান্স নিয়ে ভুলতে চাই জীবন, আমরা নিজেদের ভুলিয়ে রাখি—সে ভুল ভেঙেও যায়, সে রোমান্সের মোহ যায় খসে। আমরা সহজ আবেগে এক এক নিমেষে অভিভূত হই—পড়ি কবিতা, কিংবা গাই গান। কবিতার রাত আজও তাই আসে আমাদের এই জীবনে।

কবিতার রাত আজও আসে। শেষ হয় নি কবিতার রাত, শেষ হতে পারে না—যতদিন আকাশে এমন চাঁদ উঠবে, পৃথিবীতে এমন জ্যোৎস্নার ঢল নামবে। তখন মনে পড়বে পরীদের কথা, মনে পড়বে গ্রীক মিথ্। তখন চেতনার সমুদ্র মথিত হয়ে উঠবে কত কত চাঁদনি রাতের অমৃত, যা আমাদের স্মৃতির মধ্যে জমে আছে, যা আমাদের বিস্মৃতির কালো জলে মিলিয়ে আছে। মথিত হয়ে উঠবে সেই সব। উজ্জীবিত হয়ে উঠবে অবচেতন থেকে কবিতার পিপাসা। তাকে স্বীকার করতে ভয় কি? এ যুগের নাগরিকরা অবশ্য হাসবে। তার থেকে বেশি হাসতে পারত বৈজ্ঞানিকরা—যারা জানে, চাঁদ শুধু পৃথিবী থেকে খসে-পড়া একটা ছাই-এর কণা, একটা হিম-পিণ্ড, তার আলো প্রতিফলিত সূর্যালোক। তারা হাসতে পারত বেশি—যারা এসব জানে। কিন্তু তবু তারা মানে, এমন রাতে আকাশের তলায় দাঁড়ালেই মানে,—চাঁদ চাঁদু। কাজেই তো এমন রাত্রির মর্মবাণী—এ রাত্রির রূপ—অনুভব করতে হয় চোখ দিয়ে; দেহ দিয়ে, প্রতি রোমকূপ দিয়ে। আর এ রাত্রির রূপ ধরা পড়েছে কবিতার মধ্যে। আকাশ থেকে মনের ওপর যে জোছনা উজল ধারায় পড়ে, পিছলিয়ে পিছলিয়ে যায় সেখানে, তা নিজের বাঁধনে বাঁধা চিরদিনের মতো। এমন রাতের রূপ মিলিয়ে দেখতে হয় স্পেন্সারের পাতা থেকে আর সেকস্‌পীয়ারের থেকে, এলিজাবেথের যুগের গায়কদের থেকে আর রোমান্টিক অভ্যুত্থানের কবিদের থেকে,—আর,—আর হাইমাউ-দের ভ্রূকুটি অমান্য করে আজকের মতো রাতে চাই ইয়েট্‌স্‌ তার রবীন্দ্রনাথ।

তবু এমন কত রাত্রে আমি মনের নেশাকে ডুবিয়ে দিয়েছি কেজো কথায় ও অকেজো তর্কে। এমন উন্মেষিত বিস্ময়-বোধকে চাপা দিয়েছি সংবাদপত্রের পলিটিকাল কক্‌টেল দিয়ে। এমন কত রাত্রে যখন মনে পড়েছে কীট্‌স্‌, মনে পড়েছে 'মানসী' আর 'মহুয়া,' মনে পড়েছে 'প্রোমিথিয়ুস আনবাউণ্ড,' আমি নিজেকে ঠকিয়েছি! কেন? পাছে আমি কলেজে-পড়া ছেলের মতো হয়ে যাই? পাছে আমি হই প্রেমপত্র-লিখিয়ে মেয়ের সমতুল্য! পাছে হাইব্রাউ-রা হাসে—

দিনের আলোত যেমন আমিই কাল হাসব। পাছে অতি-অভিজ্ঞের দল হাসে—যেমন আমিও হাসব এই রাতের শেষে—পাছে কেউ বলে আমি রোমান্টিক, বলে আমাকে—যে আমি কলেজে ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে রোমান্টিক কবিতার হাড়মাংস আলাদা করে ফেলেছি; আর যে আমি হাসিতে আর তর্কে, কৌতুকে আর পরিহাসে পৃথিবীকে একটা তামাসা বলে গণ্য করি; আর যে আমি দিনের মতো তীক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে চিরে চিরে দেখি জীবনের মানে শুধু জীবিকা আর আসঙ্গ—পাছে কেউ বলে আমি কবিতা পড়ি—কারণ, আমি শব্দতাত্ত্বিক। তাই এমন কত রাত্রে চাঁদ বৃথা উঠেছে। এমন কত রাত্রে আমি কাটিয়েছি আমার কাজের আর নেশার জেলখানার—বৃথা গেছে কবিতার রাত।

বৃথা যাবে আজও চাঁদ আমার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। না থাক জেলখানায় আমার এ রাতে কোন কাজ, এ রাতে আছে অঘ্রাণের হিম। খোলা জানালায় অঘ্রাণের হিম লাগছে আমার গাঁয়ে। কেমন শীত-শীত করছে, মাথা ভার হয়ে আসছে। সর্দি ধরল বলে, এমনি আমি হাঁচতে শুরু করব। হাঁচির পরে হাঁচি—সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে হাঁচি;—ব্যারাকের পঁচিশ জনের ঘুম তাতে ছুটে পালাবে। আর নয়, আর নয়—বন্ধ করো এই খোলা জানালা—ফেলে দাও চটের পর্দা। তারপর চটের পর্দার সামনে বসে পড়া কীট্‌স্‌ কি রবীন্দ্রনাথ? আর, হাঁচা আর পড়া কবিতা? এখনি কবিতার রাত হয়ে উঠবে হাঁচির রাত।

কাজ নেই কবিতার এ রাত্রে।

প্রেসিডেন্সি জেল,
১৯৩৪।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা

গোপাল হালদার

রবীন্দ্রনাথ নাই—বাঙালী জাতির পক্ষে এই কথাটি ভাবাও যেন অসম্ভব। পৃথিবীর যে আলোক নিবিয়া গেল সেই আলোকের তুলনা নাই, কিন্তু বাঙালী জাতির আকাশ হইল এখন একেবারে অন্ধকার! অন্ধকারের এই নিঃসীমতাও যদি প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহার জন্য বাঙালী মুখাপেক্ষী হউক, তাহার কবির;—আর সেই কবিই আজ নাই।

কবি নাই, কিন্তু কাব্য রহিয়াছে; আর তাই রহিয়াছেন কবিও। এই অন্ধকারের মধ্যে বাঙালী জাতির হাতে সেই চির-আলোকের শিখা যতদিন জ্বলিবে ততদিন তাহার অন্তর শূন্য হইয়া যাইবে না, সে কবিকেও হারাইবে না।

—এমনি একটা আশ্বাসের মধ্যে আজ আমরা যাহারা বাঙালী,—বাঙলাকেই মাতৃভাষা রূপে পাইয়াছি,—তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিতে চাই। ইহাতে অন্যায়ের কিছু নাই—যাহা মানব-নিয়তি তাহাই স্বীকার করিতেছি; আর স্বীকার করিয়াই তাহা সমুত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছি। কিন্তু বাঙালী-নিয়তির বুঝি এই গৌরবের দাবী নাই। এই কাব্য-সম্পদের উত্তরাধিকার সমস্ত বাঙালীর, ইহা সত্য; কিন্তু শতকরা নব্বইটি বাঙালী তথাপি সেই সম্পদ হইতেই বঞ্চিত রহিবেন—ইহাও অত্যন্ত গদ্যময় কঠিন সত্য। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধ দুয়ার তাঁহাদের জন্য

উন্মুক্ত হয় নাই—রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাণ্ডারও তাঁহাদের অপরিচিত—এযে কত বড় জাতীয় দুর্ভাগ্য তাহা এই মুহূর্তেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। সত্য বটে, অক্ষরজ্ঞান জন্মিলেই রসজ্ঞান জন্মে, এমন নয়। কিন্তু কবির মহত্তম দান হইতে শুধু সেই চাবি-কাঠির অভাবেই তাঁহার আপনজনেরা অনেকেই যে এইভাবে বঞ্চিত রহিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। সেই সব 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' কবি ভাষা দিয়া গেলেন ; তথাপি সেই হতভাগ্যেরা সেই ভাষা লাভ করিল না,—বাঙালী-নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিণাম বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন? ভাগ্যবশে 'বাঙালীর কবি' আই সি এস বাঙালীর, 'কাব্য-বিলাস' বাঙালীর, বড় জোর কেরাণি বাঙালীর কবি রহিয়া গেলেন ;—আজও তিনি তাঁহার সেই মূঢ় মূক বাঙালীর কবি হইতে পারিলেন না। যদি বাঙালী সংকল্পের কোথাও কোন সত্যতা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রকাশ ক্ষেত্র এইখানে ; ইহা হইতে বাঙালীর সত্যকারের রবীন্দ্র-প্রণতি—অন্তত শতকরা নব্বুইটি বাঙালীর হাতে সেই অক্ষরের চাবিকাঠি তুলিয়া দেওয়া, যাহাতে কবির কাব্য-সম্পদের উত্তরাধিকার তাঁহারা অন্তত চিনিয়া লইতে পারেন।

রবীন্দ্র-গীতির মুক্ত ভাণ্ডার

সেই দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াই আজ মনে পড়িল,—এই সাধারণ বাঙালীর নিকটেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় একভাবে পৌঁছাইয়াছে—তাঁহার গানের মধ্য দিয়া। সেখানে অক্ষরের প্রাচীর ব্যবধান রচনা করিতে পারে নাই, দুর্জয় ব্যবস্থার পাহারাওয়ালা সেই 'মূঢ় ম্লান মূকজন'দের দূরে ঠেকাইয়া রাখে নাই। সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবন কালের ভিতর দিয়া একেবারে তাহাদের মরমে পশিতে পারে। পশিয়াছেও। এবং যদিবা এই নিরক্ষর দেশবাসী তাঁহার কাব্যসম্পদ হইতে বঞ্চিত রহে, তাঁহার সঙ্গীত-সম্পদ তাহাদের একেবারে সম্মুখেই উন্মুক্ত রহিয়াছে।

এইখানে আজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার মহত্তর দান, বৃহত্তর উপযোগিতা স্বীকার করিতে হয়। আর, সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয়—এই দানও দেশের আপামর সাধারণের হাতে পৌঁছাইয়া দেবার দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব যাঁহাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহারাও যেন উহার সম্মান রক্ষা করিতে পারেন। কারণ এই গানের মধ্য দিয়াই আজ তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, অধিকাংশ বাঙালীর দুয়ারে, তাহাদের প্রাণে।

রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় বেশিরভাগ বাঙালী এখন পাইবেন সে তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভার, কাব্য-প্রতিভারও ততটা নহে। এই দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভা বিশেষ আলোচনার ও বিশেষ বিশ্লেষণের বস্তু। কিন্তু বলিতে দ্বিধা করিয়া লাভ নাই,—সেই বিচার-আলোচনার অধিকার আমার অন্তত নাই। আমি চার্লস ল্যাম্বের মতোই বলিতে পারি "আমার কাজ নাই।"—জন্মগত না হোক, সঙ্গীত-জ্ঞান অর্থাৎ সঙ্গীত জ্ঞানের অভাব আমার শিক্ষাগত—অর্থাৎ শিক্ষার অভাবগত। আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার সেই আলোচনার সাহসও রাখি না। লৌকিক হিসাবে তাহার গুরুত্বটুকু শুধু নির্দেশ করিতে চাই, আর চাই সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভার নিজস্ব ধর্মটির প্রভাব নির্দেশ করিতে।

রবীন্দ্রকাব্য গীতধর্মী

রবীন্দ্রনাথ কবি—ইহাই তাঁহার প্রধান পরিচয়। অবশ্য কাব্য, সঙ্গীত, গদ্যরচনা, নাটক, নৃত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি অসংখ্য সম্পদ লইয়াই রবীন্দ্রনাথের পরিচয়—আর সেই পরিচয় তাঁহার ব্যক্তি-স্বরূপের; তাহা অখণ্ড। কিন্তু ইহাও সকলের অভ্যন্তরে এবং সকলের উপরে যে মনের ছাপ—তাহা কবির মন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয়—তিনি কবি। কবি বলিয়াই যে কেহ দেশ-কাল অতীত তাহা নয়—কালের ধর্ম, দেশের ধর্ম, বিশেষ পরিবেশ বা পারিবারিক ধর্ম, এই সবে মিলিয়াই কবিরও ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ রচনা হয়' সেই অপূর্ব ব্যক্তিত্বকে হয় অপূর্বতর সমন্বয়ের সুযোগ দেয়, অথবা বিবিধ বিরোধে তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পদ ভারতবর্ষে এবং ঠাকুর পরিবারে এক পরম সমন্বয়ে পৌঁছেছে—রবীন্দ্রনাথের পরিবেশে ছিল এই উদারতাবোধ, মানবতা-বোধ, অধ্যাত্মবোধ। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের নিজের জন্মগত প্রতিভাও ছিল ইহার অনুকূল। সেই পরমাশ্চর্য সমন্বয়ের ফলই যে রবীন্দ্র-প্রতিভা, অন্যত্র আমি তাহা নির্দেশ করিয়াছি; রবীন্দ্রনাথের জন্মগত নিজস্ব কবি-প্রকৃতির কথাও সেইখানে আলোচনা করিয়াছি। সেই কবিপ্রকৃতির ধর্ম এই যে, উহা প্রধানত গীতধর্মী বা লিরিক্যাল, অনুভূতি-মূলক; এবং গৌণত ভাবুকতা-প্রবণ বা মিস্টিক।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণও এই ধর্মে এই দুই ধর্মের গীতপ্রধান আশ্চর্য সমন্বয়,—সেই প্রাণধারা যেই খাতেই প্রবাহিত হউক।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য মুখ্যত সঙ্গীত-প্রাণ—এই কথাটি আমাদের ভুলবার উপায়

নাই। শুধু কাব্য কেন, সমস্ত রবীন্দ্র রচনাবলীই, গদ্য, প্রবন্ধ এবং বিশেষ করিয়া ছোটগল্প অনেকাংশেই এই সঙ্গীতের সুরে ও মূর্চ্ছনায় আচ্ছন্ন। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতও আবার এই সমন্বয়ের ফলে কাব্যপ্রাণ—আর তাহার ছত্রে ছত্রে সেই কথাময় অপূর্ব কবিত্ব স্ফুরিত হইয়া উঠে বলিয়াই আমাদের মত সঙ্গীতে আনাড়ি লোকেও তাহাতে মুগ্ধ হইতে পারে। কথা ও সুরের যে সমন্বয় রবীন্দ্র সঙ্গীতে সাধিত হইয়াছে, তাহাই এখানে আমাদের স্মণীয়, [৬৮০] আর উহার মাত্র মর্মটুকুই এখানে সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি।

কথা ও সুরের বিকাশ

এক বহু হয়—ইহাই বিকাশের ধারা। এককালে সুরে কথায় নৃত্য মিলিয়া মানুষের সব আপনাকে একটি পথে প্রকাশ করিতে চাহিত। তাহার পর মানুষের জীবনবোধ যতই নিবিড় ও সূক্ষ্ম হইল, ততই ভাবেও এক-একটি প্রকাশ-পথের বিশিষ্টতা তাহার নিকট প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল—তাহাতেই কাব্য সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির বিকাশও সম্ভব হইল। এই বিশিষ্টতাতেই বিকাশ। কিন্তু বিশিষ্টতা মানে বিচ্ছিন্নতা না। রসচেতনার এক একটি ক্ষেত্রে সমুতীর্ণ হইয়া মানুষের পক্ষে তাই ইহাদের সমন্বয় সাধনও হইয়া পড়ে এক-একবার প্রয়োজনীয়। কাব্য তখন ধ্বনির তরঙ্গে ভাসিয়া অনাবিষ্কৃত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, আর সঙ্গীতও সেই কথার তরণীতে বসিয়া 'নিশ্চেতন' মনের 'অনির্দেশ যাত্রায়' বাহির হয়। না হইলে সব শিল্পের মত কথা ও সুরও জীবন হইতে দূরে অবচ্ছিন্ন (abstract), কলানৈপুণ্যের নিদর্শন হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় এই সমন্বয়ই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের শিশুত্ব

একদিক হইতে দেখিলে এই কাজ দুঃসাধ্য ছিল না। কাব্য আমাদের দেশে সেদিন পর্যন্তও ছিল গানের বস্তু। সে ভাসান গানই হোক' পাঁচালিই হোক, বা দোঁহাই হোক। কিন্তু এই মিশ্রিতরূপ অনেকাংশেই কাব্যের ও সঙ্গীতের শিশুত্বসূচক—শিশু মাত্রই যেমন অ-বিশিষ্ট unindividualised একমাত্র বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীতে সময়ে সময়ে—কিন্তু সব সময়ে নহে—কাব্য ও সঙ্গীতের এই নায়কনায়িকালীলা অপূর্ব মিলনে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেখানকার মধ্যযুগীয় অলঙ্কারভারে কাব্য অনেক সময়েই অলস-গমনা। ইহার পরবর্তীকালে বাঙলা দেশ প্রথম তাহার কথা ও সুরের সমন্বয় সাধন করিল কীর্তনে। ভুলিলে

চলিবে না, উত্তর ভারতে, ভারতবর্ষের হৃদয় কেন্দ্রে তখন সঙ্গীত তাহার বিশিষ্ট দেহ লাভ করিয়া নব কান্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ! আমাদের কীর্তন সেই তুলনায় নিতান্তই পল্লীপ্রাণ বাঙালীর একটা "প্রাণের ভাষা" মাত্র। সেই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বৃহৎ ব্যাপ্তি আমাদেরও দুয়ারে আসিয়া গেল—তাহার নিকট আমাদের নতি স্বীকার করিতেই হইল। উহার নিকট কথা গোণ, এমন কি নিষ্প্রয়োজনীয়। এদিকে অনতিকাল মধ্যেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমরা কথার মহাসাম্রাজ্যও আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম—তাহাকে সুরের মুখাপেক্ষী না করিয়া আপন মর্যাদায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে দিলাম। মেঘনাদবধ' মহাকাব্য হইতে বাঙলা কাব্যের এই 'স্বরাজ সাধনা' আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীতে নব-জাগ্রত বাঙালী না পাইতেছিল তখন কীর্তনে, পল্লীসঙ্গীতে বা ভাটিয়ালীতে আপন মুক্তি, না পাইতেছিল উত্তর ভারতীয় সাধনায়, সিদ্ধি। সুরলোকে ও কাব্যলোকে বিচ্ছেদ ছিল যথেষ্ট।

'রবীন্দ্র সমন্বয়'

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতময় পরিবারের পরিবেশে জন্মিলেন। সেই পরিবেশ একদিকে সমন্বয়সূচক ; অন্যদিকে সনাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী। আর তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা মুখ্যত সঙ্গীত ধর্মী। তাঁহার কাব্য তাই কূল ছাপাইয়া ধ্বনির তরঙ্গে ভাসিয়া যায়—এই কুলহারা ছন্দোচ্ছ্বাস কাব্যের পক্ষে ভয়ের কারণ ; সর্বত্র সমর্থনযোগ্যও নয়। আর তাঁহার ভাবুকতা-প্রবণচিত্ত কিছুতেই জীবনলীলার স্থির তটে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না ; বিচিত্ররূপিনীর লীলারসে নিষিক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণেই মহাকাব্য রচনায় তিনি নামিতে পারিলেন না, লীলা নূপুরের ছন্দাঘাতে টুকরা টুকরা হইয়া গেলেন। কারণ, পূর্বপরই সঙ্গীত তাঁহার স্বভাষা হইতে চাহিয়াছে। 'বাল্মীকি (বাল্মীকি] প্রতিভা' 'মায়ারখেলার' সেই প্রথম তারুণ্যের উচ্ছ্বাস তবু সঙ্গীতের প্রচলিত ঠাট মানিয়া চলিয়াছে। তারপর কাব্যের পরিপূর্ণ লোক পার হইয়া তিনি যখন আবার 'ফাল্গুনীর' পর হইতে সঙ্গীত লোকে পুনঃপ্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার বিপ্লবীচিত্ত কাব্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় সাধন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য,' 'গীতালি', হইতে শেষ গানে পর্যন্ত তাই রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া গেলেন। এক স্তরে বাঙলা কীর্তনে এক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। উচ্চতর স্তরে কথা ও সুরের সেই সমন্বয়েই রবীন্দ্র সঙ্গীতও আজ সকল বাঙালীর সঙ্গীত হইয়াছে।

দেশ ৩১শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 16th Augu
1941 [৮ম বর্ষ * ৩০শ সংখ্যা]

ডাক আসিয়াছে

ভারতের সকল দেশভক্তের কাছে নৌ-বাহিনীর ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ডাক আসিয়াছে। নাম করিয়া করিয়া তাঁহারা ডাক দিয়াছেন কংগ্রেসকে, ডাক দিয়াছেন লীগকে, ডাক দিয়াছেন ভারতের বিপ্লবী জনতার অগ্রদূত কমিউনিস্ট পার্টিকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের নৌ-তরী তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইতেছে শ্রমিক মন্ত্রী এট্‌লী। আমলাতন্ত্রের নৌ-অধ্যক্ষ (ন্যাভ্‌ল অফিসার কমান্ডিং) তাঁহাদের শাসাইতেছেন সমূলে ধ্বংস করিবেন। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক বন্দুক তুলিবে না, তাই বন্দুক উচাইয়া এই ভারতীয় বীরদের ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে বৃটিশ সৈনিক। জাতির সম্মান ও ন্যায়ের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে মৃত্যুর মুখ হইতে নৌ-বাহিনীর ভারতীয় বন্ধুরা ডাক দিয়াছেন জাতিকে, সকল দলকে, সকল শ্রেণীকে।

এই ডাক দেশের নিজের ডাক।

সাম্রাজ্যবাদীর ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ভারতীয় সৈনিকই আহারে, বিহারে, ওঠায় বসায়, বেতনে-পেন্‌শনে, প্রতি জিনিষে বিদেশীয়দের হাতে লাঞ্ছনা-অপমান সহে। নৌবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকেরা ইহার অবসান চায়। পরাধীন ভারতের হতভাগ্য সৈনিকদেরই সাম্রাজ্যবাদের আদেশে মরিতে হইতেছে ইন্দোনেশিয়ায়। লাট সভার কংগ্রেস-লীগ প্রতিনিধিরা পর্যন্ত এই লজ্জার অবসান দাবী করিয়াছে। নৌ-বাহিনীর সৈনিকেরা দেশের এই গ্লানিকেই দূর করিতে চায়! 'আজাদ হিন্দ্

ফৌজের' সেনাদের লইয়া সাম্রাজ্যবাদীরা খেয়াল খুশী মত খেলা করিতেছে ; দেশের মানুষ রক্ত দিয়াও তাহা রোধ করিতে দৃঢ় 'সংকল্প'। সেই রক্তে নিজেদের রক্ত মিশাইতে চায় আজ নৌ-বাহিনীর এই ভাইরা।

দেশের মানুষ তাই জানে এ ডাক দেশের ডাক, ইজ্জতের ডাক, ইমানের ডাক, এ ডাক রক্তেরও ডাক। তাই বলিয়া আজ দ্বিধাগ্রস্ত হইলে চলিবে কেন? সাগর পারের পেথিক লরেন্সের জন্য যতক্ষণ কংগ্রেস-লীগ অপেক্ষা করিবেন, তাহারই পূর্বে এটলির বৃটিশ নৌ-বাহিনীর গোলায় এই বিপ্লবের বীরত্বময় অধ্যায় নিঃশেষ হইবে। বল্লভভাই কি শুধু একতরফা শান্তির বচন পড়িয়া আজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিবেন? জিন্না সাহেব কি শুধু ভাগ-বিভাগের দাবী-দাওয়ার বিশ্লেষণ করিয়া তাহা ভুলিয়া থাকিবেন? না,

ধূমায়মান ভারতবর্ষ, তাহার ধূমায়মান সৈনিক ও বৈমানিকরা, আর তাহার জ্বলন্ত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ এই দৃশ্য সহিতে পারিবে?

এক তরফা শান্তির কথা পড়িয়া আর লাভ নাই। সাম্রাজ্যবাদের উপরে নেতাদের যত আস্থা তাহার বিন্দুমাত্রও আজ দেশের অন্যদের নাই। রক্তের ডাক আজ তাহাদের কানে। দেশকে রক্তপ্লাবন হইতে বাঁচাইবার দায়েই আজ আমরা দেশের জনসাধারণ, দেশের শ্রমিক, দেশের কৃষক, দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ প্রতিশ্রুতি দিতেছি—নৌ-বাহিনীর ভাইদের এই ধর্মঘট আমাদের ধর্মঘট, নৌ-বাহিনীর একটি বীরেরও রক্তপাতে আমাদেরই বুকের রক্ত ঝরিবে। আর তাহাদের সার্থকতায় আমাদের স্বাধীনতা হইবে সন্নিকট, তাঁহাদের জীবনে আমাদের জীবন—ভারতের নবজন্ম ; ভারতের শ্রমিক কৃষকের দল এই বিপ্লবী দায়িত্ব আজ দৃঢ় চিত্তে মাথা পাতিয়া লইল।

দৈনিক 'স্বাধীনতা', শুক্রবার ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

প্রমথ চৌধুরী

গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার ৭৮ বৎসর বয়সে প্রথম চৌধুরী দেহত্যাগ করেছেন। দু-এক বৎসর ধরে তিনি সমস্ত কাজ থেকেই অবসর নিয়েছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তারও কিছু পূর্বে। তাই আজ প্রমথ চৌধুরীর বিয়োগ বাঙালীকে ব্যাকুল করবে না। তাছাড়া এ মুহূর্তে বাঙ্গালী জীবন ও বাঙ্গালী-সংস্কৃতি এত বড় অপমৃত্যুরই সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যে, আজ বাঙ্গালী চিন্তার কোনো শিখা নিবে গেলে আমরা তাতে চমকে উঠতেও পারছি না। বিশ্বাসই করা শক্ত যে, মাত্র পাঁচ বছর পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ দেশের আকাশ আলো করে, আর তাঁরই পার্শ্বে—তাঁর পরেও—ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর মত বুদ্ধি সমুজ্জ্বল মণীষী। তাঁদের দান না ফুরোতেই আমাদের প্রাণ এত দেউলে হয়ে পড়ল কি করে?

'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বলে প্রথম চৌধুরী আজ থেকে ত্রিশ বৎসরেরও বেশি আগে (বোধহয় ১৩২১ সালে) 'সবুজ পত্রে'র মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী প্রাণকে আহ্বান করেন। তার আগেই অবশ্য তিনি (প্রধানতঃ 'ভারতী'তে) আপনার পরিচয় বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু 'সবুজপত্র' থেকে তাঁর সত্যকারের প্রকাশ আরম্ভ হল। আজ 'সবুজপত্র' স্মৃতিমাত্র। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে সবুজপত্র শুধু একটা ঘটনা নয়, একটা আবির্ভাব। আর শুধু আবির্ভাবও নয়,

একটা যুগ। যুগের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথই, তাঁর কণ্ঠেই সে বাণী ফোটে। কবিতা (কথাকার), গল্প (গল্প সপ্তক), প্রবন্ধ, নাটক (ফাল্গুণী), উপন্যাস (চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে) সবদিকে সেই সর্বতোমুখী প্রতিভা তখন বাঙ্গালী মন ও বাঙ্গালী প্রাণকে নতুন সুরে ডাক দিলেন, 'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই বাণীর বাহক। 'চার ইয়ারী কথা' ও 'আহুতি'র গল্পে তাঁর কলাকুশল সুনিপুণ মন মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝক্ করে উঠত। কিন্তু মাসের পর মাস বীরবলের ব্যঙ্গে ও রঙ্গে তখন তিনি সমস্ত বাঙ্গালী চিত্তকে হাসিতে, কৌতুকে, সুতীক্ষ্ম করে তুলেছেন। আর স্বনামে অসংখ্য প্রবন্ধ, সমালোচনায় স্বচ্ছ, লঘু তীব্র রচনায় রসিকতায় বাঙ্গালী বুদ্ধিও বাঙ্গালী চেতনাকে এমন একটা ক্ষুরধার দীপ্তি দান করলেন যা অতুলনীয়।

সবুজপত্রে একদিকে ছিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য, অন্যদিকে প্রমথনাথের দৃষ্টির উজ্জ্বল্য। এই দুই নিয়েই 'সবুজপত্র'—আর প্রমথ চৌধুরীও এই দুই-এরই একটা সামঞ্জস্য সাধনা করেছিলেন সহজভাবে।

সাধারণভাবে আমরা জানি—প্রমথ চৌধুরী বাংলায় 'চলতি ভাষার' পথ প্রশস্ত করেন। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর আগেও চলতি ভাষা চলত—বেশ বেগেই চলত। তবে তাঁর তীক্ষ্ম লিখনী যে পথ সকলের চোখে আরো স্পষ্ট করে তুলল, আর রবীন্দ্রনাথও সে পথেই তখন থেকে চলতে লাগলেন। বাংলায় চলতি ভাষা পুরানো গণ্ডী ছাড়িয়ে সাহিত্যের সকল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হতে চলল। এদিকে প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্বই সর্বাধিক তাতে ভুল নেই। তেমনি ভুল নেই যে, তিনি আশ্চর্য রকমের লিপিকুশল লেখক—কি গল্প লেখক হিসাবে, কি প্রবন্ধকার হিসাবে। কিন্তু এসব নানা "কৃতিত্বের" মূল কথা হল এই যে, সবুজ পত্রের মারফৎ প্রমথ চৌধুরী বাংলায় একটি নতুন যুগের পত্তন করেন। এ যুগের প্রধান কথা হল—ব্যক্তির মুক্তি। আর বিশেষ করে প্রমথ বাবুর কথা হল 'বুদ্ধির মুক্তি'। তিনি সাদরে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও 'বুর্জোয়া' সভ্যতাকে গ্রহণ করলেন। অবশ্য তিনি বলতেন, এ সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার ও জীবনের আত্মীয়তা সুনিবিড়। কথাটা অর্দ্ধ সত্য। কিন্তু যা তিনি এভাবে আসল লক্ষ্যস্থল করে তুললেন সে হচ্ছে—মধ্যযুগীয় সমাজ ও মনের অবসান, আর তার স্থলে গ্রহণ করা ব্যক্তিসত্তার যুক্তি গ্রহণ করা বুদ্ধির বিচার। আসলে এই হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মকথা।

“ফরাসী ধর্ম”

বলা বাহুল্য, ইউরোপে এই ব্যক্তির-মুক্তির যুদ্ধ ও বুদ্ধির-মুক্তির যুদ্ধ ঘটে গিয়েছিল অনেক আগে—আমাদের দেশেও তা শুরু হয়েছিল রামমোহনের কাল থেকে। তবু আমাদের সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বাঁধা মন তা গুলিয়ে ফেলে। অন্যদিকে অবশ্য আমরা ইউরোপের চিন্তার ও চেষ্টার থেকে—সভ্যতার প্রচণ্ড বেগ প্রাণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বের্গসঁর দর্শন, এসব থেকে নতুন করে বুঝেছিলাম এই গতিবাদও। মনে হত এ যেন পুরানো সেই শক্তিবাদই। যাই হোক প্রমথ চৌধুরীর চালনায় আমাদের এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে বিদ্রোহের সুর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আর তিনি বিশেষ করে তাই উদ্বোধন করলেন ‘বুদ্ধির মুক্তির’ দাবি; তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সমালোচনা—সব মিলে বুদ্ধিকে এমন সুতীক্ষ্ণ ও সমুজ্জ্বল করে তুলল যা এক নতুন জিনিস। নিশ্চয়ই ভলটেয়ার অনেক বড় প্রতিভা ছিলেন, কিন্তু রঙ্গে, ব্যঙ্গে বিদ্রূপে প্রমথ চৌধুরী বাঙ্গালী মনকে কি তার চেয়ে কম আকৃষ্ট করেছিলেন? অবশ্য প্রমথ চৌধুরী ভলটেয়ার নন; বরং কালপ্রভাবে তিনি ছিলেন বের্গসঁর শিষ্য। অথবা আরও সত্য বোধ হয় একথা তিনি শিষ্য “ফরাসী জিনিয়াসের”—ফরাসী এনলাইটেনমেণ্ট বা বৈদগ্ধ্য. তাঁর যুক্তি নিষ্ঠা. তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা আর লেখার স্বচ্ছতা—অর্থাৎ যা কিছু আমরা ফরাসীর ধর্ম বলে জানি, বাংলায় তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাই প্রমথ চৌধুরীর লেখায়, গল্পে ও প্রবন্ধে। তাঁর বুদ্ধির শুভ্র দীপ্তি এজন্যই অনেককে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আর কেউ বাঙ্গলা সাহিত্যে এরকম স্বচ্ছতা দিতে পারেন নি। তাঁর “বীরবলী” ঢং অনেককেই প্রভাবিত করেছে. কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি শুধুমাত্র ঢং নয়. শুধু রীতিও নয়। কারণ স্বচ্ছতা শুধু একটা লেখার গুণ নয়। এ একটা মনের গুণ, আজ থেকে অনেক বছর আগে প্রমথ চৌধুরী ‘বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজম’ ঘোষণা করতে এবং ‘রায়তের কথা’ লিখতে পারলেন এই মানসিক স্বচ্ছতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার জন্য। বিচার, যুক্তি ও বিশ্লেষণ তার বুর্জোয়া বুদ্ধিনিষ্ঠ মনের নিকট পরিষ্কার করে তুলল এই সত্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী একটা স্বতন্ত্র জাতি আর বাঙলার জমিদারী প্রথা হচ্ছে একটা দুর্বার মিথ্যা ও অন্যায়। মনে রাখব আজও অনেক বুদ্ধিজীবির মুখে নানা সোস্যালিষ্ট বুকনির সঙ্গে শুনি ‘অখণ্ড ভারতের’ তর্ক এবং নানা ছলে জমিদারী স্বার্থের সমর্থন—হয়ত তাঁরাই কেউ কেউ এক সময়ে প্রমথ চৌধুরীর অনুরক্ত ‘ভক্ত’ ও ছিলেন। তা হলে বুঝতে পারি—পঁচিশ বছর পূর্বে যিনি এই মিথ্যাকে এমন পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত

করলেন তাঁর মনবুদ্ধি কতটা মধ্যযুগীয় সংস্কার কাটিয়ে একালের দিকে এগিয়ে এসেছিল। এ জন্যই দেখি—প্রমথ চৌধুরী তাঁর দিনের পলিটিক্সকে করতেন ব্যঙ্গ আর তাঁর দিনের বিপ্লবী রাজনৈতিকদের করতেন স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

একথা ঠিক, বুর্জোয়ার বুদ্ধি-বিদ্রোহ খুব বেশি দূরে অগ্রসর হয় না। নিচুর নীচু তলায় যতই বিপ্লবের বাণী প্রবেশ করে ততই ওপর তলার বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিতে বিকার ঘটে। কিন্তু আমাদের দেশে সে যুগ তখনও আসেনি। আজই হয়ত আসছে যখন জাতীয় নেতৃত্ব মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ; এ দৈন্য প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিকে স্পর্শ করে নি। তবু স্পস্ট করে তিনিও বুঝে ওঠেননি—তাঁর ‘ব্যক্তির মুক্তি” ও শেষ কথা নয়, পৃথিবীতে ব্যক্তির মুক্তি সার্থক হয় শোষণের থেকে মুক্তিলাভের সঙ্গে, সার্থক হয় সামাজিক সৃষ্টি প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। বের্গসঁনীয় প্রাণ লীলার এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির—ছাত্র দেখেও দেখতে পান নি—মার্কস-এঙ্গেলসের বাস্তব গতিবাদ আরও কত ব্যাপক ও সত্য। পুরানো সবুজপত্রের পাতায় তাই দেখি—আশ্চর্য রকমের অগ্রগামী চিন্তা কোথায় যেন এগিয়ে এসে সূত্র হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সবুজপত্রের আকৃষ্ট সেই বুদ্ধিজীবীরাই কেউ কেউ আবার দেখছি—এ সূত্র খুঁজে নিয়েছে, এগিয়ে এসেছে মার্কস এঙ্গেলসের পথে সবুজপত্রের ‘ব্যক্তির মুক্তির’ যুগ বুঝে ও মেনে নিয়ে। বুদ্ধির মুক্তির জন্য তারা আজও স্মরণ করবে প্রমথ চৌধুরীকে—এ পথের এক নিশানা “সবুজপত্রের যুগ।” আর অত্যন্ত সত্য করেই তারা আজ ভাববে প্রমথ চৌধুরীর স্বচ্ছ লেখনীর লঘু তাড়না যদি আজ থাকত। তাহলে বুদ্ধির এমন শোচনীয় পরাজয় এত সহজে হয়ত ঘটত না, হয়ত বাঙ্গালী এমন মানবতার ভূমি পৃষ্ঠ থেকেও ভ্রষ্ট হত না যেমন হল ১৬ই আগস্ট।

স্বাধীনতা ২২শে ভাদ্র, রবিবার ১৩৫৩, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

145B/Vivekananda Road,
Calcutta.
Jan., 30. 1943

প্রীতিভাজনেষু,

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। দু' দু' খানা চিঠি অমন তাড়াতাড়ি পেয়েছি, তবু জবাব দিইনি। অপরাধ এবারকার মত ক্ষমা করবেন।—জানি তা করবেন, তবু না লিখলে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত বোধ করছিলাম। তাই কাগজে-কলমে এই কথা কয়টি লিখলাম—যদিও লিখলে কথাগুলি বড় 'formal' শোনায়। আর 'formal' সম্পর্ক আপনার সঙ্গে নয়—আপনিও তা গড়তে দেন নি। আমিও গড়িনি।

দু'দিন 'ফান্টামারা' খুঁজতে হয়েছিল। বাজারে আজকাল 'পেঙ্গুইন' সুদুর্লভ। —পক্ষী জাতীয় জীবমাত্রই প্রায় সর্ব রকমে দুষ্প্রাপ্য। একখানা পাওয়া গেল এক বন্ধুর কাছে—সময় হলে ফেরৎ দেবেন। না দিলে ক্ষতি হবে না। তবে কোনো কাজে লাগলে যে ভাবে খুশী তা ব্যবহার করবেন—যতদিন খুশী রাখবেন বা বরাবরের মত রেখে দিতে পারেন, কারণ কলকাতায় আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আরও দু' এক কপি আছে।

আপনার 'গল্প সংগ্রহ' নিয়ে কিন্তু বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। এখানে এসে দেখলাম—কাগজের বাজারে আগুন। ছোট-খাট প্রকাশকদের খড়ো ঘরের এতদিনে কিছুই আর নাই। 'পুঁথিঘরের' ওঁরা সামান্য কাগজ রেখেছিলেন তা শেষ হয়েছে। এখন আর নূতন কিনতে সাহস করছেন না। ওঁদের বড় দুঃখ রইল। তা থাক, ভবিষ্যতে এক সময়ে ওঁদের আবার দেখা যাবে। কিন্তু 'গল্প সংগ্রহের' জন্যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন প্রকাশকদের খুঁজতে হবে। আমি আর কারও সঙ্গে কথা বলিনি। বলব কি ?—সেই মোহিতবাবু সুশীলবাবুর যাঁরা প্রকাশক—বিভূতিবাবুর 'নীলাঙ্গুরীয়ও তাঁরাই ছেপেছেন—, 'General Printers and Publishers' তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকলে আমি কথা বলতে পারি। ওঁরা আমার পরিচিতই। আমার বিশ্বাস, আপনার 'গল্প সংগ্রহ' পেলে

সকল প্রকাশকই উৎফুল্ল হবেন ; হ্যাঁ, মোট কত ফর্মার বই হতে পারে সমস্ত সংগ্রহটি ?

সজনি ফিরে এসেছে, জানি। একেবারে সস্ত্রীক আবার পুরানো কলকাতায় এসেছে। কিন্তু দেখা করতে এখনো পারি নি—যেমন আপনাকেও চিঠি লিখি নি। আমার অকাজের 'ডিমোন' তাড়া করেছে। তার ওপরে আজ দুদিন এখানে বাদলা। কাল পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করব।

বই-পত্র আরও কিছু আপনাকে পাঠাব কি ? লোকজন পেলে ভালো হয়। আপনারও প্রয়োজন মত জানাবেন—কি আপনার চাই। ব্যবস্থা করব।

রুশিয়ার প্রস্তাবটা নিয়ে এবার পুলিশের কর্তাদের কাছে একটু দরবার করতেই অগ্রসর হচ্ছি। উপায় কি ? আমি অবশ্য সমস্ত প্রাণ দিয়েই চাই—ওদের একবার দেখে আসতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভ হবে কিনা জানিনা। একটা কথা—প্রকাণ্ড দেশ, বহু লোক, বহু জাত। আমার নিজের বিশ্বাস—মানুষ মানুষই ! তাই, সেখানে স্বর্গ ও দেবতা খুঁজে পাব না, আবার নরক ও শয়তানও কেবল দেখব না। ভারতবর্ষে যেমন, ওদেশেও এক দিক থেকে তেমনি হবে—অর্থাৎ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' সে দর্শক তেমনি দেখবেন—মিস্ মেয়ো দেখলেন, ভারতবর্ষের drain, আর ভগ্নী নিবেদিতা দেখলেন—ধ্যান-সুন্দর হিমালয়। এই দুই নিয়েই ভারতবর্ষ। কিন্তু আমরা জানি এই ছাড়িয়েও ভারতবর্ষ। তেমনি হবে রুশিয়াও। আমি শুধু বুঝে দেখতে চাইব—সেখানে মানুষ মানুষই হবার মত উপকরণগুলো পাচ্ছে কিনা, আর তাকে অমানুষ করবার মত উপকরণগুলো উপড়ে ফেলা হচ্ছে কি না (ফেলা হয়েছে, বলতে এখনো সাহস হয় নি ; সে যে অনেক দিনের জঞ্জাল। আর dirt is a painless disease। যতটুকু বিশ্বাস, সংবাদ আমি পেয়েছি তাতে মনে হয় তা হচ্ছে। আর আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে, সেখানকার মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজেদের। অর্থাৎ তাদের প্রতি তার বিশ্বাস এসেছে যে, তারা অনেক কিছু গড়তে পারে এবং অনেক কিছু তারা গড়ছেও—যাতে ত্রুটি থাকলেও তা সৃষ্টি ; শুধু নিয়মবাঁধা কারিগরী নয়—কিন্তু থাক এ কথা এবার।

আমার 'একদা' লীলা বৌদি পড়েছেন (কিন্তু তা বলবার আগে, এই সমস্যাটা দূর করুন তো—কি করে এই মেয়েদের আমরা উল্লেখ করব ? মিসেস্ মুখার্জি ? আমি নিতান্ত ড্রইংরুমে বিহারিণীদের ছাড়া কাউকে মিসেস্ বলতে পারি না। চিরদিনকার দেশী নিয়মে আত্মীয় স্থানীয়দের আত্মীয়া বলে 'বৌদি' বরং বলব।

আমার দেশের নূতন নিয়মে যা বলতাম, তা আপনাদের অনভ্যস্ত কানে একেবারে অসহ্য। অথচ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আমাদের কাছে ওর চেয়ে বড় আহ্বান আর নেই, কি তা, আপনি কি অনুমান করতে পারেন ? 'একদা' তাঁর ভালো লেগেছে, তিনি তাও লিখে জানিয়েছেন। বুঝতেই পারেন—এতে আমার নিজেকে সত্যই ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস—আমি 'লেখক জাতের' লোক নই 'লিখিয়ে-জাতের' লোক। কিন্তু এক-একবার আপনাদের কথা শুনে নিজের সন্দেহ হয়—আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু 'অকাজের ডিমোন' তখনি আমাকে তাড়া করে—লেখা আর হয়ে উঠছে না ! সেই বড় প্ল্যান-করা কাব্যনাট্য আর লিখতে পারছি না, কিন্তু আইডিয়াটা ছাড়ি নি। সেটাও পিছনে লেগে আছে।

শরীরের অযত্ন আর সহজে করব না। আপনি শুনে খুশী হবেন—মোটের উপর খাইও। তবে ওই পক্ষিজাতীয় জীব দুর্লভ, অথচ তার ওপর লোভ আমার দুর্জয়। আপাতত, মোটের উপর এ বাজারে যথেষ্ট সুপাচ্য খাদ্যই খাচ্ছি—মায়ের হাতের গুণে।

আমার মাকে আপনাদের কথা বলেছি। তিনি সম্প্রতি পান বসন্তে বেশ ভুগেছেন, এখন তাঁর দেহ ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। অথচ বুঝতে চান না যে, আমাদের জন্য রাঁধাবাড়া, তত্ত্ব-তল্লাসী, এ আর তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব হবে না। আরও বুঝতে চান না এই কথাটি যে, ওকে এভাবে খাটতে দেখলে (চাকর-বামুন বড় নেই) আমরা মনে মনে অস্বস্তি কম বোধ করি না—যদিও মুখে ওঁর রাঁধা জিনিস না হলেই প্রায় আর খাদ্য রুচতে চায় না। কিন্তু মাকে নিয়ে কি করি ? আর নিজেকেই বা নিয়ে করি কি ?

বৌদিকে আমার নমস্কার দেবেন। আর কেয়াদের দেবেন আমার আশীর্বাদ। প্রীতি গ্রহণ করবেন। সময় পেলে যা খুশী দু-এক ছত্র আমাকে লিখবেন—দুজনাই—এই দাবীটুকু মনে রাখবেন। ইতি—

আপনাদের প্রীতিমুগ্ধ
গোপাল
(গোপাল হালদার)

বনফুলের আত্মচরিত 'পশ্চাৎপট' থেকে গৃহীত।

Follow Nagpur !

Since last week many things have happened in the national and the international fields. To begin with, Hitler met Marshal Petain on Thursday, and earlier on Wednesday in a small station in the occupied French zone he met Franco. Whatever the actual details of the talks, that Hitler is determined to commit France and Spain to his war-path is clear. Spain has been hesitating for evident reasons and the personal efforts of the Fuehrer were necessary to impress upon her the advantages of lining up with the Axispowers. It will be difficult for her and dangerous too, to disoblige Hitler. The reactions of Britain to these moves cannot be definitely anticipated at the present moment. Ii is likely, the invasion plan is suspended for the time being but that only shifts the offensive to new theatres, and places her in a still more difficult situation. In Asia too, the position is no less difficult. It is true, Japan is beginning to be tired out with her "China affair" and is willing to leave her alone for some time if Japan is allowed a free hand in certain parts of China. She has offered fresh peace terms to China as a consequence. Evidently her anticipations, of Britain being frightened by her Axis pact have been falsified. This has led to the opening up of the Burma Road and America's taking a more direct interest in the Pacific affairs. But Britain can hardly expect to get America involved in the war in the near future. Roosevelt will do every thing to keep America out of the war. The above facts indicate that Britain has difficult times ahead.

But what we are particularly concerned with is the reaction of India to this threatening international situation. Henceforth India will be the main spring-board from which Britain's Eastern offensive will be launched, The Bureaucracy in India is aware of it and is trying to meet the danger by intensifying the war effort. The Eastern Group Conference which has opened today at Delhi will find ways and means of developing India's resources to the utmost for war-ends whether she willingly consents to it or not. In the meantime the real voice of India must be gagged, India must not speak out her mind regarding this war. Fresh bans on speeches and meetings, the only outlets for public opinion, must be imposed. Even a Vinoba Bhave making speeches in obscure villages must needs be clapped behind the prison. His speeches though hardly aimed at preventing war effort must not be printed or commented upon in the press. The world must be hoodwinked into believing that the entire Indian people are behind Britain in this war, And the Bureaucracy must keep on trying to divert the attention of politically conscious India by holding out high hopes of a "Viceroy's Expanded Council" which the Congress and the Muslim League have both rejected. The Congress was obliged to 'move' though not in our direction or according to our expectations. It started a movement under the leadership of Gandhiji which has so far neither inconvenienced any one nor has advanced an inch in establishing India's self-respector or Independence. There was much speculation as to the course the Government would take with regard to this movement. Many were of opinion that as it would hardly come in the way of Britain's war effort, the Satyagraha would he totally ignored But the question of prestige has got the better of the official wisdom and Binoba Bhave was not allowed to go on with his harmless preachings. Now we know what awaits the other Satyagrahis. In view of the course taken by the Government Mahatmaji has suspended the movement for the time being till he can decide upon the nexr course. Neither he nor the Working Committee think it necessary to take the Indian people into their confidence. So the latter have no duty but to be silent spectators of the whole affair. We have the tragic fact of Congress still hesitating in its course of action while hundreds of India's best men and women are being daily imprisoned and the movements of a still greater number restricted for no greater offence than carrying on their usual political activities. The Congress has failed those who had been its main strength. Not only that, the Congress machinery is directed not to fight the British Imperialism but those who had been more outspoken in defending its honour. And a Subhas Bose or a Sarat Bose must be got out of the way on any pretext however threatning the International situation be or however critical be the times for India.

But we must not give ourselves over to despair. If the Congress has failed let us not fail India in the most critical time when her destiny is about to be shaped for better or for worse. Our path lies clear. Let us marshall all the really revolutionary forces behind India's demand for complete Independence, which issue has been brought to the forefront of world affairs by the international situation, We can no longer allow Imperialist plans being imposed upon us, but must give effect to India's own intention regarding her future in the new scheme of things. It appears some of our comrades have been bewildered by the recent happenings in India and outside and are oppressed by a sense of defeatism. The times are difficult, no doubt, and require our utmost courage and foresight. History teachs us not to despair. Other countries had to face similar periods of gloom and despondency, when only a few had their vision clear and forged ahead with determination and saved their country from being doomed. There shouhl be no hazziness for us. Nagpur is a clear pointer and we must follow up its lead.

সুভাষচন্দ্র সম্পাদিত 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার ২য় বর্ষের ১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ গোপাল হালদারের রচনা। ২৭ অক্টোবর, ১৯৪০ এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার পরে পত্রিকার এই সংখ্যা রাজরোষে পড়ে। তার জামানত বাজেয়াপ্ত করে চার হাজার টাকার নতুন জামানত দাবি করা হয়। ৩০শে নভেম্বর ১৯৪০ সংখ্যায় সেই তথ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রের এক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় ছাপা হয়; যাতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে।

The Poet is no more

The Poet is no more. We wish, we had not to record this. We knew indeed that the sun was about to set. And it is set now. Out of our life a glory is gone, out of the globe a light and joy. Words fail to notice it as words must fail at such an event. For he indeed gave us speech, gave us the thought we call ours. He blew into them life and joy that was his own. That life and joy is departed from our world. And words fail us, therefore; as we fail the Dead.

We must leave him, therefore, to History. That Recording Angel of Time alone can know him, see him whole and complete. He passes our measures, for he passes into History. He cannot be summed up at the moment. Perhaps he will never be summed up at all. No man in fact yields to the arithmetics of his fellowmen. They piece together facts and features; they cannot create the form or the being. For every man is unique. But his uniqueness awaits also discovery. It has to be discovered to him as also for the world. This is the work of the Poet; and this is creation. For the Poet sees into the uniqueness of us all and reveals also the Miracle of Man. His is the testament of uniqueness; it is the testment of humanity too. The Poet unbares to the world the essential uniquness of all individuals. He unravels in the very act too the essential humanity that is 'in widest commonalty spread'. Man is not Man otherwise. The Poet gives him the form—a unique thing; he gives him the soul—a more unique gift, and still the Poet remains his fellowman and shares the common humanity—a most unique phenomenon.

He was equally a Poet and a Man, as we had him.

And in so far as he was that, a Poet and a Man, he defies not only us the living and our littleness; but he also defeats death and its decaying process. He is with the Immortals, now and forever. "He is; he is with Shakespeare" and Keats and Kalidasa. Only all that is mortal in him is in ashes.

Yet we his countrymen and his fellowmen would not countenance even that. That mortal frame was our pillar of light by this long, long night. He was our title to the world's recognition. He was our testament to humanity. We are indeed a 'lost tribe' in the march of peoples. We are in the wilderness for ages. We did not pray for prophets through weary years. We received more than a Prophet:—a Poet. He was to make us a Nation and remake us into Man. He discovered us, therefore, and revealed us unto ourselves. It was a national revelation; it was an awakening of the national being. The Soul of India woke into life and song. And for that Soul of India he was the Covenant too. Our national value was metamorphosed by him into the "world value". The Testament of India grew through him into the Testament of Humanity; the "Religion" we call India into the "Religion of Man". This is the Covenant we made with our destiny. And that destiny the Poet revealed to us. That destiny we must accept even as we lose the Master and the Maker of the Nation.

As the mortal remains return to dust as it must, the immortal truth of that Being remains with us. That to us is not merely the down of his songs, imperishable as they are. It is the Testament of Freedom and Humanity. This is our deathless destiny as revealed by Rabindra Nath, the Poet of India's destiny, and the Poet of India's Freedom.

The Poet is dead. Long live the Poet.

Hindusthan Standard
Thursday, August 7, 1941

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত গোপাল হালদারের সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

আমার প্রসঙ্গে আমি

আমার জন্মদিন—যতদূর জানি, ২৮শে মাঘ সোমবার, ইং ১১।১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

যেভাবে তা পালন করতে ভালবাসি—বাড়িতে, ২।৪ জন বন্ধু এলে ভাল লাগে, হইচই না হয়

আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ—আমার স্ত্রী

আমাকে জীবনে যিনি বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন—আমার পিতা ৺সীতাকান্ত হালদার, জ্যেঠতুতো দাদা ৺রঙ্গীন হালদার

আমার মতে আমার প্রিয় বই—সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা

আমি যা পছন্দ করি না—আমার সামনে আমার প্রশংসা

আমি ভয় পাই যাতে—অপরকে কষ্ট দিতে

আমি বিশ্বাস করি—মানবতা

যে বিষয়ে পড়তে বেশি ভাল লাগে—সাহিত্য

আমার প্রিয় খাবার—দই-সন্দেশ

আমার অবসর বিনোদন কাটে—আড্ডায়

যে লেখাটিতে আমায় বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে—একদা

জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন—বোম্বাই'এর এলিফ্যান্টা কেভ'এ ত্রিমূর্তি দর্শন

আমি যে বিষয়ে স্পর্শকাতর—প্রিয়জনের নিন্দা

আমার প্রিয় পোষাক—ধুতি-পাঞ্জাবী

আমার প্রিয় বিদেশী লেখক—শেক্সপীয়ার

আমার প্রিয় রাজনীতিক—পূরণ চাঁদ যোশী

আমার প্রিয় খেলোয়াড়—উমাপতি কুমার

আমার প্রিয় প্রসাধন—কিচ্ছু নেই

আমি সাধারণত লিখি যে সময়—সকালে লিখতে ভাল লাগে

ঠিকানা—সি. আই. টি. বিল্ডিং, ব্লক-এইচ, ফ্ল্যাট-১৯
কলিকাতা-৭০০০১৪

স্বাক্ষর—গোপাল হালদার
১৯।৩।৮৮

'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা

পরিচয়

মহালয়ার পূর্বেই

প্রকাশিত হবে।

IMPORTANT PUBLICATION OF THE CALCUTTA UNIVERS

1. Bama Bodhini Patrika—Dr. Bharati Ray Rs
2. Asutosh Mukhopadhayer Sikkha Chinta —Dr. D.C. Sinha Rs
3. Purba Banger Kabi Gan—Dr. Dinesh Ch. Sinha Rs.
4. Mymensingha Gitika—Ray Bahadur D.C. Sen Rs.
5. Banglar Baul—Pt. Kshiti Mohan Sen Shastri Rs
6, Agrarian System of Ancient India—U.N. Ghosal Rs.
7. Kavi Kankan Chandi—Sri Srikumar Banerjee Rs,
8. Bankim Smarak Sankha—Dr. Ujjal Kr. Mazumdar Rs
9. Hand Book of the C.U —Calcutta University Rs
10. The Science of Sulba—B.B. Dutta Rs
11 Anchalik Bangla Bhasar Abhidhan— Dr. A. K. Bandhvopadhyay Rs.
12. Ekaler Chhoto Galpa Sanchayan—C. U. Rs.
13. Ekaler Kabita Sanchayan—C. U. Rs.
1.4 Ekaler Prabandha Sanchayan— C. U. Rs.
15. Ekaler Samalochana Sanchayan—C. U. Rs.
16; Sakta Padavali—Amarendra Nath Ray Rs.
17. Vaishnab Padavali (Chayan)—C. U. Rs
18. Studies in Indian Antiquities— H.C. Ray Chaudhury Rs
19. Nabacharyya Pada—Dr. Sasibhusan Dasgupta Rs
20. Temples of Ranipur Jharial—D. R. Das Rs
21, History of Sanskrit Literature— Dr. S. N. Dasgupta & S. K. Dey R
22. Elements of the Science of Language— I. J. S. Taraporewala R
23. An Introduction to Indian Philosophy— Dutta & Chatterjee Rs
24. Yoga Philosophy of Patanjali—H. Aranya Rs.

For further Details Please Contact—

Manager, Book-Depot, Calcutta University,
48, Hazra Road, Calcutta-700 019

All the Publications will be available at the Calcutta Univ
Sales Counter, College Street Campus Calcutta-700 07

PARICHAYA March-June 1994 Reg. No. 13732
WB/EC—26

আমাদের আশা

বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ কুলটি-বরাকর, ডিসেরগড় ও নিয়ামতপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির সংযুক্তিকরণের ফলশ্রুতি বর্তমান "কুলটি মিউনিসিপ্যালিটির" উদ্ভব। এর ফলে জনপ্রতিনিধিদের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তাঁদের পক্ষে ব্যাপকতর জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৃণমূলে জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও নির্বাচকমণ্ডলী তথা— জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

আমরা আশা করব, এর ফলে নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

—প্রকাশ চট্টরাজ
চেয়ারম্যান
কুলটি মিউনিসিপ্যালিটি

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৯০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম ঃ তিরিশ টাকা

পরিচয়